অর্থবিদ্যার পরিচয়

প্রথম খণ্ড

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ঘোষ, এম. এ:, ডি. ফিল্.

ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড
২৯৪ বউবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

MACMILLAN AND COMPANY LIMITED
CALCUTTA BOMBAY MADRAS
Companies and representatives throughout the world

First Edition 1965

Made in India
Printed by B. Mukherjee at Kalika Press Private Ltd.
25, D. L. Roy Street, Calcutta-6 and
Published by U. N. Banerjee, for Macmillan & Co. Ltd.
294, Bow Bazar Street, Calcutta-12

সূচীপত্র

১ | অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু ও আলোচনা-ক্ষেত্র
(Subject-matter and Scope of Economics)

কোন এক সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন তাঁহার দুই শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। শিশু দুইটির কান্না দেখিয়া একজন প্রতিবেশী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেদের কি ব্যাপার?" লিঙ্কন হাসিয়া সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "পৃথিবীতে আর দশজনের যাহা ব্যাপার, ইহাদেরও তাহাই। আমার কাছে তিনটি আখরোট আছে। অথচ ছেলেদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া চাই।"

উপরের ছোট গল্পটির মধ্যে আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটি বড় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহা হইল: আমরা যে সকল দ্রব্য চাহিয়া থাকি তাহাদের তুলনায় আমাদের হাতে অর্থ বা অভাব-পূরণের উপকরণসমূহ অত্যন্ত অপ্রচুর। আমাদের যদি প্রচুর পরিমাণে টাকা-কড়ি থাকিত তাহা হইলে যে কোন দ্রব্য যে কোন পরিমাণে কিনিয়া ইচ্ছামত অভাব পূরণ করিতে পারিতাম।

মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রধান সমস্যা হইল এই: অভাব তাহার অগণিত, কিন্তু অভাব পূরণের উপায় বা উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। কোন মানুষই সম্পূর্ণভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করিতে পারে না; তবে প্রত্যেকে তাহার আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী অবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করে।

মানুষের সকল কাজের প্রেরণা আসে অভাবের তাড়না হইতে। অভাব আবার অফুরন্ত, সীমাহীন। অভাব একদিকে যেমন সীমাহীন, অন্যদিকে আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। আমাদের খাদ্যসামগ্রীব অভাব, বাস-স্থানের অভাব, শিক্ষার অভাব, আমোদ-প্রমোদের অভাব—একটি অপরটির সহিত পূর্তিলাভের জন্য প্রতিযোগিতা করে। আমাদের বিভিন্ন অভাবের কোন্‌টা মুখ্য, কোন্‌টা গৌণ বাছিয়া পছন্দ করিতে হয়। কিন্তু অভাব অগণিত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হইলেও মানুষের হাতে অভাব পূরণের উপকরণ বা আয় সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ আয় দ্বারা অগণিত অভাব কিভাবে পূরণ করে সেই ক্রিয়া-কলাপই অর্থবিদ্যা আলোচনা করে।

সংজ্ঞা ও বিষয়-বস্তু

(Definition and Subject-matter)

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও সংজ্ঞা লইয়া বিতর্কের শেষ নাই ; এ সম্পর্কে শেষ কথাও বলা হয় নাই। মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসিয়াছে। ফলে অর্থ-বিদ্যার পুরাতন সংজ্ঞা ও বিষয়-বস্তু পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং নূতন চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা সেই স্থান গ্রহণ করিতেছে। তাহাছাড়া বিভিন্ন যুগে মনীষিগণ নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া প্রচলিত চিন্তা ও ধারণার উপর নূতন আলোকপাত করিয়া আসিতেছেন। তাহার ফলশ্রুতি হিসাবেও অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও আলোচনা-ক্ষেত্র বিভিন্ন সময়ে নবতর নির্দেশনা পাইতে বাধ্য।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানিগণ অর্থশাস্ত্রকে ধনবিজ্ঞান (Science of Wealth) আখ্যা দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন যে, অর্থবিদ্যার মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল জাতীয় সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ উদ্ঘাটন করা। মানুষের কার্যকলাপের প্রধান লক্ষ্যই হইল ধন বা সম্পদ অর্জন করা। কিভাবে সম্পদ উৎপাদিত হয় এবং কিভাবে ভোগ পূরণে উহা ব্যয়িত হয় তাহাই অর্থবিদ্যার প্রকৃত আলোচনার বিষয়।

ক্ল্যাসিক্যাল মতবাদ

কিন্তু আড্যাম স্মিথ ও তাঁহার অনুগামিগণ অর্থবিদ্যার আলোচনায় সম্পদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে কার্লাইল, রাস্কিন প্রমুখ অনেক চিন্তানায়ক এই শাস্ত্রকে নানাদিক হইতে নিন্দাবাদ করেন। তাঁহারা মন্তব্য করেন যে, যদি সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ ব্যয় সম্পর্কিত কার্যাবলীই অর্থবিদ্যার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে এই শাস্ত্রের পঠন-পাঠন মানুষকে স্বার্থপর, নীচ ও অর্থলোলুপ করিয়া তুলিতে বাধ্য। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহা মানুষের পরিবর্তনশীল বাস্তব জীবনের সহিত সংগতি বজায় রাখিতে পারে নাই। যে অনুমিত শর্তের উপর ক্ল্যাসিক্যাল ধ্যান-ধারণা প্রতিষ্ঠিত তাহা বাস্তব-জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য। ইঁহাদের মতবাদে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মানুষের কার্যক্রম কেবলমাত্র সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে এবং এই অর্থে

মানুষ নিছক অর্থনৈতিক মানুষ (Economic Man)। কিন্তু সভ্যসমাজে মানুষের ক্রিয়াকলাপ আরও নানাবিধ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া থাকে।

অর্থবিদ্যার এই নিন্দাসূচক সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি জানান নয়া ক্ল্যাসিক্যাল (Neo-classical) অর্থবিজ্ঞানিগণের মধ্যমণি অধ্যাপক মার্শাল। এই প্রখ্যাত চিন্তানায়ক অর্থবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা ও বিষয়-বস্তু নির্দেশ করিয়া ইহাকে মানুষের সাধারণ জীবনের একাংশের আলোচনা-ক্ষেত্র বলিয়া দাবি করেন। [১]তিনি বলেন, অর্থ-

মার্শালের চিন্তাধারা

শাস্ত্রের আলোচনায় সম্পদের স্থান আছে বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা বড় স্থান হইল মানুষের সাধারণ জীবনের ব্যবহারিক উন্নয়নের। অর্থবিদ্যার প্রথম ও প্রধান উপজীব্য বিষয় হইল মানুষ ও তাহার ব্যবহারিক মঙ্গল। সম্পদ হইল ঐ মঙ্গল সাধনের উপায়মাত্র। সম্পদ সকল সময়েই মানুষের জাগতিক-জীবনের মঙ্গলসাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। তাহার বৈষয়িক উন্নতির প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় অপরিহার্য। অতএব, মার্শালের মতে, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পদ অর্জন ও সম্পদ ব্যয় সংক্রান্ত যে সকল কার্যক্রম দ্বারা মানুষের ব্যবহারিক মঙ্গলবিধান সম্ভব তাহাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। [২]মার্শাল ও তাঁহার অনুগামিগণের চিন্তাধারায় অর্থবিদ্যার আলোচনায় মানবকল্যাণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই চিন্তাধারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের দিক নির্দেশ করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু নয়া ক্ল্যাসিক্যাল এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন ইংলণ্ডের প্রখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ লায়নেল রবিনস্। তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন যে, অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু সম্পদ নয়, মঙ্গলও নয়। কেবলমাত্র সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সুখ-সুবিধা বিধান অর্থবিদ্যা আলোচনার প্রকৃত ক্ষেত্র নহে। আবার নীতিবিদের ন্যায়

১. Marshall: "Political Economics or Economics is a study of mankind in the ordinary business of life."

২. Marshall: "...it examines that part of the individual and social action which is mostly closely connected with the attainment and with the use of the material requisites of well-being."

অর্থবিজ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গলের মাপকাঠিতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ ও উহার মূল্যবিচার করাও যুক্তিযুক্ত নহে। মঙ্গলের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ করাও সম্ভব নহে। টাকাকড়ির মাপকাঠিতে মঙ্গল সঠিকভাবে পরিমাপ করাও চলে না। অর্থবিদ্যা কিছুতেই কোন লক্ষ্য বা আদর্শাশ্রয়ী হইতে পারে না।[১] মানুষের যে কার্যাবলী মঙ্গলবিধায়ক কেবলমাত্র তাহাই অর্থনীতিক কার্যাবলী এবং অর্থশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু—রবিনস্ নয়া ক্ল্যাসিক্যালগণের এই চিন্তাধারা গ্রহণ করেন নাই।

রবিনস্ অর্থশাস্ত্রকে মানব কল্যাণ বৃদ্ধির উপায় হিসাবে স্বীকার না করিলেও ইহাকে তিনি বিশ্লেষণধর্মী ও বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, মানুষের অভাব অগণিত কিন্তু অভাব পূরণের জন্য তাহার হাতে যে সকল সম্পদ বা উপকরণ আছে তাহা অপ্রচুর। এই অপ্রচুর উপকরণসমূহ আবার বহুরকমের ব্যবহারের উপযোগী। অগণিত অভাব বা বিবিধ প্রদত্ত উদ্দেশ্য (given ends) পূরণের জন্য মানুষ তাহার হাতের উপকরণগুলির কোন্‌টিকে কোন্ ব্যবহারে নিয়োগ করিবে তাহা নির্বাচন করে। রবিনসের মতে অর্থবিদ্যা হইল এমন একটি বিজ্ঞান যাহা মানুষের সেই আচরণ বা কার্যাবলী আলোচনা করে যাহাতে তাহার বহুবিধ অভাব বা উদ্দেশ্য এবং বিবিধ ব্যবহারোপযোগী উপকরণসমূহ বা সম্পদের সম্পর্ক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

রবিনস প্রদত্ত সংজ্ঞা

রবিনসের উপরি-উক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় মানুষের জীবনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। প্রথমত, মানুষের অভাব বা উদ্দেশ্য (ends) অগণিত। দ্বিতীয়ত, তাহার হাতে অভাব পূরণের সময় ও উপায়-সমূহ (means) অপ্রচুর বা সীমাবদ্ধ। এই উপায়সমূহ বা উপকরণগুলি আবার বিভিন্ন ব্যবহারের (alternative uses) উপযোগী। তৃতীয়ত, বিভিন্ন অভাব বা উদ্দেশ্যগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে মানুষকে তাহার নিজের হাতের উপায় বা উপকরণসমূহকে বিবিধ ব্যবহারের জন্য বাছিয়া পছন্দ করিতে হয়। বিবিধ ব্যবহারের উপযোগী অপ্রচুর উপায়গুলি দ্বারা সে কিভাবে তাহার অসংখ্য অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা করে মানুষের সেই

১. Robbins : "Economics is neutral between ends."

ক্রিয়াকলাপই অর্থবিদ্যার মৌল বিষয়-বস্তু। রবিনসের মতে অপ্রাচুর্যকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের আচরণ বা কার্যক্রম অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা।[১]

কিন্তু রবিনসের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারাও সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তাঁহার সংজ্ঞায় অর্থবিদ্যার সামাজিক দিকটা একেবারে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। ফলে, তাঁহার হাতে অর্থবিদ্যার অধ্যয়ন ক্ষেত্র বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়াছে। শুধু ব্যক্তিগত ভোগ মিটাইতে মানুষ কিভাবে পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করে অর্থশাস্ত্র কেবলমাত্র সেই আলোচনাতে কেন্দ্রীভূত থাকিবে ইহা মোটেই কাম্য নহে। যাহাতে সীমাবদ্ধ সম্পদ দ্বারা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয় অর্থবিদ্যা সে বিষয়েও নির্দেশ দিবে।

অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রশ রবিনসের চিন্তাধারার আর একটি অসম্পূর্ণতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মানুষের অভাব অসংখ্য। সেই তুলনায় অভাব পূরণ করিবার উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। কেন না, তাঁহার আয় পরিমিত পরিমিত আয় দ্বারা অগণিত অভাব পূরণ করা সম্ভব নহে। সেইজন্য নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়—অভাবগুলির মধ্যে কোন্‌টি আগে পূরণ করিতে হইবে, কোন্‌টিই বা পরে মিটাইলে চলিবে। আবার অভাব পূরণ করিতে হইলে আয় দ্বারা অভাব মিটাইবার উপকরণগুলি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। তাহার জন্য ভোগকারিগণকে উৎপাদনকারিগণের নিকট হইতে দ্রব্য বা সেবাকার্য বিনিময় করিতে হয়। এইরূপে বিনিময়ের মাধ্যমে দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া অগণিত অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ যে চেষ্টা করে উহাই অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।[২] রবিনসের সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ এই জন্য যে, তিনি বিনিময়ের ভূমিকাকে অর্থবিদ্যার আলোচনায় আদৌ স্থান দেন নাই।

রবিনসের চিন্তাধারায় ত্রুটি

রবিনসের মতবাদের একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমানে অধিকাংশ

১. **Robbins :** "Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."

২. **Cairncross :** "Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their wants, and how these attempts react through exchange."

অর্থবিজ্ঞানী ইঁহার অভিমতই মানিয়া লইয়াছেন। যেমন, ষ্টোনিয়ের ও হেগ রবিনসের অনুকরণে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "অর্থশাস্ত্র প্রধানত অপ্রাচুর্য ও অপ্রাচুর্য হইতে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহাদের আলোচনা করে।"[১] কেইনস ও তাঁহার অনুগামিগণের অনেকে অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় অপ্রাচুর্য ছাড়া আরও দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উহারা হইল, কর্মনিয়োগ এবং জাতীয় আয়। অতি সম্প্রতি নিয়োগ ও আয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলির আলোচনা অর্থবিদ্যায় বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে।

অর্থনীতিক সমস্যার প্রকৃতি
(Nature of Economic Problems)

মানুষের অভাব অগণিত। কিন্তু অভাব পূরণ করিবার উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। মানুষ তাহার অগণিত অভাব সীমাবদ্ধ উপকরণ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পূরণ করিতে কি উপায়ে সক্ষম হইবে অর্থবিদ্যা সেই সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়। মানুষের অভাবের পূরণ হয় দ্রব্য ও সেবাকার্যাদি ভোগের মাধ্যমে। অভাব পূরণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনের। আবার অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ধার্য করিবারও প্রয়োজন আছে। অনেক সময় ব্যক্তিগত অভাববোধ সামাজিক অভাববোধ অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। ইহা অবশ্য নির্ভর করে সামাজিক গঠন ও মূল্যবোধের উপর। অতএব বলা চলে যে, অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের প্রধান কাজ হইল ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষের অভাবের গুরুত্ব নির্দেশ করা এবং তাহার ভিত্তিতে দ্রব্য ও সেবাদি উৎপাদনের ধারা স্থির করা।

অভাবের গুরুত্ব নির্দেশ এবং উৎপাদনের ধারা নির্ধারণ

দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন নির্ভর করে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও শিল্পজ্ঞানের (technology) উপর। যে কোন দেশে উৎপাদনের উপাদানসমূহ প্রয়োজনের তুলনায় সীমাবদ্ধ। ফলে, প্রত্যেক দেশের উৎপাদন ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা আবার নির্ভর করে দেশের বর্তমান শিল্পজ্ঞানের উপর। কোন্ দ্রব্য, কোন্ কোন্ উপাদানের

১. Stonier & Hague : "Economics is fundamentally a study of scarcity and of the problems which scarcity gives rise."

কতটা পরিমাণ নিয়োগ দ্বারা, কি পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় শিল্পজ্ঞানের মারফৎ। আবার ইহাও লক্ষণীয় যে, উপাদানগুলির যোগান যে শুধু সীমাবদ্ধ তাহা নহে, উহারা বিকল্প ব্যবহারেরও উপযোগী। উহারা একাধিক দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতে পারে। উহারা যদি একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ অন্য একটি দ্রব্যের উৎপাদনে উহাদের যোগান ঘাটতি পড়িবে এবং ঐ দ্রব্যটির উৎপাদনও ইহার ফলে কম পরিমাণে হইবে।

উৎপাদনে বিবিধ উপাদানের বিলি-বণ্টন ও ব্যবহার

অবশ্য এইভাবে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্য একটি দ্রব্যের উৎপাদনে কতটা হ্রাস পাইবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে কোন্ শিল্প-কৌশল ও উৎপাদন-পদ্ধতির ব্যবহার করা হইতেছে তাহার উপর। সুতরাং, অর্থশাস্ত্রীর আর একটি প্রধান কাজ হইল, কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদানের কিভাবে বিলি-বণ্টন ও ব্যবহার হইবে সে সমস্যার বিশ্লেষণ করা এবং কোন্ উৎপাদন পদ্ধতি নির্বাচন ও ব্যবহার দ্বারা দেশের উৎপাদন সর্বাধিক সম্ভব বৃদ্ধি পাইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া।

কিন্তু মানুষের অভাব পূরণের জন্য উৎপাদনের উপকরণসমূহের উপযুক্ত বিলি-বণ্টন এবং উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্য ও সেবাদির যোগান বাড়ানো একমাত্র অর্থনীতিক সমস্যা নহে। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাদি যাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এবং বিভিন্ন সময়ের মধ্যে কাম্যভাবে বণ্টিত হয় সে-ব্যবস্থাও অর্থশাস্ত্রীকে স্থির করিতে হয়। উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাদি বণ্টনের উপর ভোগকারিগণ কতটা পরিমাণ অভাব পূরণ করিতে সক্ষম তাহা নির্ভর করে।

উৎপাদিত দ্রব্যের কাম্য বণ্টন

মানুষের অভাব পূরণই অর্থনীতিক ক্রিয়া-কলাপের আদি কথা। এই অভাব পূরণ নির্ভর করে প্রধানত উৎপাদনের উপর। উৎপাদনের পরিমাণ ও উহার বণ্টন-ব্যবস্থাই সমাজের অর্থনীতিক মঙ্গলকে নিয়মিত করে। যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলি পূর্ণভাবে নিয়োগ লাভ করে না, অর্থনীতিক মঙ্গলের দিক হইতে সে ব্যবস্থাকে মোটেই দক্ষ বলা চলে না। আবার শুধু উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ লাভ ঘটিলেই যে উৎপাদন-ব্যবস্থা দক্ষ

উপাদানসমূহের পূর্ণ নিয়োগ

হইবে, তাহাও ঠিক নহে। দ্রব্যের উৎপাদন পরিমাণ যেমন উপাদানগুলির পূর্ণ নিয়োগের উপর নির্ভরশীল তেমনি উপাদানগুলি বিভিন্ন ব্যবহারে কিভাবে বিলি-বণ্টন করা হয়, দক্ষ উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য তাহারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মানুষের অভাব পূবণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে আর একটি সমস্যার সমাধানও অর্থবিজ্ঞানীকে খুঁজিয়া বাহিব করিতে হয়। ইহা হইল : কি করিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান বাড়াইয়া ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে মূলধনই মানুষেব সৃষ্ট এবং এই মূলধন গঠনের সঙ্গে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের পরিমাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মূলধনের গঠন আবার নির্ভর করে ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় বর্তমান ভোগের পরিমাণ হ্রাসের উপর। অর্থশাস্ত্রীকে স্থির করিতে হয় দেশের বর্তমান আয়েব কতটা ভোগ্যদ্রব্যের অভাব পূরণে ব্যয় করা উচিত, আবাব কতটাই বা ভবিষ্যৎ মূলধন সৃষ্টিব কাজে নিয়োগ করা সমীচীন।

মূলধন গঠন

টাকাকড়ি সংক্রান্ত কাজকর্ম অর্থবিদ্যার কতটা আলোচনার বিষয়?

(How far Economics studies the part played by money in human affairs ?)

কেয়ার্ণক্রশ প্রমুখ অনেক অর্থনীতিবিদেব ধারণা এই যে, টাকাকড়ি বা অর্থকে কেন্দ্র কবিয়া মানুষ দিনরাত যে কাজকর্ম করিয়া থাকে অর্থবিদ্যা তাহারই আলোচনা করে।[১]

মানুষ সকালে শয্যাত্যাগ হইতে শুরু করিয়া রাত্রে শয্যাগ্রহণ অবধি অসংখ্য কাজ করিয়া থাকে। তাহার প্রতিটি কাজের উদ্দেশ্যই কোন-না-কোন অভাব পূরণের প্রচেষ্টা। মানুষের অভাব অগণিত। একটি দ্রব্যের অভাব মিটিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন দ্রব্যের জন্য অভাবের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অভাব মিটাইবার জন্য বিবিধ উপকরণ ও দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে হয়। অভাব তৃপ্তির উপকরণসমূহ সংগ্রহের জন্য আবার টাকাকড়ি উপার্জন করিতে হয়।

১. Cairncross : "Economics studies the part played by money in human affairs."

উপার্জিত অর্থের বিনিময়ে উপকরণ বা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মানুষ তাহাব অধিকাংশ অভাব পূরণ করিতে পারে। অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য মানুষের অর্থ উপার্জন ও অর্থ ব্যয়ের যে প্রচেষ্টা উহাই তাহার অর্থনীতিক ক্রিয়া এবং অর্থশাস্ত্রের বিষয়-বস্তু।

ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, একমাত্র টাকাকড়ি উপার্জন ও ব্যয় দ্বারাই মানুষের ক্রিয়াকলাপ শেষ হইয়া যায় না। অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয় ছাড়াও মানুষ অনেক কাজ করিতে পারে। যেমন, মা যখন সন্তানকে স্তন্যপান করান, সে কাজের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন করা নহে। সে কাজকে অর্থনীতিক বলা যায় না এবং উহা অর্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নহে। মানুষের যে-সকল ক্রিয়াকলাপ একমাত্র অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায় উহাই অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানুষের জীবনে টাকাকড়ির কি ভূমিকা, অর্থশাস্ত্র তাহা লইয়া আলোচনা করে।

কিন্তু অর্থবিদ্যা কেবলমাত্র টাকাকড়ির কি ভূমিকা সেই সম্পর্কে আলোচনা করে বলিলে ঠিক হইবে না। প্রকৃতপক্ষে অর্থবিদ্যা টাকাকড়ির আলোচনা করে না, টাকাকড়ি যে বিষয়গুলিতে ব্যবহার করা হয়, সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। টাকাকড়িব ব্যবহার সম্পর্কিত বিষয়গুলি হইল প্রধানত তিনটি: (১) বিনিময় (exchange), (২) অপ্রাচুর্য (scarcity), এবং (৩) নির্বাচন (choice)।

বিনিময়

মানুষ টাকাকড়ি চায় তাহার কারণ উহা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। প্রাচীনকালে যখন টাকাকড়ির প্রচলন ছিল না তখন মানুষ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময় করিত। কিন্তু এই ব্যবস্থার অনেক প্রকার অসুবিধা ছিল বলিয়া টাকা পয়সার প্রচলন শুরু হয়। অথচ টাকাকড়ি কিন্তু মানুষের অভাব প্রত্যক্ষভাবে পূবণ করিতে পারে না। টাকা পয়সা দ্বারা মানুষ ভোগ্যদ্রব্য কিনিয়া তবে অভাব পূরণ করে। টাকাকাড়ি বিনিময়ের উপকরণ মাত্র।

অপ্রাচুর্য

কিন্তু টাকাকড়ি ব্যয় করিয়া মানুষ যে সকল দ্রব্য যোগাড় করে উহাদের যোগান অফুরন্ত নহে। যে সকল দ্রব্যের যোগান চাহিদার তুলনায় অফুরন্ত, সেগুলির উপর মানুষ স্বভাবত টাকাকড়ি ব্যয় করে না। কিন্তু যে সকল দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ ও অপ্রচুর, উহাদের বিনিময় করিতেই মানুষ টাকাকড়ি ব্যয়

করে। দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর বলিয়াই অর্থব্যয় ব্যাপারে আমরা বিশেষভাবে ব্যয়-সংক্ষেপ করি। মানুষের অভাবের শেষ নাই; কিন্তু অগণিত অভাব পূরণের উপকরণ সংগ্রহের জন্য তাহার হাতে অর্থের যোগান সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ অর্থের বিনিময়ে মানুষ ভোগ্যদ্রব্য কিনিয়া তাহার অভাব মোচন করে।

অভাব অগণিত অথচ অর্থের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া অর্থব্যয় সম্পর্কে মানুষকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অর্থ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই অর্থেব এত দাম। আবার অর্থের এত দাম বলিয়াই অর্থব্যয় সম্পর্কে মানুষকে মিতাচারী হইতে হয়, তাহাকে বাছাই করিতে হয়

নিবাচন

কোন্ অভাবটি আগে পূরণ করিবে, কোন্‌টি পরে মিটাইবে। আমরা যখন একটি অভাব মিটাইতে কিছু অর্থব্যয় করি তাহাব অর্থ আমাদের আর একটি অভাব মিটাইতে অর্থের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়। সেইজন্য অর্থব্যয়ের সময় আমাদের নির্বাচন কবিতে হয় কোন্‌টি মুখ্য অভাব, কোন্‌টি গৌণ অভাব।

অতএব এইরূপ বলা যায় যে, অর্থবিদ্যা কেবলমাত্র টাকাকড়ি সম্পর্কে আলোচনা করে না। কিন্তু টাকাকড়ি ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের যে তিনটি প্রধান কাজ—যথা, বিনিময়, অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন—ইহাই অর্থবিদ্যার প্রকৃত আলোচ্য বিষয়। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে অর্থবিদ্যার নূতন করিয়া এই ধবনের একটি সহজ সংজ্ঞা নির্দেশ করা চলে: "সীমাবদ্ধ অর্থদ্বারা মানুষ তাহাব অগণিত অভাব পূরণের যে চেষ্টা করে সেই কাজই অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু।"

অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি
(Scope of Economics)

অর্থবিদ্যার আলোচনার পরিধি জানিতে হইলে ঐ শাস্ত্রের প্রকৃত উপাদান বা বিষয়-বস্তু কি তাহা জানা প্রয়োজন। অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, উহার আলোচনা-ক্ষেত্রের পরিধি বহু দিক হইতে সীমাবদ্ধ।

অর্থবিদ্যা একটি সমাজ-বিজ্ঞান। সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাজকর্ম লইয়া অর্থশাস্ত্র আলোচনা করে। সমাজ-বহির্ভূত মানুষের কাজকর্ম

অর্থবিদ্যার আলোচনার মধ্যে পড়ে না। ইহার কারণ এই যে, সমাজ-বহির্ভূত মানুষের কাজকর্মের দরুণ কোন অর্থনীতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ তাহার অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য অনেক কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার সকল কর্মপ্রচেষ্টাই অর্থ-বিদ্যার আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। যেমন, মা যখন সন্তানকে সেবাশুশ্রূষা করেন তখন সন্তানের অভাব পবিতৃপ্ত হয়। কিন্তু মায়েব এই কাজ অর্থদ্বারা পরিমাপ করা যায় না। মানুষেব যে সকল কর্মপ্রচেষ্টা বা সেবাদি অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা চলে না সেগুলি অর্থবিদ্যাব আলোচনা-ক্ষেত্র নহে। মানুষের যে সকল কাজকর্ম টাকাকড়ির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা টাকাকড়ির মাধ্যমে পরিমাপ করা চলে, অর্থবিদ্যায় কেবল উহাদেরই আলোচনা করা হয।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অর্থবিদ্যা টাকাকডি সম্পর্কিত কাজকর্মের আলোচনা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে টাকাকডি ব্যবহার সম্পর্কিত সমস্যাব বিষয়েই এই শাস্ত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া থাকে। অর্থশাস্ত্রের মূল সমস্যা হইল, অপ্রচুর অর্থ বা উপকরণ দ্বাবা মানুষ তাহার অগণিত অভাব কিভাবে পূরণ করে তাহার বিশ্লেষণ কবা।

কিন্তু কেবলমাত্র এই ধরনের সমস্যার বিশ্লেষণ দ্বারাই অর্থবিদ্যার অধ্যয়নক্ষেত্র শেষ হইয়া যায় না। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কিভাবে সম্ভব হইতে পারে তাহার আহলাচনাও অর্থশাস্ত্রেব গণ্ডির মধ্যে। অর্থশাস্ত্র কেবল অর্থনীতিক সমস্যাব বিচার-বিশ্লেষণ দ্বাবা সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা জ্ঞানের উপর আলোক সম্পাত করে না। সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াও ইহা মানব কল্যাণের পথনির্দেশ করিয়া থাকে। অর্থশাস্ত্র একদিকে যেমন অর্থনীতিক সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ করিবার মত উপযুক্ত জ্ঞানের সন্ধান দেয়, অন্যদিকে সমস্যা নিরাকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারও অনুসন্ধান করে। আধুনিক অর্থশাস্ত্রের আলোচনায় মানব-কল্যাণের পথনির্দেশ বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

অর্থনীতিক বিধিগুলির প্রকৃতি

(Nature of Economic Laws)

অর্থবিদ্যা বিজ্ঞানধর্মী শাস্ত্র। বিজ্ঞানের যেমন কতকগুলি সাধারণ

বিধি বা নিয়ম আছে, অর্থবিদ্যারও কতকগুলি বিধি আছে। বিজ্ঞানের বিধি বলিতে বুঝায় এমন একটি সাধারণ বিবৃতি যাহা দুইটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং ঐ সম্পর্কের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছুটা সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত দিয়া থাকে।[১] বৈজ্ঞানিক বিধিগুলি সাধারণভাবে কতকগুলি প্রবণতা বা ঝোঁক যাহা সাধারণ ভাবে নির্ভুল বা নিশ্চিত হইয়া থাকে।

অর্থনীতিক বিধি কাহাকে বলে?

অর্থনীতিক বিধিগুলিও বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় কার্য-কারণ সম্বন্ধের পূর্বাভাস দিয়া থাকে। সাধারণ অবস্থায় মানুষের আচরণ বা কার্যাবলীর ঝোঁক কোন্ দিকে যাইতে পারে অর্থনীতিক বিধিগুলি তাহারই ইঙ্গিত দিয়া থাকে। যেমন, কোনও দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা বাড়িবে। সাধারণ অবস্থায় মানুষের আচরণের সাধারণ প্রবণতা নির্দেশ করাই অর্থনীতিক বিধির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় সুনিশ্চিত নহে। অর্থনীতিক বিধিগুলি মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া থাকে। মানুষের কার্যকলাপ সকল অবস্থাতে একইরূপ হইবে—অর্থবিদ্যা তাহা বলিতে পারে না। মানুষের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে প্রত্যেকেরই একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, প্রত্যেকেই কিছুটা বিবেচনা-প্রবণ (rational)। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেচনা ছাড়াও মানুষের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা আরও অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের প্রবৃত্তি, মানসিক উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, অজ্ঞতা, সংস্কার ইত্যাদি অনেক সময় তাহার বিচার ও বিবেক-বুদ্ধিকে ম্রিয়মাণ করিয়া কর্ম-প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করে। মানুষের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা যখন এইরূপ বহুবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং ইহাদের প্রত্যেকটি যখন পরিবর্তনশীল তখন মানুষের কার্যক্রম সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নিয়ম বা বিধি ধার্য করা সম্ভব নয়। সেইজন্য অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতিক বিধিকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের সহিত তুলনা না করিয়া জোয়ার-ভাঁটার

অর্থনীতিক বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক বিধির ন্যায় নিশ্চিত ও নির্ভুল নহে

---

১. Marshall: "...a general proposition or statement of tendencie[s] more or less certain, more or less definite."

নিয়মের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১] মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি নিয়ম। এই নিয়মটি নিশ্চিত। একথা নির্ভুলভাবে বলা যায় যে, কোন দ্রব্য উপরে ছুড়িয়া মারিলে উহা পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ভূমিতলে পড়িয়া যাইবে। বায়ুর গতি, দ্রব্যটির ওজন ইত্যাদি জানিতে পারিলে একথাও বলা যায়, কতটা বেগে দ্রব্যটি ভূমিতলে নামিয়া আসিবে। কিন্তু জোয়ার-ভাঁটার ক্ষেত্রে এইরূপ নিশ্চিত ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না। জোয়ার-ভাঁটার সম্ভাব্য সময় ও কারণগুলি অনুমান করা সম্ভব; কিন্তু জোয়ারের গতিবেগ কতটা উঠিবে সে সম্বন্ধে নির্ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায় না। বৈজ্ঞানিক বিধিগুলির তুলনায় অর্থনীতিক বিধিগুলি কম নিশ্চিত, কম যথাযথ। রসায়নশাস্ত্র কিংবা অন্যান্য প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি জড়পদার্থ লইয়া আলোচনা করে। সেইজন্য উহাদের বিধিগুলি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল হইলেও শর্তগুলির ব্যতিক্রম দেখা যায় না। কিন্তু অর্থবিদ্যা সজীব মানুষের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে বলিয়া অর্থনীতিক বিধিগুলি যে সকল শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি সকল পরিবেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলে, অর্থনীতিক বিধিগুলি মানুষের আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে পারে না। দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে, কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে দাম কমিলে চাহিদা কতটা বাড়িবে তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেইজন্য 'অর্থনীতিক বিধিগুলি কার্যত অনুমান-সাপেক্ষ (hypothetical) বা শর্তাধীন। অনুমানগুলি সত্য হইলে, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে, তবেই মানুষের আচরণের সাধারণ প্রবণতা প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। যেমন, মানুষের আয়, অভ্যাস, রুচিবোধ, পছন্দক্রম ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবেই দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়িবে। সেইজন্য কোন অর্থনীতিক বিধি বিবৃত করিতে হইলে 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিলে' (other things remaining the same) কথাটি ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি অনুমান-সাপেক্ষ বলিয়া মূল্যহীন বলা চলে

১. Marshall: "The laws of Economics are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact laws of gravitation."

না। বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলিও অনুমান-ধর্মী, কিন্তু তাহা বলিয়া উহারা উপযোগ-বিহীন নহে। ইহা সত্য যে, অর্থনীতিক বিধিগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়ম অপেক্ষা অধিক অনুমান-নির্ভর। মানুষের আচরণ বিভিন্ন পরিবেশে কি হইতে পারে সে সম্পর্কে অর্থনীতিক বিধিগুলি নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না। কিন্তু অর্থনীতিক বিধিগুলি সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক আচরণের সাধারণ প্রবণতাগুলি সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়া থাকে, বাস্তব জীবনে তাহার মূল্য বড কম নহে। আবাব অনেক অর্থনীতিক বিধি আছে যাহার উৎস বিজ্ঞান, যাহা জড পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করে। যেমন, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of Diminishing Returns)। এইরূপ বিধিগুলি শর্তসাপেক্ষ হইলেও বৈজ্ঞানিক বিধিব ন্যায় ইহাদেব বড একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

অর্থনীতিক বিধিগুলি অনুমানসাপেক্ষ হইলেও মূল্যহীন নহে

অর্থবিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি

(Methodology of Economics)

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সাধারণত যে দুইটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, অর্থবিদ্যার আলোচনায় সেই দুইটি পদ্ধতিরই ব্যবহার দেখা যায়। এই পদ্ধতি দুইটি হইল: (১) অবরোহ এবং (২) আবোহ পদ্ধতি (Deductive and Inductive Methods)।

অবরোহ পদ্ধতিতে কতকগুলি মূল সত্য ধরিয়া লইয়া উহা হইতে বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিতে হয়। মূল সত্য হইতে বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমে অনুমান-সাপেক্ষ মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি হইতে যুক্তির সাহায্যে তথ্যসমূহের বিশ্লেষণেব অবতারণা করিতে হয়। পরে এইরূপ বিশ্লেষণ হইতে সিদ্ধান্তগুলির সত্যতায় পৌঁছান হয়। এই পদ্ধতিটিকে অনুমান-সিদ্ধান্ত পদ্ধতি বা বিমূর্ত পদ্ধতিও (Hypothetical Method or Abstract Method) বলা হয়।

অববোহ পদ্ধতি

আরোহ পদ্ধতি অবরোহ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত। অবরোহ পদ্ধতিতে যেমন সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে পৌঁছান হয়, আরোহ পদ্ধতিতে

তেমনি বিশেষ সত্য হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথমে মানুষের ইতিহাস বা বাস্তব-জীবনের ঘটনাবলী হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তারপর ঐ তথ্যেব ভিত্তিতে সাধারণ সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছান হয়। আরোহ পদ্ধতিকে বাস্তব বা ঐতিহাসিক পদ্ধতিও (Realistic or Historical Method) বলে।

আবোহ পদ্ধতি

অবরোহ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত সরল। যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তিসমূহ অবতারণা করা হয় সেগুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্ভুলভাবে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি যে সকল অনুমানের উপব প্রতিষ্ঠিত উহারা প্রায়ই বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য। ফলে, অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ সিদ্ধান্তগুলিব সত্যতা প্রমাণ করা বাস্তবত সম্ভব নহে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ কেবলমাত্র অবরোহ পদ্ধতি ব্যবহাব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি কাল্পনিক ও বাস্তব-জীবনের সহিত সম্পর্করহিত হইয়া পড়ে।

অববোহ পদ্ধতিব সুবিধা ও অসুবিধা

আরোহ পদ্ধতির প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। এই পদ্ধতিটি অনুমানেব উপব নির্ভর করে না। ইহা বাস্তব তথ্যের উপর নির্ভব করিয়া বিশেষ সত্য হইতে সাধাবণ সত্যে উপনীত হয় বলিয়া অধিকতর নির্ভুল ও নিশ্চিত। এই পদ্ধতির প্রধান সমর্থক জার্মানীর ঐতিহাসিক অর্থবিজ্ঞানিগণ। ইঁহারা এই পদ্ধতি প্রয়োগদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যার অনুমান-সাপেক্ষ সাধারণ নীতিগুলি অবাস্তব ও অসম্পূর্ণ। আবার এই পদ্ধতির সাহায্যে ইঁহাবা এই সিদ্ধান্তেও আসিয়াছেন যে, মানুষের পরিবর্তনশীল অর্থনীতিক আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সার্বজনীন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু আরোহ পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ ত্রুটি-বিহীন নহে। এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে বহু তথ্যেব ভিত্তিতে পর্যালোচনা অবতারণা করা হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত সাধারণ সত্য নির্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

আরোহ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যার আলোচনায় অবরোহ পদ্ধতিরই প্রাধান্য ছিল।

কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল অর্থবিদ্যার আলোচনায় অবরোহ ও আরোহ এই দুইটি পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

বর্তমানে অর্থবিদ্যার আলোচনায় গাণিতিক পদ্ধতি (Mathematical Method) বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহা অর্থবিদ্যা বিশ্লেষণের পৃথক একটি পদ্ধতি নহে। কার্যত ইহা অবরোহ ও আরোহ এই উভয় পদ্ধতির অন্তর্গত একটি নবতর বিশ্লেষণ ধারা।

গাণিতিক পদ্ধতি

ইদানীং অর্থবিদ্যার আলোচনা-ক্ষেত্র এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, ইহার এক একটি শাখা এক একটি নূতন ও পৃথক পঠন-পাঠনের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। আজিকার বিশেষীকরণের (specialisation) যুগে অর্থবিদ্যার আলোচনা শুধু বর্ণনা-প্রধান (descriptive) নহে, ইহা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ-প্রধান (analytical) হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে সংক্ষিপ্ততা, ধারণার সুস্পষ্টতা ও যথার্থতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। ফলে, গণিত, গাণিতিক সমীকরণ, গাণিতিক প্রতীক ইত্যাদির ব্যবহার অর্থবিদ্যার আলোচনায় প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সম্প্রতি এই নবতর গাণিতিক ধারা ইকনমেট্রিক্স (Econometrics) নামে অর্থবিদ্যার নূতন শাখা হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। অর্থবিদ্যা যতই বিশ্লেষণ-ধর্মী হইতেছে, ততই ইহার আলোচনায় গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োগও বৃদ্ধি পাইতেছে।

তবে একথা মনে রাখা উচিত যে, গাণিতিক পদ্ধতির অধিক ব্যবহারেব দরুণ অর্থবিদ্যার আলোচনা অবাস্তব হইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। অর্থবিদ্যা যে মুখ্যত পরিবর্তনশীল মানব-সমাজের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বিদ্যা একথা ভুলিলে চলিবে না। গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে অর্থবিদ্যা নিছক বিশ্লেষণের যন্ত্র (tools of Economic Analysis) ও তত্ত্বপ্রধান হইয়া না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অর্থবিদ্যা
(Micro-Economics and Macro-Economics)

বর্তমানে অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণ ধারা দুইটি বিভিন্ন পথে অনুসৃত হয়: (১) ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ এবং (২) সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ। ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণে অর্থবিদ্যাকে ক্ষুদ্রত্বের দিক,

ষ্টের দিক (Micro aspect) হইতে আলোচনা করা হয়। ইহা ইল অর্থ-ব্যবস্থার অংশ-বিশেষের আলোচনা।[১] অপরপক্ষে সমষ্টিগত র্থনীতিক বিশ্লেষণে অর্থ-ব্যবস্থাকে সমগ্রতার দিক, সমষ্টির দিক (Macro spect) হইতে আলোচনা করা হয়। সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে কটি বিষয়-বস্তু ধরিয়া উহার বিভিন্ন কার্যাবলীর বিশ্লেষণ করাই সমষ্টিগত র্থবিদ্যার বৈশিষ্ট্য।[২]

ব্যষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ

ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যায় অর্থনীতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের আলোচনা করা হয়। যেমন, আমরা যখন ভোগকারীর ব্যক্তিগত আচরণ, একটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন, একটি শিল্পের উৎপাদন, একটি দ্রব্যের দাম, উৎপাদনের একটি পাদানের মূল্য ইত্যাদি কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আলোচনা করি, খন সেই আলোচনাকে ব্যষ্টিগত অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু হিসাবে ধরা হয়। াষ্টিগত অর্থবিদ্যার আলোচনায় ব্যক্তিবিশেষের কিংবা একটি শিল্পের াহিদা বিশ্লেষণ করা হয়, সমাজের সামগ্রিক চাহিদা আলোচনা করা হয় । সেইরূপ ব্যক্তি বিশেষের বা একটি শিল্পের আয় কিভাবে স্থির হয় াহাই ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের বিষয়-বস্তু। জাতীয় আয় কিভাবে নির্বাচিত হয় াহা এই বিশ্লেষণের মধ্যে ধরা হয় না। একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিয়োগ ই বিশ্লেষণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কিন্তু গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থার মগ্রিক নিয়োগের আলোচনা এই বিশ্লেষণ ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না।

ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সামগ্রিক র্থনীতিক ব্যবস্থাতে পূর্ণনিয়োগ বর্তমান আছে ইহা অনুমান করিয়া ইয়া, ঐ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের আলোচনা করা হয়। এই অনুমানের ত্তিতে অর্থনীতিক সমস্যা প্রধানত উৎপাদনের উপকরণসমূহের বিলি-বণ্টন । মূল্য-তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া দেখা দেয়। ক্ল্যাসিক্যাল ও নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাঁহাদের আলোচনায় ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। ফলে, তাঁহারা প্রধানত মূল্য ও বণ্টন-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

১. গ্রীক শব্দ 'Micros' হইতে 'Micro' কথাটির উৎপত্তি। 'Micros' অর্থ 'ক্ষুদ্র', একটি দ্রব্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ।

২. 'Macro' কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'Macros' হইতে। 'Macros' অর্থ সমগ্রত্ব, সমষ্টি, বৃহত্তত্ব।

সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার আলোচনায় কোন গুরুত্ব তাঁহারা প্রদান করেন নাই।

অধুনা লর্ড কেইনস্‌ই সর্বপ্রথম সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অর্থনীতিক ব্যবস্থার সামগ্রিকতা গোটা অর্থ-ব্যবস্থার গড় লইয়া আলোচনা করা হয়। জাতীয় আয়, জাতীয় উৎপাদন, মোট সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ, মোট নিয়োগ, মোট চাহিদা, মোট যোগান, সাধারণ মূল্যস্তর, মজুরি ও সুদের হারের গড় ইত্যাদি সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার আলোচনার বিষয়-বস্তু। কিভাবে এই সকল সমষ্টি পরস্পর সম্পর্কিত, কিভাবে একটি আর একটিকে প্রভাবিত করিয়া সামগ্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর কার্য করে সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা তাহা অনুসন্ধান করা হয়।

সমষ্টিগত অর্থনীতিক বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণে পূর্ণনিয়োগের অনুমান করা হয় না। সেইজন্য উপরি-উল্লিখিত অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন সমষ্টি কিভাবে নির্ধারিত হয়, তাহা জানা প্রয়োজন হয়। এই সমষ্টিগুলির নির্ধারকসমূহের দ্বারা দেশের আয় ও নিয়োগ কিভাবে সর্বাধিক সম্ভব হইতে পারে, সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি তাহা সন্ধান করে। অর্থবিদ্যার আলোচনায় সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এইজন্য আবশ্যক হয় যে, ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্তে লইয়া যায়। অর্থবিদ্যায় এমন অনেক বিষয় আছে যাহা খণ্ডত্বের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সমগ্রত্বের ক্ষেত্রে সত্য নাও হইতে পারে। যেমন, বলা যায়, অর্থনীতিক সংকটের সময় ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সঞ্চয় করার উপকারিতা আছে; কিন্তু সকল লোক সঞ্চয় করিতে থাকিলে সংকট আরও তীব্রতর হইবে।

অর্থনীতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণের জন্য কোন একটি পদ্ধতিই এককভাবে যথেষ্ট নহে। দুইটি পদ্ধতিকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত পদ্ধতির যে কোন একটি ব্যবহার করিলে কোন অর্থনীতিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। যেমন, কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কতটা হইবে তাহা কেবল ঐ প্রতিষ্ঠানের পৃথক সিদ্ধান্তের ফল নহে। উহা অনেকাংশে দেশের সামগ্রিক আয়, নিয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির উপরও নির্ভর করিয়া থাকে।

দুইটি পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক

আবার, অপরদিকে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও, সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নাও হইতে পারে। সুতরাং, অর্থবিদ্যার পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি দুইই ব্যবহার করিবার প্রয়োজন আছে।

অর্থবিদ্যা অধ্যয়নের গুরুত্ব
(Value of the Study of Economics)

অধ্যয়ন শাস্ত্র হিসাবে অর্থবিদ্যা আধুনিককালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যার গুরুত্ব আজ নিম্নলিখিত একাধিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত :

১। **বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে :** অর্থবিদ্যা সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ করিয়া বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও তর্ক-বিতর্কের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে। এই শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা আমাদের চিন্তাশক্তি তীক্ষ্ণ ও বিচার-বুদ্ধি সতেজ হয়।

২। **মানুষের দৈনন্দিন জীবনে :** নিছক তত্ত্বীয় আলোচনা ও বিশ্লেষণের পথপ্রদর্শন করিয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু নিঃশেষ হইয়া যায় না। সাধারণ মানুষের বাস্তব-জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান এবং উহাদের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিতেও অর্থবিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট সাহায্য করে। অর্থবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তি বুঝিতে পারে না কিভাবে তাহার প্রাত্যহিক জীবন দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনৈতিক কর্মসূত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই জ্ঞান ব্যতীত কেহ নাগরিক হিসাবে তাহার অধিকার ও কর্তব্যগুলি সম্পর্কেও সজাগ হইতে পারে না।

৩। **ব্যবসায়িগণের নিকট :** ব্যবসায়ী ও কারবারিগণের নিকট অর্থবিদ্যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবসায়িগণ ভবিষ্যৎ অনুমান করিয়া বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সেই অনুমান যাহাতে কার্যত সত্য হয় তাহার জন্য চাহিদা, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি সম্পর্কে তাহাদের অর্থনৈতিক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৪। **পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে :** উন্নত ও অনগ্রসর প্রায় সকল দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের জন্য প্রত্যেক সরকারকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দেশের

সীমাবদ্ধ উপকরণসমূহের সর্বাধিক কাম্য বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার জন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন হয় দেশের অর্থনীতিক সমস্যাগুলির সুষ্ঠু বিশ্লেষণ, আর একদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় অর্থনীতিক তত্ত্ব সম্পর্কীয় জ্ঞান ও উহার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

৫। **সরকারী প্রশাসনিক কার্যে:** সরকার বাজেট রচনা ও রূপায়ণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলাফল যাহাতে দেশের অর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর শুভ হয়, তাহার জন্য সরকারী প্রশাসনিক কর্মচারিগণকে সরকারের আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হয়। অর্থবিদ্যার তত্ত্বীয় জ্ঞান ছাড়া তাহাদের পক্ষে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা অসম্ভব।

২ কতিপয় মৌলিক ধারণা
(Some Fundamental Concepts)

কোন শাস্ত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করিতে হইলে গোড়াতেই কতকগুলি মৌলিক ধারণা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থবিদ্যা আলোচনা-প্রসঙ্গেও এমন কতকগুলি শব্দের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিবে যেগুলি সম্পর্কে প্রথমেই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। অর্থবিদ্যার এইরূপ কয়েকটি মৌলিক ধারণা নিচে আলোচনা করা হইল।

দ্রব্য
(Goods)

মানুষ তাহার দৈনন্দিন অভাব মিটাইবার জন্য বহু রকমের জিনিস সংগ্রহ করে। খাদ্যবস্তু, পানীয়, পরিধেয়, বাসগৃহ, জলবায়ু ইত্যাদি জিনিসগুলি মানুষের কোন-না-কোন অভাব মোচন করিয়া থাকে। এইরূপ যে জিনিস-দ্বারা মানুষের অভাব মেটে তাহাকেই অর্থবিদ্যায় দ্রব্য বলা হয়।

(১) প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

দ্রব্য দুই প্রকারের হইতে পারে—প্রাকৃতিক বা অবাধলভ্য (Free) এবং অর্থনৈতিক (Economic) দ্রব্য। যে জিনিস প্রকৃতির দান, যাহা অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, পরিশ্রম করিয়া মানুষের যাহা যোগাড় করিতে হয় না, উহাকে প্রাকৃতিক বা অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। যেমন, আবহাওয়ায় বাতাস, সমুদ্রের জল, সূর্যের কিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য। অপর পক্ষে, অর্থনৈতিক দ্রব্য মানুষের চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর। অর্থনৈতিক দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া মানুষকে মূল্য দিয়া ইহা ক্রয় করিতে হয়। যেমন খাদ্যবস্তু, বাসগৃহ ইত্যাদি।

অনেক সময় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে এই পার্থক্য খাটে না। একই জিনিস ক্ষেত্রবিশেষে প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক দ্রব্য হইতে পারে। যেমন, আবহাওয়ায় যে বায়ু বহে আমরা উহাকে প্রাকৃতিক

দ্রব্য বলি। কিন্তু চিত্রগৃহে আতপ নিবারণের জন্য যে বায়ু কাজে লাগানো হয় উহা অর্থনৈতিক দ্রব্য। যে জিনিস অর্থের বিনিময়ে কিনিয়া অভাব মিটাইতে হয় উহাই প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক দ্রব্য। সাধারণত অর্থনৈতিক দ্রব্যকে সম্পদ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

(২) বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য

দ্রব্যকে আবার বস্তুগত (material) এবং অবস্তুগত (non-material)—এই দুই শ্রেণীতেও ভাগ করা চলে। যে সকল জিনিসকে আমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাই সেই সকল জিনিসকে বস্তুগত দ্রব্য বলা হয়। যেমন, খাদ্যদ্রব্য, সাজ-পোশাক, ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি বস্তুগত দ্রবা। অবস্তুগত দ্রব্যগুলি আমরা পদার্থ হিসাবে দেখিতে পাই না; কিন্তু উহারা সেবা (service) প্রদান করিয়া মানুষের অভাব পূরণে সহায়তা করে। অবস্তুগত দ্রব্যের উদাহরণ বলিতে ব্যবসায়ের সুনাম (goodwill of a business), ডাক্তার বা ব্যারিষ্টারের পেশাগত নৈপুণ্য, শিক্ষকের পঠন-পাঠন, গায়কের গান প্রভৃতিকে বুঝায়।

অনেকে বস্তুগত দ্রব্যকে 'সামগ্রী' (commodity) বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু বস্তুগত দ্রব্যকে সামগ্রী বলিয়া অভিহিত করার অসুবিধা আছে। সামগ্রীর প্রধান লক্ষণ হইল সমজাতীয়তা (homogeneity)। অর্থাৎ কোন জিনিসের এক একক যদি অপর কোন জিনিসের এক এককের পূর্ণ পরিবর্তক (perfect substitutes) হয় তাহা হইলে দ্রব্য দুইটিকে সামগ্রী বলা চলে।[১] সামগ্রীর এই অর্থ ধরিলে ধান কিংবা আমকে আমরা প্রকৃতপক্ষে সামগ্রী বলিতে পারি না। কেন না, আউস ধান ও আমন ধান সমজাতীয় নহে; সেইরূপ ল্যাংড়া ও হিমসাগর আম একে অন্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক নহে। এই সকল দ্রব্যকে সামগ্রী না বলিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দ্রব্য (specific goods) বলা চলে। কেন না, আমন ধান, ল্যাংড়া আম প্রভৃতি জিনিসের সম্পূর্ণ পরিবর্তক নাই।

দ্রব্যকে উহার ব্যবহার অনুযায়ী একবার ব্যবহার্য (single-use) দ্রব্য এবং স্থায়ী (durable) দ্রব্য—এই দুই ভাগেও ভাগ করা চলে।

১. Joan Robinson : A commodity is "a consumable good...homogeneous within itself".

একবার ব্যবহার্য দ্রব্য একবার ব্যবহারের ফলেই শেষ হইয়া যায়, আর ব্যবহার করা চলে না। যেমন, কয়লা একবার পোড়াইলে আর পোড়ানো সম্ভব নহে। স্থায়ী দ্রব্য একাধিকবার ব্যবহার করিলেও নিঃশেষ হইয়া যায় না। যেমন, কোন যন্ত্রপাতি একবার ব্যবহারের ফলেই নিঃশেষ হয় না, বহু বৎসর অবধি কাজে ব্যবহার করা চলে।

(৩)
একবার ব্যবহার্য
ও স্থায়ী দ্রব্য

জিনিসের ব্যবহারের দিক হইতে দেখিলে কতকগুলিকে ভোগ্যদ্রব্য (consumer's goods) এবং কতকগুলিকে মূলধনী বা বিনিয়োগ দ্রব্য (capital or investment goods) বলা চলে। যে সকল দ্রব্য সরাসরিভাবে মানুষের অভাব মিটায় উহাদিগকে ভোগ্যদ্রব্য বলা হয়। যেমন খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। আর মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের সহায়তা করিয়া অপ্রত্যক্ষভাবে মানুষেব অভাব মোচন করিয়া থাকে। যেমন, কারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল ইত্যাদি। অনেক সময় একই জিনিস ভোগ্যদ্রব্য বা মূলধনী দ্রব্য হইতে পারে। কখন্ উহা ভোগ্যদ্রব্য হইবে, আবার কখন্ই বা মূলধনী দ্রব্য হইবে তাহা নির্ভর করে জিনিসটির ব্যবহারের উপর। যেমন কোন ব্যক্তি যদি সন্ধ্যায় বায়ুসেবনের জন্য মোটর গাড়ি রাখেন তাহা হইলে উহা তাহার কাছে ভোগ্যদ্রব্য হইবে। কিন্তু কোন ডাক্তার যদি তাহার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য মোটর গাড়ি ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা হইবে তাহার কাছে মূলধনী দ্রব্য।

(৪)
ভোগ্যদ্রব্য ও
মূলধনী দ্রব্য

উপযোগ
(Utility)

আমরা যে সকল দ্রব্য অর্থের বিনিময়ে কিনিয়া থাকি উহাদের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা থাকা চাই। যদি কোন দ্রব্যের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে উহার জন্য আমরা অর্থব্যয় করিতে রাজী হই না। দ্রব্যের এই অভাব মিটাইবার ক্ষমতাকেই উপযোগ বলা হয়।

উপযোগ দ্রব্যের গুণ বা উপকারিতা নির্দেশ করে না। যেমন, মদ, তামাক প্রভৃতি দ্রব্য ক্ষতিকর, উহাদের উপকারিতা নাই। কিন্তু তাহা

বলিয়া উহাদের উপযোগ নাই এ কথা বলা চলে না। কেন না, উহারা কোন কোন অভাব মিটাইবার ক্ষমতা রাখে। অনেকে এই সকল দ্রব্যের অভাব বোধ করে এবং ইহাদের বিনিময়ে অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত। সুতরাং উপযোগের সহিত কোন উপকারিতা বা নৈতিক প্রশ্ন জড়িত নাই। কোন দ্রব্যের জন্য মানুষের আকাঙ্খা (desiredness) থাকিলেই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি।

একই দ্রব্যের কাহারও নিকট উপযোগ থাকিতে পারে, কাহারও নিকট উপযোগ নাও থাকিতে পারে। যিনি ধূমপান করেন না তাহার কাছে তামাকেব কোন উপযোগ নাই। কিন্তু যিনি ধূমপায়ী তাহার কাছে তামাকের যথেষ্ট উপযোগ আছে। আবার সময়ের পার্থক্যে একই ব্যক্তির আকাঙ্খা বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। যেমন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে কোন ব্যক্তি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইলে শীতল পানীয় জলের উপযোগ তাহার কাছে খুব বেশি। আবার শীতকালে তাহার কাছে শীতল জলের উপযোগ খুব কমিয়া যাইবে। সুতরাং, উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ও মানসিক (subjective) ধারণা। কোন দ্রব্যের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা সকল সময় সকল মানুষের নিকট সমান হইতে পারে না।

উপযোগ একটি আপেক্ষিক ও মানসিক ধাবণা

সম্পদ

(Wealth)

সাধারণ লোক টাকাকড়ি, বাড়িঘর, জমিজমাকেই সম্পদ বলিয়া থাকে। এই সকল জিনিসের উপযোগ আছে এবং অর্থের বিনিময়ে মানুষ ইহাদের কিনিতেও রাজী হয়। কিন্তু জিনিসের কেবল উপযোগ বা অভাব মোচনের ক্ষমতা থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা যায় না। যেমন, আমরা আবহাওয়ায় যে বায়ু গ্রহণ করি, উহার অভাব মিটাইবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু উহা এত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় যে উহা আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়াও শেষ হয় না। উহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত বলিয়া পয়সা দিয়া কিনিতেও হয় না। কিন্তু কোন চিত্রগৃহে বায়ুর যোগান চাহিদার তুলনায় প্রচুর নহে। সেইজন্য সেখানে যখন আমাদের বায়ু চাই তখন তাহার জন্য দাম দিতে হয়। সুতরাং, যে দ্রব্য মানুষের চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ এবং যাহা অভাব

মিটাইবার ক্ষমতা রাখে, তাহাকেই সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যায়। অর্থবিদ্‌রা সম্পদ বা ধন কথাটি সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন। কোন দ্রব্যের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বা গুণ থাকিলেই উহাকে সম্পদ বলা চলে।

প্রথমত, দ্রব্যটির যোগান অপ্রচুর হওয়া চাই। যে দ্রব্য প্রকৃতির দান, তাহার যোগানও প্রচুর। তাহাকে সম্পদ বলা যায় না। যেমন, সমুদ্রের জল, প্রাকৃতিক দ্রব্য সেইজন্য সম্পদ নহে। যে দ্রব্যের যোগান অপ্রচুর সেই দ্রব্য সকলের অভাব মিটাইবার মত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না। ইহাকে বিশেষ কাজে লাগাইতে হইলে মূল্য দিতে হয়। যেমন, শহরে পানীয় জল। ইহার যোগান অপ্রচুর এবং ইহা পাইতে হইলে অর্থব্যয় করিতে হয়। ইহাকে সম্পদ বলা চলে।

দ্রব্যের অপ্রাচুর্য বা যোগান টান

দ্বিতীয়ত, সম্পদ হইতে হইলে দ্রব্যের উপযোগ থাকা চাই। যে জিনিসের তৃপ্তিদান বা অভাব পূরণের ক্ষমতা নাই তাহাকে সম্পদ বলা যায় না। যিনি মদ স্পর্শ করেন না, তাহার কাছে মদের কোন উপকারিতা নাই। সেইজন্য মদ তাহার কাছে সম্পদ নহে। কিন্তু মদ্যপায়ীর নিকট মদ সম্পদ। উহা তাহাকে তৃপ্তিদান করিতে পারে।

দ্রব্যের উপযোগ

তৃতীয়ত, সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বাস্তব সামগ্রী হওয়া চাই এবং কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে ইহাকে পরিমাপ করা চলে। অবাস্তব দ্রব্য বা সেবাকার্য—যেমন, ডাক্তারের উপদেশ, উকীলের পরামর্শ, শিক্ষকের শিক্ষাদান, অভিনেতার অভিনয় প্রভৃতির অস্তিত্ব কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে বস্তুগত দ্রব্যের আকার ধারণ করে না। সেইজন্য ইহাদের কাজের পরিমাণ কত তাহা নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং ইহারা সম্পদ বা ধন নহে।

দ্রব্যের বাস্তবতা

চতুর্থত, সম্পদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাকে হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। দ্রব্যের হস্তান্তরযোগ্যতা বলিতে উহার মালিকানার পরিবর্তন বুঝায়। দ্রব্যটি একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত নাও হইতে পারে, কিন্তু উহার মালিকানা যদি এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট যায়, তাহা হইলে উহা সম্পদ হইবে। যেমন, ব্যবসায়ের সুনাম (business

দ্রব্যের হস্তান্তরযোগ্যতা

goodwill) ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তরিত করা যায়। সেইজন্য ইহা সম্পদ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কোন ডিপ্লোমার মালিকানা একজনের নিকট হইতে আর একজনের নিকট হস্তান্তরিত করা চলে না। ফলে, ইহা সম্পদ নহে।

পঞ্চমত, সম্পদ বলিতে কেবল বাহ্যিক পদার্থ বুঝাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ জিনিস বা অন্তর্নিহিত গুণ হস্তান্তরযোগ্য নহে। সেইজন্য উহা সম্পদ নহে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বা বার্ণাড শ'র মেধা বাহ্যিক পদার্থ নহে বলিয়া সম্পদ বলা যায় না।

বাহ্যিক পদার্থ হওয়া চাই

অনেকে সম্পদ বলিতে দুইপ্রকার দ্রব্য বুঝিয়া থাকেন। একপ্রকার হইল, ভোগ্যদ্রব্য (Consumption goods), আর একপ্রকার, উৎপাদক দ্রব্য (Producers' goods)। ভোগ্যদ্রব্য মানুষ সরাসরি ভাবে ব্যবহার করিয়া অভাব মিটায়। যেমন, খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। আর উৎপাদক দ্রব্য মানুষের উৎপাদনে সহায়তা করিয়া পরোক্ষভাবে অভাব মোচন করে। যেমন, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি। উৎপাদকদ্রব্য নিয়োগ দ্বারা মানুষ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়া আয় সৃষ্টি করে। উৎপাদক দ্রব্যকেই আবার পুঁজি বা মূলধন (Capital) বলা হয়।

সম্পদের প্রকারভেদ
(Classification of Wealth)

সম্পদকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : (১) ব্যক্তিগত সম্পদ (Personal or Individual Wealth), (২) সমষ্টিগত সম্পদ বা সামাজিক সম্পদ (Collective or Social Wealth) এবং (৩) জাতীয় সম্পদ (National Wealth)।

ব্যক্তিগত সম্পদ বলিতে প্রত্যেক লোকের বাস্তব ও অবাস্তব সকল রকম মূল্যবান দ্রব্য, তৈজসপত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি বুঝায়। বাড়িঘর, ভূ-সম্পত্তি, আসবাব, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি মূল্যবান বাস্তব জিনিস যেমন ব্যক্তিগত সম্পদ তেমনি ব্যবসার সুনাম, গ্রন্থ-মুদ্রণকার্যের স্বত্ব প্রভৃতি অবাস্তব দ্রব্যও ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমষ্টিগত সম্পদ বলিতে আমরা সেইসকল বাস্তব ও অবাস্তব বস্তুবিশেষকে

বুঝি যাহা সমাজের সকলেই উপভোগ করে এবং সমাজের সকল ব্যক্তিই যাহার মালিক। রাস্তাঘাট, জাতীয় রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতি সমষ্টিগত সম্পদ।

দেশের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পদের মোট সমষ্টিকেই জাতীয় সম্পদ বলে। জাতীয় সম্পদ পরিমাপ করিতে হইলে একবৎসরে উৎপন্ন মোট দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্য ধরিতে হয়। সমস্ত দ্রব্য ও সেবাকার্যই দেশের বার্ষিক মোট উৎপন্ন সম্পদ বলিয়া ধরা হয়।

এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হয় কিন্তু সেগুলিকে সামাজিক বা জাতীয় সম্পদ হিসাবে ধরা চলে না। যেমন, কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র, টাকাকড়ি ইত্যাদি কোন ব্যক্তির সম্পদ বলিয়া ধরা যায়। কেন না দ্রব্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকিলে সম্পদ বলা হয় সে সকল বৈশিষ্ট্যই এই সকল দ্রব্যের আছে। ইহাদের উপযোগ আছে; প্রত্যক্ষ-ভাবে অভাব মোচন করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও শেয়ার, ডিবেঞ্চার, ঋণপত্র প্রভৃতি কাগজ বিক্রয় করিয়া উহাদের মালিক ইচ্ছামত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারে এবং উহাদের দ্বারা অভাব মোচন করিতে পারে। এই সকল কাগজের যোগান সীমাবদ্ধ, ইহারা হস্তান্তরযোগ্য। কিন্তু ব্যক্তির দিক হইতে ইহারা সম্পদ বলিয়া গণ্য হইলেও সামাজিক দিক হইতে ইহারা সম্পদ নহে। যদি কোন ব্যক্তি যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তাহা হইলে ঐ কোম্পানীর উপর তাহার অংশত মালিকানা জন্মে। কোম্পানীর উপর মালিকানা জন্মানোর অর্থ কোম্পানী, ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সম্পদের উপর অধিকার জন্মানো। কিন্তু শেয়ার-পত্র ব্যক্তির নিকট এইভাবে মূল্যবান হইলেও সমাজের নিকট উহার দাম নাই। সেইজন্য সরকারী ঋণপত্রও জাতীয় সম্পদ নহে। সরকার ঋণ পরিশোধ করে কর সংগ্রহ দ্বারা। ফলে, দেশের একশ্রেণীর নিকট হইতে অর্থ অন্য শ্রেণীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। ইহাতে জাতীয় সম্পদের সৃষ্টি হয় না, যদিও কিছু কিছু ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

অনেক দ্রব্য ব্যক্তিগত সম্পদ বলিয়া ধরা যায় কিন্তু উহারা জাতীয় সম্পদ নহে।

টাকাকড়িও সামাজিক দিক হইতে সম্পদ নহে। অনেকে ইহাকে সম্পদ না বলিয়া সম্পদের প্রতীক বলেন। কেন না, ধাতু মুদ্রাই হউক, আর কাগজী নোটই হউক, অন্যদ্রব্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া লোকে উহাদের

চাহিয়া থাকে, উহাদের নিজস্ব মূল্য আছে বলিয়া কেহ চাহে না। অবশ্য ধাতুমুদ্রার মধ্যে ধাতুটুকুকে সম্পদ বলা যায়, কিন্তু কাগজী নোট একেবারেই জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যায় না। কাগজী নোট যদি সম্পদ হইত, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশই ইচ্ছামত যত খুশী কাগজী নোট ছাপাইয়া দেশের সকল রকম অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান দ্বারা লোকের সকল অভাব-অভিযোগ মিটাইতে পারিত।

টাকাকড়ি জাতীয় সম্পদ নহে

আয়
(Income)

অর্থবিদ্যায় আয় কথাটার একটি বিশেষ অর্থ আছে। মানুষের সম্পদ ও আয় এক নহে। যদিও সম্পদ ও আয় উভয়কেই আমরা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করি তথাপি কথা দুইটির অর্থ এক নহে। সম্পদ বলিতে আমরা বুঝি মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থিত জিনিসপত্র বা সঞ্চিত উপযোগ, আর আয় বলিতে বুঝি কোন নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ সম্পদদ্বারা যে উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি করে তাহাকে। নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের ভোগ্য উপযোগকেই আয় বলা চলে। সম্পদকে বলা হয় উপযোগের তহবিল (store of utility), আর আয়কে বলা হয় উপযোগের স্রোত (flow of utility)। মনে কর, তোমার একটি বসত বাড়ি আছে। উহা তোমার সম্পদ; কিন্তু ঐ বাড়ি যে তোমাকে বৎসরের পর বৎসর আশ্রয় দান করে—উহার ঐ উপযোগ-প্রবাহ হইল তোমার আয়। আবার, যদি আমরা বলি কোন ব্যক্তির আয় ১০০৲ টাকা, তাহা হইলে কতটা সময়ের মধ্যে ঐ আয় সে উপার্জন করে তাহা জানা দরকার। ঐ আয় তাহার এক মাসে, কিংবা এক বৎসরে অর্জিত কিনা তাহা নির্দেশ করিতে হয়। কোন এক ব্যক্তি যদি ব্যাঙ্কে ২০,০০০ টাকা জমা রাখে এবং ঐ আমানত হইবে সুদ বাবদ বৎসরে ৫০০ টাকা পায়, তাহা হইলে ঐ আমানতী টাকা হইবে তাহার সম্পদ, আর ঐ সুদের টাকা হইবে তাহার আয়। তাহা হইলে আমরা দেখি যে, সম্পদ হইতেই আয়ের সৃষ্টি।

আয় ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য

আয়কে আমরা যখন টাকার অঙ্কে হিসাব করি তখন উহাকে বলা

হয় আর্থিক আয় (money income)। কিন্তু আয়কে শুধু যে টাকা-কড়ির অঙ্কেই হিসাব করা হয় তাহা নহে। আয় আবার সেবাস্রোতের আকারেও পাওয়া যায়। টাকা-পয়সার সহায়তায় সম্পদ হইতে যে সেবাকার্য বা আরাম লাভ করা যায় তাহাকে প্রকৃত আয় (real income) বলা যায়। যেমন, বাড়ি ভাড়া বাবদ মালিক যে অর্থ পান উহা তাহার আর্থিক আয়। আবার ভাড়াটিয়া ঐ বাড়ি হইতে যে আশ্রয় বা আরাম পান, ঐ সেবাস্রোতকে প্রকৃত আয় বলা হয়।

মোট আয় ও নীট আয়

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সম্পদ হইতে যখন আয়ের সৃষ্টি হয়, তখন সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। মনে কর, কোন ব্যক্তি তাহার বাড়ি ভাড়া দিয়া বৎসরে ভাড়া বাবদ ১০০০৲ টাকা পান। এই ১০০০৲ টাকা তাহার বাড়ি ভাড়া হইতে বাৎসরিক আয়। ইহা নীট আয় (net income) নহে, ইহা তাহার মোট আয় (gross income)। এক বৎসর বাড়ি ভাড়া খাটানোর ফলে বাড়িটা কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও উহার মূল্য কমিয়া যায়। যদি বাৎসরিক ক্ষয়ের পরিমাণ হয় ১০০৲ টাকা, তাহা হইলে বাড়িটা অটুট রাখিতে মোট আয় ১০০০৲ টাকা হইতে ঐ ক্ষয়প্রাপ্তির দরুণ ১০০৲ টাকা বাদ দিলে যে ৯০০৲ টাকা বৎসরে পাওয়া যাইবে তাহাই ঐ ব্যক্তির নীট আয়। অতএব কোন ব্যক্তির আয় হিসাব করিতে হইলে দেখিতে হইবে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে তাহার নিকট কতটা মূল্যের উপযোগ স্রোত সৃষ্টি হইতেছে। উহা হইতে উৎপাদন খরচ বাদ দিলেই তাহার নীট আয় নির্ণয় করা যায়।

ভোগ
(Consumption)

ভোগ হইল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ভোগ দ্বারা মানুষ তাহার অভাব পূরণ করে। ভোগ অর্থ দ্রব্য বা সেবার উপযোগ ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করা। যখন আমরা খাবার খাই কিংবা জামা-কাপড় ব্যবহার করি, তখন এই সকল দ্রব্যের উপযোগ বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া যায়। সকল দ্রব্যের উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয় না। কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহার উপযোগ বহুবার ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়। যেমন,

একজোড়া জুতা কিংবা একটি আলমারির উপযোগ বহুদিন ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়। আবার, কোন খাদ্যবস্তুর উপযোগও একবার ব্যবহারের ফলেই নিঃশেষ হইয়া যায়। সেইরূপ সেবার উপযোগ একবার ব্যবহারের ফলেই নিঃশেষ হইয়া যায়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ভোগ একদিকে যেমন আমাদের অভাব মিটায়, অন্যদিকে আবার ভোগ্যদ্রব্যের তৃপ্তিদানের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয়। অর্থশাস্ত্রে ভোগ অর্থই দ্রব্য বা সেবার উপযোগ বিনাশ।

উৎপাদন
(Production)

সাধারণত উৎপাদন বলিতে পদার্থ (matter) বা জিনিস সৃষ্টি এই অর্থ বুঝায়। কিন্তু মানুষ প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারে না। প্রকৃতিদত্ত পদার্থের উপর মানুষ কেবল নূতন রূপ বা আকার দিতে পারে। মানুষ কাঠ সৃষ্টি করিতে পারে না, কিন্তু সূত্রধর যখন তাহার পরিশ্রম দ্বারা কাঠ হইতে চেয়ার বা টেবিল তৈরি করে তখন কাঠের অভাব পূরণের ক্ষমতা জন্মে, উহার উপযোগ সৃষ্টি হয়। পদার্থের এই উপযোগ সৃষ্টিকেই (creation of utility) অর্থশাস্ত্রে উৎপাদন বলে। মানুষ তাহার শ্রমদ্বারা যখন প্রকৃতিদত্ত জিনিসকে নূতন আকার বা রূপদান করে তখনই হয় উপযোগ সৃষ্টি। এই উপযোগ সৃষ্টিই উৎপাদন।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মানুষ কেবল বাস্তব দ্রব্যই সৃষ্টি করে না, সেবাকার্যও সৃষ্টি করিতে পারে। সে যেমন খাদ্যদ্রব্য, ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি উৎপাদন করে তেমনি চিকিৎসা, বিদ্যাদান, সেবা প্রভৃতিও সৃষ্টি করিয়া থাকে। মানুষ যে শ্রমদ্বারা বাস্তব-দ্রব্য উৎপাদন করে উহাকে বলা হয় উৎপাদনশীল শ্রম (productive labour), আর যে শ্রমদ্বারা সে সেবা উৎপাদন করে উহাকে বলে অনুৎপাদনশীল শ্রম (unproductive abour)। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ মানুষের শ্রমকে এইভাবে উৎপাদনশীল এবং অনুৎপাদনশীল এই দুই ভাগে শ্রেণীবিভাগ করেন না। তাহারা বলেন, মানুষের শ্রমদ্বারা বস্তুগত-দ্রব্য সৃষ্ট হইলে তাহা যেমন

বাস্তব-দ্রব্য সৃষ্টি ও সেবাকার্য সৃষ্টি দুইই উৎপাদন

উপযোগ সৃষ্টি করে, তেমনি সেবামূলক কার্য সৃষ্ট হইলে তাহাও তেমন উপযোগ সৃষ্টি করে। যিনি চেয়ার তৈরি করেন তিনি যেমন উপযোগ সৃষ্টি করেন, তেমনি যিনি বিদ্যাদান করেন তিনিও তেমনি উপযোগ সৃষ্টি করেন। মোট কথা, উৎপাদন অর্থ উপযোগ সৃষ্টি।

যে উপযোগ সৃষ্টি বা মূল্যসৃষ্টিকে (creation of value) আমরা উৎপাদন বলি তাহা যে কোন আকারে ঘটিতে পারে। যেমন, পাট উৎপাদন, চেয়ার তৈরি প্রভৃতি দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি হয়, ইহা উৎপাদন। আবার যদি কোন দোকানদার মিলে উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিয়া জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করে তাহাতেও কিন্তু উপযোগ বা মূল্য সৃষ্টি হইতে পারে। সে যদি প্রতিখানা ধুতি ৮৲ টাকা দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া ১০৲ টাকায় ভোগকারিগণের নিকট বিক্রয় করে তাহা হইলে তাহার ঐ কাজের ফলেও ২৲ টাকা উপযোগ বা মূল্য সৃষ্টি হইবে। দোকানদারের এই যে বিক্রয় কার্য ইহাকেও উৎপাদন বলা হয়। আবার ধরা যাক, কোন ব্যবসায়ী যদি একবৎসর পূর্বে সস্তায় আলু কিনিয়া রাখিয়া বর্তমানে অধিক দামে বিক্রয় করে তাহা হইলেও উপযোগ বা মূল্য সৃষ্টি হইবে। ব্যবসায়ীর এই মজুত কার্য ও উৎপাদনের অঙ্গ হিসাবেই ধরা হয়। সুতরাং উৎপাদন অর্থ কেবলমাত্র কোন বস্তু তৈরি দ্বারা উপযোগ বা মূল্য সৃষ্টিই বুঝায় না। দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা কিংবা মজুত রাখিয়া দ্রব্যের যদি মূল্য সৃষ্টি করা যায় তাহা হইলে এই বিক্রয় বা মজুত রাখিবার কার্যকেও উৎপাদন কার্য বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উৎপাদনের মধ্যে দ্রব্য বিক্রয় ও মজুত রাখিবার কার্যও ধরা যাইতে পারে

উৎপাদনের উপাদান
(Factors of Production)

উৎপাদনের জন্য কতকগুলি উপকরণের প্রয়োজন হয়। যে সকল উপকরণ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন সম্ভব হয় উহাদের প্রত্যেকটিকে উৎপাদনের উপাদান বলা হয়। উৎপাদন করিতে যাহাই সহায়তা করে তাহাই উপাদান।[১]

১. Benham : "Anything that contributes towards output is a factor of production."

সাধারণভাবে উৎপাদনের সকল উপকরণগুলিকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ রা হয়: জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন। ইহার প্রত্যেকটি উৎপাদনের ক একটি উপাদান। ভূমি বলিতে প্রাকৃতিক যে কোন সম্পদকে বুঝাইয়া াকে। শ্রম অর্থ মানুষের মানসিক বা কায়িক যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা। প্রাকৃতিক সম্পদ সংযোগে মানুষের শ্রম অনেক সময় বাস্তব সামগ্রী তৈরি রে। এই বাস্তব সামগ্রী যখন উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাকে লধন বলা হয়। জমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনটি উপাদানের সম্মিলন ও ারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার প্রয়োজন হয়। ই ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনাকে বলা হয় সংগঠন। ইহা উৎপাদনের চতুর্থ পাদান।

উৎপাদনের উপাদানগুলির এই চারি শ্রেণীর বিভাগকে প্রচলিত বা ম্পরাগত শ্রেণীবিভাগ (traditional classification) বলা হয়। ৎপাদনের উপাদানসমূহের এই প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনেকে মানেন নাই। কদল অর্থনীতিবিদের ধারণা যে, উৎপাদনের উপাদান মাত্র দুইটি—ভূমি বং শ্রম।[১] মূলধন ও সংগঠন পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কৃতিদত্ত সম্পদ যখন শ্রমদ্বারা বাস্তব-দ্রব্যে পরিণত হয়, তখন তাহাকে লধন বলা হয়। আবার সংগঠন শ্রমেরই রূপান্তর মাত্র।

অনেকে মনে করেন, উৎপাদনের উপাদান তিনটি: জমি, শ্রম ও মূলধন। তুর্থ উপাদান সংগঠন পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য হইতে পারে না, কেন না, সংগঠন এক ধরনের শ্রম। যাঁহারা সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদান বলিয়া গণ্য করিতে চাহেন না তাঁহারা প্রধানত নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দর্শাইয়া থাকেন:

সংগঠন কি একটি পৃথক উপাদান?

(১) সংগঠন অর্থ অন্যান্য উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, কার্যের বস্থাপনা ও পরিচালনা। উৎপাদন-কার্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ায়িত্ব কেবলমাত্র সংগঠকই গ্রহণ করেন না। শ্রমিকও এই দায়িত্বের ছু কিছু অংশ গ্রহণ করে। অবশ্য সংগঠক এবং শ্রমিকের দায়িত্ব একই কার নহে। শ্রমিকের কাজের মধ্যে সংগঠনের পরিমাণ খুবই সামান্য

---

১. Benham : "For some purposes...a two-fold classification into man an environment...is realistic."

তাহা হইলেও বলা চলে, শ্রমিককে মেহনতের সঙ্গে কিছুটা সংগঠন-কার্যও করিতে হয়।

(২) সংগঠন বলিতে উৎপাদনের ঝুঁকি বহনও ধরা হয়। উৎপাদনের ঝুঁকি কেবলমাত্র মূলধনের মালিক কিংবা সংগঠকই গ্রহণ করেন না, প্রত্যেক শ্রমিককেও কিছুটা গ্রহণ করিতে হয়। শ্রমিককে অনেক সময় শারীরিক বিপদ, বেকার হইবার সম্ভাবনা প্রভৃতি ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়।

(৩) প্রত্যেক প্রকারের শ্রমিকই বিচার-বুদ্ধি, দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কিছু-না-কিছু অধিকারী। সাধারণ মোটরগাড়ির চালক যখন শহরের রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালায় তখন এই সকল গুণের কিছু কিছু প্রয়োগ করিতে হয়। আবার বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও পরিচালকেরও একই ধরনের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন হয়। সুতরাং শ্রম ও সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

সংগঠন প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান না হইলেও ব্যবহারিক সুবিধার জন্য উৎপাদনের উপাদানগুলিকে চারিভাগে ভাগ করিবার রীতিই দেখা যায়। এই শ্রেণীবিভাগের প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা প্রত্যেকটি উপাদানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উহাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক কি নীতিদ্বারা নির্ণয় হয় তাহা ভালভাবে বুঝিতে পারা যায়।

আধুনিক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, উৎপাদনের উপাদানের সংখ্যা মাত্র চারিটি নহে—উপাদানের সংখ্যা অসংখ্য হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভিন্ন একক সমজাতীয় (homogeneous) নহে। যেমন, এক একর জমির উর্বরতা অপর এক একর জমির উর্বরতার সমান নহে। একজন শ্রমিক আর একজন শ্রমিকের সমান দক্ষ নহে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন একক ভিন্নজাতীয় (heterogeneous)। আবার একটি উপাদান আর একটি উপাদানের পরিবর্তক (substitutable)। ১০ জন শ্রমিকের পরিবর্তে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা চলে। উৎপাদনের উপাদানগুলি ভিন্নজাতীয় এবং পরিবর্তন-যোগ্য বলিয়া উৎপাদনে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় উহারা সংখ্যায় অগণিত। উহাদিগকে উৎপাদনশীল কাজকর্ম (productive services অথবা অন্তর্নিয়োগ (inputs) আখ্যা দেওয়া চলে।

মূল্য ও দাম
(Value and Price)

মূল্য ও দাম শব্দ দুইটি অর্থশাস্ত্রে পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মূল্য হইল বিনিময় হার। কোন এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাকেই মূল্য বলা হয়। যদি এক কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে চার কিলোগ্রাম আলু পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক কিলোগ্রাম চাউলের মূল্য হইল চার কিলোগ্রাম আলু, আবার চার কিলোগ্রাম আলুর মূল্য হইল এক কিলোগ্রাম চাউল।

মূল্য আমরা সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহার করি। এক, ব্যবহার মূল্য (value-in-use); আর দুই, বিনিময় মূল্য (value-in-exchange)। দ্রব্যের ব্যবহার মূল্য বলিতে বুঝি উহার উপকারিতা (usefulness)। যেমন, জলের ব্যবহার মূল্য খুবই বেশি। আর বিনিময় মূল্য বলিতে বুঝি, এক দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্যের যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা। যেমন, এক কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে যদি চার কিলোগ্রাম আলু পাওয়া যায় তাহা হইলে এক কিলোগ্রাম চাউলের বিনিময় মূল্য চার কিলোগ্রাম আলু। অর্থশাস্ত্রে মূল্য বলিতে প্রকৃতপক্ষে আমরা জিনিসের বিনিময় মূল্যই বুঝিয়া থাকি। কোন দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের যে বিনিময় হার উহাকেই বিনিময় মূল্য বলা হয়।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন দ্রব্যের বিনিময় মূল্য বেশি হইলেই যে উহার ব্যবহার মূল্যও বেশি হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। জলের বিনিময় মূল্য সামান্যই। কিন্তু উহার ব্যবহার মূল্য অপরিসীম। আবার হীরকের বিনিময় মূল্য খুবই বেশি। কিন্তু ব্যবহার মূল্য নাই বলিলেই চলে। দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যের সহিত যদি উহার যোগান সীমাবদ্ধ হয় ও উহার হস্তান্তরযোগ্যতা থাকে তবেই উহা বিনিময় মূল্য দাবী করিতে পারে।

দ্রব্যের বিনিময় মূল্যকে যখন আমরা টাকা-পয়সা দ্বারা প্রকাশ করি তখন উহাকে বলা হয় দাম (price)। অর্থের দ্বারা দ্রব্যের মূল্য প্রকাশিত হইলেই উহাকে দাম বলে। যেমন, এক কিলোগ্রাম চাউলের দাম ৩্ টাকা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সকল দ্রব্যের মূল্য একই সময়ে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। কিন্তু সকল দ্রব্যের দাম একই সময়ে

বাড়িতে বা কমিতে পারে। যেমন, ১৫ বৎসর পূর্বে যদি ৩৭ কিলো চাউল দিয়া ৭৬ কিলো গম পাওয়া যাইত, আর এখন ২৮ কিলো চাউল দিয়া ৭৬ কিলো গম পাওয়া যায়, তাহা হইলে বলা চলে, বর্তমানে চাউলের মূল্য বাড়িয়াছে আর গমের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু ১৫ বৎসর পূর্বেকার তুলনায় এখন কার্যত চাউল ও গম উভয়ের দাম বাড়িয়াছে।

ভারসাম্য
(Equilibrium)

অর্থবিদ্যায় ভারসাম্যের ধারণাটি গণিতশাস্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভারসাম্য বলিতে সেই অবস্থাকে বুঝায় যেখানে পৌঁছিলে আর কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। ভারসাম্যের অবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্রাম লাভ করে—উহার কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় না। অনেকে আধুনিক অর্থবিদ্যাকে ভারসাম্যের অর্থবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার কারণ এই যে, অর্থবিদ্যার নাভিকেন্দ্র যে মূল্যতত্ত্ব, উহা প্রধানত ভারসাম্যেরই আলোচনা। দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য তখনই স্থাপিত হয় যখন মূল্য, ভোগকারীর প্রান্তিক উপযোগ ও বিক্রেতার উৎপাদন ব্য পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় কি ভোগকারী, কি বিক্রেতা কেহ যথাক্রমে দ্রব্যের ভোগ ও উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি করা লাভজনক মনে করে না দ্রব্যের উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ স্থির থাকে। এইভাবে কেবলমা দ্রব্যমূল্যের ক্ষেত্রেই যে ভারসাম্যে উপনীত হওয়া যায় তাহা নহে। ভোগ পণ্যের প্রতিটি ক্রেতা, পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি শি প্রভৃতিও ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছিতে পারে।

আংশিক ভারসাম্য
(Partial Equilibrium)

যখন একজন ভোগকারী, একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা একটি শি ভারসাম্য আলোচনা করা হয় তখন উহাকে আংশিক ভারসাম্য বলা হ আমরা এই পুস্তকে মূল্যতত্ত্বের যে আলোচনা করিব, তাহা প্রকৃতপ আংশিক ভারসাম্যের আলোচনা। ধরিয়া লওয়া হয়, সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যব ভারসাম্য আংশিক ভারসাম্যের আলোচনায় বজায় রহিয়াছে। "অ

অবস্থা অপরিবর্তিত রহিয়াছে" অনুমান করিয়া লইয়া, আংশিক ভারসাম্য অর্থনীতিক ঘটনার কেবলমাত্র প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলি বিশ্লেষণ করে, পরোক্ষ ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াগুলি বিবেচনা করে না। অর্থবিদ্যায় ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ (Micro-economic Analysis) আংশিক ভারসাম্যেরই আলোচনা।

সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য
(General Equilibrium)

সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য বলিতে সমাজ বা দেশের গোটা অর্থনীতিক ব্যবস্থার ভারসাম্য বুঝায়। সামগ্রিক ভারসাম্যের আলোচনায় সকল দ্রব্যের পরিমাণ ও উহাদের দাম নিরূপণকারী বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়। অর্থনীতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সকল রকম প্রতিক্রিয়াগুলিই এই আলোচনার বিষয়-বস্তু। কিভাবে অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, কিভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরস্পরকে প্রভাবিত করে তাহা সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় বিবেচনা করা হয়। অর্থবিদ্যার সমষ্টিগত বিশ্লেষণে (Macro-economic Analysis) সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সম্পদ ও কল্যাণ
(Wealth and Welfare)

সম্পদ ও কল্যাণের অর্থ এক নয়। সম্পদ বলিতে সেইসকল দ্রব্যকে বুঝায় যাহার যোগান সীমাবদ্ধ, যাহার অভাব পূরণ করিবার মত উপযোগ আছে এবং যাহা হস্তান্তরযোগ্য। কল্যাণ একটি অবাস্তব মানস পদার্থ—যাহা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বুঝায়। দেশ, কাল, পাত্রভেদে কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট ও বিভিন্ন। কিন্তু সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

অর্থবিদ্যায় সম্পদ বলিতে দ্রব্যসমষ্টি বুঝায় আর কল্যাণ মানসিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুটা সম্পদের প্রয়োজন আছে। সাধু-সন্ন্যাসীরও খাদ্য ও পরিধেয় প্রয়োজন হয়। সাধারণ লোকের জাগতিক সুখের জন্যও কিছুটা সম্পদ অপরিহার্য।

সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি, সম্পদ বাড়িলে কল্যাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সম্পদ কল্যাণ বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক। কিন্তু তাহা বলিয়া সম্পদ কল্যাণের সমানুপাতিক নহে। সম্পদ যে পরিমাণে বাড়ে কল্যাণ কিন্তু ঠিক একই পরিমাণে বাড়ে না। যে লোকের ৫০ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে তাহার কল্যাণ বা সুখ যে লোকের ২৫ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে তাহার চেয়ে দ্বিগুণ নহে। সামাজিক দিক হইতে সম্পদ বৃদ্ধি অর্থই কল্যাণ বৃদ্ধি নহে। মনে করা যাক, কোন শহরে একটি মদের কারখানা নির্মাণ করা হইল। ইহার ফলে ঐ কারখানার মালিকের এবং দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু উহা দ্বারা মানুষের কল্যাণ বাড়িবে, একথা বলা যায় না। কেন না, মদ্যপানে উৎসাহ লাভ করিয়া দেশের লোকের স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটাইবে।

সম্পদ কল্যাণের সহায়ক হইলেও কল্যাণের সুষ্ঠু পরিচিতি একমাত্র সম্পদ নয়। সম্পদ ব্যতীত কল্যাণ আরও অনেক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে।

কল্যাণ দেশের ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সম্পদ বা ধন-বণ্টনে যে দেশে অসমতা বিদ্যমান সেখানে কল্যাণ বৃদ্ধি অসম্ভব। এইরূপ আর্থিক অবস্থায় একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর অভাব পূরণের উপযোগ প্রচুর, অন্যদিকে দরিদ্রের ভোগ করিবার মত উপযোগের পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এইরূপ সমাজে দরিদ্রশ্রেণী শুধু যে উপযোগের অভাবেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট তাহা নহে, তাহাদের দৈন্য, 'অসন্তোষ আরও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, যখন তাহারা ধনীশ্রেণীর আদব-কায়দা ও জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিয়া থাকে।

কল্যাণ শুধু ধন-বণ্টন পদ্ধতির উপরই যে নির্ভর করে তাহা নহে, ধনোৎপাদন ও ধনব্যয়ের প্রণালীও সমাজকল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বাধীন কর্মোৎসাহ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কোনই সুযোগ-সুবিধা নাই, সেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না। সেইরূপ যদি উৎপন্ন সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারে ব্যয় করা না হয়, তাহা হইলেও সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে কিন্তু দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে না। যেমন, দেশে উৎপন্ন কাগজ যদি অরুচিসম্পন্ন পুস্তক প্রণয়নে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সম্পদ বৃদ্ধি অর্থই কল্যাণ বৃদ্ধি নহে। তবে সম্পদ বাড়িলে কল্যাণ বাড়িবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা, ধন-বণ্টন পদ্ধতি, ধনব্যয়ের প্রণালী প্রভৃতিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের উপর কল্যাণের হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে নির্ভর করে।

৩ ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মূল্য-ব্যবস্থা

(Capitalist Economic System and Price Mechanism)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

(Nature and Characteristics of the Capitalist System)

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল কথা হইল ব্যক্তিস্বাধীনতা। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইল বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন ও লেন-দেন করিতে পারে। অবশ্য উৎপাদনের কিছু কিছু উপকরণের মালিকানা সরকারের হাতেও থাকিতে পারে এবং দেশের প্রয়োজনে সরকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানত ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য অনেকে এই ব্যবস্থাকে অবাধ উদ্যোগ-শীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (free enterprise economy) আখ্যা দিয়া থাকেন।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ হইল ভোগীর অবাধ ক্রয়-পরিকল্পনা (purchase plan)। প্রতিদিনের ভোগের জন্য দ্রব্য বা সেবা বিভিন্ন পরিবার (household) ক্রয় করে। পরিবারই ভোগের একক (consuming unit)। পরিবারই ইচ্ছামত দ্রব্যের বাজারে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্য কিনিয়া থাকে। অবশ্য পরিবারের সকলেই যে দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা নহে। যিনি পরিবারের কর্তা বা গৃহিণী তিনি পরিবারের সকলের হইয়া দ্রব্য বা সেবা ক্রয়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পরিবারের একটি ক্রয়-পরিকল্পনা থাকে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিবার বর্তমান দামে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ের জন্য যে মোট অর্থ ব্যয় করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উহাকে বলা হয় পরিবারের ক্রয়-পরিকল্পনা। টাকার বিনিময়ে কি কি দ্রব্য বা সেবা কতটা পরিমাণ ক্রয় করা হইবে তাহাও পরিবার নির্বাচন করিয়া থাকে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আর একটি প্রধান অঙ্গ হইল উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বিক্রয়-পরিকল্পনা (sales plan)। দ্রব্য উৎপাদনকারী ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এই বিক্রয়-পরিকল্পনা ধার্য করে। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকেরাও কতকগুলি পরিবার। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় নিজস্ব উপকরণ দ্বারা উৎপাদন করিতে পারে। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানের নিজের জমি ও যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম থাকিতে পারে। আবার অনেক সময় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকার বিনিময়ে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উৎপাদনকার্য চালাইতে হয়। উৎপাদনের জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাহাও পরিবারের নিকট হইতে পাওয়া যায়। পরিবারই উপকরণের যোগান-দাতা। পরিবার যেমন ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ উৎপাদন বা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে বিভিন্ন উৎপাদনকারী ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান। দ্রব্য বা সেবা বিক্রয়ের একক হইল বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান। কোন নির্দিষ্ট সময়ে বর্তমান বাজার দামে প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহাকে বলা হয় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-পবিকল্পনা (sales plan of a firm)।

উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাজকর্ম এবং তৎসম্পর্কীয় লেন-দেন প্রধানত দুই প্রকার বাজারে সম্পন্ন হয়। এক, দ্রব্যের বাজার (commodity market) আর দুই, উপকরণের বা উপাদানের বাজার (factor market)। দ্রব্যের বাজারে উৎপাদনকারী ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি হইল বিক্রেতা আর বিভিন্ন পরিবার হইল উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেতা। বিভিন্ন ভোগী পরিবার যাহা ব্যয় করে তাহাই বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের সমান। এই বাজারে আদান-প্রদানের ফলে টাকা-পয়সা ভোগী পরিবারের নিকট হইতে উৎপাদনকারী বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত হয়। আবার উপকরণের বাজারে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইল ক্রেতা এবং নানা পরিবার হইল বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা। এই বাজারে লেন-দেনের ফলে অর্থের গতি ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরিবারের দিকে ধাবিত হয়। উপকরণের বাজারে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ব্যয় বিভিন্ন উপকরণ বিক্রেতা পরিবারের আয়ের সহিত সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

মূল্য-ব্যবস্থা
(Price System)

ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ লেন-দেন। উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক হইল বিভিন্ন ব্যক্তি। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত উপকরণসমূহ ক্রয় করিয়া দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে। আবার বিভিন্ন ব্যক্তি ইচ্ছামত ভোগের জন্য দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। এইভাবে উৎপাদন এবং ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাধীন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির এই ক্রিয়াকলাপ অবাধ হইলেও শৃঙ্খলাবিহীন নহে। বিভিন্ন ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতির আদিম পিতা অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাধীন আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা কোন অদৃশ্য হস্ত দ্বারা (Invisible hand) পরিচালিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তির কর্মপ্রচেষ্টা যে অদৃশ্য হস্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে তাহার নাম মূল্য-ব্যবস্থা (Price System)।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ লেন-দেন থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তি ইচ্ছামত ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না। ভোগীর দ্রব্য ক্রয় করিবার স্বাধীনতা আছে বটে। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়ে সে কোন দ্রব্য কতটা পরিমাণে ক্রয় করিবে তাহা নির্ভর করে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের উপর। আবার ক্রয়ের পরিমাণ ভোগীর আয়ের উপরও নির্ভর করে। ভোগীর আয় অর্থ ই উপকরণের মালিক হিসাবে ভোগী যে ব্যবহার মূল্য পায় তাহার আর্থিক আয়কে বুঝায়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীন মালিকানা আছে সত্য, কিন্তু কেহ উৎপাদনের পরিমাণ যদৃচ্ছা হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া লাভবান হইতে পারে না। উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশেষভাবে ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভর করে। ক্রেতার চাহিদা আবার প্রতিফলিত হয় মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে। অর্থাৎ ক্রেতা কি মূল্য দিয়া দ্রব্য কিনিবে তাহার উপর উৎপাদক কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণ উৎপাদন করিবে তাহা নির্ভর করে।

উৎপাদনের পদ্ধতিকেও মূল্য-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কোন দ্রব্য উৎপাদনের একাধিক বিকল্প পদ্ধতি থাকিতে পারে। কোন্ পদ্ধতি উৎপাদক কার্যত গ্রহণ করিবে তাহা নির্ভর করিবে উৎপাদন ব্যয়ের উপর। উৎপাদন

ব্যয় আবার নির্ভর করে উপকরণগুলির মূল্যের উপর। সাধারণত যে সকল উপকরণের আপেক্ষিক মূল্য কম উহাদের অধিকতর ব্যবহার করিলে উৎপাদন ব্যয় ন্যূনতম হইবে, উৎপাদকের লাভও সর্বাধিক হইবে। এইভাবে মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদনকার্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে পরিচালিত হইয়া থাকে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের ব্যাপারেও মূল্য-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। লোকের হাতে কতটা উপকরণ আছে এবং কি মূল্যে সেই উপকরণ নিয়োগ করে তাহাব উপর আয় নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন উপকরণেব ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হয়। উপকরণ বিভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োজিত করিয়া আয় উপার্জন করার স্বাধীনতা প্রত্যেকটি উপকরণের মালিকের আছে। তবে কোনও উপকরণের মালিকই ইচ্ছামত যতটা পরিমাণ খুশি উপকরণ ব্যবহার করিতে পারে না। নিয়োজিত উপকরণের পরিমাণ নির্ভর করিবে উহার ব্যবহার মূল্যের উপর। শ্রম উৎপাদনের একটি প্রধান উপকরণ। শ্রমিকের আয় মজুরি নির্ভর করিবে শ্রমের পরিমাণ এবং কি মূল্যে শ্রম নিয়োজিত হইয়াছে তাহার উপর। যে শ্রমিক যত অধিক পরিমাণ শ্রমের মালিক হইবে এবং যত অধিক শ্রমের ব্যবহার মূল্য পাইবে, সে তত বেশি মজুরি লাভ করিবে। অর্থাৎ আয়ের বণ্টন নির্ভর করে নিয়োজিত উপকরণগুলির মালিকানা ও উহাদের ব্যবহার মূল্যের উপর। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় বণ্টনের কেন বৈষম্য দেখা যায়। উপকরণ-গুলির মালিকানার বৈষম্য এবং উহাদের ব্যবহার মুল্যের পার্থক্যই সমাজে আয়ের বৈষম্য ঘটাইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে জমি, শ্রম, মূলধন ও কারখানার মালিকের উপকরণগুলির মালিকানা সমান নহে। আবার, বিভিন্ন উপকরণের নিয়োগও সমান দক্ষ (efficient) নহে। ফলে, বিভিন্ন উপকরণের মালিকের আয় উপকবণগুলির ব্যবহার মূল্যের মাধ্যমে পৃথক হইতে বাধ্য।

পরিশেষে, মূলধন সৃষ্টির পবিমাণ ও প্রকৃতিও মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভের প্রত্যাশা হইতেই মূলধন সৃষ্টির উৎসাহ আসে। মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, লাভের অঙ্কও বাড়িয়া থাকে। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধন সাধারণত

দীর্ঘস্থায়ী। উহাদের ব্যবহার বা বিনিয়োগ স্বভাবতই উহাদের ভবিষ্যৎ মূল্য ও লাভের প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে। আবার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনের উৎপাদনও দ্রব্যের উৎপাদনের ন্যায় চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ-ভোগীর মধ্যে দ্রব্যের বণ্টন, উৎপাদন, আয়ের বণ্টন, মূলধন সৃষ্টি প্রভৃতি মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই সকল কাজ কাম্যভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

1. Discuss the nature and characteristics of the Capitalist system.

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

[পৃ: ৪০-৪১]

2. Describe the role of the Price system in the Capitalist system.

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থার ভূমিকা বর্ণনা কর।

[পৃ: ৪২-৪৪]

৪ বাজারের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Markets)

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল লক্ষ্য হইল অভাব মোচন। মানুষের অভাব পূরণের উপায় হইল দ্রব্য ও সেবা ভোগ করা। ভোগের জন্য দ্রব্য ও সেবা নির্বাচন এবং ক্রয় করিতে হয়। এই নির্বাচন ও ক্রয়ের কাজ করিয়া থাকে ভোগকারী বা পরিবার (household)। ভোগকারী যে দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করিয়া থাকে তাহা আসে যোগানের মাধ্যমে। এই যোগান আবার উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। পরিবার কিংবা শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। উৎপাদনকারিগণ অনেক সময় নিজস্ব উপকরণ দ্বারা কিংবা পরিবারের নিকট হইতে উপাদানসমূহ ক্রয় করিয়া দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার, অনেক সময় উৎপাদনের উপকরণগুলি তাহারা অপর ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারীর নিকট হইতে কিনিয়া লয়।

অতএব আমরা দেখি দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা ও যোগানদারদের ভিতর প্রচুর লেন-দেন হয়। এই লেন-দেন বা আদান-প্রদান যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহাকে বলা হয় বিনিময়। আবার এই বিনিময় ঘটে টাকাকড়ির মাধ্যমে, যাহাকে আমরা দাম বলি। দ্রব্যের বা সেবার এই যে বিনিময় দাম ইহা বাজারে নির্ধারিত হয়। বাজারই ঠিক করিয়া দেয়, কি দামে ক্রেতাগণ বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দ্রব্য বা সেবা কিনিতে পারিবে।[১]

ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে যে লেন-দেন হয় তাহা সাধারণত দুই ধরনের বাজারে সম্পন্ন হয়। উৎপাদনকারীর যখন উৎপাদনের জন্য নিজস্ব উপকরণ বা উপাদান থাকে না, তখন তাহারা ঐ উপকরণগুলি অন্যান্য ব্যবসায়ী বা পরিবারের নিকট হইতে ক্রয় করে। এই লেন-দেন ঘটে উপাদান বা উপকরণের বাজারে (factor market), যেখানে দ্রব্য উৎপাদন-কারী হইল ক্রেতা এবং উপকরণগুলি যোগান দেয় যে ব্যবসায়িগণ বা

---

১. J. Harvey : "The market fixes the price at which those who want a good can obtain it from those who have to sell it."

পরিবার তাহারা হইল বিক্রেতা। আবার ভোগকারী বা পরিবার যে দ্রব্য ভোগের জন্য উৎপাদনকারীর নিকট হইতে ক্রয় করে উহার আদান-প্রদান ঘটে পণ্যের বাজারে (commodity market)।

বাজারের অর্থ কি ?
(What is meant by Market ?)

সাধারণত মানুষ যে স্থানে জিনিসপত্রের লেন-দেন বা বেচা-কেনা করে সেই স্থানকেই বাজার বলিয়া থাকে। যেমন, নূতনবাজার, বড়বাজার, হগ্ সাহেবের বাজার ইত্যাদি। কিন্তু অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। বাজারের অর্থ হয় পণ্যের বাজার অথবা উৎপাদনের উপাদানের বাজার। পণ্য বা উপাদানের ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যখন কোন লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় অর্থবিদ্যায় তখন উহাকে বাজার বলিয়া অভিহিত করা হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এই লেন-দেনের সম্পর্ক কোন একটি বিশেষ স্থানে স্থাপিত হইতে পারে—তখন এই আদান-প্রদান প্রত্যক্ষভাবে সম্পাদিত হয়। আবার এই সম্পর্ক কোন নির্দিষ্টস্থানে প্রত্যক্ষভাবে স্থাপিত নাও হইতে পারে। যেমন, ক্রেতা ভারতবর্ষে অবস্থান করিতে পারেন, আর বিক্রেতা অবস্থান করিতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেন-দেনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ কি অপ্রত্যক্ষ" উহা বড় কথা নহে। বাজার বলিতে বিশেষভাবে বুঝায়, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেন-দেনের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং ক্রেতার চাহিদা-দাম দ্বারা বিক্রেতা প্রভাবিত হইয়াছে এবং বিক্রেতার যোগান-দাম দ্বারা ক্রেতা প্রভাবিত হইয়াছে।

বাজারের কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদান নির্দেশ করা যায়। প্রথমত, বাজার অর্থ পণ্যের বাজার অথবা সেবার বাজার। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যে-সকল দ্রব্য বা সেবা লেন-দেন হয় উহার প্রত্যেকেরই একটি পৃথক বাজার আছে। যেমন, পাটের বাজার, তুলার বাজার, শেয়ার বাজার, শ্রমের বাজার, মূলধনের বাজার ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা-বিক্রেতা থাকা চাই এবং উহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সহজ লেন-দেন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া চাই। তৃতীয়ত, লেন-দেনের সহজ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে ক্রেতার প্রদত্ত দাম (চাহিদা-দাম) দ্বারা যেমন বিক্রেতার প্রভাবিত হওয়া

চাই, তেমনি আবার বিক্রেতার প্রদত্ত দাম (যোগান-দাম) দ্বারা ক্রেতারও প্রভাবিত হওয়া চাই। অর্থবিদ্যায় বাজার বলিতে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের মধ্যে এমন সংযোগ বুঝায় যাহার দরুণ বাজারে একই ধরনের দ্রব্য বা সেবা একই দামে বিক্রয় হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

বাজারের শ্রেণীবিভাগের নির্দেশক
(Criteria for the classification of Markets)

বাজারের বহুপ্রকার শ্রেণীবিভাগ বা গঠনভেদ সম্ভবপর। কিন্তু দ্রব্যের বা সেবার দাম নির্ধারণের আলোচনায় সকল রকম শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা দাম নিরূপিত হয়, সেই সকল বিষয়ের লক্ষণের ভিত্তিতেই আমরা বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা আবশ্যক বোধ করি। এই দিক হইতে বিচার করিতে গেলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ বা গঠনভেদ করা চলে :

১। **উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার সংখ্যা :** বাজারের শ্রেণীবিভাগ নির্ধারণে বিক্রেতা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা অগণিত হইতে পারে, কতিপয় হইতে পারে ; আবার মাত্র একটি হইতে পারে। বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার সংখ্যার উপর উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান ও দাম নির্ধারণ নির্ভর করে। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশি হইবে, পণ্যের যোগান ও বাজার দামের উপর তাহাদের প্রভাবও তত কম হইবে। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত বা অসংখ্য হইলে কোন বিক্রেতাই এককভাবে দ্রব্যের যোগান ও দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কতিপয় বা মুষ্টিমেয় হইলে কোন একজন বিক্রেতার পণ্য যোগান ও দামের উপর কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। আবার বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা থাকিলে পণ্যের যোগান ও দামকে সে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিতে পারে।

২। **ক্রেতার সংখ্যা :** ক্রেতার সংখ্যাও পণ্যের ক্রয় পরিমাণ ও বাজার দামকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকিতে পারে, মুষ্টিমেয় ক্রেতা থাকিতে পারে, আবার অগণিত ক্রেতা থাকিতে পারে। বাজারে ক্রেতার সংখ্যা যত কম হইবে, পণ্যের ক্রয় পরিমাণ ও দামের উপর যে কোন একজন ক্রেতার প্রভাব তত বেশি হইবে।

৩। **উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি :** বাজারের গঠন-ভেদ বিবেচনা করিবার আর একটি উপাদান হইল : বিক্রেতাগণ যে দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিতেছে উহারা একজাতীয় (homogeneous) না একটির সহিত আর একটির কম-বেশি মিল বা পার্থক্য (differentiation) আছে। যে দ্রব্যগুলি সবদিক হইতে একজাতীয় উহাদের একটি আর একটির সম্পূর্ণ পরিবর্তক (perfect substitute) বলিয়া গণ্য করা হয়। ফলে, এই সকল দ্রব্যের বিভিন্ন বিক্রেতাগণ একই দামে দ্রব্যগুলি বিক্রয় করে ; কোন একজন বিক্রেতা খুশিমত যে-কোন দাম ক্রেতাদের উপর চাপাইয়া দিতে পারে না। আবার দ্রব্যগুলির মধ্যে যদি সামান্য মিল কিংবা কম-বেশি পার্থক্য থাকে তাহা হইলে ক্রেতার নিকট উহারা অনিখুঁত পরিবর্তক (imperfect substitute) অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য (differentiated products) বলিয়া গণ্য হইবে। এই ধরনের দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিক্রেতা ক্রেতাগণের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দাম লাভের চেষ্টা করিতে পারে।

৪। **বাজার সম্পর্কে জ্ঞানের মাত্রা :** বাজার সম্পর্কে সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার জ্ঞানের মাত্রার বিভিন্নতাও বাজার দাম প্রভাবিত ও বাজারের গঠনভেদ নির্ধারণ করিয়া থাকে। যে বাজারে পণ্য কেনা-বেচা কি দামে হইতেছে—এই সম্পর্কে সকল বিক্রেতা ও ক্রেতাই খবর রাখে, সেই বাজারে কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা একক ভাবে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আবার যে বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের পূর্ণ জ্ঞান নাই সে বাজারে একই পণ্যের দামের তারতম্য ঘটিতে পারে।

৫। **উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধা-অসুবিধা :** উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের বা বিক্রেতার বাজারে অবাধে প্রবেশ করা কিংবা বাজার হইতে সহজে সরিয়া যাওয়ার উপরও বাজার দাম ও বাজারের গঠন নির্ভর করে। যদি বাজারে বিক্রেতাগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারে কিংবা বাজার হইতে অবাধে প্রস্থান করিতে পারে তাহা হইলে ঐ বাজারে প্রতিযোগিতার প্রভাব খুব শক্তিশালী হইবে। ফলে, কোন একজন বিক্রেতা একক ভাবে পণ্য যোগান ও দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু বাজারে যদি নূতন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার পক্ষে প্রবেশ করা কঠিন হয়, আবার বাজার হইতে চলিয়া যাওয়ারও অসুবিধা থাকে তাহা হইলে বাজারে প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইবে। ফলে, কোন

প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা পণ্যের যোগান দামকে কিছুটা প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইবে।

বিভিন্ন বাজারের রূপ
(Different Market Forms)

উপরে আলোচিত নির্দেশক বা লক্ষণগুলির ভিত্তিতে বাজারের নিম্নলিখিত রূপ বা গঠনভেদ নির্দেশ করা চলে :

১। নিখুঁত বা পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজার
(Market under Perfect Competition)[১]

নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল : (ক) অসংখ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা এবং ক্রেতা বর্তমান ; (খ) সকল প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা সম্পূর্ণ একজাতীয় পণ্য (homogeneous product) বিক্রয় করিতেছে ; (গ) যে কোন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা যে কোন সময়ে অবাধে বাজারে বা শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে, কিংবা বাজার বা শিল্প অবাধে পরিত্যাগ করিতে পারে ; (ঘ) প্রত্যেকটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা কতটা পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিবে সে সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে ; (ঙ) সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বাজার সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান আছে ; (চ) উৎপাদকের বিভিন্ন উপাদানগুলি এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে অবাধে চলাচল করিতে পারে। অর্থাৎ উপাদানগুলির বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্র বা শিল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ সচলতা আছে ; (ছ) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার দ্রব্য বা সেবা বিক্রয়ের ব্যয় নাই।

১. অধ্যাপক চেম্বারলিন বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার (Pure Competition) বাজার এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার Perfect Competition বাজারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আলোচিত প্রথম চারিটি বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকিলেই বাজারকে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বাজার বলা যায়। আবার ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির সহিত যদি অবশিষ্ট আর তিনটি বৈশিষ্ট্য অতিরিক্ত থাকে তাহা হইলে সে বাজারকে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ্ আবার বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা ও নিখুঁত প্রতিযোগিতা এই দুইটি ধারণাকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

২। অনিখুঁত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার
(Market under Imperfect Competition)

যে-সকল লক্ষণ বা উপাদানের ভিত্তিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার গঠিত, বাস্তবক্ষেত্রে উহাদের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তব বাজার বলিতে অনিখুঁত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারকেই বুঝাইয়া থাকে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার ছাড়া যে কোন রূপ বা গঠনের বাজারকেই কল্পনা করা যায়। সেইজন্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। এইরূপ বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(ক) ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অবস্থিত ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের তুলনায় কম ; (খ) বিক্রেতাগণ সম্পূর্ণ এক জাতীয় পণ্য বিক্রয় করে না। কিছুটা মিল কিন্তু কিছুটা পৃথক এইরূপ পণ্য বিক্রয় করে। পণ্য পৃথকীকরণ এই বাজারের একটি প্রধান লক্ষণ ; (গ) উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার বাজারে প্রবেশে বাধানিষেধ থাকে ; (ঘ) উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে বা শিল্পে সচলতা হ্রাস পায় ; (ঙ) ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ বাজার সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নহে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি বাস্তবের সকল বাজারেই কম-বেশি দেখা যায়। আবার এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাবল্য ও দুর্বলতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার বাজারের গঠন-ভেদ বা বিভিন্ন রূপ নির্দেশ করা যায়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের চরম রূপ হইল বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার ছাড়া আর অন্যান্য অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হইল : একচেটিয়া ক্রেতার বাজার, বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার, অলিগোপলি বা অল্পসংখ্যক বিক্রেতার বাজার, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার
(Pure Monopoly)

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিলে বাজারকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বলা চলে :

(ক) বাজারে একটিমাত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা আছে ;

(খ) বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যটির কোন ভাল পরিবর্তক বা প্রতিযোগী দ্রব্য নাই; (গ) বাজারে ক্রেতার সংখ্যা অগণিত; (ঘ) বাজারে অপর কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশ সম্ভব নয় (closed entry)। বাজারে যদি অন্য কোন প্রতিযোগী প্রবেশ করিতে না পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্যটির কোন পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য না থাকে, তাহা হইলে একমাত্র বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকেই পণ্য উৎপাদনের শিল্প বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ও শিল্প এক হইয়া যায়, উহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয় না। এইরূপ বাজারে একটি উৎপাদক বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানই পণ্যের যোগান সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার পণ্যের দাম নির্ধারণেও প্রতিষ্ঠানটি সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এইরূপ বাজার বাস্তবে কখনো সম্ভবপর নহে। বাস্তবে কখনও কল্পনা করা যায় না যে, কোন উৎপাদিত পণ্যের কোন পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য নাই। সকল দ্রব্যই পরস্পর কম-বেশি পরিবর্তক বা প্রতিযোগী। বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে মোমবাতি, কেরোসিনের আলো প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। আবার এইগুলির কোনটি না পাইলে কিংবা অস্বাভাবিক উচ্চ দামে বিক্রি হইলে লোকে পরিবর্তক হিসাবে অন্ধকারে থাকিতেও রাজী থাকিতে পারে। বাস্তবে সকল দ্রব্যেরই কিছু না কিছু পরিবর্তক বা প্রতিযোগী দ্রব্য আছেই—উহারা ভাল বা কাছাকাছি পরিবর্তক বা প্রতিযোগী না হইতে পারে। ফলে, বাস্তবে যে একচেটিয়া বাজার দেখা যায় উহা বিশুদ্ধ নহে। বাস্তবের একচেটিয়া বাজার কম-বেশি একচেটিয়া ভাবাপন্ন।

একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার
(Monopolistic Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার—দুইই চরম অবস্থা। বাস্তব ক্ষেত্রে উহার কোনটির সন্ধান মেলে না। যে সকল বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের উপর এই দুইটি বাজার নির্ভরশীল উহাদের বাস্তবক্ষেত্রে একত্রে বড় একটা দেখা যায় না।

বাস্তব বাজারে নানা জটিলতাপূর্ণ একাধিক পরিস্থিতি দেখা যায়। উহাদের মধ্যে অধিকাংশ বাজারেই পাশাপাশি একচেটিয়া প্রভাব এবং প্রতিযোগিতার লক্ষণ দেখা যায়। এইরূপ একচেটিয়া ভাবাপন্ন এবং প্রতিযোগিতার লক্ষণবিশিষ্ট বাজারকে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত হইল :

(ক) এই বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকিলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায় অগণিত বা অসংখ্য নহে।

(খ) বাজারে পণ্যটির অনেক বিক্রেতা থাকিলেও ক্রেতার নিকট কোন বিক্রেতার পণ্য অপর কোন বিক্রেতার পণ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক বা প্রতিযোগী পণ্য নহে। আবার, ক্রেতার কাছে একজন বিক্রেতার পণ্য অপর কোন বিক্রেতার পণ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তকহীন বা প্রতিযোগীবিহীন পণ্যও, নহে। অর্থাৎ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রয় করে উহাদের মধ্যে কম-বেশি মিল দেখা যায় কিন্তু উহারা সর্বাংশে এক-জাতীয় নহে। যেমন, কলিকাতা শহরে অনেক দর্জির দোকান আছে। উহারা সবাই স্যুট তৈরি করিয়া থাকে। কিন্তু এক দোকানের তৈরি স্যুট এবং আর এক দোকানের তৈরি স্যুট সম্পূর্ণ একজাতীয় নহে। উহাদের মধ্যে কম-বেশি মিল থাকিলেও সর্বাংশে মিল দেখা যায় না। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতাগণ প্রায়-একরূপ পণ্য বিক্রয় করিলেও, প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্যের কিছুটা পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য থাকে। পৃথকীকৃত পণ্য (Differentiated products) যোগানো এই বাজারের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। পণ্য পৃথকীকরণের (product differentiation) মাধ্যমেই প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার পণ্যের কিছু সংখ্যক অনুরক্ত ক্রেতা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। এই অনুরক্ত ক্রেতাগণের নিকট বিক্রেতা একচেটিয়া কারবারীর ন্যায়। সে যদি ইহাদের নিকট পণ্যের দাম সামান্য বেশিও দাবী করে, তাহা হইলেও তাহার অনুরক্ত ক্রেতাগণ তাহার পণ্যের পৃথকীকৃত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া অপর কোন বিক্রেতার নিকট হইতে সস্তায় পণ্যটি কিনিতে যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া সে তাহার অনুরক্ত ক্রেতাগণের নিকট খুশিমত যে কোন দাম চাহিতে পারে না। কেননা, বাজারে প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকায় এক বিক্রেতা

আর এক বিক্রেতার অনুরক্ত ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। আবার বাজারে নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রবেশেরও কোন বিশেষ বাধা নাই। ফলে, এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা পণ্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবারীর মত ইচ্ছামত যে দাম চাপাইবার চেষ্টা করে উহা বাজারের প্রতিযোগিতা কিছুটা সীমিত করিয়া দেয়।

(গ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল এই বাজারে পণ্যের দামের উপর বিক্রয় ব্যয়ের (selling cost) প্রভাব থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের কোন বিক্রয় ব্যয় নাই। একচেটিয়া বাজারেও বিক্রয় ব্যয়ের কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাকে তাহার অনুরক্ত ক্রেতাগণকে হাতে রাখিতে হয়; আবার প্রতিযোগী বিক্রেতাগণের খরিদদারগণকেও নিজের পণ্যের দিকে টানিয়া আনিতে হয়। ইহার জন্য যথেষ্ট প্রচার-কার্য ও বিজ্ঞপ্তি-প্রকাশের প্রয়োজন হয়। এই বাবদ যে ব্যয় হয় উহাকে পণ্য বিক্রয়ের ব্যয় বলা হয়। এই পণ্য বিক্রয় ব্যয় অনেক সময় পণ্য উৎপাদন ব্যয়কেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা যখন পণ্যের দাম স্থির করে তখন উহা এমনভাবে ধার্য করা হয় যাহাতে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় ব্যয় দুইই উঠিয়া আসে। দাম নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের সহিত বিক্রয় ব্যয়ও ধরিতে হয় বলিয়া এই বাজারে পণ্যের দাম স্বভাবত বেশি হয়।

অলিগোপলি (Oligopoly)—এই বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল: (ক) ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য; (খ) কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয় বা অল্প কয়েকজন মাত্র; (গ) নূতন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার বাজারে প্রবেশের পথ সীমাবদ্ধ (restricted entry)।

এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কতিপয় বলিয়া প্রত্যেক বিক্রেতার পণ্য যোগানের উপর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। প্রত্যেক বিক্রেতা মোট পণ্য যোগানের একটি মোটা অংশ যোগান দিয়া থাকে। আবার বাজারে প্রতিযোগী বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও খুব তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে, প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার পণ্য বিক্রয় ও মূল্যনীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিক্রেতাগণের পণ্য যোগান ও মূল্যনীতির উপর কিরূপ হইতে পারে তাহা অনুমান করিয়া নিজে

চূড়ান্তভাবে পণ্য যোগান ও মূল্যনীতি ধার্য করে। এই বাজারে বিক্রেতাগণ পরস্পরের পণ্য বিক্রয়-নীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে।

অলিগোপলি দুই প্রকারের হইতে পারে—**বিশুদ্ধ** (Pure) এবং **পৃথকীকৃত** (Differentiated)। বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে বিক্রেতাগণ সর্বাংশে এক জাতীয় (homogeneous) দ্রব্য যোগান দিয়া থাকে। এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা যে পণ্যটি বিক্রয় করে উহা ক্রেতাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্তক। আর যে বাজারে বিক্রেতাগণের পণ্যে বেশ মিল থাকিলেও সামান্য পার্থক্য দেখা যায় উহাকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি বলা হয়। এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতাগণ যে পণ্যটি বিক্রয় করে উহা ক্রেতাগণের নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্তক নহে।

ডুয়োপলি (Duopoly)—ডুয়োপলির বৈশিষ্ট্য হইল: (ক) বাজারে বহু ক্রেতা; (খ) কিন্তু উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা মাত্র দুইটি; (গ) দুইটি বিক্রেতা ছাড়া আর অপর কোন বিক্রেতার বাজারে প্রবেশের বাধা থাকে। ডুয়োপলি অলিগোপলিরই একরূপ প্রকারভেদ বলা চলে।

ক্রেতার একচেটিয়া বাজার (Monopsony)—সাধারণ একচেটিয়া (Monopoly) বাজার বলিতে যাহা বুঝায় ক্রেতার একচেটিয়া বাজার তাহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। এই বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল: (ক) বাজারে বহু বিক্রেতা; (খ) কিন্তু ক্রেতা মাত্র একটি। এই প্রকার বাজার বাস্তবে বড় একটা দেখা যায় না। শ্রমের বাজারে যদি একমাত্র কোন মালিক একটি গোষ্ঠীভুক্ত শ্রম নিয়োগ করেন তাহা হইলে উহাকে ক্রেতার একচেটিয়া বাজার বলা চলে। একচেটিয়া বিক্রেতা যেমন ক্রেতাগণকে শোষণ (exploitation) করিয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ একচেটিয়া ক্রেতাও বিক্রেতাগণকে শোষণ করিয়া থাকে।

ডুয়োপসনি (Duopsony)—এই বাজার ডুয়োপলির সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা মাত্র দুইটি।

অলিগোপসনি (Oligopsony)—অলিগোপলির সম্পূর্ণ বিপরীত

অবস্থাকে অলিগোপসনি বলে। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত, কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা মাত্র কতিপয় বা মুষ্টিমেয়।

দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral Monopoly)— এইরূপ বাজারে ক্রেতাও একজন, আবার বিক্রেতাও একজন। একজন ক্রেতা বলিতে এক ব্যক্তি বা একটি সংঘ হইতে পারে, আবার একজন বিক্রেতা বলিতেও এক ব্যক্তি বা একটি সংঘ বলা যায়। সাধারণত শ্রমের বাজারে এইরূপ অবস্থা দেখা যায়। কোন শিল্পের অধীন সমস্ত শ্রমিক একটিমাত্র শ্রমিক-সংঘের সভ্য হইতে পারে। তখন এই সংঘই শ্রমিক যোগানো নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং একমাত্র শ্রম বিক্রেতা হিসাবে নিয়োগকর্তার সহিত নিয়োগ ও মজুরি নীতি নির্ধাবণে বোঝাপড়া করিতে পারে। আবার একটি শিল্পের অধীন বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি একটি উৎপাদক সংঘে সংগঠিত হয় তাহা হইলে এই সংঘ সকল প্রতিষ্ঠানের হইয়া শ্রমের নিয়োগ সম্পর্কে একমাত্র চাহিদাকারী হিসাবে মজুরিনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এইরূপ শ্রমের চাহিদা ক্ষেত্রে যখন একটি মাত্র ক্রেতা এবং যোগানের দিকেও একটিমাত্র বিক্রেতা দেখা যায়, তখন শ্রমের ঐ বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলা হইয়া থাকে।

৫ | ভোগকারীর আচরণ-তত্ত্ব
(Theory of Consumer Behaviour)

ভোগকারীর আচরণ-তত্ত্ব কাহাকে বলে ?
(What is the Theory of Consumer Behaviour ?)

মানুষের অভাব বোধ হইতেই সকল রকম অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত। মানুষ অভাব পূরণ করে ভোগ দ্বারা। ভোগ হইল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি প্রধান অঙ্গ। ভোগকারী অভাব তৃপ্তির জন্য দ্রব্য কিংবা সেবা ক্রয় করিয়া থাকে। ভোগকারীর চাহিদাই অর্থনৈতিক কাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য।

ভোগকারীর চাহিদার পশ্চাতে বহু শক্তি কাজ করিয়া থাকে। ভোগকারীর চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ভোগকারী কেন, কখন, কতটা পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করিতেছে, সে তাহার আয় কি ভাবে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য বা সেবার মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেছে—এই সকল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ভোগকারীর দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করিবার ক্ষেত্রে যে সামগ্রিক ব্যবহারটির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই ভোগকারীর আচরণ-তত্ত্ব। ভোগকারীর আচরণ-তত্ত্বের উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তু হইল তাহার চাহিদার পশ্চাতে কি কি শক্তি কি ভাবে কাজ করিয়া থাকে তাহার বিশ্লেষণ করা।

(অভাব ও উহার বৈশিষ্ট্য)
(Wants and their Characteristics)

অভাবপূরণই ভোগকারিগণের লক্ষ্য। ইহার জন্য ভোগকারিগণ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য চাহিয়া থাকে ঐ চাহিদা পূরণের জন্যই বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অবিরত দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করিয়া চলিয়াছে। ভোগকারীর অভাবের তাড়নাতেই চাহিদার উৎপত্তি। অভাবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

অভাব অগণিত

প্রথমত, ভোগকারীর অভাব সাধারণভাবে অগণিত। কোন একটি জিনিসের অভাব মিটিলে মানুষের আবার নূতন করিয়া অপর জিনিসের জন্য অভাব বোধ হয়। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে

সঙ্গে মানুষের অভাববোধ দিন দিনই বাড়িতেছে। মানুষের আদিম জনক-জননী আদম-ইভের অভাব ছিল সীমাবদ্ধ, আজিকার নরনারীর অভাব সীমাহীন বলা চলে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে ভোগকারীর অভাব অফুরন্ত হইলেও কোন একটি দ্রব্যের জন্য তাহার অভাব কিন্তু সীমাবদ্ধ। মানুষের কোন একটি জিনিসের অভাববোধ সম্পূর্ণভাবে মিটিতে পারে। ধর, কোন এক ব্যক্তি সন্দেশ খাইতে ভালবাসে। কিন্তু তাহাকে যদি ক্রমশ একটির পর একটি সন্দেশ আহার করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে শেষটায় এমন অবস্থা আসিবে যখন তাহার সন্দেশ গ্রহণের আকাঙ্খা একেবারেই থাকিবে না।

কোন একটি দ্রব্যের অভাববোধ সীমাবদ্ধ

তৃতীয়ত, মানুষের কতকগুলি অভাব পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী (competitive)। ভোগকারীর কোন একটি অভাব একাধিক দ্রব্য হইতে মিটিতে পারে। মানুষের পানের নেশা চা বা কফি হইতে মিটিতে পারে। অতএব চা ও কফি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবার, আমাদের খাদ্যসামগ্রীর অভাব, বাসস্থানের অভাব, শিক্ষার অভাব, আমোদ-প্রমোদের অভাব—একটা অপরটার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পূর্তিলাভের জন্য।

অভাব পরস্পরেব প্রতিদ্বন্দ্বী

চতুর্থত, মানুষের কিছু কিছু অভাব পরস্পর পরিপূরক (complementary) হিসাবে দেখা যায়। যেমন, আমাদের পড়াশুনা করিবার অভাব, কাগজ, কালি, কলম প্রভৃতির দ্বারা মিটিতে পারে। সুতরাং এই জিনিস কয়েকটি একে অন্যের পরিপূরক। সেইরূপ রুটি ও মাখন, মোটরগাড়ি ও পেট্রল পরস্পরের পরিপূরক।

ভোগ ও উহার প্রকৃতি
(Consumption and its Nature)

মানুষের অভাব আছে বলিয়াই ভোগের প্রয়োজন হয়। আবার ভোগের প্রয়োজন হয় বলিয়াই উৎপাদন, বিনিময় ও বহু রকমের অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের প্রয়োজন হয়। মানুষের অভাব যত বাড়িবে ও বৈচিত্র্যময় হইবে উহা মোচনের জন্য ভোগ্যদ্রব্য ও সেবাকার্যের প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্যও তত বাড়িবে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নূতন নূতন রুচির বিকাশ

হইতেছে, আর অভাববোধও বাড়িতেছে। ফলে নিত্য নূতন ভোগ্যদ্রব্যের প্রচলন ক্রমাগত বাড়িতেছে।

ভোগের প্রকৃতি কি কি বিষয়ের উপব নির্ভবশীল

কোন ব্যক্তির ভোগের ধরন প্রথমেই নির্ভর করে তাহার নিজস্ব শারীরিক প্রয়োজনের উপর। নিছক শরীর-রক্ষার তাগিদে তাহাকে অনেকগুলি দ্রব্য ভোগ করিতে হয়। শরীর-রক্ষার প্রয়োজনে কে কি দ্রব্য ভোগ করে তাহা আবার দেশ, কাল ও সমাজের শ্রেণীগত পার্থক্যের উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তির ভোগের ধবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় সমাজের প্রভাব ও সামাজিক চাহিদা দ্বারা। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব রুচিবোধ, খেয়াল-খুশি ও স্বাধীন অভাববোধ আছে যাহা দ্বারা তাহার ভোগ একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু সমাজের প্রভাবকে মানুষ একেবারে অবজ্ঞা করিতে পারে না। যে সমাজে সে বাস করে উহার রুচিবোধ, জীবন-যাত্রা সম্পর্কে ধারণা প্রভৃতি তাহার অভাববোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সামাজিক রুচি, আচার, প্রয়োজন প্রভৃতিব ভিত্তিতে অভাববোধের পার্থক্য হয়; আবার দ্রব্যের ও সেবাকার্যেরও স্তর-বৈষম্য করা হয়। ভোগকারীর ভোগের ধরনই এই যে, উহা সামাজিক অভাববোধ ও পছন্দ-ক্রমের সহিত সব সময়ই খাপ খাওয়াইয়া লইতে চেষ্টা করে।

মানুষ দীর্ঘদিন ধরিয়া যে-সকল দ্রব্য ভোগ করিতে অভ্যস্ত সেগুলিকে সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। অভ্যস্ত জিনিসগুলি তাহার জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করিয়া থাকে। ফলে, মানুষের ভোগের প্রকৃতি এই জিনিসগুলির উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে।

কোন ব্যক্তির ভোগের ধরন বিশেষভাবে নির্ভর করে সমাজে সে যে যে গোষ্ঠীর (social group) মধ্যে বসবাস করে বা মেলামেশা করে সেই সেই গোষ্ঠীর অভাববোধ ও ভোগের ধরনের উপর। সেই সকল গোষ্ঠী যে-সকল দ্রব্য ব্যবহার করে বা ভোগ করিতে চেষ্টা করে, সেই দ্রব্যগুলি সে ব্যবহার করিতেও চেষ্টা করে। সাধারণত প্রত্যেক ভোগ-কারীই নিজের গোষ্ঠী অপেক্ষা যে গোষ্ঠী সামাজিক দৃষ্টিতে একটু উঁচুতে সেই গোষ্ঠীর ভোগের ধরন অনুকরণ করিতে চায়। এইরূপ যখন অপরের ভোগের ধরন অনুকরণ দ্বারা কোন ভোগকারীর ভোগের প্রকৃতি ধার্য হয়, তখন উহাকে বলা হয় প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect)।

পরিশেষে, ভোগের প্রকৃতি ভোগকারীর বর্তমান আয় দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাহার বর্তমান ভোগ আবার অনেক সময় অতীত আয়ের পরিমাণ দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, অতীত আয়ের সহায়তায় সে এমন একটা বিশেষ ভোগ-ধরনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে পরবর্তীকালে সহজে সেই ধরন পরিবর্তন করিতে পারে না।

ভোগ ও আয়
(Consumption and Income)

কোন ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে তাহার ব্যয় করিবার ক্ষমতার উপর। ব্যয়ের এই ক্ষমতা আবার নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। কিন্তু ভোগকারী দ্রব্যের উপর কতটা ব্যয় করিতে সমর্থ তাহা কেবলমাত্র তাহার বর্তমান আয়ের উপরই নির্ভর করে না। নিকট অতীতে কতটা সর্বোচ্চ আয়ের স্তরে সে পৌঁছিয়াছিল (Peak-level of income reached in the recent past) তাহার উপরও তাহার ভোগ ব্যয় নির্ভর করে। নিকট অতীতে সর্বোচ্চ আয় স্তরে থাকাকালীন সে যে-সকল দ্রব্য ভোগ করিতে অভ্যস্ত ছিল বর্তমানে পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী সে সেই জিনিসগুলির ব্যবহার একেবারে বর্জন করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, অতীতে অর্জিত আয় হইতে ভোগকারী বর্তমান ভোগের প্রয়োজনেও কিছু অর্থ ব্যয় করিতে পারে।

ভোগের ধরন ও ব্যয়-পদ্ধতি সম্পর্কে জার্মান পরিসংখ্যানবিদ্ এংগেল নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম নির্দেশ দিয়াছেন। এই নিয়মগুলিকে এংগেলের ভোগ বিধি (Engel's Laws of Consumption) বলা হয়:

এংগেলের ভোগবিধি

(১) ভোগকারীর আয়ের পরিমাণ যত কম হইবে খাদ্যের উপর আয়ের শতাংশ (percentage) ব্যয় তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে। যে ব্যক্তির আয় ১০০ টাকা সে খাদ্যের উপর হয়তো তাহার আয়ের ৮০ শতাংশ ব্যয় করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির আয় ৫০০ টাকা সে খাদ্যের উপর ৫০ কি ৬০ শতাংশের বেশি ব্যয় করিবে না। এক-জন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার আয়ের অধিকাংশই খাদ্যের উপর ব্যয় করিয়া থাকে। সেই তুলনায় একজন ধনী ব্যক্তি তাহার আয়ের অনুপাতে দরিদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক কম অর্থ খাদ্যের উপর ব্যয় করে।

(২) আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর (আয় বৃদ্ধির অনুপাতে) ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার আয় হ্রাস পাইলে এই ব্যয় কমিয়া যায়।

(৩) ভোগকারীর আয় যে স্তরেই থাকুক না কেন, পোশাক, বাড়িভাড়া, আলো, তাপ প্রভৃতির জন্য ব্যয়ের অনুপাত প্রায় একরূপ থাকে।

ভোগপ্রবণতা
(Propensity to Consume)

মানুষ আয় দ্বারা ভোগ ব্যয় করিয়া থাকে। এই ভোগের মাধ্যমেই অভাব তৃপ্ত করা সম্ভব হয়। আয় হইতে ব্যয় করিয়া ভোগকারীর অভাব তৃপ্ত করার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ইহাকে ভোগপ্রবণতা বলে। ভোগের বিধি এই যে, যাহার আয় যত অল্প সে ভোগের উপর আয়ের অনুপাতে তত বেশি অর্থ ব্যয় করে। আবার যাহার আয় যত বেশি সে ভোগের উপর আয়ের অনুপাতে তত কম অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং বলা চলে, যাহাদের আয় অল্প তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশি, আর যাহাদের আয় বেশি তাহাদের ভোগপ্রবণতা কম। ভোগপ্রবণতাকে আয়ের ভগ্নাংশ হিসাবে নিম্নখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

কোন ব্যক্তির আয় যদি ১০০৲ টাকা হয়, এবং ভোগ ব্যয় ৭০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে তাহার ভোগপ্রবণতা হইবে $\frac{৭০}{১০০} = \frac{৭}{১০}$। ইহাকে গড়পড়তা ভোগপ্রবণতা বলে। এখন যদি এই ব্যক্তির আয় ১০৲ টাকা বাড়ে এবং উহার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি পায় ৬৲ টাকা তাহা হইলে ভোগকারীর প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হইবে $\frac{৬}{১০} = \frac{৩}{৫}$। ভোগপ্রবণতা ভোগের প্রকৃতি ও ভোগ কাঠামোর উপর নির্ভর করে। ভোগকারীর ভোগকাঠামোব সহজে পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া ভোগপ্রবণতাও হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি পায় না। ভোগীর প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা স্বভাবতই এক (unit) অপেক্ষা কম হয়। কোন ভোগকারীর আয় ১০৲ টাকা বাড়িলে তাহার ভোগ ব্যয়ও ১০৲ টাকা বাড়ে না, উহা ১০৲ টাকা হইতে কিছু কম বৃদ্ধি পায়।

ভোগকারীর আচরণ নির্ধারণের দুইটি ধারা
(Two Approaches to the Determination of Consumer Behaviour)

ভোগকারী বাজারে কোন্ দ্রব্য কি দামে, কতটা পরিমাণ ক্রয় করিবে

এবং কি প্রকারেই বা সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করে। অর্থবিজ্ঞানিগণ ভোগকারীর এই আচরণ নির্ধারণে উপযোগ ধারণাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উপযোগের ভিত্তিতেই ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়।

ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণে দুইটি পৃথক ধারা বা ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত ব্যাখ্যা যাহাকে উপযোগ-তত্ত্ব (Utility theory) বলা হয়। আর একটি আধুনিক ব্যাখ্যা যাহাকে পছন্দ-তত্ত্ব (Preference theory) বলা হয়। অবশ্য দুইটি ব্যাখ্যাতেই উপযোগের ভিত্তিতেই ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করা হয়। দুইটি ব্যাখ্যাই কতকগুলি মৌলিক অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনুমানগুলির মধ্যে বিশেষ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অনুমানগুলি হইল : (ক) দুইটি ব্যাখ্যাতেই অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপর ব্যয় করে। (খ) বাজারে যে দামে সে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্য ক্রয় করিবে তাহা পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সেই নির্ধারিত দামে ভোগকারী নিজের আয় অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে। (গ) ভোগকারী ইচ্ছা করিলে তাহার নির্দিষ্ট আয় দ্বারা নির্ধারিত বাজার দামে দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণ ক্রয় করিতে পারে। (ঘ) দ্রব্য ও সেবাকার্য ক্রয়ের পশ্চাতে ভোগকারীর লক্ষ্যই হইল সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা। প্রত্যেক ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় ও দ্রব্যের নির্ধারিত বাজার দাম অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণ এরূপভাবে ক্রয় করিবে যাহাতে তাহার পক্ষে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হয়।

দুইটি তত্ত্বের অনুমানের মধ্যে মিল

উভয় ব্যাখ্যাতে উপরিউক্ত অনুমানগুলির মিল থাকা সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে মূলত পার্থক্য রহিয়াছে। ভোগকারী দ্রব্য বা সেবাকার্যের উপযোগ হইতে তৃপ্তিলাভ করে। এই উপযোগ বাস্তবত পরিমাপ করা যায় কি না তাহা লইয়াই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে বিরোধ। অধ্যাপক মার্শাল এবং উপযোগ তত্ত্বের অন্যান্য সমর্থকগণ মনে করেন যে, দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপযোগ পরিমাপযোগ্য। ভোগকারী কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে উহার বিভিন্ন একক হইতে কতটা

মার্শালের উপযোগ-তত্ত্বকে পরিমাণবাচক উপযোগ-তত্ত্ব বলা হয়

পরিমাণ উপযোগ লাভ করিবে তাহা অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা চলে। দ্রব্যেব বিভিন্ন এককের উপযোগ ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি পরিমাণবাচক সংখ্যা দ্বারা (cardinal number) নির্দেশ করা যায়। এই ভাবে দ্রব্যের বিভিন্ন একক হইতে যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ পাওয়া যায় উহাদিগকে যোগ করিলে ঐ যোগফল দ্রব্য ক্রয়ের যে অবস্থায় সর্বাধিক হইবে সেই অবস্থাকেই ভোগকারীর সর্বাধিক তৃপ্তির অবস্থা বলিয়া নির্দেশ করা চলে। পরিমাণবাচক সংখ্যা দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করা যায় বলিয়া মার্শালের উপযোগ-তত্ত্বকে পরিমাণ বাচক উপযোগ-তত্ত্ব (Theory of Cardinal Utility) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

দ্বিতীয় তত্ত্বটির প্রবক্তা হইলেন প্যারেটো, হিক্‌স প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপযোগ পরিমাপযোগ্য নহে। যেহেতু উপযোগের পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নহে, সেই হেতু দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয়ের কোন্ স্তরে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ করা সম্ভব তাহাও সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগ কত পরিমাণ তাহা জানিতে না পারিলেও, ভোগকারী অনায়াসে বলিতে পারে একটি কলার তুলনায় একটি আম তাহার কাছে বেশি পছন্দসই কি না কিংবা আমের প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি তাহার কাছে বেশি পছন্দসই কি না। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের কিংবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগের পরিমাণ কতটা তাহা পরিমাপ করা সম্ভব না হইলেও, ভোগকারী তাহার পছন্দ অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের কিংবা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের গুরুত্ব নির্দেশ করিতে পারে। বিভিন্ন দ্রব্যকে কিংবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন একককে সে তাহার পছন্দ অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি ক্রম (order) ধার্য করিয়া দিয়া একটি মনোগত তালিকা প্রস্তুত করিতে পারে। এইভাবে যে দ্রব্যটিকে বা দ্রব্যের একক সমষ্টিকে সে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে তাহা কিনিলেই তাহার পক্ষে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ সম্ভব হইবে। এইভাবে দ্রব্যের গুরুত্ব বা ক্রমবাচক সংখ্যার (Ordinal numbers) ভিত্তিতে উপযোগ বিশ্লেষণকে গুরুত্ববাচক উপযোগ-তত্ত্ব (Theory of ordinal utility) বলা হইয়া থাকে।

পছন্দ-তত্ত্বকে গুরুত্ব-বাচক উপযোগ-তত্ত্ব বলা হয়

মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্ব বা পরিমাণগত উপযোগ-তত্ত্ব
(The Marshallian Utility Theory or Theory of Cardinal Utility)

কোন দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকেই উপযোগ বলে। দ্রব্যের এই অভাব পূরণের ক্ষমতা আছে বলিয়াই উহার চাহিদা দেখা দেয়। দ্রব্যের উপযোগ হইতেই উহার চাহিদার সৃষ্টি। মার্শাল এবং তাঁহার সমর্থকগণ মনে করেন যে, উপযোগ যদিও একটি মানসিক বিষয়, তথাপি উহার পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। ভোগকারী একটি দ্রব্য বা উহার একটি একক ক্রয়ের জন্য যে দাম দিতে রাজী থাকে উহাই ঐ দ্রব্যের বা দ্রব্য এককের পরিমাপক বলা যায়। টাকার উপযোগ অপরিবর্তনীয় ধরিয়া লইয়া, ভোগকারী যদি কোন দ্রব্যের দাম হিসাবে বেশি টাকা দিতে রাজী থাকে তাহা হইলে দ্রব্যটির উপযোগ তাহার কাছে বেশি হইবে, আর সে যদি কম টাকা দিতে রাজী হয় তাহা হইলে উহার উপযোগ তাহার কাছে কম হইবে। মার্শাল এবং তাঁহার সমর্থকগণের মতে, দামের সাহায্যে দ্রব্যের উপযোগ পরিমেয়।

উপযোগ পরিমেয়

মোট উপযোগ .
(Total Utility)

কোন দ্রব্যের উপযোগ বলিলে সাধারণত উহার মোট উপযোগ বুঝায়। যদি কোন ভোগকারী বাজারে গিয়া ১টি আম ক্রয় করে এবং উহার উপযোগ যদি ২০ হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি, এক একক আম হইতে ২০র সমান উপযোগ লাভ হইয়াছে। ভোগকারী যদি আমের এইরূপ তিনটি একক ক্রয় করে তাহা হইলে ঐ তিন একক হইতে ভিন্নভাবে যে উপযোগ লাভ হইবে উহাদের যোগফলই মোট উপযোগ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারী একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করিয়া ঐ সকল এককগুলি হইতে যে পরিমাণ উপযোগসমষ্টি লাভ করিয়া থাকে, উহাই তাহার মোট উপযোগ। সুতরাং, মোট উপযোগ = প্রথম এককের উপযোগ + দ্বিতীয় এককের উপযোগ + তৃতীয় এককের উপযোগ।

প্রান্তিক উপযোগ
(Marginal Utility)

ভোগকারী কোন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক কিনিতে কিনিতে এমন এক সীমায় পৌঁছিতে পারে যখন তাহাকে বিবেচনা করিতে হইতে পারে যে, ঐ দ্রব্যের আরও অতিরিক্ত একক ক্রয় বা ভোগ করা তাহার কাছে যথার্থ লাভের হইবে কি না। ভোগকারী এইভাবে দ্রব্য ক্রয়ের যখন প্রান্ত-সীমায় আসিয়া পড়ে তখন যে শেষ এককটি সে ক্রয় করে তাহাকে প্রান্তিক একক (marginal unit) বলে। এই প্রান্তিক একক হইতে সে যে উপযোগ লাভ করে তাহাই ভোগকারীর প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক উপযোগ হইল দ্রব্যের এক একক ক্রয় বা ভোগ বৃদ্ধি বা হ্রাসের ফলে মোট উপযোগ যতটুকু অতিরিক্ত বাড়ে বা কমে। মনে কর, ৫টি আম হইতে কোন ভোগকারী ৫০ মাত্রা মোট উপযোগ লাভ করে। সে যদি ৬টি আম হইতে ৫৫ মাত্রা মোট উপযোগ পায়, তাহা হইলে একটি অতিরিক্ত আম হইতে সে যে ৫ মাত্রা বেশি উপযোগ লাভ করিবে উহাই তাহার কাছে প্রান্তিক উপযোগ। অনেকে আবার দ্রব্যের সর্বশেষ এককের উপযোগকেও প্রান্তিক উপযোগ বলিয়া থাকেন। দ্রব্যের এককগুলি যদি খুব ক্ষুদ্রভাবে ধরা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত এক একক অথবা সর্বশেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের মধ্যে বিশেষ একটা তফাৎ হয় না। সেই জন্য কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক অথবা সর্বশেষ একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগকে প্রান্তিক উপযোগ বলা চলে।

$$\text{অতএব, প্রান্তিক উপযোগ} = \frac{\text{মোট উপযোগের সামান্য পরিবর্তন}}{\text{ক্রয় বা ভোগের পরিমাণের সামান্য পরিবর্তন}}$$ ১

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক
(Relation between Total Utility and Marginal Utitity)

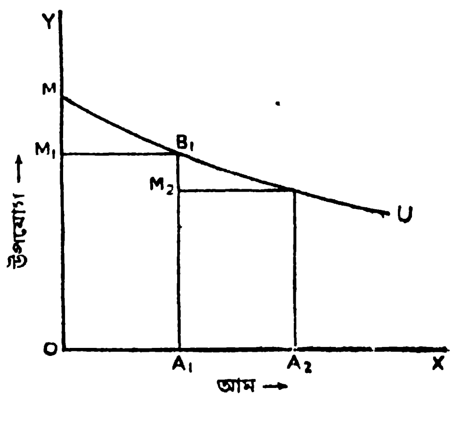
মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তাহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কোন ভোগকারী যখন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক পর পর ক্রয় করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট দ্রব্যটির মোট উপযোগ ক্রমাগত বাড়িবে কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে। মোট

১. $$\text{M.U.} = \frac{\text{Small changes in Total Utility}}{\text{Small changes in quantity purchased or consumed}} = \frac{\Delta U}{\Delta Q}$$
[Δ = Small changes]

উপযোগ বিভিন্ন একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগসমূহের সমান নিচের উদাহরণ হইতে সম্পর্কটি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

আমের সংখ্যা	মোট উপযোগ	প্রান্তিক উপযোগ
১	১৫	১৫
২	২৮	১৩
৩	৩৮	১০
৪	৪৬	৮
৫	৫২	৬
৬	৫৭	৫

উপরের উদাহরণে আমরা দেখিতে পাই, ভোগকারী যখন ১টি আম ক্রয় বা ভোগ করে তখন সে ১৫ মাত্রার মোট উপযোগ এবং ১৫ মাত্রার প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। সে আর একটি আম যখন বেশি ভোগ করে (অর্থাৎ যখন সে দ্বিতীয় আমটি ভোগ করে), তখন আমের মোট উপযোগ হয় ২৮ মাত্রা এবং প্রান্তিক উপযোগ ১৩ মাত্রা। তাহা হইলে বলা চলে যে, আম দুইটি হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগের পরিমাণ (২৮ মাত্রা) : প্রথম আমটি ভোগের প্রান্তিক উপযোগ ১৫ মাত্রা এবং দ্বিতীয় আমটি ভোগের প্রান্তিক উপযোগ ১৩ মাত্রার যোগফল বা সমষ্টির সমান। এইরূপে N সংখ্যক আমের মোট উপযোগের পরিমাণ = ১টি আমের প্রান্তিক উপযোগ + ২টি আমের প্রান্তিক উপযোগ + ··· + N সংখ্যক আমের প্রান্তিক উপযোগ। প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের মধ্যে সম্পর্কটি রেখাচিত্রের সাহায্যে এইভাবে দেখানো যায় :



কোন ব্যক্তি যখন OA_1 একক আম ক্রয় বা ভোগ করে তখন সে $OA_1B_1M_1$ মাত্রার মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে। আবার দ্বিতীয় একক আম A_1A_2 ভোগ করিলে $A_1A_2B_2M_2$ মাত্রার অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে। $A_1A_2B_2M_2$ মাত্রাই তাহার দুইটি আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ। আর দুইটি আম হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগের পরিমাণ হইবে $OA_1B_1M_1 + A_1A_2B_2M_2$ । B_1 এবং B_2 বিন্দু যোগ করিলে MU একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা পাওয়া যাইবে।

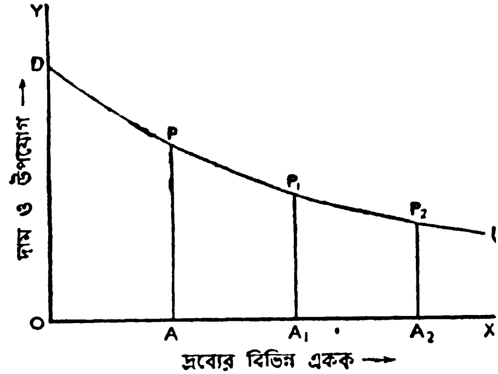
উপরের আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, ভোগকারী যতই ভোগের একক ক্রয় বা ভোগ বৃদ্ধি করে, ততই দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে। এইভাবে প্রান্তিক উপযোগ কেন কমিতে থাকে তাহা ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি দ্বারা বুঝানো হয়।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি
(Law of Diminishing Marginal Utility)

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির সারমর্ম এই যে, একটি দ্রব্যের যত অধিক পরিমাণ আমরা ভোগের জন্য পাই, ততই ঐ দ্রব্যের উপযোগ আমাদের কাছে ক্রমাগত কমিতে থাকে। ভোগকারী প্রথম যখন একটি দ্রব্য ব্যবহার করিতে শুরু করে তখন উহা তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করিয়া থাকে ; উহা হইতে সে যথেষ্ট উপযোগও লাভ করে। কিন্তু ঐ দ্রব্যের পুঁজি সে যতই বৃদ্ধি করিতে থাকে (এবং আর কোন অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয়) ততই দ্রব্যের উপযোগ ক্রমান্বয়ে তাহার কাছে হ্রাস পাইতে থাকিবে। যেমন, দারুণ গ্রীষ্মে এক গেলাস শীতল পানীয় হইতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু তাহাকে যদি একই রকমের দ্বিতীয় গেলাস পানীয় দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার উপযোগ প্রথম গেলাসের তুলনায় কম হইবে। এইরূপ গেলাসের পর গেলাস একই রকম পানীয় হইতে উপযোগ ঐ ব্যক্তির নিকট ক্রমাগত হ্রাস পাইবে।

মানুষ ভোগের জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহা হইতে যে উপযোগ লাভ করে তাহা অর্থমূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়। কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য সমান অর্থমূল্য দিতে আমরা নারাজ। দ্রব্যের প্রথম একক যদি

সর্বাধিক উপযোগ দান করে তাহা হইলে উহার জন্য আমরা সর্বোচ্চ অর্থমূল্য দিই। যতই দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক ক্রয় করিতে থাকি, ততই অতিরিক্ত উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমরা অর্থমূল্যও ক্রমাগত কম দিতে থাকি। দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ক্রয় করিতে করিতে শেষে এমন একটি এককে আসিয়া উপস্থিত হই, যখন উহার অতিরিক্ত একক উপযোগ-বিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। যে শেষ একক অবধি আমরা দ্রব্যটি ক্রয় করিতে প্রস্তুত, উহাকে দ্রব্যের প্রান্তিক একক (marginal unit) বলা হয়, এবং দ্রব্যের ঐ প্রান্তিক একক হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায়, তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। নিম্নে একটি চিত্রাঙ্কন দ্বারা ক্ষীয়মাণ উপযোগের বিষয়টি নির্দেশ করা হইল :



OX অক্ষরেখা চাহিদা দ্রব্যের বিভিন্ন একক নির্দেশ করে এবং OY অক্ষরেখা দাম ও উপযোগ নির্দেশ করে। ক্রেতা প্রথম একক দ্রব্য OA ক্রয় করিতে AP দাম দিতে ইচ্ছুক ; দ্বিতীয় একক দ্রব্য AA_1 ক্রয় করিতে A_1P_1 দাম দিতে ইচ্ছুক। এবং তৃতীয় একক দ্রব্য A_1A_2 ক্রয় করিতে A_2P_2 দাম দিতে রাজী। প্রথম এককের দাম AP অপেক্ষা দ্বিতীয় এককের দাম A_1P_1 কম ; আবার দ্বিতীয় এককের দাম A_1P_1 অপেক্ষা তৃতীয় এককের দাম A_2P_2 আরও কম। সুতরাং, প্রথম এককের উপযোগ অপেক্ষা দ্বিতীয় এককের উপযোগ কম, তেমনি দ্বিতীয় একক অপেক্ষা তৃতীয় এককের উপযোগ আরও কম। P, P_1 এবং P_2 বিন্দু যোগ করিলে যে DU বক্ররেখা পাওয়া যাইবে উহাই ক্ষীয়মাণ উপযোগ রেখা।

ক্ষীয়মাণ উপযোগের বিধিকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি (Law of Diminishing Marginal Utility) বলিলেই ভাল হয়। কেন না, কোন ব্যক্তি যতই একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করিতে থাকে ততই তাহার কাছে অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের মাত্রা কমিতে থাকে।

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির অনুমিত শর্তাবলী ও ব্যতিক্রম

(Assumptions and Limitations of the Law of Diminishing Marginal Utility)

ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধিটির প্রয়োগে অনেক বাধা ও ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এই নিয়মটি গড়িয়া উঠিয়াছে উহা সর্বথা সত্য ও বাস্তব নহে।

প্রথমত, নিয়মটির ব্যাখ্যানে অনুমান করা হয় যে, ভোগী দ্রব্যের বিভিন্ন একক উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি দ্রব্যের বিভিন্ন একক অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণের হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের পুঁজি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত উপযোগ হ্রাস না পাইয়া বাড়িতে থাকিবে। যেমন, কয়লার বিভিন্ন একক যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ হয়, তাহা হইলে কয়লার পুঁজি বাড়িলে উহার অতিরিক্ত উপযোগ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, এই নিয়মের আর একটি অনুমান এই যে, ক্রেতা বা ভোগকারীর আচরণ, ব্যবহার, রুচি বা প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন ধরা হয় না। যদি একজন লোক অতিমাত্রায় মদ খায়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক রুচি বা প্রকৃতি বদলায়—তখন গেলাস গেলাস মদ খাইলেও অতিরিক্ত মদের উপযোগ তাহার কাছে হ্রাস পায় না।

তৃতীয়ত, এমন অনেক জিনিস আছে, যথা, প্রাচীন মুদ্রা, বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিট ইত্যাদি যেগুলির ক্ষেত্রে এই বিধি খাটে না। প্রাচীন মুদ্রা বা ডাকটিকিট সংগ্রহের পরিমাণ যতই বাড়ুক না কেন, উহার উপযোগ ক্রেতার নিকট ক্রমাগত হ্রাস না পাইয়া বাড়িতেই থাকে।

চতুর্থত, ভোগী যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যটি ব্যবহার করে তবেই কেবল এই বিধিটি প্রযোজ্য হইবে। যদি দিনের মধ্যে কেহ দুইবার

মাত্র আহার করে, একবার বেলা ১১ টায় আর একবার ৪ টায়, তাহা হইলে তাহার কাছে খাদ্যের দ্বিতীয় এককের উপযোগ হ্রাস পাইবে না।

পঞ্চমত, অনেকে বলেন যে, নিয়মটি সঠিক ভিত্তির উপর গঠিত নহে। কোন জিনিসের চাহিদার পরিমাণ ও উপযোগ কেবলমাত্র ঐ জিনিসের বাজার দামের উপর নির্ভর করে না—ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাণ ও উহাদের বাজার মূল্যের উপরও উহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কোন ভোগীই পৃথকভাবে এক একটি দ্রব্য ক্রয় বা ব্যবহার করে না। আমরা যদি একটি দ্রব্যই ক্রমাগত ক্রয় করিতে থাকি, তাহা হইলে অন্য দ্রব্য ক্রয় করিতে আমাদের অর্থের টান পড়িবে। কিন্তু এই মতবাদটিও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। কেন না, কোন দ্রব্যের জন্য যদি আমরা অর্থমূল্য নাও দিই আর ঐ দ্রব্যের পরিমাণ ব্যবহার যদি ক্রমাগত বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলেও উহার ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পাইবে।

ষষ্ঠত, এই বিধির আর একটি ব্যত্যয় এই যে, জিনিসের উপযোগের পরিমাণ অর্থমূল্য দিয়া সঠিক ভাবে পরিমাপ করা যায় না। কোন জিনিসের উপযোগ ভোগীর মানসিক ধারণার উপর নির্ভর করে। অর্থমূল্য হইল বাস্তব মাপকাঠি। উপযোগের মত মানসিক পদার্থকে অর্থের বাস্তব মাপকাঠি দ্বারা সঠিক পরিমাপ করা চলে না। একটি জিনিসের বিভিন্ন একক হইতে ক্রেতা কত বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ লাভ করে সেগুলি আমরা তুলনা করিতে পারি, কিন্তু পরিমাপ করিতে পারি না।

পরিশেষে, এই বিধিটির বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, ইহা শুধু নির্দেশ দেয় কেমন করিয়া পুঁজি বৃদ্ধির ফলে ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভোগীর কাছে দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি শুধু উহার পুঁজি পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, অন্য লোকের পুঁজি পরিমাণ দ্বারাও ভোগীর নিকট দ্রব্যের উপযোগ নির্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন, কোন শহরে দুইজন প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রাহক প্রতিযোগী আছে। উহাদের দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগ্রহ যদি হারাইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির সংগ্রহের ক্রমিক উপযোগ তাহার পুঁজি পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির অনুমিত শর্তগুলি অবাস্তব হইলেও এবং বিধিটির নানা ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও ভোগকারীর দ্রব্য ক্রয়

ও ভোগ সম্পর্কে ইহা মৌলিক সত্যের সন্ধান দিয়া থাকে। অধিক দ্রব্য ক্রয় বা ভোগে ভোগকারীর নিকট কেন উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া যায় এবং কেন দাম না কমিলে সে উহা আর কিনিতে রাজী হয় না, সে প্রশ্নের সন্ধান এই বিধিটি প্রদান করিয়া থাকে। পরে আমরা দেখিব, চাহিদার নিয়মেরও (Law of Demand) মূল ভিত্তি হইল ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি।

ভোগকারীর ভারসাম্য
(Consumer's Equilibrium)

ভোগকারী পরিবার বা ব্যক্তির আয় সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহার অভাব অনন্ত। এই সীমিত আয় দ্বারা ভোগকারী কি ভাবে তাহার অভাব ভাল ভাবে পূরণ করিতে পারে তাহাই তাহার সমস্যা। ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় যখন বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপর ব্যয় করে, তখন তাহার লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা। ভোগীর ভারসাম্য সেই ক্ষেত্রেই হইয়াছে বলা যায়, যেখানে সে সীমাবদ্ধ আয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বণ্টন দ্বারা সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে। ভারসাম্যের ক্ষেত্রে পৌঁছিলে ভোগকারী আর বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে আয় বণ্টনের পরিবর্তন দ্বারা উপযোগ বৃদ্ধি করিতে পারে না।

একটিমাত্র দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য
(Consumer's Equilibrium with one Commodity)

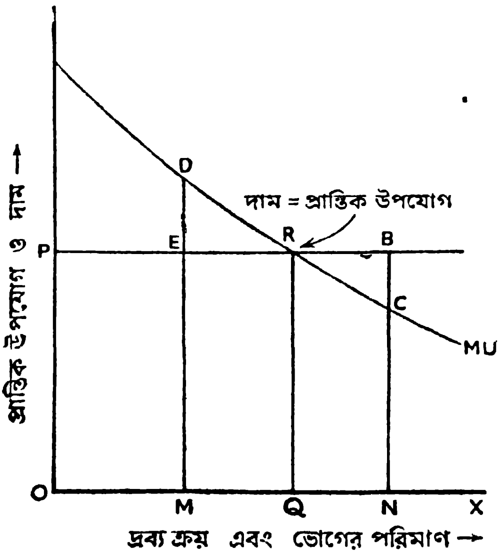
যদি ভোগকারী তাহার আয় একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে কি ভাবে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করিবে? একটি মাত্র দ্রব্য বা সেবাকার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত কি?

আমরা উপযোগের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, ভোগকারী একটি দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে, ততই তাহার কাছে উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে। আবার দ্রব্যটি যত কম পরিমাণে কিনিবে, ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকিবে। দ্রব্যটির কতটা পরিমাণ সে ক্রয় করিবে তাহা উহার প্রান্তিক উপযোগের দ্বারা স্থির করিতে হয়। যদি সে মনে করে দ্রব্যটির অতিরিক্ত এক একক (প্রান্তিক একক) ক্রয় করা লাভজনক, তবেই সে অতিরিক্ত এক একক ক্রয় করিবে। দ্রব্যটির অতিরিক্ত

এক একক ক্রয় ভোগকারীর নিকট লাভজনক কিনা তাহা সে উহার বাজার দাম দিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ সে দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক এবং উহার বাজার দাম মিলাইয়া দেখিয়া তবে ঐ অতিরিক্ত একক ভোগ করিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেখিবে যে, দ্রব্যের অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ উহার বাজার দামের তুলনায় বেশি, ততক্ষণ সে উহা কিনিতে থাকিবে। এই ভাবে দ্রব্যটির অতিরিক্ত একক ক্রয় করার ফলে উহার প্রান্তিক উপযোগ কমিতে কমিতে একসময় বাজার দামের সহিত সমান হইয়া পড়িবে। দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ ও বাজার দাম যে ক্ষেত্রে সমান হইবে, তাহাই ভোগকারী বা ক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত। সুতরাং, ভোগকারী সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের জন্য নির্দিষ্ট দামে সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিবে, যতটা ক্রয় করিলে দ্রব্যটির দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়। গাণিতিক ভাষায় ভোগকারীর ভারসাম্যের এই শর্তটি এই ভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$P = MU \text{ অথবা } \frac{MU}{P} = 1$$

ভোগকারীর প্রতিটি দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই এই শর্তটি সমান ভাবে প্রযোজ্য। পার্শ্বস্থ রেখা-চিত্রের সাহায্যে দ্রব্যের দাম ও উহার প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক এবং ভারসাম্য অবস্থায় ভোগকারীর দ্রব্য ক্রয় ও ভোগের পরিমাণ ব্যাখ্যা করা হইল :



OX অক্ষটি দ্রব্যের ক্রয় ও ভোগের পরিমাণ এবং OY অক্ষটি দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করিতেছে। দ্রব্যটির বাজার দাম OP। দ্রব্যটির দাম নির্দিষ্ট। পূর্ণ প্রতিযোগিতার

বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকায় কোন একজন ভোগকারীর দ্রব্য ক্রয়ের তারতম্যের ফলে বাজার দামের পরিবর্তন হয় না। MU হইল ভোগকারী বা ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগের রেখা। ভোগকারী OQ পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়াই থামিয়া যাইবে, উহার বেশি কিনিবে না ; কেন না, OQ পরিমাণ দ্রব্য কিনিলেই দ্রব্যটির বাজার দাম ও ইহার প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইবে। OQ পরিমাণ দ্রব্য কিনিলে সে OQRA মোট উপযোগ বা তৃপ্তিলাভ করিবে। OQ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই ভোগকারীর ভার-সাম্যের অবস্থা। ভোগকারী OQ পরিমাণের চেয়ে কেন বেশি কিংবা কম দ্রব্য কিনিতে পারে না তাহা সহজেই দেখান যায়।

মনে কর, ভোগকারী ON দ্রব্য কিনিল। এ ক্ষেত্রে দ্রব্যটির দাম NB উহার প্রান্তিক উপযোগ NC অপেক্ষা অধিক হইবে। ভোগকারী যদি QN দ্রব্য কেনে তাহা হইলে RBC পরিমাণ উপযোগ হারাইবে—মোট উপযোগ এই পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং, ভোগকারী OQ এককের বেশি দ্রব্য ক্রয় করিবে না।

আবার মনে কর, ভোগকারী OM একক দ্রব্য কিনিল। এক্ষেত্রে দ্রব্যটি হইতে সে যে প্রান্তিক উপযোগ পাইবে তাহা উহার বাজার দামের চেয়ে অধিক হইবে। সুতরাং OM একক দ্রব্য কিনিয়াই সে থামিয়া যাইবে না। মোট উপযোগ বৃদ্ধি করিবার আশায় সে আরও অতিরিক্ত MQ একক দ্রব্য কিনিবে। অতএব ভোগকারী ON পরিমাণের কম এবং OM পরিমাণের বেশি অর্থাৎ OQ পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে। এই OQ পরিমাণ দ্রব্য কিনিলেই ভারসাম্যের শর্ত, দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হইবে।

দুইটি বা ততোধিক দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য : সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি

(Equilibrium with two or more goods : Law of Equi-marginal Utility)

বাস্তব জগতে কোন ভোগকারীই কেবলমাত্র একটি দ্রব্য ক্রয়ে তাহার আয় ব্যয় করে না। সে তাহার সীমাবদ্ধ আয় দুই বা ততোধিক দ্রব্য

ক্রয়ে ব্যয় করিয়া থাকে। ভোগকারীর সমস্যা হইল, সে বিবিধ দ্রব্য ও সেবাকার্যের উপর যে নির্দিষ্ট আয় বণ্টন করে তাহা কোন্ নীতিদ্বারা কিভাবে স্থির করিবে। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে ভোগকারীর আচরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি অনুমান ধরিয়া লইতে হয়: (১) প্রত্যেক ভোগকারীর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় আছে। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের সমস্তটা সে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ (a certain combination of goods and services) ক্রয় করিতে ব্যয় করে।

(২) যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য বাজারে সে ক্রয় করিবে উহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য (finely divisible)।

(৩) বাজারে ভোগকারী বা ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য। বাজারে দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট রহিয়াছে—কোন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে যত খুশি দ্রব্য একক ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু তাহার ক্রয়ের ফলে দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হয় না।

(৪) প্রত্যেক ভোগকারী বা পণ্য ক্রেতাকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন (rational) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। এইরূপ ক্রেতার লক্ষ্য হইতেছে, তাহার নির্দিষ্ট আয় বিবিধ দ্রব্য ও সেবাকার্যের নির্দিষ্ট সংমিশ্রণ ক্রয়ে এমনভাবে ব্যয় করা যাহাতে সে সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়।

এই পরিবেশ ধরিয়া লইয়া কোন ভোগকারী যখন বাজারে বিবিধ দ্রব্য কিনিতে শুরু করে, তখন সে স্বভাবতই মিলাইয়া দেখে বিভিন্ন দ্রব্য কিনিয়া সে কতটা পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতেছে। মনে কর, ক্রেতা বাজারে আম ও কলা এই দুইটি মাত্র দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। ক্রেতার মোট আয় ২০৲ টাকা এবং আম ও কলা প্রতিটি ফলের বাজার দাম যথাক্রমে ২০ পয়সা ও ১০ পয়সা। ক্রেতা তাহার আয়ের প্রথম ২০ পয়সা দ্বারা একটি আম বা দুইটি কলা কিনিতে পারে। সে যদি দেখে যে দুইটি কলা হইতে প্রাপ্ত উপযোগ অপেক্ষা একটি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ বেশি, তাহা হইলে ২০ পয়সা ব্যয় করিয়া সে একটি আমই কিনিবে। কিন্তু সে যতই অতিরিক্ত একক আম কিনিতে থাকিবে, ততই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি অনুসারে অতিরিক্ত আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ (প্রান্তিক উপযোগ)

কমিতে থাকিবে। তখন আবার তাহার কাছে কলার উপযোগ বাড়িতে থাকিবে। এইভাবে ক্রেতা বিচার করিয়া দেখিবে, আম ও কলার উপর সে যে শেষ টাকাটি ব্যয় করে তাহা হইতে যথাক্রমে প্রাপ্ত উপযোগের পরিমাণ কতটা। সে যদি দেখে আমের উপর শেষ টাকাটি ব্যয় করার ফলে প্রাপ্ত উপযোগ কলার উপর শেষ টাকাটি ব্যয়িত হওয়ার ফলে প্রাপ্ত উপযোগের তুলনায় কম, তাহা হইলে স্বভাবতই সে আমের উপর এক টাকা ব্যয় কমাইয়া কলার উপর এক টাকা ব্যয় বাড়াইয়া দিবে। অর্থাৎ যদি তুলনা-মূলকভাবে আম ক্রয়ে এক একক ব্যয়ের উপযোগ (যাহাকে আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়) কলা ক্রয়ে এক একক ব্যয়ের উপযোগ (যাহাকে কলা ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বলা যায়) হইতে কম হয়, তাহা হইলে ক্রেতা দ্রব্য দুইটি ক্রয় ব্যাপারে ব্যয়ের ধরন পরিবর্তন করিবে। সে কম প্রান্তিক উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য, আমের উপর ব্যয় কমাইয়া উহার পরিবর্তে অধিক প্রান্তিক উপযোগসম্পন্ন দ্রব্য কলার উপর ব্যয় বাড়াইতে থাকিবে।

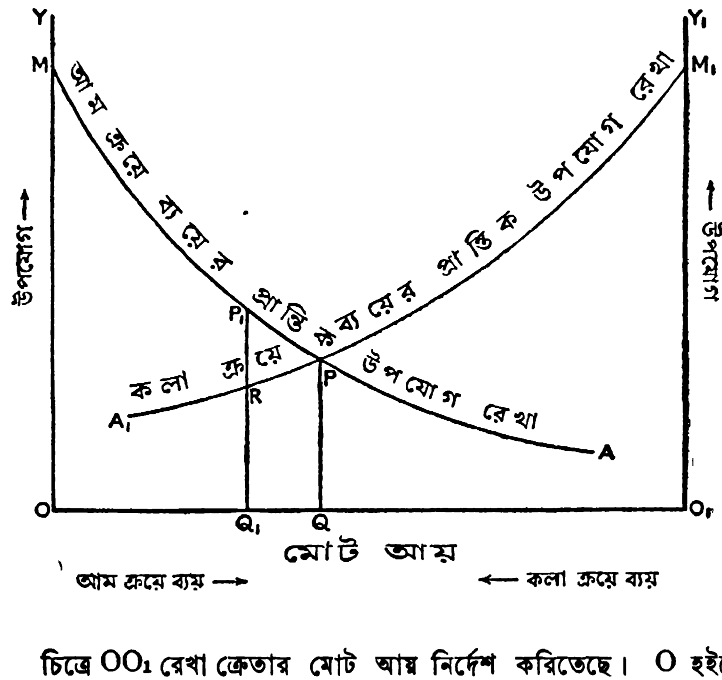
পরিবর্তকতার নীতির প্রয়োগ

এইভাবে ক্রেতা পরিবর্তকতার বিধি (principle of substitution) প্রয়োগ দ্বারা যে দ্রব্যটির (আমের) প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া গিয়াছে উহা ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবে এবং যে দ্রব্যটির (কলার) প্রান্তিক উপযোগ বাড়িয়া গিয়াছে উহা ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। দ্রব্য দুইটির উপর ব্যয়ের পরিবর্তন ততক্ষণ চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না দুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় পৌঁছিলে ক্রেতা আর দ্রব্য দুইটি ক্রয়ের পরিমাণ অর্থাৎ দ্রব্য দুইটির উপর ব্যয়ের কোন পরিবর্তন করিবে না। ইহাই ক্রেতার ভারসাম্যের অবস্থা। এই অবস্থাতেই ক্রেতা দ্রব্য দুইটি ক্রয়ে তাহার নির্দিষ্ট আয় এমনভাবে বণ্টন করিয়া দেয় যে, প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ হইতে সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে এবং দুইটি দ্রব্যের সংমিশ্রণ হইতে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করে। সুতরাং বলা চলে যে, ক্রেতা বা ভোগকারীর ভোগসাম্যের অবস্থা সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিদ্বারা নির্ধারিত হয়।

রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা বা সম-প্রান্তিক বিধির বিশ্লেষণ

(Diagrammatic representation of Consumer's equilibrium or Law of Equi-marginal Utility)

কি ভাবে সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি প্রয়োগের মাধ্যমে ভোগকারী পণ্য ক্রয় ব্যাপারে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিতে পারে তাহা নিচের রেখাচিত্র দ্বারা বুঝানো যায় :



চিত্রে OO_1 রেখা ক্রেতার মোট আয় নির্দেশ করিতেছে। O হইতে ডান দিকে আম ক্রয়ের ব্যয় এবং O_1 হইতে বামদিকে কলা ক্রয়ের ব্যয় নির্দেশ করিতেছে। OO_1 রেখার উপর যে কোন বিন্দু ধরিলে উহা আম ও কলা ক্রয়ে ভোগকারীর আয় কতটা পরিমাণ ব্যয়িত হইয়াছে দেখানো যায়। MA আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা এবং M_1A_1 কলা ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা। Q বিন্দুতে দুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। সুতরাং, ক্রেতা যদি

আমের উপর OQ পরিমাণ আয় ব্যয় করে এবং কলার উপর O_1Q পরিমাণ ব্যয় করে, তাহা হইলে তাহার মোট উপযোগ সর্বাধিক হইবে এবং সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে। কিন্তু Q না হইয়া যদি Q_1 বিন্দু মোট ব্যয়ের ভাগ নির্দেশ করে, তাহা হইলে ক্রেতা OQ_1 পরিমাণ অর্থ আম ক্রয়ে এবং O_1Q_1 পরিমাণ অর্থ কলা ক্রয়ে ব্যয় করিবে। এক্ষেত্রে আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ P_1Q_1 কলা ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ RQ_1 অপেক্ষা অধিক হইবে। এই অবস্থায় সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি খাটিবে না এবং ক্রেতার উপযোগও সর্বাধিক হইবে না। সুতরাং, কেবলমাত্র আম ক্রয়ে ভোগকারী OQ আয় ব্যয় করিলে এবং কলা ক্রয়ে O_1Q আয় ব্যয় করিলেই ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইবে এবং এই অবস্থায় আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কলা ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগের সহিত পরস্পর সমান হইবে।

লক্ষণীয় এই যে, আমের প্রান্তিক উপযোগকে আমের দাম দিয়া ভাগ করিলেই আম ক্রয়ে ব্যয়িত টাকার প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়। সেইরূপ কলার প্রান্তিক উপযোগকে কলার দাম দিয়া ভাগ করিলে কলা ক্রয়ে ব্যয়িত টাকার প্রান্তিক উপযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং, ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্তটি বা সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা নির্দেশ করা যায় :

$$\frac{\text{আমের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{আমের দাম}} = \frac{\text{কলার প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কলার দাম}}$$[১]

ক্রেতার ভারসাম্যের আর একটি শর্ত আছে। সে বিভিন্ন দ্রব্যের সংমিশ্রণ ক্রয়ে তাহার আয় এমনভাবে ব্যয় করিবে যে উহা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া যায়। ভারসাম্যের এই দ্বিতীয় শর্তটি নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা নির্দেশ করা যায় :

ক্রেতার মোট আয় = আমের উপর মোট ব্যয় + কলার উপর মোট ব্যয়

সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কেবল যে দুইটি মাত্র দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নহে। ভোগকারী যখন দুইএর অধিক দ্রব্য বা সেবাকার্য

১. Consumer's Equilibrium : $\frac{\text{MU of Mango}}{\text{Price of Mango}} = \frac{\text{MU of Banana}}{\text{Price of Banana}}$

ক্রয়ে তাহার আয় ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া দেয় তখনও ভারসাম্যের অবস্থায় পৌঁছিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্য সংমিশ্রণের উপর ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ পরস্পর সমান হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় হইতে প্রাপ্ত উপযোগ উহাদের দামের সহিত সমানুপাতিক হয়।

সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির সমালোচনা
(Criticism of the Law of Equi-marginal Utility)

সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির দ্বারা ক্রেতার ভারসাম্যের যে বিশ্লেষণ করা হয় তাহা নিম্নলিখিত একাধিক কারণে সমালোচিত হইয়াছে :

প্রথমত, ক্রেতার পক্ষে সকল অবস্থায় সূক্ষ্মভাবে সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি রক্ষা করিয়া দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভবপর নহে। যদিও ক্রেতাকে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় দ্বারা প্রত্যেকটি দ্রব্য হইতে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে হইলে বাজার সম্পর্কে ক্রেতার যেরূপ সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতার কার্যত থাকে না।

দ্বিতীয়ত, সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি প্রয়োগ দ্বারা ক্রেতার ভারসাম্য স্থাপন করিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের এককগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব জগতে ভোগকারীকে এমন অনেক দ্রব্য কিনিতে হয় যাহাদের একক মোটেই ক্ষুদ্র ও বিভাজ্য নহে। বাড়ি, গাড়ি, রেফ্রিজারেটার, টেলিভিসন প্রভৃতি অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের এককগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায় না। এই সকল দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তকতার বিধি প্রয়োগ দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করিয়া ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব নহে।

তৃতীয়ত, সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটির সমীকরণে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাজার দাম, ক্রেতার রুচিবোধ, দ্রব্যের পছন্দক্রম প্রভৃতি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এ অনুমানটিও বাস্তবত সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না।

কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বলা চলে যে, সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ক্রেতা বা ভোগকারী কিভাবে তাহার আয় বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিবে সে সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নির্দেশ দিয়া থাকে।

মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বের ভিত্তিতে চাহিদা-রেখার নির্ণয়
(Derivation of the Demand Curve on the basis of the Marshallian Utility Analysis)

মার্শাল ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ এবং সম-প্রান্তিক উপযোগ—এই দুইটি বিধির উপর ভিত্তি করিয়া ভোগকারীর নিকট কোন দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি বা চাহিদা-রেখা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য অবস্থার যদি কোনরূপ পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে ভোগকারী কোন একটি দ্রব্যের যত অধিক পরিমাণ ক্রয় বা ভোগ করিতে থাকিবে তাহার নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ ততই কমিতে থাকিবে। সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি হইতে এই দেখা যায় যে, ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্য সংমিশ্রণের উপর এমনভাবে ব্যয় করে যাহাতে প্রত্যেক দ্রব্যটির উপর ব্যয়ের শেষ একক হইতে সে সমপরিমাণ উপযোগ লাভ করিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় হইতে প্রাপ্ত উপযোগ উহাদের দামের সমানুপাতিক হয়।

মনে কর, কোন ভোগকারী আম ও কলা এই দুইটি দ্রব্যের উপর তাহার সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া ভারসাম্য অবস্থা লাভ করিয়াছে। সুতরাং, সে এই দুইটি দ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়া যে প্রান্তিক উপযোগ লাভ কবিয়াছে তাহা নিচের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

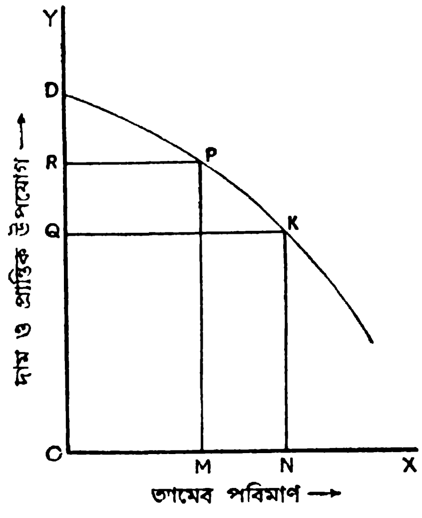
ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ

$$= \frac{\text{আমের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{আমের দাম}} = \frac{\text{কলার প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কলার দাম}}$$

এখন ধরা যাক, বাজারে আমের দাম কমিল, কিন্তু কলার দাম একই রহিল। আমের দাম কমিবার ফলে ক্রেতা পূর্বে যতটা আম কিনিত তাহা এখন কম ব্যয়ে কিনিতে পারিল। অর্থাৎ আমের দাম কমিবার দরুণ তাহার আয়ের সবটা ব্যয় হইল না, আগের পরিমাণ আম কেনা সত্ত্বেও তাহার হাতে কিছু টাকা রহিয়া গেল। আমের দাম কমিবার ফলে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধি ঘটিল। ইহাকে দামের আয় প্রভাব (income effect) বলে। এখন এই বর্ধিত আয়ের সমস্তটা ব্যয় না করা পর্যন্ত সে নূতন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিতে পারিবে না। আমের দাম কমিবার ফলে ভোগকারীর হাতে যে টাকা বাঁচিয়া গেল ঐ টাকা কিভাবে ব্যয় করিলে সে নূতন ভারসাম্য অবস্থায়

পৌঁছিবে? আমের দাম সস্তা হওয়ায় ভোগকারীর নিকট উহার প্রান্তিক উপযোগ উহার দাম অপেক্ষা বেশি হইয়া পড়িবে। ফলে, কলার তুলনায় আম হইতে অধিক উপযোগ পাওয়া যাইবে বলিয়া সে কলা বেশি না কিনিয়া আমই বেশি কিনিতে থাকিবে। অর্থাৎ আমের দাম হ্রাস পাইবার ফলে ভোগকারী আমই বেশি করিয়া কিনিতে থাকিবে। ইহাকে দামের পরিবর্তক প্রভাব (substitution effect) বলে। এইভাবে আমের দাম কমিবার দরুণ তাহার যে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা দিয়া আম কিনিবার ফলে আমের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইয়া দামের সহিত সমান হইয়া পড়িবে। তখন ভোগকারী নূতন এক ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে যে অবস্থায় সে কম দামে বেশি পরিমাণ আম কিনিবে।

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যদি ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি এবং সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়, তাহা হইলে কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ভোগকারী উহা অধিক পরিমাণে কিনিয়া থাকে এবং দাম বাড়িলে কম পরিমাণে কিনিয়া থাকে। চাহিদার এই সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতেই মার্শাল চাহিদা-রেখা নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার বিশ্লেষণ অনুসারে কোন দ্রব্যের চাহিদা-রেখা বাম হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। নিচে চিত্র দ্বারা মার্শালীয় চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা হইল :



OX অক্ষরেখা আমের পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখা আমের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করিতেছে। পূর্বে OR দামে ভোগকারী OM পবিমাণ আম কিনিয়া P বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থা লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় সে আম হইতে PM পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিয়াছিল। এখন আমের দাম কমিয়া OQ হইল। দাম কমিবার দরুণ ভোগকারী ON পরিমাণ আম কিনিয়া K বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য অবস্থায় পৌছিল এবং KN পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিল। P ও K বিন্দু যোগ করিলে যে PK রেখা পাওয়া যায় উহাই আমের প্রান্তিক উপযোগ-রেখা। এই রেখাটি হইতে বুঝা যায় যে, ক্রেতা যতই বেশি আম কিনিয়াছে ততই আমের প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া গিয়াছে। ক্রেতার প্রান্তিক উপযোগ-রেখাই ভোগকারীর নিকট আমের চাহিদা-রেখা। চাহিদা-রেখার ঢাল (slope) ঋণাত্মক (negative); অর্থাৎ রেখাটি বামে উপর হইতে ডানদিকে ক্রমশ নামিতে থাকে। দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ চাহিদার পরিমাণ বাড়ে বলিয়াই চাহিদা-রেখা বাম হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বের ত্রুটিবিচ্যুতি

(Defects of the Marshallian Utility Analysis)

অধ্যাপক মার্শাল ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ বিধি ও সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির ভিত্তিতে ভোগকারীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা হইয়াছে। নিচে উপযোগ-তত্ত্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি উল্লেখ করা হইল:

(১) মার্শাল দ্রব্য ও সেবাকার্য হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায় তাহার পরিমাণগত পরিমাপ দ্বারা ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি অর্থকে উপযোগ-পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু উপযোগ মনোগত ধারণা। ইহা অর্থের মানদণ্ড দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। আমরা বলিতে পারি না যে, কোন ভোগকারী একটি দ্রব্যের প্রথম একক হইতে ২০ মাত্রার উপযোগ, দ্বিতীয় একক হইতে ১৫ মাত্রার উপযোগ লাভ করিয়াছে। উপযোগ অপরিমেয় (non-

measurable) বলিয়া উহার ভিত্তিতে রচিত মার্শালীয় চাহিদার বিশ্লেষণও সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত নহে।

(২) উপযোগ-তত্ত্বের আর একটি প্রধান গলদ এই যে, ইহা গুরুত্ব বা স্তরবাচক সংখ্যা (ordinal number system) ব্যবহারের পরিবর্তে পরিমাণবাচক সংখ্যা (cardinal number system) ব্যবহার দ্বারা উপযোগ প্রকাশ করিয়াছে। পরিমাণবাচক সংখ্যা ব্যবহার করিয়া দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগ যোগ বা বিয়োগ দ্বারা মোট উপযোগ এবং প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হইয়াছে। কিন্তু গুরুত্ব বা স্তরবাচক সংখ্যা দ্বারা উপযোগ নির্ণয় করিতে যাহারা পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, উপযোগ যোগ বা বিয়োগ করা যায় না। বিভিন্ন এককের উপযোগ তুলনা করিয়া বলা যায়, কোন্ একক হইতে বেশি এবং কোন্ একক হইতে কম উপযোগ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু কতটা বেশি বা কতটা কম তাহা বলা যায় না।

(৩) মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বে ভোগকারী একটি মাত্র দ্রব্য ক্রয় করিয়া উহা হইতে যে উপযোগ লাভ করে তাহা পৃথকভাবে পরিমাপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ক্রেতার নিকট অন্যান্য দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত রহিয়াছে ধরিয়া লইয়া, একটি দ্রব্য হইতে সে যে উপযোগ লাভ করিতেছে তাহা নির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন ভোগকারী একটিমাত্র দ্রব্য কিনিয়া ভোগ করিতেছে দেখা যায় না। ভোগকারী একযোগে একাধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। এই দ্রব্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, উহারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটি দ্রব্যের উপযোগ বিচ্ছিন্নভাবে পরিমাপ করা যায় না। আমের উপযোগ পরিমাপ করিতে হইলে কলা কিংবা অন্য কোন ফলের উপযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উহা করিতে হয়।

(৪) উপযোগ-তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ভোগকারী যখন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করে তখন তাহার আয় বা অর্থের প্রান্তিক উপযোগে কোন পরিবর্তন ঘটে না। এই অনুমানটি অবাস্তব। কেন না, কোন দ্রব্যের অধিক পরিমাণ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারীর আয় বা অর্থের স্বল্পতা ঘটে এবং সেইজন্য তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগও বাড়িয়া থাকে। ধরা যাক, কোন এক ভোগকারীর আয় ২৫৲ টাকা এবং প্রতিটি আমের বাজার দাম ১৲ টাকা। সে যদি একটি আম ক্রয় করে তাহা হইলে তাহার হাতে বাকী আর রহিল ২৪৲ টাকা। অর্থের পরিমাণ এই ভাবে

কমিয়া গেলে উহার উপযোগ তাহার কাছে বৃদ্ধি পাইবে। মার্শালের আলোচনায় দামের এই আয়-প্রভাবের স্থান স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হয় নাই।

(৫) এমন অনেক সামগ্রী আছে যাহার চাহিদা উপযোগ-তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। বাড়ি, গাড়ি, রেডিও প্রভৃতি সামগ্রী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। এইরূপ যে সকল সামগ্রীর এককগুলি অবিভাজ্য ও বৃহৎ উহাদের ক্ষেত্রে ক্রয়ের পরিমাণ সামান্য কম-বেশি করিয়া প্রান্তিক উপযোগের সূক্ষ্ম পরিমাণগত হিসাব করা চলে না।

(৬) পরিশেষে, কোন দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ যে আয়-প্রভাব এবং পবিবর্তক-প্রভাব দেখা যায় উপযোগ-তত্ত্বে তাহা যথাযথ গুরুত্বের সহিত বিশ্লেষণ করা হয় নাই। অবশ্য কোন দ্রব্যের মূল্য সস্তা হইলে উহার পরিবর্তক প্রভাব চাহিদার উপর কি ভাবে আসিয়া পড়ে তাহা এই তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু মার্শাল আয়-প্রভাব এবং পরিবর্তক-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য কি তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বিচার করেন নাই। কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ভোগকারীর চাহিদা কতটা আয়-প্রভাব এবং কতটা পবিবর্তক-প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তাহা তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই।

কিন্তু মার্শালের উপযোগ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত বিরূপ সমালোচনা-গুলি করা হইলেও তাঁহার সমর্থনে দুই একটি কথা বলা চলে। মার্শাল তাঁহার বিশ্লেষণে প্রধানত আংশিক ভারসাম্য (partial equilibrium) পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি ভোগকারীর একটি দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয়ের ব্যাখ্যানই প্রধানত দিয়াছেন। সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি তাহার মোট আয়ের অতি সামান্য অংশ একটি দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, তাহা হইলে দ্রব্যটির বিভিন্ন একক ক্রয় করা সত্ত্বেও অর্থের প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে বাড়িবে না বলিয়া ধরা যায়। আবার দ্রব্যটির দাম পরিবর্তনের ফলে আয়-প্রভাবও যৎসামান্য হইবে।

কিন্তু তথাপি মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বের অন্যান্য ত্রুটির জন্য সম্প্রতি একাধিক অর্থনীতিবিদ্ ভোগকারীর আচরণ ও চাহিদা বিশ্লেষণের একটি বিকল্প তত্ত্ব (Alternative theory) প্রদান করিয়াছেন। ওই তত্ত্বটিকে পছন্দ-তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

৬ | পছন্দ-তত্ত্ব ঃ নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ
(The Preference Theory : Indifference Curve Analysis)

আধুনিক একাধিক অর্থনীতিবিদের মতে "মার্শাল প্রবর্তিত উপযোগ-তত্ত্ব দ্বারা ভোগকারীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভব নহে। উপযোগ একটি মানসিক ধারণা বলিয়া উহা পরিমাপ করা যায় না। কোন একটি দ্রব্যের চাহিদাকে বিচ্ছিন্ন ও অন্য নিরপেক্ষভাবে (in isolation) বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। কিন্তু উপযোগ পরিমেয় না হইলেও তুলনীয় (comparable)। আমের চাহিদা নির্ণয় করিতে হইলে অন্যান্য ফলের চাহিদার সহিত তুলনা করিয়া তবে নির্ণয় করিতে হয়। ভোগকারীর নিকট বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। সেইজন্য একটি দ্রব্যের চাহিদা পৃথকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ভোগকারীর কি অনুপাত পছন্দ তাহা নির্ণয় করা যায়। আমের চাহিদা বিচ্ছিন্নভাবে নির্ণয় করা না গেলেও আম ও কলা কিংবা অন্যান্য ফলের মধ্যে ভোগকারী কি অনুপাতে পছন্দ করিবে তাহা নির্ধারণ করা যায়। ভোগকারীর এই পছন্দের অনুপাত বা ক্রম (scale of preference) মনোগত ধারণা নহে। ভোগকারীর পছন্দের ক্রম তাহার বাহ্যিক আচরণে প্রকাশ পায়, এবং ইহা উপযোগের তুলনায় অধিক বাস্তব। সেইজন্য সম্প্রতি অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ই উপযোগ অপেক্ষা পছন্দের আপেক্ষিকতার ধারণার মাধ্যমে ভোগীর আচরণ ও চাহিদার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। এই পছন্দ-তত্ত্ব বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবে তাঁহারা নিরপেক্ষতা-রেখার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

নিরপেক্ষতা-রেখা
(Indifference Curve)

নিরপেক্ষতা-রেখার ধারণাটি প্রথম ব্যবহার করেন অর্থনীতিবিদ্‌ এজওয়ার্থ। পরে প্যারেটো এই ধারণাটির আরও ব্যাপক বিশ্লেষণ করিয়া চাহিদার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি হিকস্‌, এ্যালেন, স্যামুয়েলসন প্রমুখ

অর্থনীতিবিদ্‌গণের অবদানের ফলে নিরপেক্ষতা-রেখা বিশ্লেষণ অর্থবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

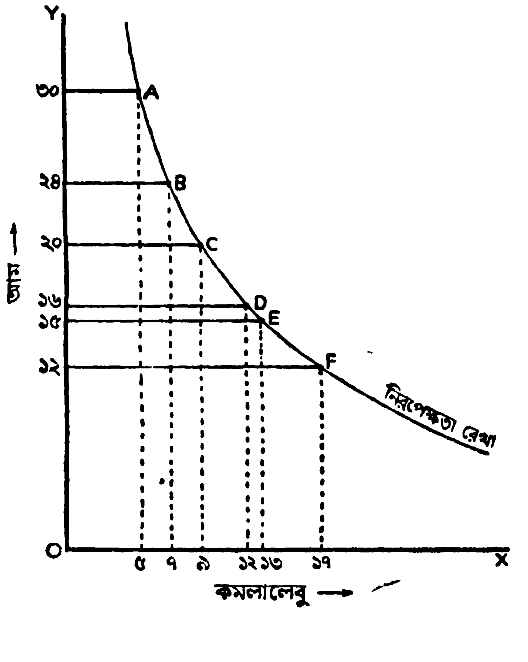
নিরপেক্ষতা-রেখার ধারণাটি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে যে, ভোগকারীর একটি দ্রব্যের ভোগ হইতে প্রাপ্ত উপযোগের সহিত অপর একটি দ্রব্যের ভোগ হইতে প্রাপ্ত উপযোগের তুলনা করা যায়। সে দ্রব্য দুইটির প্রত্যেকটি হইতে কতটা পরিমাণ উপযোগ লাভ করে তাহা অবশ্য বলিতে পারে না, কিন্তু সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে দ্রব্য দুইটির মধ্যে কোন্‌টি হইতে বেশি উপযোগ অথবা কোন্‌টি হইতে কম উপযোগ লাভ করা যায়। সে তাহার পছন্দ বা পক্ষপাত অনুযায়ী বলিতে পারে, কোন্ দ্রব্যটি তাহার নিকট বেশি পছন্দ, আর কোন্ দ্রব্যটি কম পছন্দ। সে তাহার পছন্দ অনুযায়ী বাছিয়া লইতে পারে কোন্ দ্রব্য কতটা পরিমাণে ক্রয় করিবে। এইভাবে প্রত্যেক ভোগকারী তাহার পছন্দ অনুযায়ী দুই বা ততোধিক দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ (combination) স্থির করে। ইহাকে ভোগীর পছন্দক্রম বা পক্ষপাতক্রম (scale of preferences) বলে। ভোগীর পছন্দক্রম বলিতে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ বুঝায়, যাহার প্রত্যেকটি হইতে সে সমান উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করে। দুই বা ততোধিক দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণই সে সমানভাবে পছন্দ করে। এইরূপ বিভিন্ন সংমিশ্রণের সে যে কোনটি পছন্দ করিতে পারে। সে যদি একটি সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে অন্যান্য সংমিশ্রণ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে; কেন না সকল সংমিশ্রণেরই মোট উপযোগ সমান। নিচে আম ও কমলালেবু এই দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন কাল্পনিক সংমিশ্রণ ধরিয়া লইয়া একটি তালিকা রচনা করা হইল। এই সংমিশ্রণগুলির প্রতি ভোগকারীর সমান পক্ষপাত বা নিরপেক্ষতা, কোন একটির প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নাই। আম ও কমলালেবুর এইরূপ বিভিন্ন সংমিশ্রণ সম্বলিত তালিকাকে ভোগকারীর নিরপেক্ষতা সূচী (indifference schedule) বলা হয়।

ভোগকারীর পছন্দক্রম

	আম	কমলালেবু
প্রথম সংমিশ্রণ	৩০	৫
দ্বিতীয় "	২৪	৭
তৃতীয় "	২০	৯

চতুর্থ	"	১৬	১২
পঞ্চম	"	১৫	১৩
ষষ্ঠ	"	১২	১৭
		ইত্যাদি	ইত্যাদি

আম ও কমলালেবুর বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি সাজাইয়া নিচের রেখাচিত্রে দেখানো যায় :



উপরের চিত্রে OX অক্ষরেখা কমলালেবু এবং OY অক্ষরেখা আমের সংখ্যা বা পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। A বিন্দু দিয়া প্রথম সংমিশ্রণ ৩০টি আম ও পাঁচটি কমলালেবু, B বিন্দু দিয়া দ্বিতীয় সংমিশ্রণ ২৪টি আম ও ৭টি কমলালেবু, C বিন্দু দিয়া তৃতীয় সংমিশ্রণ ২০টি আম ও ৯টি কমলালেবু, D বিন্দু দিয়া চতুর্থ সংমিশ্রণ ১৬টি আম ও ১২টি কমলালেবু, E বিন্দু দিয়া পঞ্চম সংমিশ্রণ ১৫টি আম ও ১৩টি কমলালেবু এবং F বিন্দু দিয়া ষষ্ঠ সংমিশ্রণ ১২টি আম ও ১৭টি কমলালেবু প্রকাশ করিতেছে।

A, B, C, D, E ও F বিন্দুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে যে রেখা পাওয়া যায় উহাই ভোগকারীর নিরপেক্ষতা-রেখা। এই রেখাকে নিরপেক্ষতা-রেখা বলা হয় এই কারণে যে, এই রেখার উপর যে কোন বিন্দু হইতে আম ও কমলালেবুর যে কোন সংমিশ্রণ ধরা হউক না কেন উহার উপযোগ ভোগকারীর নিকট সমান। কোন একটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট সংমিশ্রণের উপব তাহার কোন বিশেষ পক্ষপাত নাই। নিরপেক্ষতা-রেখার উপরে বিভিন্ন বিন্দু দুইটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ নির্দেশ করিয়া থাকে ঐ সংমিশ্রণের প্রত্যেকটি হইতে একই সমান মোট উপযোগ পাওয়া যায়। অনেকে নিরপেক্ষতা-রেখাকে সম-উপযোগ রেখাও (Iso-utility Curve) বলিয়া থাকেন। ইহাকে সম-উপযোগ রেখা বলিবার কারণ এই যে, রেখাটি সম-উপযোগসম্পন্ন বিন্দুগুলি যুক্ত করিয়া অঙ্কন করা হয়। নিরপেক্ষতা-রেখাকে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের সমান উপযোগ বিশিষ্ট বিভিন্ন সংমিশ্রণ যে সকল বিন্দু দিয়া গঠিত হয় সেই বিন্দুগুলিব সঞ্চারপথ বলা যায়।[১]

নিরপেক্ষতা-রেখা কাহাকে বলে ?

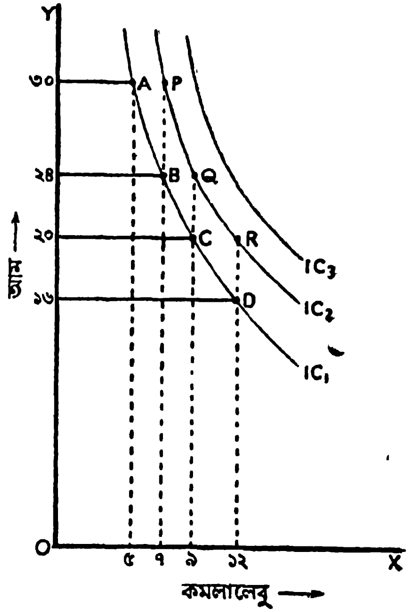
নিরপেক্ষতা-মানচিত্র
(Indifference Map)

উপরে আম ও কমলালেবুর সম-উপযোগবিশিষ্ট বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করিয়া একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অঙ্কন করা হইয়াছে। যদি পরপব এইরূপ একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা অঙ্কন করিয়া ভোগকারীর পছন্দের বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করা হয় তাহা হইলে সেই চিত্রকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বলা চলে। পূর্বের চিত্রে দেখানো হইয়াছে, ভোগকারীর নিকট ৩০টি আম ও ৫টি কমলালেবু, ২৪টি আম ও ৭টি কমলালেবু, ২০টি আম ও ৯টি কমলালেবু প্রভৃতি সংমিশ্রণগুলির প্রত্যেকটি সমান উপযোগ বা তৃপ্তি বহন করে। কিন্তু সে যদি ৩০টি আমের সহিত ৫টি কমলালেবুর পরিবর্তে ৩০টি আম ও ৭টি কমলালেবুর সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে ইহা A বিন্দুর সংমিশ্রণ অপেক্ষা তাহার কাছে অধিক পছন্দনীয় হইবে। আবার ২৪টি আমের সহিত ৭টি কমলালেবুর পরিবর্তে সে যদি ২৪টি আম ও ৯টি কমলালেবুর

১. "An indifference curve is the locus of points each of which represents a collection of commodities with same total utility to a particular consumer"

সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে ইহা B বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে অধিক পছন্দসই হইবে। তেমনি ২০টি আম ও ৯টি কমলালেবুর পরিবর্তে সে যদি ২০টি আম ও ১২টি কমলালেবুর সংমিশ্রণ পছন্দ করে তাহা হইলে ইহা C বিন্দুর সংশ্রমিণ হইতে অধিক আকর্ষণীয় হইবে।

নিচের চিত্রে আম ও কমলালেবুর নূতন সংমিশ্রণগুলি যথাক্রমে সাজানো হইল। P, Q, R বিন্দুতে নূতন সংমিশ্রণগুলি পরস্পর সমান উপযোগ-সম্পন্ন। এই বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করিলে দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখা IC_2 প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখা IC_1 হইতে ডানদিকে ঊর্ধ্বে বসিবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় নিরপেক্ষতা-রেখার উপর অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি প্রথম নিরপেক্ষতা-রেখার উপর অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণের তুলনায় ভোগকারীর নিকট বেশি আকর্ষণীয়। এইভাবে ভোগকারীর পছন্দ অনুযায়ী আরও বেশি উপযোগসম্পন্ন সংমিশ্রণের ভিত্তিতে ডানদিকে উঁচুতে একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা আঁকা চলে। আবার একইভাবে কম উপযোগসম্পন্ন সংমিশ্রণের ভিত্তিতে বামদিকে ও নিচে একাধিক নিরপেক্ষতা-রেখা আঁকা যায়। এইভাবে যখন একাধিক নিরপেক্ষ-রেখাচিত্র অঙ্কন করা হয় তখন উহাকে নিরপেক্ষতা-মানচিত্র কিংবা নিরপেক্ষতা-রেখাসমূহের পরিবার (Family of Indifference Curves) বলা হইয়া থাকে।



ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার

(Diminishing Marginal Rate of Substitution)

নিরপেক্ষতা-রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে নামিতে থাকে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভোগকারী যদি একটি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে অপর দ্রব্যটি কম পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ সমান হইবে না। মনে কর, ভোগকারীর নিকট কফি ও সিগারেটের নিম্নলিখিত বিভিন্ন সংমিশ্রণ সমান পছন্দসই।

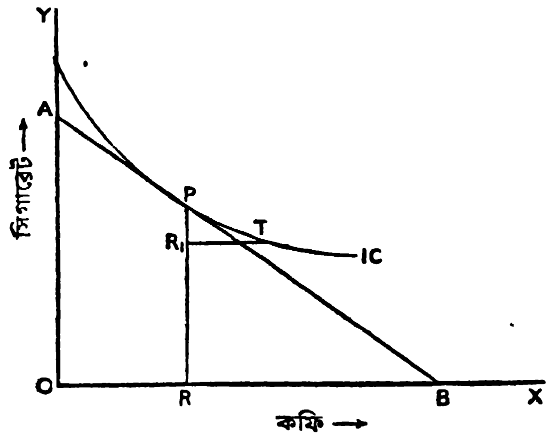
	কফির পেয়ালা	সিগারেট	পরিবর্তনের হার
প্রথম সংমিশ্রণ	৪	২৫	
দ্বিতীয় „	৫	২০	১ পেয়ালা : ৫ সিগারেট
তৃতীয় „	৬	১৬	১ পেয়ালা : ৪ সিগারেট
চতুর্থ „	৭	১৩	১ পেয়ালা : ৩ সিগারেট
পঞ্চম „	৮	১১	১ পেয়ালা : ২ সিগারেট

প্রথম সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারী ৪ পেয়ালা কফি ও ২৫টি সিগারেট ভোগ করে। সে যদি এক পেয়ালা বেশি কফি ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে ৫টি সিগারেটের ভোগ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ এখন সে ৫টি সিগারেটের সহিত এক পেয়ালা কফি বিনিময় করিল। এক কাপ অতিরিক্ত কফির উপযোগ এখন তাহার কাছে ৫টি সিগারেটের সমান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বলা চলে যে, কফির সহিত সিগারেটের পরিবর্তন হার ১ : ৫। ভোগী যদি আরও বেশি কফি ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে উহার পরিবর্তে সিগারেটের ভোগ বাদ দিতে রাজী হইতে হইবে। কিন্তু পূর্বে যেমন তাহাকে এক পেয়ালা অতিরিক্ত কফি ভোগ করিতে ৫টি সিগারেটের ভোগ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এখন অতিরিক্ত এক পেয়ালা কফি ভোগ করিতে কম সংখ্যক সিগারেটের (অর্থাৎ ৪টি সিগারেটের) ভোগ কমাইতে রাজী হইতে হইবে। ইহার কারণ এই যে, সে যতই অতিরিক্ত পেয়ালা কফি ভোগ করিবে, ততই কফির প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে কমিতে থাকিবে এবং যত বেশি সংখ্যক সিগারেটের ভোগ ত্যাগ করিবে, ততই সিগারেটের প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট বাড়িতে থাকিবে। সেইজন্য এ ক্ষেত্রে কফির সহিত সিগারেটের বিনিময় বা পরিবর্তন হার ১ : ৪ হইবে। অর্থাৎ এক পেয়ালা কফি এখন ৫টি সিগারেটের পরিবর্তক নহে, এক পেয়ালা কফি এখন ৪টি সিগারেটের পরিবর্তক। এখন কফি ও সিগারেটের মধ্যে পরিবর্তনের হার হ্রাস পাইয়াছে। তাহা হইলে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে

প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দেশ করা যায় : ভোগকারী তাহার মোট উপযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, একটি দ্রব্যের ভোগ যে পরিমাণ ত্যাগ করিয়া অপর একটি দ্রব্যের যে ক্ষুদ্র অতিরিক্ত একক ভোগ করিতে রাজী থাকে তাহাই দ্রব্য দুইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বা পরিবর্তনের অনুপাত (Marginal Rate of Substitution or Substitution Ratio)।

প্রান্তিক পরিবর্তনের হার কাহাকে বলে ?

উপরের সারণীতে আমরা দেখি যে, দ্বিতীয় সংমিশ্রণে কফি ও সিগারেটের পরিবর্তনের হার ১ : ৫, তৃতীয় সংমিশ্রণে ১ : ৪, চতুর্থ সংমিশ্রণে ১ : ৩ ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভোগী যতই অতিরিক্ত পেয়ালা কফি ভোগ করিতে চাহিবে ততই সিগারেট ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। আবার কফি ভোগের পরিমাণ বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে কফির প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইবে ; অপর দিকে সিগারেট ভোগ যতই সে বাদ দিবে ততই সিগারেটের প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ ভোগী যতই অতিরিক্ত একক কফি গ্রহণ করিবে ততই সিগারেটের পরিবর্তে কফির বিনিময় হার কমিতে থাকিবে। এই ভাবে কফি ও সিগারেটের মধ্যে বিনিময় হার হ্রাসকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার অথবা ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তন-যোগ্যতা (Diminishing Marginal Rate of Substitution or Diminishing Marginal Substitutability) বলা হয়।



রেখাচিত্রের সাহায্যে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার আরও সুস্পষ্টভাবে বুঝানো যায়।

চিত্রে IC নিরপেক্ষতা-রেখার P বিন্দুতে ভোগকারী OR পরিমাণ

কফি এবং RP সংখ্যক সিগারেট ভোগ করে। IC নিরপেক্ষতা-রেখার উপর Pএর নিকট অবস্থিত T আর একটি বিন্দু। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ভোগকারী অতিরিক্ত R_1T পরিমাণ কফির জন্য R_1P সংখ্যক সিগারেট ভোগ বাদ দিতে রাজী হইলে তাহার মোট উপযোগ সমান থাকিবে। সুতরাং $\frac{R_1P}{R_1T}$ কে কফি ও সিগারেটের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার বলা যাইতে পারে $\frac{R_1P}{R_1T}$ আবার T বিন্দুর ঢাল (slope) নির্দেশ করে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, T বিন্দু Pএর অতি সন্নিকটে অবস্থিত। অর্থাৎ ভোগকারী কফির যে অতিরিক্ত একক গ্রহণ করিয়াছে তাহা অতি ক্ষুদ্র। তাহা হইলে বলা চলে যে, PT রেখা P বিন্দুতে স্পর্শক (tangent) ABতে আসিয়া মিলিবে। সুতরাং নিরপেক্ষতা-রেখার কোন বিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দ্বারা নির্দেশ করা যায়।[১] নিরপেক্ষতা-রেখা যতই বাম দিক হইতে দক্ষিণে নিচে নামিতে থাকিবে ততই কফির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং সিগারেটের সংখ্যা হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ তখন ভোগকারী অতিবিক্ত কফির জন্য স্বল্পতর সিগারেট বাদ দিতে রাজী হইবে। এই অবস্থাতে কফি ও সিগারেটের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হ্রাস পাইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে নিরপেক্ষতা-বেখাব বিন্দুগুলিতে স্পর্শকের ডালও ক্রমশ কমিতে থাকিবে।

নিরপেক্ষতা-রেখার বৈশিষ্ট্য

(Characteristics or Properties of the Indifference Curve)

নিরপেক্ষতা-রেখার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

(১) নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল নিম্নমুখী, উহা বাম হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে নামে। সেইজন্য এই রেখার ঢাল ঋণাত্মক (negative)।

---

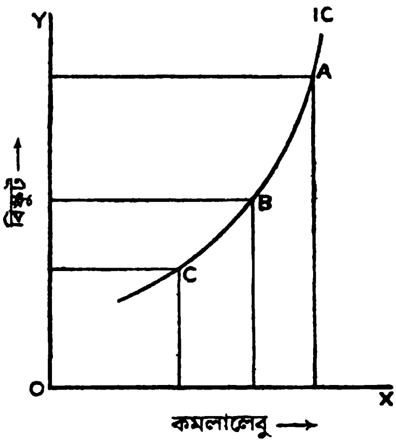
১. গণিতের সাহায্যে x ও y এই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$MRS_{yx} = \frac{-\Delta y}{\Delta x}$$

[এখানে MRS_{yx} হইল y ও x এই দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ; $-\Delta y$ হইল y দ্রব্য ত্যাগের পরিমাণ ; Δx হইল x দ্রব্য ভোগের অতিরিক্ত সামান্য ক্রীত পরিমাণ]

নিরপেক্ষতা রেখা কেন উপর হইতে নিচে নামে এবং বাম দিক হইতে ডানদিকে অগ্রসর হয় তাহা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ভোগকারী মোট উপযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যদি একটি দ্রব্যের সামান্য বেশি ভোগ করিতে চায় তাহা হইলে অপর দ্রব্যটির ভোগ কিছুটা অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। একটি দ্রব্যের সামান্য বেশি ভোগ করিতে চাহিয়া অপর দ্রব্যটিরও যদি পূর্বেকার পরিমাণ সে ভোগ করিতে চাহে তাহা হইলে দ্রব্য দুইটির এই সংমিশ্রণ হইতে তাহার পূর্বের তুলনায় অধিক মোট উপযোগ লাভ হইবে। এ অবস্থায় সে একই নিরপেক্ষতা-রেখার উপর থাকিতে পারিবে না।

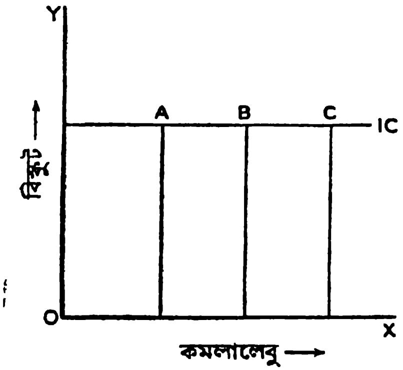
ভোগী একটি দ্রব্যের কিছুটা ভোগ ত্যাগ করে বলিয়া নিরপেক্ষতা-রেখা উপর হইতে নিচে নামে ; আবার অপর একটি দ্রব্যের কিছুটাও অধিক পরিমাণে ভোগ করে বলিয়া নিরপেক্ষতা-রেখা বাম হইতে ডানদিকে নামে। রেখাটির ঢাল (slope) যে ঋণাত্মক তাহারও ইহাই কারণ। নিরপেক্ষতা-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখে অগ্রসর হইতে পারে না অর্থাৎ নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল ধনাত্মক (positive) হইতে পারে না। ঊর্ধ্বমুখী নিরপেক্ষতা-রেখা অঙ্কিত করিলে ঐ রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে দ্রব্যের যে ভিন্ন সংমিশ্রণ গঠিত হইবে তাহা সম-উপযোগসম্পন্ন হইতে পারে না। উপরের চিত্রে একটি ঊর্ধ্বমুখী ধনাত্মক নিরপেক্ষতা-রেখা আঁকিয়া দেখানো হইল যাহা গ্রহণযোগ্য নহে।



চিত্রে নিরপেক্ষতা-রেখার A, B ও C বিন্দুতে কমলালেবু ও বিস্কুটের যে তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ গঠিত হইয়াছে ভোগকারীর নিকট উহারা সমান পছন্দসই হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় C বিন্দুতে দ্রব্য দুইটির সংমিশ্রণ হইতে যে উপযোগ লাভ হইবে B বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে তাহা অপেক্ষা বেশি উপযোগ লাভ হইবে ; আবার A বিন্দুর সংমিশ্রণ B বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে আরও বেশি উপযোগসম্পন্ন হইবে। ইহার কারণ

এই যে, C বিন্দুতে যে সংখ্যক বিস্কুট ও কমলালেবুর সংমিশ্রণ গ্রহণ করা হইয়াছে, B বিন্দুর সংমিশ্রণে দুইটি দ্রব্যকে আরও অধিক সংখ্যায় ধরা হইয়াছে। আবার A বিন্দুর সংমিশ্রণে দ্রব্য দুইটির সংখ্যা B বিন্দুর সংমিশ্রণ অপেক্ষা আরও বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু একই নিরপেক্ষতা-রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন সংমিশ্রণের উপযোগ অসমান হইতে পারে না। সেইজন্য ঊর্ধ্বমুখী ধনাত্মক নিরপেক্ষতা-রেখাও অসম্ভব।

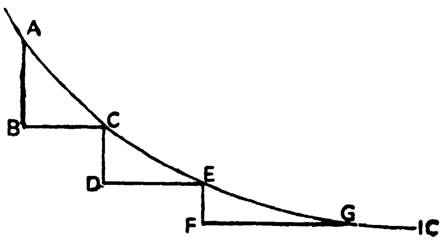
আবার, নিরপেক্ষতা-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে পারে না। নিচের চিত্রে একটি কাল্পনিক সমান্তরাল নিরপেক্ষতা-রেখা আঁকিয়া দেখানো যায় যে, ইহা বাস্তবত অসম্ভব। চিত্রে কাল্পনিক নিরপেক্ষতা-রেখা আঁকিয়া উহার উপর A, B ও C বিন্দুতে কমলালেবু ও বিস্কুটের তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ দেখানো হইয়াছে। এই তিনটি সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারীর সমান উপযোগ লাভ করার কথা। কিন্তু চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, A বিন্দুর সংমিশ্রণের তুলনায় B বিন্দুর সংমিশ্রণ হইতে বেশি উপযোগ এবং B বিন্দুর সংমিশ্রণের তুলনায় C বিন্দু হইতে বেশি উপযোগ লাভ হইতেছে। অতএব নিরপেক্ষতা-রেখা সমান্তরাল হইতে পারে না। আবার, নিরপেক্ষতা-রেখা উল্লম্ব হইতে পারে না, তাহাও একইভাবে দেখানো যায়।



উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নিরপেক্ষতা-রেখা যখন ঊর্ধ্বগামী নহে, কিংবা সমান্তরাল নহে কিংবা উল্লম্ব নহে, তখন ইহা অবশ্যই বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী হইবে।

(২) নিরপেক্ষতা রেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা O বিন্দুর দিকে (যে বিন্দু হইতে অক্ষদ্বয়ের উদ্ভব হইয়াছে) সাধারণত উত্তল (convex) হইবে। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে রহিয়াছে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তন হারের কার্যকারিতা। ভোগকারী যখন একটি দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন তাহাকে অবশ্যই অপর একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইতে হয়। যখন সে

একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইয়া অপর একটি দ্রব্যের ভোগ বাড়াইতে থাকে তখন প্রথম দিকে, সে যে দ্রব্যটির ভোগ কিছুটা বাড়াইতে চায় তাহার পরিবর্তে অপর দ্রব্যটির ভোগ অধিক পরিমাণে ত্যাগ করিতে রাজী হয়। যে দ্রব্যটির ভোগ সে কমাইতে থাকে উহার পরিমাণ তাহার নিকট ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকায় দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকে। ফলে, পরের দিকে এই দ্রব্যটি অপর দ্রব্যের বিনিময়ে সে কম দিতে চাহিবে। নিরপেক্ষতা-রেখা O বিন্দুর দিকে কেন উত্তল হয় নিচে চিত্র দ্বারা আরও স্পষ্টভাবে দেখানো যায় :



আপেল

উপরের চিত্রে BC আপেল AB কফির বিনিময়ে
DE আপেল CD কফির বিনিময়ে
FG আপেল EF কফির বিনিময়ে

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আপেলের বিভিন্ন একক BC, DE ও FG পরস্পর সমান। অর্থাৎ BC = DE = FG ; কিন্তু AB > CD > EF। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কফি ও আপেলের মধ্যে বিনিময় বা পরিবর্তনের হার সকল ক্ষেত্রে সমান নহে কিন্তু এই হার ক্রমহ্রাসমান। এই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তন হারের দরুণই নিরপেক্ষতা রেখা O বিন্দুর দিকে উত্তল। রেখাটি যদি O বিন্দুর দিকে অবতল (concave) হইত কিংবা সরলরেখা হইত তাহা হইলে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক পরিবর্তনের হার প্রযোজ্য হইত না।

নিরপেক্ষতা-রেখা সাধারণত O বিন্দুর দিকে উত্তল হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সকল দ্রব্য একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্তক (perfect substitute) কিংবা একে অপরের পরিপূরক (supplementary), উহাদের ক্ষেত্রে ভোগীর নিরপেক্ষতা-রেখা O বিন্দুর দিকে উত্তল হইবে না।

(৩) নিরপেক্ষতা-রেখার ঢাল রেখাটির উপরের দিকে বেশি এবং নিচের দিকে কম।

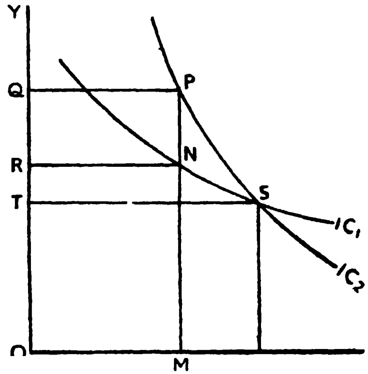
এই বৈশিষ্ট্যটিও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপাদন হারের সাহায্যে বুঝানো যায়। উপরের চিত্রে দেখা যায় যতই নিরপেক্ষতা-রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিচে নামিতে থাকে, ততই কফি ত্যাগের অনুপাত কমিতে থাকে এবং আপেল ভোগের অনুপাত বাড়িতে থাকে। ইহার কারণ নিরপেক্ষতা-রেখাটি যখন বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখে নামিতে থাকে, তখন উহার ঢাল রেখাটির উপর দিকে বেশি এবং নিচের দিকে কম হয়।

(৪) দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা কখনো পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না।

ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেকটি রেখা ভোগকারীর পছন্দের একটি বিশেষ স্তর নির্দেশ করে। তাহার পছন্দের বিভিন্ন স্তর বিভিন্ন নিরপেক্ষতা-রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। যদি একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি নিরপেক্ষতা-রেখাকে ছেদ করিতে পারিত তাহা হইলে ছেদবিন্দুতে দুইটি রেখায় অবস্থিত বিন্দুই সমান পছন্দের স্তর নির্দেশ করিত। কিন্তু দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা ভোগকারীর পছন্দের দুইটি বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়া থাকে। নিচের চিত্র দ্বারা দেখানো যায়, কেন দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না।

IC_1 এবং IC_2 দুইটি নিরপেক্ষতা-রেখা। IC_2 রেখাটি IC_1 রেখার তুলনায় ভোগীর নিকট অধিক পছন্দের স্তর নির্দেশ করে। IC_2 রেখার উপর P বিন্দুতে X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OQ এককের সংমিশ্রণ IC_1 রেখার উপর N বিন্দু হইতে লব্ধ X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OR একক সংমিশ্রণের তুলনায় অধিক উপযোগ বা তৃপ্তি প্রদান করে। যদি দুইটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তাহা হইলে ছেদবিন্দু দুইটি রেখার উপরই পড়িবে। এখন N ও S বিন্দু একই নিরপেক্ষতা-রেখা IC_1-এর উপর অবস্থিত

থাকায় X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OR এককের সংমিশ্রণ এবং X দ্রব্যের OL একক ও Y দ্রব্যের OT এককের সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারী সমান পরিমাণ উপযোগ লাভ করিবে। আবার, সেইরূপ P বিন্দু ও S বিন্দু একই নিরপেক্ষতা-রেখা IC_2-এর উপর অবস্থান করায় X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OQ এককের সংমিশ্রণ এবং X দ্রব্যের OL একক ও Y দ্রব্যের OT এককের সংমিশ্রণ সমান উপযোগ দান করিবে। ইহার অর্থ এই যে, X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OR এককের সংমিশ্রণ এবং X দ্রব্যের OM একক ও Y দ্রব্যের OQ একক সমান উপযোগসম্পন্ন—যাহা মোটেই সম্ভবযোগ্য নহে। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একটি নিরপেক্ষতা-রেখা অপর একটি নিরপেক্ষতা-রেখার হয় দক্ষিণে উপরের দিকে নতুবা বামে নিচের দিকে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু উহারা পরস্পরকে স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না।



(৫) পরিশেষে, একই নিরপেক্ষতা-রেখা মানচিত্রে দক্ষিণে ও উপরের দিকে অবস্থিত রেখার উপর নির্দিষ্ট সংমিশ্রণগুলি ভোগকারীর নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক পছন্দসই এবং অধিক তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। আবার, বামে ও নিচের দিকে অবস্থিত রেখার উপর নির্দিষ্ট সংমিশ্রণগুলি ভোগকারীর নিকট অপেক্ষাকৃত কম পছন্দসই এবং কম তৃপ্তি প্রদান করিয়া থাকে।

দাম-রেখা বা বাজেট-রেখা : ভোগকারীর আয় ও দাম
(Price or Budget Line : Consumer Income and Prices)

ভোগকারীর চাহিদা ও ভোগের ভারসাম্য নির্ধারণ করিতে হইলে কেবলমাত্র তাহার নিরপেক্ষতা-মানচিত্র বিশ্লেষণই যথেষ্ট নহে। কেন না, নিরপেক্ষতা-রেখাগুলি কেবলমাত্র তাহার পছন্দের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া থাকে। ভোগীর চাহিদা ও ভারসাম্য অবস্থা নির্ণয় করিতে

হইলে নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে তাহার আয় ও দ্রব্যগুলির আপেক্ষিক দামের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়।

কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারীর আয় সীমাবদ্ধ। যে দামে সে বাজারে দ্রব্যগুলি ক্রয় করে উহাও নির্দিষ্ট, পূর্বেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সে তাহার নির্দিষ্ট আয় সমস্তটা ব্যয় করিয়া দুই বা ততোধিক দ্রব্যের কি কি সম্ভাব্য সংমিশ্রণ কিনিতে পারে তাহার নির্দেশ পায় দাম-রেখা অথবা বাজেট-রেখা হইতে। এই রেখাকে আয়-দাম রেখা (Income-Price Line) ; অথবা ভোগ-সম্ভাবনা রেখাও (Consumption-Possibility Line) বলা হয়। ধরা যাক, ভোগকারী তাহার সম্পূর্ণ আয় আম ও কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে। তাহার মোট আয়কে I, আমের সংখ্যাকে X এবং কমলালেবুর সংখ্যাকে Y, আমের দামকে Px এবং কমলালেবুর দামকে Py দ্বারা নির্দেশ করা হইল। তাহা হইলে তাহার নির্দিষ্ট আয় দ্বারা আম ও কমলালেবুর কোন্ কোন্ সংমিশ্রণ সে ক্রয় করিতে পারে তাহা নিম্নলিখিত বাজেট সমীকরণ দ্বারা (budget equation) প্রকাশ করা যায়:

$$I = XPx + XPy$$

আমরা ভোগীর আয়ের পরিমাণ কতটা জানি না ; আম ও কমলালেবুর বাজার দাম কত তাহাও জানি না। তবে ভোগী যদি তাহার সমস্ত আয় আম অথবা কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে, তাহা হইলে আম বা কমলালেবু কতটা পাওয়া যাইবে তাহা জানিতে পারা যায়। সে যদি সমস্ত আয় আম ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে যতটা আম পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা = $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{আমের মূল্য}}$

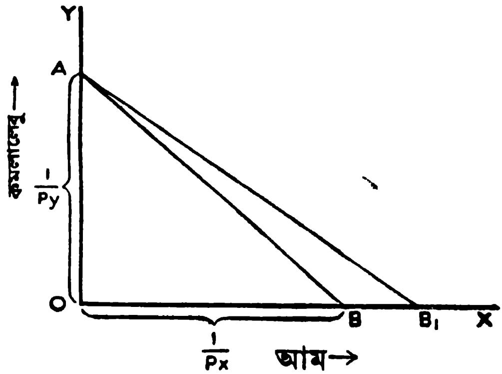
$$\text{অর্থাৎ} \quad X = \frac{I}{Px}$$

সেইরূপ সে যদি সমস্ত আয় কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে যতটা কমলালেবু পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা = $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{কমলালেবুর মূল্য}}$

$$\text{অর্থাৎ} \quad Y = \frac{I}{Py}$$

কিন্তু বাস্তবে কোন ভোগকারী তাহার আয় কোন একটিমাত্র দ্রব্যের

উপর ব্যয় করে না ; সে আম ও কমলালেবু দুইই কিনিবে। ভোগকারীর পছন্দের স্তর ও দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম না জানা পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে বলিতে পারি না যে, কোন্ দ্রব্যের কতটা সংখ্যা কিনিব। কিন্তু দ্রব্য-দুইটির কি কি সংখ্যা তাহার পক্ষে কেনা সম্ভব, ভোগকারীর বাজেট সমীকরণ-রেখা তাহার নির্দেশ দিতে পারে। নিচে জ্যামিতিক রেখাচিত্রের সাহায্যে বাজেট সমীকরণ-রেখা অঙ্কন করা হইল :



উপরের চিত্রে AB ভোগকারীর বাজেট-রেখা। AB রেখার উপর বিন্দুগুলি, নির্দিষ্ট দামে ভোগকারী তাহার সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া আম এবং কমলালেবুর কোন্ কোন্ সংমিশ্রণ ক্রয় করিতে পারে তাহা দেখাইতেছে। সুতরাং বাজেট-রেখা হইল, ভোগকারী তাহার নির্দিষ্ট আয়ের দ্বারা নির্দিষ্ট দামে দুই বা ততোধিক দ্রব্যের যে বিভিন্ন সম্ভাব্য সংমিশ্রণ কিনিতে পারে, উহাদের সঞ্চারপথ।[১] তাহার আয় দ্বারা কেবল আম কিনিলে আমের পরিমাণ $\frac{I}{Px}$ কিনিবে, ইহা X রেখার উপর নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার, তাহার আয় দ্বারা কেবল কমলালেবু কিনিলে কমলালেবুর পরিমাণ $\frac{I}{PY}$ কিনিবে, তাহা y রেখার উপর নির্দেশ করা হইয়াছে।

এখন বাজেট-রেখা ABর ঢাল হইল $\frac{OA}{OB}$। কিন্তু সমস্ত আয় কমলালেবু

১. The budget line is 'the locus of all possible combinations of commodities at given prices, that can be bought with a given money income.'

কিনিতে ব্যয় করিলে যে পরিমাণ কমলালেবু পাওয়া যায় তাহার সমান হইল OA। অর্থাৎ $OA = \frac{1}{Py}$

সেইরূপ সমস্ত আয় আম ক্রয়ে ব্যয় করিলে যে পরিমাণ আম পাওয়া যায় তাহার সমান হইল OB। অর্থাৎ $OB = \frac{1}{Px}$। সুতরাং AB বাজেট-

$$\text{রেখার ঢাল} = \frac{OA}{OB} = \frac{\frac{1}{Py}}{\frac{1}{Px}} = \frac{Px}{Py}$$

অতএব বাজেট-রেখার ঢাল আম ও কমলালেবুর মূল্যের অনুপাত নির্দেশ করে।

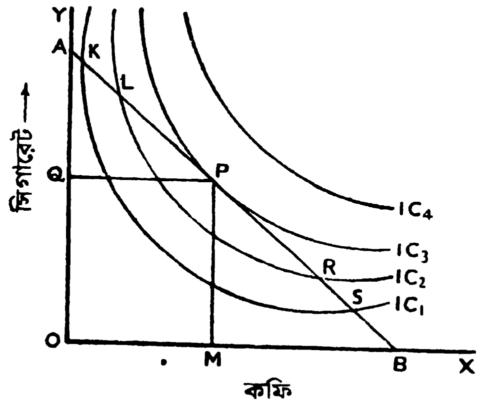
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজেট-রেখার অবস্থিতির পরিবর্তন ঘটিতে পারে। যদি দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট থাকে আর ভোগকারীর আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বাজেট-রেখা পুরাতন বাজেট-রেখার দক্ষিণে ও উপরে সরিয়া যাইবে এবং পুরাতন রেখার সমান্তরাল হইবে।

দামের পরিবর্তন ঘটিলেও বাজেট-রেখা সরিয়া যাইবে। ভোগকারীর আয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, এবং কমলালেবুর দামে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে আমের দাম কিছুটা কমিলে সে আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ আম কিনিতে পারিবে। . ইহার ফলে পুরাতন বাজেট-রেখা সরিয়া ডান দিকে ও নিচে সরিয়া যাইবে। কিন্তু যেহেতু সে আপেলের পরিমাণ বেশি কিনিবে, আর কমলালেবুর পরিমাণ আগের মতই কিনিবে সেইহেতু বাজেট-রেখাটি (৯৯ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ) A হইতে সরিয়া যাইবে না, কিন্তু B হইতে দক্ষিণে ও নিচে সরিয়া যাইবে। এখন ক্রেতার নূতন বাজেট-রেখা হইবে AB_1 এবং আমের দাম কমিবার দরুণ সে মোট OB_1 পরিমাণ আম কিনিবে।

পছন্দ-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভোগকারীর ভারসাম্য নির্ণয়
(Determination of Consumer's Equilibrium on the basis of Preference Theory)

ভোগকারীর লক্ষ্যই হইল, তাহার বাজেট নির্দিষ্ট আয় নির্দিষ্ট দামের একাধিক দ্রব্যের সংমিশ্রণের উপর ব্যয় করিয়া সর্বাধিক সম্ভব উপযোগ বা

তৃপ্তি লাভ করা। সর্বাধিক সম্ভব উপযোগবিশিষ্ট সংমিশ্রণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাকে পরিবর্তনের নীতি (Principle of Substitution) ব্যবহার করিতে হয়—একটি দ্রব্যের ভোগ কমাইয়া অপরটির ভোগ বাড়াইয়া সেই সংমিশ্রণটি বাহির করিতে হয় যাহা তাহার নিকট সর্বাধিক সম্ভব উপযোগসম্পন্ন। যখন সে এই সংমিশ্রণটি খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয়, তখন আর পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়া যায়। এখন নিরপেক্ষতা-রেখা হাতিয়ারটি (technique) ব্যবহার করিয়া ভোগকারীর ভোগসাম্য কি ভাবে নির্ধারণ করা যায় তাহা নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা যাইতে পারে :



উপরের নিরপেক্ষতা-মানচিত্রে বাজেট-রেখা বা দাম-রেখা AB স্থাপন করা হইয়াছে। বাজেট-রেখা ১নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_1-কে K ও S বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে এবং ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_2কে L ও R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। কিন্তু ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_3কে স্পর্শক রেখারূপে (tangent) P বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। আর ৪নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_4 বাজেট-রেখার বাহিরে অবস্থান করিতেছে। এখন ৪নং রেখায় অবস্থিত কফি ও সিগারেটের বিভিন্ন সংমিশ্রণই ভোগকারীর নিকট সবচেয়ে অধিক পছন্দসই হওয়ার কথা ; কেন না চারিটি নিরপেক্ষতা-রেখার মধ্যে IC_4 রেখাটাই সবচেয়ে দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। কিন্তু রেখাটি বাজেট-রেখার বাহিরে

বলিয়া (অর্থাৎ তাহার আয় যথেষ্ট নহে বলিয়া) এই রেখার উপর অবস্থিত সংমিশ্রণ ভোগকারীর কিনিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, এই সংমিশ্রণগুলির মধ্যে কোন একটি কিনিয়া ভোগকারী সর্বাধিক উপযোগ লাভ বা ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিতে পারে না। আবার ১নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_1-এর উপর অবস্থিত K ও S বিন্দুর সংমিশ্রণগুলির কোনটি হইতেও সে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, ১নং নিরপেক্ষতা-রেখাটি সবচেয়ে বামে অবস্থান করার দরুণ ভোগকারীর সর্বনিম্ন পছন্দের স্তর নির্দেশ করিতেছে। আবার ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার উপর অবস্থিত L ও R বিন্দুর সংমিশ্রণ দুইটি হইতেও ভোগী সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারে না। কেন না, এই রেখাটির চেয়ে তৃতীয় নিরপেক্ষতা-রেখাটি আরও দক্ষিণে অবস্থান করিয়া উচ্চতর পছন্দের স্তর নির্দেশ করিতেছে। তৃতীয় নিরপেক্ষতা-রেখাটিই ভোগকারীর বাজেটের মধ্যে সর্বোচ্চ পছন্দ-স্তর নির্দেশ করিতেছে। সুতরাং তাহার আয় সম্পূর্ণভাবে ব্যয় করিয়া P বিন্দুতে অবস্থিত সংমিশ্রণ ক্রয় করিলেই সে ভারসাম্যে পৌঁছিতে পারিবে। P বিন্দুই ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দুতে সে OM পরিমাণ কফি ও MP পরিমাণ সিগারেট কিনিয়া সর্বাধিক উপযোগ বা তৃপ্তি লাভ করিবে।

দুইটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

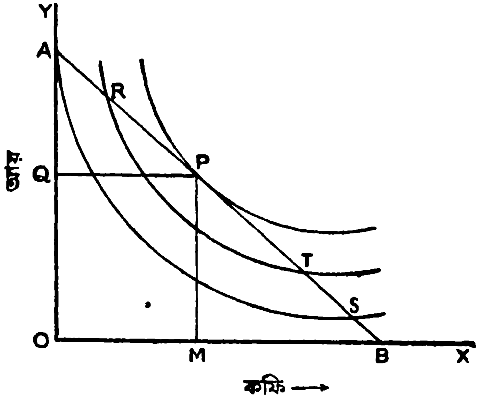
ভোগীর ভারসাম্যের অবস্থা গণিতের সাহায্যে সংক্ষেপে এই ভাবে বুঝানো যায়। উপরের চিত্রে বাজেট-রেখা ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখা IC_3কে P বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং P বিন্দুতে নিরপেক্ষতা-রেখাটির ঢাল হইল কফি ও সিগারেটের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের সমান। [৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। আবার বাজেট-রেখা নিরপেক্ষতা-রেখার স্পর্শক বলিয়া P বিন্দুতে দুইটি রেখার ঢালও পরস্পর সমান। P বিন্দুতে বাজেট-রেখার ঢাল কফি ও সিগারেটের মূল্যের অনুপাতের সমান [১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]। সুতরাং, ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত এই ভাবে নির্দেশ করা যায়: ভোগকারীর ভারসাম্য সেই বিন্দুতে স্থাপিত হয় **যেখানে দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ও উহাদের মূল্যের অনুপাত সমান**। গাণিতিক ভাষায় **ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত হইল :** $\frac{MRSY}{MRSX} = \frac{Px}{Py}$

ভোগীর ভারসাম্যের গাণিতিক ব্যাখ্যা

[MRS হইল প্রান্তিক পরিবর্তনের হার, X হইল কফি, Y হইল সিগারেট এবং P হইল দাম।]

এতক্ষণ আমরা দুইটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগীর ভারসাম্য কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই বিশ্লেষণ দুইএর অধিক বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রেও চলিতে পারে। যখন বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করা হয় তখন একটি রেখা দ্বারা একটি দ্রব্য নির্দেশ করিতে হইবে, আর একটি রেখা দ্বারা ভোগকারীর আয় নির্দেশ করিতে হইবে। নিচে চিত্রের সাহায্যে বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য কি ভাবে নিরূপিত হয় দেখানো হইল :

বহু দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য



OX অক্ষরেখা কফি নির্দেশ করিতেছে এবং OY অক্ষরেখা ভোগকারীর আয় নির্দেশ করিতেছে। গোড়াতে A বিন্দুতে ভোগকারীর হাতে OA পরিমাণ আয় আছে এবং সে উহার কিছুই কফি ক্রয়ে ব্যয় করিতেছে না। সে তাহার আয়ের কিছুটা ছাড় দিয়া R বিন্দুতে গেল এবং কিছু পরিমাণ কফি কিনিল। A বিন্দুর চেয়ে R বিন্দু ভোগকারীর নিকট অধিক পছন্দনীয় হইবে ; কেন না, A বিন্দু হইল ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার উপর আর R বিন্দু হইল ২নং নিরপেক্ষতা-রেখার উপর। সে যদি ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখায় অবস্থিত P বিন্দুতে যায় তাহা হইলে তাহার উপযোগ আরও বৃদ্ধি পাইবে ;

কেন না, এই রেখাটি ১নং ও ২নংএর তুলনায় উচ্চতর পছন্দ-স্তর নির্দেশ করে। আবার, সে যদি T ও S বিন্দুতে সরিয়া যায় তাহা হইলে ক্রমশ কম উপযোগ পাইতে থাকিবে। ভোগকারীর পক্ষে ভারসাম্য অবস্থা হইবে P বিন্দু। P বিন্দুতে সে AQ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া OM পরিমাণ কফি লাভ করিবে।

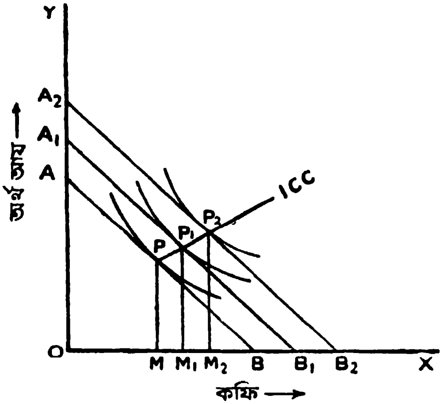
আয়-প্রভাব
(Income Effect)

আয়-ভোগ রেখা (Income-Consumption Curve)

ভোগকারী যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে উহাদের দাম যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে তাহার আয় বাড়িলে দ্রব্যের ভোগ বাড়িয়া যাইবে, আবার আয় কমিলে দ্রব্যের ভোগ কমিয়া থাকে। আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগকারী উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে পারে। আয় পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার যে ভোগ পরিবর্তন ঘটে উহাকে আয়-প্রভাব বলা হয়। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম যদি একই থাকে, আর ভোগীর আয় পরিবর্তন ঘটিয়া তাহার ভোগের পরিবর্তন ঘটে, তবেই তাহা আয়-প্রভাব। আয়-প্রভাব আর এক প্রকারে ঘটিতে পারে। কোন দ্রব্যের দাম কমিলে ভোগী একই পরিমাণ টাকা ব্যয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। দ্রব্যটির দাম কমিবার ফলে যদিও তাহার অর্থ আয় একই থাকে, কিন্তু তাহার প্রকৃত আয় বাড়িয়া যায় যাহার ফলে তাহার আর্থিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে সচ্ছল হয়। এইভাবে দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ ভোগীর প্রকৃত আয় যখন বৃদ্ধি পায় তখন উহাকে আয়-প্রভাব বলা হয়। এইরূপ দুই প্রকার আয়-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে ভোগকারী তাহার অর্থ আয় বৃদ্ধির ফলে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে সক্ষম হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম কমিয়া যাইবার দরুণ ভোগকারীর যে প্রকৃত আয় বাড়ে তাহার ফলে সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে পারে না। পরপৃষ্ঠায় রেখা-চিত্রের সাহায্যে আয়-প্রভাব প্রকাশ করা হইল :

চিত্রে OX রেখাদ্বারা কফি এবং OY রেখাদ্বারা ভোগকারীর

অর্থ আয় নির্দেশ করা হইয়াছে। (OY রেখাদ্বারা আর একটি দ্রব্যও নির্দেশ করা চলে)। ভোগকারীর আয় যতই বাড়ে ততই তাহার বাজেট-রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে সরিয়া যায়। AB, A_1 B_1, A_2 B_2



প্রভৃতি বাজেট-রেখাগুলি পরস্পর সমান্তরাল; কেন না, কফির দাম নির্দিষ্ট ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কেবলমাত্র ভোগীর আয় বাড়িতেছে অনুমান করা হইয়াছে। বাজেট-রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোগীও উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় চলিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে। P, P_1 ও P_2 বিন্দুগুলি যোগ করিলে ICC রেখাটি পাওয়া যাইবে।

আয়-ভোগ রেখা

উহাকে আয়-ভোগ রেখা (Income-Consumption Curve) কিংবা ব্যয়-ভোগ রেখা (Expenditure-Consumption Curve) বলা হয়। দ্রব্যগুলির দাম নির্দিষ্ট আছে ধরিয়া লইলে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির ফলে তাহার ভোগের উপর কি প্রতিক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটে আয়-ভোগ রেখা সেই সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া থাকে।[১]

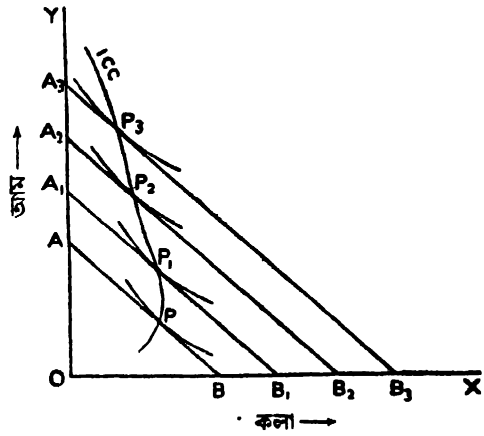
আয়-ভোগ রেখা সাধারণত ডানদিকে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, ভোগীর আয় বৃদ্ধির ফলে (আর দ্রব্যের মূল্য যদি অপরিবর্তিত থাকে), দুইটি দ্রব্যের ভোগই তাহার কাছে বৃদ্ধি পায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, আয়-ভোগ রেখা কিছুটা

১. Stonier and Hague : 'Income consumption curve shows how consumption reacts to changing income when prices of both goods are given and constant.'

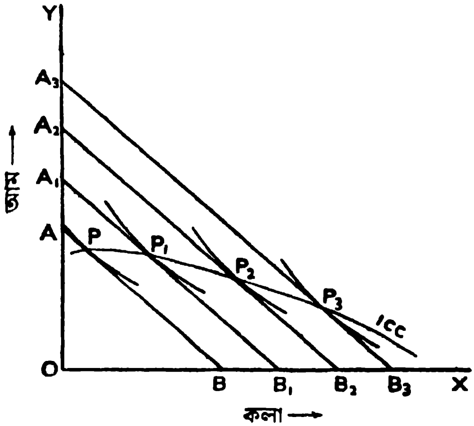
উপরের দিকে উঠার পর উপরে বামদিকে কিংবা নিচে ডানদিকে বাঁকিয়া যাইতে পারে (slopes upwards to the left or slopes downwards to the right)। আয়-ভোগ রেখার এই আকৃতি দেখিয়া আয়-প্রভাবের প্রকারভেদ করা চলে।

আয়-প্রভাবের প্রকারভেদ

আয়-ভোগ রেখা যখন ডানদিকে সামনে উপরের দিকে উঠে তখন উহাকে ধনাত্মক আয়-প্রভাব (positive income effect) বলা হয়। এইরূপ আয়-প্রভাবের তাৎপর্য এই যে, ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির সহিত সে দুইটি দ্রব্যের ভোগই বাড়াইয়া দেয়। সাধারণত স্বাভাবিক বা উৎকৃষ্ট (normal or superior) দ্রব্যের ভোগের বেলাতেই চাহিদার প্রকৃতি এইরূপ হইয়া থাকে। এই অবস্থা পূর্বের চিত্রে দেখানো যায় যদি দুইটি অক্ষরেখা দ্বারা দুইটি দ্রব্য নির্দেশ করা হয়। আয়-ভোগ রেখা যখন কিছুটা উপরের দিকে উঠার পর উপরে বামদিকে মোড় লইতে থাকে তখন উহাকে ঋণাত্মক আয়-প্রভাব (negative income effect) বলা হয়। এইরূপ আয়-প্রভাবের তাৎপর্য এই যে, ভোগকারী তাহার আয় বৃদ্ধির সহিত একটি দ্রব্যের ভোগ বা ক্রয় কমাইয়া দেয়, আর একটি দ্রব্যের ক্রয় বাড়াইয়া দেয়। এই ভাবে ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির ফলে যে দ্রব্যের ক্রয় কমিয়া যায় তাহাকে নিকৃষ্ট (inferior) দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের ক্রয় বাড়িয়া যায় তাহাকে উৎকৃষ্ট (superior) দ্রব্য বলা হয়। এইরূপ ঋণাত্মক আয়-প্রভাব নিচের রেখাচিত্রে দেখানো হইল :



পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে আয়-ভোগ রেখা বামে উপরের দিকে মোড় লইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভোগী তাহার আয় বৃদ্ধির সহিত কলার পরিমাণ কম কিনিতেছে এবং আমের পরিমাণ বেশি কিনিতেছে। এখানে কলা তাহার নিকট নিকৃষ্ট দ্রব্য এবং কলার ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক। আবার আয়-ভোগ রেখা যখন দক্ষিণে নিচের দিকে নামে তখনও উহাকে ঋণাত্মক আয়-প্রভাব বলা চলে। নিচের রেখাচিত্র দ্বারা এই ধরনের আয়-প্রভাবও



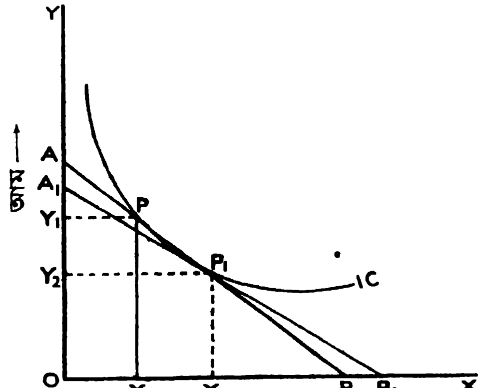
দেখানো যায়। উপরের চিত্রে আয়-ভোগ রেখা ডানদিকে নিচে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, ভোগকারী তাহার আয় বৃদ্ধির সহিত আমের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কম কিনিতেছে আর কলার পরিমাণ বেশি কিনিতেছে। এখানে আমের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক।

বিশেভাবে লক্ষণীয় এই যে, আয়-প্রভাবের পরিমাণ নির্ভর করে ভোগ-কারী বা ক্রেতা তাহার আয়ের কত অংশ দ্রব্য ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহার উপর। ক্রেতা যদি তাহার আয়ের অতি অল্প অংশই দ্রব্যটির উপর ব্যয় করে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের ফলে আয়-প্রভাব বিশেষ অনুভূত হইবে না।

পরিবর্তন-প্রভাব
(Substitution Effect)

দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটিলে ভোগকারী দ্রব্য দুইটির ভোগের পরিমাণ অদল-বদল করিতে বাধ্য হয়।

সে তখন ভোগের পরিমাণ এমন ভাবে অদল-বদল করে যাহাতে তাহার আয় একই থাকে—বাড়েও না, কমেও না। একটি দ্রব্যের দাম যদি বাড়ে এবং আর একটির কমে, তাহা হইলে ভোগকারী তাহার মোট উপযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দ্রব্য দুইটির ভোগ যে কম-বেশি করে তাহাকে দামের পরিবর্তন-প্রভাব বলে। দাম কমিবার ফলে যে দ্রব্যটি অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়, ক্রেতা স্বভাবতই সেই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে কিনিবে। সে অপেক্ষাকৃত দামী দ্রব্যটির স্থলে সস্তা দ্রব্যটি পরিবর্তন করিবে। জিনিসের আপেক্ষিক দাম পরিবর্তনের ফলে, এই ভাবে যখন অপেক্ষাকৃত চড়া দামের জিনিসটি কম পরিমাণে এবং সস্তা দামের জিনিসটি বেশি পরিমাণে ক্রয় করা হয় তখন তাহাই পরিবর্তন-প্রভাব। পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে সে বেশি দামের জিনিসটির পরিবর্তে কম দামের জিনিসটি বেশি করিয়া ভোগ করে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভোগীর পরিবর্তন-প্রভাব দেখানো হইল :



উপরের চিত্রে AB ভোগকারীর মূল বাজেট-রেখা এবং P মূল ভারসাম্য বিন্দু। ভোগকারী OX_1 একক কলা এবং OY_1 একক আম ক্রয় করিয়া সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিয়াছে। মনে কর, কলার ও আমের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমের দাম চড়া হইয়াছে এবং কলার দাম সস্তা হইয়াছে ; কিন্তু ভোগীর আয় একই সমান রহিয়াছে। আমের দাম চড়া হইবার ফলে তাহার যেমন আয় কমিল, তেমনি কলার দাম সস্তা হইবার ফলে তাহার আয় বাড়িল। ইহাকে ভোগকারীর আয়ের ক্ষতিপূরণমূলক

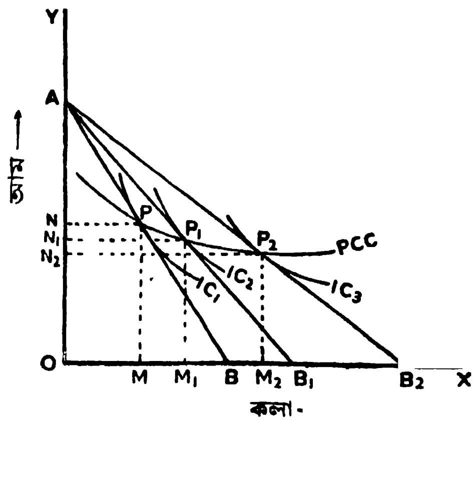
পরিবর্তন (Compensating variation in consumer's income) বলে।

কিন্তু ভোগকারীর আয় সমান থাকার দরুণ সে একই নিরপেক্ষতা-রেখার উপরই রহিল, অথচ দাম পরিবর্তনের ফলে তাহাকে নূতন এক ভারসাম্য অবস্থা লাভ করিতে হইল। উপরের রেখাচিত্র হইতে বুঝা যাইবে যে, কলার দাম সস্তা হওয়ায় এবং আমের দাম বেশি হওয়ায় ভোগকারীর নূতন বাজেট-রেখা হইল A_1B_1। এই বাজেট-রেখা নিরপেক্ষতা-রেখাকে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিল। এখন সে আমের OY_2 একক ও কলার OX_2 একক কিনিলে ভারসাম্যে পৌঁছিয়া সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পারিবে। দুইটি দ্রব্যের ভোগের আপেক্ষিক পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিলেও ভোগকারী কিন্তু একই নিরপেক্ষতা-রেখায় অবস্থান করিবে। সে কেবল মূল ভারসাম্য বিন্দুর পরিবর্তন করিয়া নূতন ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছিবে।

দাম-প্রভাব

(Price Effect)

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভোগকারীর আয় অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং সে যে দুইটি দ্রব্য কিনিতেছে তাহার একটির দামে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, অথচ আর একটির দাম কমিয়াছে, তাহা হইলে ভোগকারীর প্রকৃত আয়, ভোগের পরিমাণ ও ভার-সাম্যের অবস্থার যে পরিবর্তন দেখা যায় তাহাকেই দাম-প্রভাব বলে। ভোগকারীর উপর দাম-প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কিভাবে হইতে পারে নিচের চিত্রের সাহায্যে তাহা নির্দেশ করা হইল :



পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে ভোগকারীর প্রথম বাজেট-রেখা ছিল AB এবং ভারসাম্য বিন্দু ছিল P। সে ভারসাম্য অবস্থায় OM একক কলা এবং ON একক আম কিনিয়াছিল। কলার দাম কমিবার ফলে, উহা কিনিবার ক্ষমতা বাড়িয়া দাঁড়াইল OB, অথচ আমের দাম অপরিবর্তিত থাকায় আম কিনিবার ক্ষমতা OAই রহিয়া গেল। নূতন বাজেট-রেখা হইল AB_1 এবং উহা ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে P_1 বিন্দুতে স্পর্শ করিল। P_1ই নূতন ভারসাম্যের বিন্দু। এই বিন্দুতে ভোগকারী OM_1 একক কলা ও ON_1 একক আম কিনিল। এইভাবে কলার দাম যদি আরও সস্তা হয় তাহা হইলে উহা কিনিবার ক্ষমতা আরও বাড়িয়া যাইবে, নূতন বাজেট-রেখা AB_2 ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে স্পর্শ করিয়া P_2 বিন্দুতে ভোগকারীর ভারসাম্য স্থাপন করিবে। P_2 বিন্দুতে ভোগকারী OM_2 একক আম ও ON_2 একক কলা ক্রয় করিয়া সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিবে।

দাম-ভোগ রেখা

P, P_1 এবং P_2 বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করিলে যে রেখাটি পাওয়া যাইবে উহাকে দাম-ভোগ রেখা (Price Consumption Curve) বলা হয়। এই দাম-ভোগ রেখার সাহায্যেই দাম-প্রভাব দেখানো হইয়া থাকে।

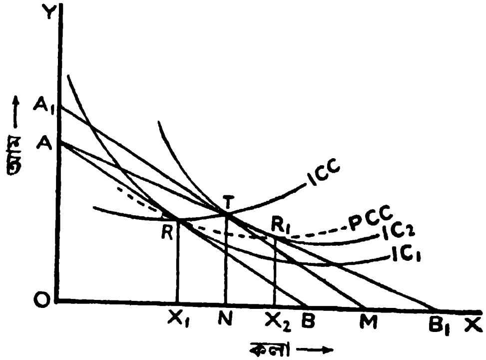
লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দাম-প্রভাবকে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশ্লেষণ করা হইয়া থাকে।

মনে কর, একটি দ্রব্যের দাম কমিয়াছে, অপরটির দাম অপরিবর্তিত রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ভোগকারীর প্রকৃত আয় বাড়িয়া যাইবে যাহার ফলে সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা-রেখায় উঠিতে পারিবে এবং যে দ্রব্যটির দাম সস্তা হইয়াছে তাহা অধিক পরিমাণে ক্রয় ও ভোগ করিতে পারিবে। ইহাই হইল একটি দ্রব্যের দাম কমিবার দরুণ চাহিদার উপর আয়-প্রভাব।

আবার, একটি দ্রব্যের দাম কমিলে, এবং অপর দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকিলে, ভোগকারীর উপর পরিবর্তন-প্রভাবের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। সে যখন দেখে একটি দ্রব্য অপরাপর দ্রব্য কিংবা অর্থ আয়ের তুলনায় সস্তা হইয়াছে তখন সে স্বভাবত দামী দ্রব্যের বদলে সস্তা দ্রব্যটি পরিবর্তন করিবে। পরিবর্তন-প্রভাবের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, দ্রব্যের দাম সস্তা হইলে ভোগীর ঐ দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়। আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব উভয়ে মিলিতভাবে যে দাম-প্রভাব ঘটাইয়া চাহিদার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—

এই দাম-প্রভাবের কতটা আয়-প্রভাবের দরুণ এবং কতটা পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ তাহা নির্দেশ করা যায়। দাম-ভোগ রেখা হইতে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব পৃথক পৃথকভাবে দেখানো যায়। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হইল :

দাম-প্রভাবের উপর আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের প্রতিক্রিয়া



প্রথমে ভোগকারীর ভারসাম্য বিন্দু ছিল R এবং এই বিন্দুতে সে OX_1 পরিমাণ কলা ও RX_1 পরিমাণ আম ক্রয় করিয়াছিল। এখন যদি কলার দাম হ্রাস পায় তাহা হইলে ভোগকারীর মূল বাজেট-রেখা AB সরিয়া গিয়া AB_1 হইবে। এই অবস্থায় তাহার নূতন ভারসাম্য ২নং নিরপেক্ষতা-রেখায় R_1 বিন্দুতে স্থাপিত হইবে। এখানে দেখা যাইতেছে যে, কলার দাম হ্রাস পাওয়ায় কলা ক্রয়ের পরিমাণ OX_1 হইতে বাড়িয়া OX_2এ দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ কলার দাম কমিবার দরুণ কলা ক্রয়ের পরিমাণ X_1X_2 বাড়িয়াছে। ইহাই দাম-প্রভাব। কলার দাম হ্রাস পাইবার ফলে এই যে দাম-প্রভাব ঘটিল তাহা অংশত আয়-প্রভাবের দরুণ, অংশত পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ। কতটুকু আয়-প্রভাবের দরুণ এবং কতটুকু পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ এখন তাহাই দেখানো হইতেছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, মূল ও নূতন ভারসাম্য বিন্দু R ও R_1 যোগ করিলে দাম-ভোগ রেখা পাওয়া যায়। ধরা যাক, কলার দাম হ্রাস পাওয়ার ফলে ভোগকারীর প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইল। ইহার ফলে তাহার বাজেট-রেখা ডানদিকে সরিয়া A_1Mএ গিয়া দাঁড়াইল। এই নূতন বাজেট-রেখা মূল বাজেট-রেখার সমান্তরালভাবে ২নং নিরপেক্ষতা-রেখা

IC_2তে T বিন্দুকে স্পর্শ করিল। R ও T বিন্দুকে যোগ করিলে ক্রেতার আয়-ভোগ রেখা পাওয়া যায়। R ও T বিন্দুর মধ্যে দূরত্বটুকুই কলার দাম কমিবার দরুণ আয়-প্রভাব। অর্থাৎ ভোগকারীর দাম-প্রভাব X_1X_2-এর মধ্যে আয়-প্রভাবের দরুণ অতিরিক্ত ক্রয় হইতেছে X_1N। আর বাকি NX_2 হইতেছে পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ অতিরিক্ত ক্রয়। মনে রাখিতে হইবে যে, আয়-প্রভাবের দরুণ ভোগকারীকে নিচে অবস্থিত নিরপেক্ষতা-রেখা হইতে উচ্চতর রেখায় সরিয়া যাইতে হয়। আর পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে ভোগকারীকে একই নিরপেক্ষতা-রেখার উঁচু বিন্দু হইতে নিম্নতর বিন্দুতে সরিয়া আসিতে হয়। উপরের মানচিত্রের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় :

দাম-প্রভাব = আয়-প্রভাব + পরিবর্তন-প্রভাব

দাম-প্রভাব $= X_1X_2$

আয়-প্রভাব $= X_1N$

পরিবর্তন-প্রভাব $= NX_2$

দাম-ভোগ রেখাটি (PCC) দাম পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ দাম-প্রভাব নির্দেশ করিয়া থাকে।

আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব
(Importance of Distinction between Income Effect and Substitution Effect)

মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বের একটি প্রধান গলদ এই যে, ইহা পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে নাই। কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণে যে বৃদ্ধি ঘটে, উহার কতটা পরিবর্তন-প্রভাবের দরুণ আর কতটাই বা আয়-প্রভাবের দরুণ, তাহার বিশ্লেষণ মার্শালের তত্ত্বে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, নিরপেক্ষতা-রেখার তত্ত্ব কেবল তাহার সন্ধানই দেয় না ; চাহিদা বৃদ্ধির পরিমাণ কতটা পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে এবং কতটা আয়-প্রভাবের ফলে তাহারও সন্ধান দিয়া থাকে। আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাবের সম্মিলিত ফল যে দাম-প্রভাব, নিরপেক্ষতা-রেখা তত্ত্বে তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা মেলে। ভোগকারীর চাহিদার উপর দাম-প্রভাবের (price effect) মোট প্রতিক্রিয়া কিভাবে উহার দুইটি উপাদান (components)

পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের কার্যকারিতার দরুণ দেখা দেয় তাহা এই তত্ত্বে পৃথকভাবে জানিতে পারা যায়। সুতরাং, কোন দ্রব্যের চাহিদার উপর দাম-প্রভাবের কি প্রতিক্রিয়া তাহা স্পষ্টভাবে জানিতে হইলে পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

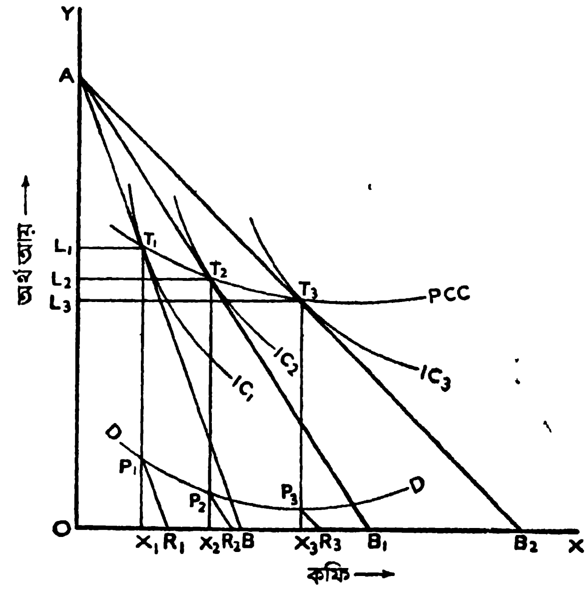
এই দুইটি প্রভাবের মধ্যে পরিবর্তন-প্রভাব সকল অবস্থাতেই অর্থাৎ যে কোন রকম দ্রব্যের বেলায় ধনাত্মক ; কেন না, দামী দ্রব্যের তুলনায় সস্তা দ্রব্য পরিবর্তক হিসাবে কেনা হইয়া থাকে। যে দ্রব্যটির দাম কমে নাই তাহার তুলনায় যে দ্রব্যটির দাম কমিয়াছে উহার চাহিদার পরিমাণ স্বভাবতই বাড়িয়া থাকে। কিন্তু আয়-প্রভাব সর্বদা ধনাত্মক নাও হইতে পারে। দ্রব্য অনুযায়ী আয়-প্রভাব ধনাত্মক, ঋণাত্মক কিংবা একেবারে শূন্য হইতে পারে। উৎকৃষ্ট কিংবা স্বাভাবিক (superior or normal) দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক হইতে বাধ্য। এই সকল দ্রব্যের দাম কমিলে আয়-প্রভাবের দরুণ ক্রেতার মোট চাহিদা বাড়ে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোন দ্রব্যকে নিকৃষ্ট (inferior) মনে করে, তাহা হইলে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হইয়া থাকে। এই ধরনের দ্রব্যের বেলায় দাম কমিবার ফলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়িলেও চাহিদার পরিমাণ কমিতে দেখা যায়। অন্যান্য দ্রব্যের বেলায় যেক্ষেত্রে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও চাহিদার পরিমাণে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা দেয় না, সেখানে আয়-প্রভাব শূন্য (zero)। এই সকল দ্রব্যকে নিরপেক্ষ (neutral) দ্রব্য বলা হয়।

স্বাভাবিক কিংবা উৎকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ও আয়-প্রভাব দুই-ই ধনাত্মক হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন-প্রভাব ধনাত্মক হইলেও আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণাত্মক আয়-প্রভাব ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের চেয়ে বেশি জোরদার হইতেও দেখা যায়। এই সকল দ্রব্যের বেলায় দাম কমিলে দ্রব্যটির চাহিদা হ্রাস প্রায়। তবে ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের দরুণ চাহিদা যতটা হ্রাস পাইতে পারিত, ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবের ফলে কার্যত ততটা হ্রাস পায় না। এই সকল দ্রব্যকে 'গিফেন দ্রব্য' (Giffen goods) বলে।

পছন্দ-তত্ত্বের ভিত্তিতে চাহিদা-রেখা নির্ণয়

(Derivation of the Demand Curve on the basis of Preference Theory)

কোন ব্যক্তির চাহিদা-রেখা দ্বারা এই নির্দেশ পাওয়া যায়, সে বিভিন্ন দামে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কতটা পরিমাণ ক্রয় করিবে। পছন্দ-তত্ত্বের ভিত্তিতে বা নিরপেক্ষতা-রেখার ব্যবহার দ্বারা ভোগকারীর নিকট একটি দ্রব্যের চাহিদা-রেখা নির্ণয় করা যায়। ক্রেতার দাম ভোগ-রেখা (Price Consumption Curve) হইতে দেখানো যায়, সে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ ক্রয় করিবে। ক্রেতা বাস্তব জীবনে বহু দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। বহু দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয় করিতে হইলে নিচের চিত্রে ভূমিতলের রেখা OXকে কফি ধরিয়া লইয়া অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত আছে অনুমান করিতে হইবে। লম্ব অক্ষ OY দ্বারা ভোগকারীর অর্থ আয় নির্দেশ করিতে হইবে, যাহা সে কফি ক্রয়ে ব্যয় কবিবে।



উপরের চিত্রে IC_1, IC_2 ও IC_3 ভোগকারীর তিনটি ক্রমোচ্চ নিরপেক্ষতা-রেখা নির্দেশ করিতেছে। কফির দাম ক্রমশ কমিয়া যাওয়ার

ফলে ভোগকারী তাহার সমস্ত আয়-ব্যয় দ্বারা যথাক্রমে OB, OB_1 ও OB_2 পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে সক্ষম। যথাক্রমে অধিক পরিমাণ দ্রব্য কেনার ফলে তাহার বাজেট-রেখা হইবে AB, AB_1 ও AB_2। এই বাজেট-রেখাগুলি যথাক্রমে ১নং, ২নং ও ৩নং নিরপেক্ষতা-রেখাগুলিকে T_1, T_2 ও T_3 বিন্দুতে স্পর্শ করিবে। T_1, T_2 ও T_3 বিন্দুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে কফির জন্য ভোগকারীর দাম-ভোগ রেখা পাওয়া যায়। এখন AB বাজেট-রেখার ঢাল $= \frac{L_1A}{OX_1}$। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভোগকারী যখন প্রথমবারে L_1A পরিমাণ অর্থ আয় ব্যয় দ্বারা OX_1 পরিমাণ কফি কিনিতেছে, তখন কফির এক এককের দাম জানিতে হইলে L_1Aকে OX_1 দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। সেইরূপ যখন OX_2 পরিমাণ কফি কিনিতেছে তখন এক একক কফির দাম $= \frac{L_2A}{OX_2}$, এবং যখন OX_3 পরিমাণ কফি কিনিতেছে, তখন এক একক কফির দাম $= \frac{L_3A}{OX_3}$।

এখন এক একক কফি নির্দেশ করিবার জন্য OX অক্ষরেখার উপর X_1 বিন্দুর ডান পাশে R_1 বিন্দু নির্দেশ করা গেল। সেইরূপ একই দূরত্ব লইয়া X_2 বিন্দুর পাশে R_2 এবং X_3 বিন্দুর পাশে R_3 বিন্দু নির্দেশ করা যায়। এখন X_1R_1এর দাম নির্দেশ করিতে হইলে AB বাজেট-রেখার সমান্তরাল করিয়া P_1 বিন্দু হইতে একটি রেখা টানিলে উহা T_1X_1 রেখার P_1 বিন্দুতে মিলিত হইবে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, T_1 বিন্দুতে বাজেট-রেখা ABএর ঢাল OX_1 পরিমাণ কফির উপর L_1A পরিমাণ অর্থ ব্যয় নির্দেশ করে। ঠিক সেইরূপ R_1 বিন্দুতে P_1R_1 রেখা ও X_1R_1 পরিমাণ কফির উপর P_1X_1 পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দিতেছে। অর্থাৎ বলা চলে যে, P_1X_1 দামে (ইহাই এক একক কফির দাম) OX_1 পরিমাণ কফি কেনা হইয়াছে। আবার, P_2 বিন্দু হইতে AB_1 বাজেট-রেখার সমান্তরাল করিয়া P_2R_2 রেখা এবং P_3 বিন্দু হইতে AB_2 রেখার সমান্তরাল করিয়া P_3R_3 রেখা টানিলে দেখা যায় যে, P_2X_2 দামে OX_2 পরিমাণ এবং P_3X_3 দামে OX_3 পরিমাণ কফি কেনা হইয়াছে। এখন P_1, P_2 ও P_3 বিন্দুগুলি যুক্ত করিলে DD চাহিদা-রেখা পাওয়া যাইবে।

পছন্দ-তত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতির মূল্যায়ন
(Evaluation of the Preference Theory or Indifference Curve Technique)

আধুনিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে পছন্দ-তত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। অধ্যাপক হিকস্ ভোগকারীর চাহিদা নির্ণয়ে এই পদ্ধতিকে প্রচলিত উপযোগ-তত্ত্বের বিকল্প ব্যাখ্যান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এবং আরও অনেক অর্থনীতিবিদ্ দাবী করেন যে, নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতিটি প্রাচীন উপযোগ-তত্ত্ব হইতে নিম্নলিখিত একাধিক কারণে উৎকৃষ্টতর :

প্রথমত, পছন্দ-তত্ত্বে উপযোগ সম্পর্কে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ধারণা গ্রহণ করা হইয়াছে। মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বের ভিত্তি হইল যে, উপযোগ অর্থের মাধ্যমে পরিমাণগতভাবে পরিমাণ করা। কিন্তু পছন্দ-তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, উপযোগ সম্পূর্ণভাবে মনোগত ধারণা, ইহা পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা যায় না। উপযোগ অপরিমেয়, কিন্তু তুলনীয়। বিভিন্ন দ্রব্যের কিংবা একই দ্রব্যের বিভিন্ন এককের উপযোগ পরিমাণ করা যায় না বটে, কিন্তু উহাদের পরস্পর তুলনা করা যায়। উহাদের তুলনা করিয়া ভোগকারীর পছন্দক্রম অনুযায়ী চাহিদা নির্ণয় করা যায়। উপযোগের এই ধারণাই অধিকতর বাস্তবধর্মী।

দ্বিতীয়ত, মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বে ভোগকারীর নিকট একটিমাত্র দ্রব্য বা সেবাকার্যের উপযোগ বা চাহিদা বিচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। কিন্তু পছন্দ-তত্ত্বে ভোগকারীর নিকট দুই বা বহু দ্রব্যের চাহিদা বিশ্লেষণ করায় অধিকতর বাস্তবসম্মত হইয়াছে।

তৃতীয়ত, মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বে বহুসংখ্যক ও সংকীর্ণ শর্তাবলী ধরিয়া লইয়া উপযোগ ও চাহিদার ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। সেই তুলনায় পছন্দ-তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলি সংখ্যায় কম ও অসংকীর্ণ। যেমন, মার্শালের উপযোগ-তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ভোগকারী যত পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করুক না কেন তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত থাকিবে। মার্শাল এই শর্ত ধরিয়া লইয়া দাম পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রভাব ও পরিবর্তন-প্রভাব ঘটিয়া থাকে তাহা সুস্পষ্টভাবে পৃথক করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু পছন্দ-তত্ত্বে এই শর্ত গ্রহণ

না করায় আয়-প্রভাবের ও পরিবর্তন-প্রভাবের পার্থক্য স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। ইহা অধিকতর বাস্তবসম্মত হইয়াছে।

চতুর্থত, মার্শাল তাঁহার উপযোগ-তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার সীমিত ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব-দ্বারা চাহিদার সকল রকম পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই তুলনায় পছন্দ-তত্ত্বে চাহিদার অধিকতর ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পছন্দ-তত্ত্ব দ্বারা ভোগকারীর চাহিদার যে কোন রকম পরিবর্তনের ব্যাখ্যান করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মার্শালের চাহিদার নিয়ম 'গিফেন দ্রব্যের' চাহিদার বিশ্লেষণ করিতে পারে না। কেন একটি দ্রব্যের দাম কমিলেও ভোগকারী ঐ দ্রব্য বেশি ক্রয় করে না—এই প্রশ্নের উত্তর মার্শালের তত্ত্বে পাওয়া যায় না। কিন্তু পছন্দ-তত্ত্ব এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, কোন দ্রব্যের দাম কমিবার ফলে পরিবর্তন-প্রভাব যদি ধনাত্মক হয় এবং আয়-প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক ঋণাত্মক হয়, তাহা হইলে ভোগকারী ঐ দ্রব্যটি কম কিনিবে।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য পছন্দবাচক নিরপেক্ষতা-তত্ত্ব পরিমাণ-বাচক উপযোগ-তত্ত্ব হইতে উন্নততর বলিয়া দাবি করা হইলেও অনেকে আবার পছন্দ-তত্ত্বের একাধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

পছন্দবাচক নিরপেক্ষতা-তত্ত্বের সমালোচনা

প্রথমত, অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন, নিরপেক্ষতা-তত্ত্বের নিজস্ব কোন অভিনবত্ব নাই। রবার্টসন, আর্মস্ট্রং প্রভৃতি অর্থবিজ্ঞানিগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, নিরপেক্ষতা-তত্ত্ব উপযোগ-তত্ত্ব ছাড়া নূতন কিছু নহে। মূলত ইহা উপযোগের নূতন অঙ্গসজ্জা। প্রচলিত ধারণা ও সমীকরণের পরিবর্তে ইহা কেবলমাত্র নূতন কয়েকটি ধারণা ও সমীকরণ প্রবর্তন করিয়াছে। উপযোগের পরিবর্তে নিরপেক্ষতা-তত্ত্ব 'পছন্দ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছে। ১, ২, ৩ প্রভৃতি পরিমাণবাচক সংখ্যার (Cardinal number system) দ্বারা উপযোগ পরিমাপ করিবার পরিবর্তে নিরপেক্ষতা-তত্ত্ব ১ম, ২য়, ৩য় প্রভৃতি গুরুত্ব বা স্তরবাচক সংখ্যা (Ordinal number system) দ্বারা ভোগকারীর পছন্দ নির্দেশ করিয়াছে। প্রচলিত প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি বর্জন করিয়া উহার স্থলে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার—এই ধারণাটি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটির পরিবর্তে ক্ষীয়মাণ

প্রান্তিক পরিবর্তনের হার নীতি ব্যবহার করা হইয়াছে। পরিশেষে, নিরপেক্ষতা-তত্ত্বে ভোগকারীর যে ভারসাম্যের শর্ত ধার্য করা হইয়াছে, তাহাও প্রচলিত উপযোগ-তত্ত্বের ভারসাম্যের শর্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নহে। মার্শালীয় উপযোগ-তত্ত্বে ক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত হইল দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং দামের অনুপাত সমান হওয়া চাই। পছন্দ- বা নিরপেক্ষতা-তত্ত্বে ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত হইল, দ্রব্যগুলির প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এবং উহাদের দামের অনুপাত সমান হওয়া চাই। তাহা হইলে বলা চলে যে, নিরপেক্ষতা-তত্ত্বটি প্রচলিত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে নূতন কোন বিশ্লেষণ নহে। ইহা প্রচলিত উপযোগ-তত্ত্বের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন যে, নিরপেক্ষতা-তত্ত্বটি কতকগুলি অবাস্তব শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া একটি দুর্বল তত্ত্ব। এই তত্ত্বের একটি অন্যতম শর্ত হইল যে, ভোগকারী তাহার পছন্দ-সূচী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। ইহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক দ্রব্যের মধ্যে ভোগকারীর নিকট দুইটি দ্রব্যের পছন্দক্রম, পরিবর্তন, মোট উপযোগ, মোট ব্যয়, আয় প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক ধারণা বর্তমান। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাধারণ ক্রেতার মস্তিষ্কে এত বিষয়ে জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নহে।

তৃতীয়ত, নিরপেক্ষতা-রেখার পদ্ধতি দুইটি দ্রব্যের বেলায় ভোগকারীর চাহিদা নির্ধারণে বিশেষভাবে উপযোগী। কিন্তু বাস্তব জীবনে ভোগকারী দুইটির অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। যখন সে দুইটির অধিক দ্রব্যের মধ্যে তাহার আয় ব্যয় করে, নিরপেক্ষতা-মানচিত্র উহার সরলতা হারাইয়া ফেলে। তিনটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ত্রিমাত্রিক মডেলের (three dimensional model) অবতারণা করিতে হয়। উহা বিশ্লেষণকে বিশেষভাবে জটিল করিয়া তোলে। তিনটির অধিক দ্রব্যের বেলায় জ্যামিতিক ব্যাখ্যান একেবারে অকেজো হইয়া পড়ে।

চতুর্থত, উপযোগ-তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ভোগকারী দ্রব্যের যে বিভিন্ন একক ক্রয় করিয়া থাকে, ঐগুলিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলে। কিন্তু গাড়ি, বাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের এককগুলি অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় বিভাজ্য নহে। এইরূপ অবিভাজ্য দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয়ে কি উপযোগ-তত্ত্ব, কি পছন্দ-তত্ত্ব, কোনটিরই উপযোগিতা নাই।

পরিশেষে, উপযোগ-তত্ত্বের মত পছন্দ-তত্ত্বেও ধরিয়া লওয়া হয় যে, ভোগকারীর নিকট কোন দ্রব্যের প্রথম এককের তুলনায় দ্বিতীয় একক কম পছন্দসই বা আকর্ষণীয়। এ অনুমানও বাস্তবসম্মত নহে। যাহার একখানি মোটরগাড়ি আছে তাহার নিকট দ্বিতীয় মোটরগাড়ি কম আকর্ষণীয় হইবে বলা চলে না। যে সকল ব্যক্তি আড়ম্বরপূর্ণ ভোগে আসক্ত (Conspicuous consumption) কিংবা যাহারা ভোগের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করিতে উৎসুক (keen about seeking self-expression in variety), তাহাদের নিকট অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রথম এককের তুলনায় দ্বিতীয় একক অধিক পছন্দসই হয়। এই সকল ব্যক্তির ভোগ বিশ্লেষণে মার্শালের উপযোগ-তত্ত্ব ও পছন্দ-তত্ত্ব দুইই মূল্যহীন।

উপরি-উক্ত ত্রুটি সত্ত্বেও পছন্দ-তত্ত্ব বা নিরপেক্ষতা-রেখা পদ্ধতি অধিকতর বাস্তবধর্মী বলিয়া ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই চাহিদা বিশ্লেষণের একমাত্র হাতিয়ার নহে।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত
(Consumer's Surplus)

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি অধ্যাপক মার্শালের অবদান। কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি প্রধান ভিত্তি হিসাবে তিনি এই ধারণাটি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক অর্থ-তত্ত্বের বিশ্লেষণে ধারণাটির গুরুত্ব বড় একটা স্বীকার করা হয় না।

মার্শাল বলেন, অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারী উদ্বৃত্ত তৃপ্তি লাভ করে: সে যে আর্থিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে তাহা অপেক্ষা তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ করে বেশি। অনেক জিনিস আছে যাহা ক্রয় করিতে ভোগকারী অতিরিক্ত দাম দিতে রাজী থাকে, অথচ যে বাজার দামে জিনিসগুলি সে প্রকৃতপক্ষে কিনিতে পারে উহা অপেক্ষাকৃত কম। জিনিসের এই চাহিদা-দাম (demand price), অর্থাৎ জিনিসটি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবার পরিবর্তে উহা পাইবার জন্য যে দাম দিতে ক্রেতা রাজী থাকে, এবং জিনিসের বাজার-দাম (market price) অর্থাৎ যে দামে জিনিসটি বাজারে ক্রয় করা হয়, এই দুইএর মধ্যে যে পার্থক্য তাহাই ভোগকারীর

ভোগ-উদ্বৃত্ত কাহাকে বলে?

উদ্বৃত্তের অর্থনৈতিক পরিমাপ।[১] মনে কর, কোন ব্যক্তি একখানা খবরের কাগজের জন্য ৫০ পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করিতে রাজী; কিন্তু উহার বাজার দাম ১৮ পয়সা হওয়ায় সে উহা ১৮ পয়সাতেই ক্রয় করিতে পারিল। এখানে ৩২ পয়সা হইল ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাপ। ভোগী যে দাম দিতে রাজী থাকিত এবং যে দাম দিয়া জিনিসটি কিনিয়াছে উহার পার্থক্যই তাহার ভোগ-উদ্বৃত্ত। (Consumer's surplus is the difference between the potential price and the actual price)। এই দুই দামের মধ্যে পার্থক্য যত বেশি হইবে ততই ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণও বাড়িবে, আবার পার্থক্য যত কম হইবে ততই ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণও কমিবে। ভোগীর চাহিদা-দাম ও বাজার-দাম সমান হইলে ভোগকারী কোন উদ্বৃত্ত তৃপ্তি বা সন্তোষ লাভ করিতে পারে না।

অধ্যাপক মার্শাল ভোগ-উদ্বৃত্ত ধারণাটি ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের বিধি হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ক্রেতা একটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ যতই বাড়াইতে থাকে, ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ তাহার নিকট কমিতে থাকিবে। যেমন, একটি কমলালেবু হইতে কোন ক্রেতা যদি ১২ পয়সার উপযোগ লাভ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় কমলালেবু ক্রয় করিলে উহার প্রান্তিক উপযোগ ১২ পয়সা অপেক্ষা কম হইবে। মনে কর, দ্বিতীয় কমলালেবুটি হইতে ক্রেতা ৮ পয়সার উপযোগ লাভ করিল। তৃতীয় একটি কমলালেবু ক্রয় করিয়া ক্রেতা ৬ পয়সার উপযোগ লাভ করিল। সে যদি আর অতিরিক্ত কমলালেবু ক্রয় না করে, তাহা হইলে তৃতীয় কমলালেবুটি তাহার প্রান্তিক ক্রয় (marginal purchase) ধরিতে হইবে। এই প্রান্তিক ক্রয়ের উপযোগ ও বাজার-দাম সমান। প্রান্তিক

ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপের সূত্র

কমলালেবুটি যখন ৬ পয়সায় পাওয়া যায়, অপর দুইটি লেবুর প্রত্যেকটির বাজার-দামও ৬ পয়সা। তাহা হইলে তিনটি কমলালেবুর মোট বাজার-দাম অর্থাৎ উহাদের উপর মোট প্রকৃত ব্যয় হইবে : ৬ × ৩ = ১৮ পয়সা। কিন্তু তিনটি লেবুর মোট

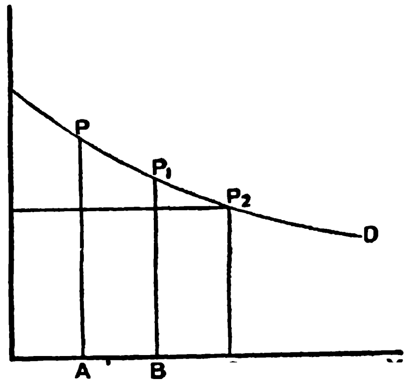
১. Marshall. : "The excess of price which a person would be willing to pay rather than go without the thing, over that which he actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus."

উপযোগ : ১২+৮+৬=২৬ পয়সা। সুতরাং, তিনটি কমলালেবু ক্রয় দ্বারা ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইবে : ২৬−১৮=৮ পয়সা। তাহা হইলে মার্শালের মতানুযায়ী ভোগকারীর উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার সূত্র হইল :

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত=মোট উপযোগ−মোট প্রকৃত ব্যয়
(ক্রয়ের একক সমষ্টি × দাম)

[Consumer's Surplus = Total Utility − Total Expenditure
(number of units purchased × price)]

সূত্রটি নিচের রেখাচিত্র দ্বারাও নির্দেশ করা যায় :



OX অক্ষরেখা দ্বারা দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে এবং OY অক্ষরেখায় দাম ও উপযোগ নির্দেশ করা হইয়াছে। DD হইল ভোগকারীর চাহিদা-রেখা ও ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের রেখা। ভোগকারী তিনটি একক কমলালেবু কিনিয়াছে। প্রথম একক কমলালেবু কিনিয়া মোট উপযোগ লাভ করিল OAPD (=OA × PA) ক্ষেত্রের সমান, দ্বিতীয় একক কিনিয়া মোট উপযোগ লাভ করিল ABP_1P (=$AB \times BP_1$) ক্ষেত্রের সমান এবং তৃতীয় একক লেবু কিনিয়া মোট উপযোগ লাভ করিল BCP_2P_1 (=$BC \times CP_2$) ক্ষেত্রের সমান। অর্থাৎ তিনটি কমলালেবু কিনিয়া সে মোট উপযোগ লাভ করিল OCP_2D ক্ষেত্রের সমান। অপরদিকে তিনটি লেবু কিনিতে সে যে মোট দাম দিল বা মোট

ব্যয় করিল তাহা OCP_2P $(OC \times CP_2)$ ক্ষেত্রের সমান। অতএব ভোগকারীর উদ্বৃত্ত লাভ হইল : OCP_2D ক্ষেত্র $-$ OCP_2P ক্ষেত্র, অর্থাৎ PP_2D ত্রিকোণের সমান।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মার্শাল ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি বিশ্লেষণ করিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন :

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের অনুমিত শর্তাবলী

(ক) উপযোগ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়।

(খ) ক্রেতা জিনিসের বিভিন্ন একক ক্রয় করিলেও তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ একই সমান থাকিবে।

(গ) একটি দ্রব্যের উপযোগ কেবলমাত্র উহার ভোগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, অন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না।

(ঘ) যে দ্রব্যটি ক্রয় করা হইতেছে বাজারে উহার কোন পরিবর্তক (substitutes) নাই। এবং

(ঙ) বাজারে সকল ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত হিসাব করা সম্ভব। বাজারে প্রত্যেকটি ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় দ্বারা যে উদ্বৃত্ত উপযোগ লাভ করে উহা যোগ করিলেই বাজারের মোট ভোগ-উদ্বৃত্ত হিসাব করা যায়।

ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটির সমালোচনা

(Criticism of the Doctrine of Consumer's Surplus)

ভোগ-উদ্বৃত্ত ধারণাটির একাধিক ত্রুটি আছে। বহু দৃষ্টিকোণ হইতে তত্ত্বটিকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

প্রথমত, যে সকল অনুমিত শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া ধারণাটি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে উহারা মোটেই বাস্তবসম্মত নহে। ধারণাটির একটি মূল অনুমিত শর্ত হইল যে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ভোগীর নিকট সকল অবস্থাতেই সমান থাকে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। ভোগী একটি দ্রব্য যতই অধিক পরিমাণ ক্রয় করিতে থাকে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগও তাহার নিকট ততই বাড়িতে থাকে। অর্থের এই প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি মার্শাল তাঁহার হিসাবের মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। ফলে, তাঁহার ভোগ-উদ্বৃত্তের পরিমাণ বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে নাই।

দ্বিতীয়ত, ক্রেতার যে চাহিদা-তালিকা ও চাহিদা-দামের ভিত্তিতে ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা হয় তাহা কাল্পনিক হিসাবমাত্র। যদি একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগানে হঠাৎ টান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার জন্য ক্রেতা কি দাম দিতে রাজী হইবে তাহা সহজে নির্ধারণ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া প্রচলিত বাজার-দাম (customary prices) অপেক্ষা প্রকৃত বাজার-দাম যদি কম-বেশি হয় তাহা হইলেও ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ কবার বাস্তব অসুবিধা আছে।

তৃতীয়ত, জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় এবং কৃত্রিম আবশ্যকীয় দ্রব্যের (conventional necessaries) বেলায় ভোগ-উদ্বৃত্ত অপরিমেয়। অনেক সময় এই সকল দ্রব্যের অভাবে ভোগকারীর চাহিদা-দাম অস্বাভাবিকরূপে বেশি হইতে পারে।

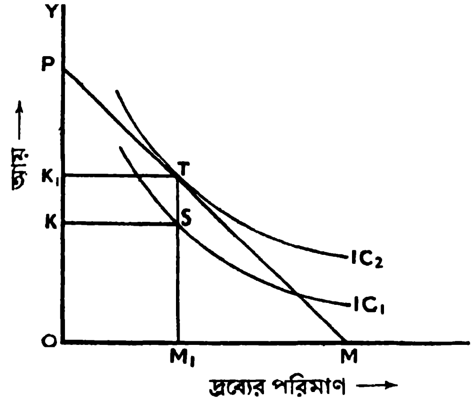
চতুর্থত, পরিবর্তক ও অনুপূরক সামগ্রীর বেলায়ও ভোগ-উদ্বৃত্ত পবিমাপের অসুবিধা আছে। চা-এর পবিবর্তক যদি কফি হয়, তাহা হইলে চায়ের অভাবে কফির উপযোগ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে ; আবার, কফির অভাবে চায়ের চাহিদা-দামও অত্যন্ত বেশি হইবে।

পবিশেষে, বাজারের মোট ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করারও অসুবিধা আছে। বাজারে বিভিন্ন ক্রেতাব আয় বিভিন্ন ; তাহাদের রুচি, আচার-ব্যবহার, অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দও বিভিন্ন। ফলে, একই দ্রব্য ক্রয় করিতে বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা-দামও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। সেইজন্য প্রতিটি ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত যোগ দিয়া বাজারের মোট ভোগ উদ্বৃত্ত হিসাব করার অসুবিধা আছে।

ভোগ-উদ্বৃত্ত ধারণার সংস্কার সাধন
(Rehabilitation of the Doctrine of Consumer's Surplus)

হিকস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ উপযোগের ভিত্তিতে ক্রেতার ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার পদ্ধতি মোটেই বাস্তবসম্মত মনে করেন না। ভোগ-উদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে মার্শাল অর্থের প্রান্তিক উপযোগ যে অপবিবর্তিত থাকে অনুমান করিয়াছেন, সে শর্তটিও তাঁহারা অবাস্তব বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। হিকস্ ভোগ-উদ্বৃত্তকে ক্রেতার অর্থ আয় বৃদ্ধি বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছেন—যাহা কেবল দ্রব্যের দাম কমিবার ফলেই তাহার ভাগ্যে জোটে। নিচের রেখাচিত্রদ্বারা হিকসের ব্যাখ্যা প্রকাশ করা হইল :



উপরের চিত্রে OX অক্ষরেখায় একটি দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে এবং OY অক্ষরেখায় ভোগকারীর আয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে। ভোগকারী যদি তাহার আয় OP দ্বারা X দ্রব্যটি কিনিতে চাহে তাহা হইলে OM পরিমাণ দ্রব্য কিনিলেই তাহার সমস্ত আয় ব্যয় হইয়া যাইবে। মনে কর, ভোগকারী তাহার কিছু আয় হাতে রাখিয়া OM_1 পরিমাণ দ্রব্য কিনিবার জন্য OK পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে রাজী ছিল। সে ক্ষেত্রে সে নিম্নতর উপযোগসম্পন্ন ১নং নিরপেক্ষতা-রেখার উপর থাকিয়া যাইত। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে PK_1 পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া একই পরিমাণ দ্রব্য OM_1 ক্রয় করিল। তাহার বাজেট-রেখা উপযোগসম্পন্ন উচ্চতর ২নং নিরপেক্ষতা-রেখাকে T বিন্দুতে স্পর্শ করিল। এই T বিন্দুর ভার-সাম্যে তাহার অধিক উপযোগ লাভ হইবে। কিন্তু T বিন্দুতেও সে OM_1 পরিমাণ দ্রব্যই কিনিল। অর্থাৎ নিম্নতর নিরপেক্ষতা-রেখায় S বিন্দুতে OM_1 পরিমাণ দ্রব্য না কিনিয়া T বিন্দুতে OM_1 পরিমাণ দ্রব্য কেনাতে তাহার আয় কিছুটা বাঁচিয়া গেল। S বিন্দুতে কিনিতে হইলে তাহার অর্থ ব্যয় হইল PK পরিমাণ, আর T বিন্দু কিনিতে তাহার অর্থ ব্যয় হইল PK_1 পরিমাণ। তাহার K_1K পরিমাণ $(=PK-PK_1)$ ব্যয় বাঁচিয়া গেল। ফলে, ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ হইল $KSTK_1$ ক্ষেত্রফলের সমান।

ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত ধারণাটির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিকগত গুরুত্ব

(Theoretical and Practical Importance of the Doctrine of Consumer's Surplus)

ভোগকারীর উদ্বৃত্তের ধারণাটি আধুনিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে অনেকেই বর্জন করিয়াছেন। কিন্তু অর্থবিদ্যার তত্ত্বহিসাবে এবং ব্যবহারিক জীবনের উপযোগিতার দিক হইতে ধারণাটির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমত, এই তত্ত্বটি জিনিসের ব্যবহার মূল্য (value-in-use) এবং উহার বাজার মূল্যের (value-in-exchange) পার্থক্য বিশেষভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে। সকল দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য এক নহে। লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবহার উপযোগ খুব বেশি, কিন্তু উহাদের বাজার-মূল্য অত্যন্ত কম। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া ভোগকারী খুব বেশি পরিমাণ ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ করে। এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে সে যে অর্থ ব্যয় করে সেই তুলনায় উহারা তৃপ্তি বা সন্তোষ প্রদান করে অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে এই ধারণাটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। একচেটিয়া ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভের জন্য সর্বোচ্চ সম্ভব দাম ধার্য করে না।' কেন না, সর্বোচ্চ সম্ভব দাম ধার্য করিলে ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ মোটেই সম্ভব হয় না। যদি একচেটিয়া বাজার-দাম খুব উচ্চ স্তরে ধার্য করা হয় এবং তাহার ফলে ক্রেতাগণের উদ্বৃত্ত একেবারেই অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাগণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। সে অবস্থায় একচেটিয়া কারবার বিঘ্নিত হইবার ভয় আছে। সেইজন্য একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ভোগকারীর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এমনভাবে বাজার দাম নির্ধারণ করা উচিত যাহাতে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত লাভ বেশি পরিমাণে বিনষ্ট না হয়।

তৃতীয়ত, সরকারের আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় ভোগ-উদ্বৃত্তের ধারণাটির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। সরকার যখন কোন দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করে তখন ঐ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। কর ধার্যের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়িলে ভোগকারিগণের ভোগ-উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইবে। সুতরাং, সরকারের

বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল কর স্থাপন করা উচিত যাহাতে একদিকে উহারা সরকারের রাজস্ব-বৃদ্ধির সহায়তা করে, অন্যদিকে ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ কমাইয়া না দেয়।

চতুর্থত, দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত দ্বারা পরিমাপ করা যায়। একটি দেশ অপর দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য সাধারণত অধিক দামে আমদানি করিয়া থাকে উহা যদি অপেক্ষাকৃত সস্তাদামে ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ঐ দেশের ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ হইবে।

পঞ্চমত, কল্যাণধর্মী অর্থবিদ্যায় (Welfare Economics) এই ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগিতা যথেষ্ট। যাহাতে সমাজের সমষ্টিগত ভোগতৃপ্তি সর্বাধিক পরিমাণে লাভ করা যায় অর্থবিদ্যার উহাই লক্ষ্যস্থল। সমাজের পণ্য যোগান ও মূল্য এমন ভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে ভোগকারীর ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া উৎপাদক শ্রেণীর লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি না পায়। কল্যাণকামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি হইবে ভোগীর সর্বোচ্চ সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত লাভের ব্যবস্থা করা।

পরিশেষে, তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণেও ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। যদি একই সময়ে দুইটি দেশের অধিবাসিগণের কিংবা বিভিন্ন সময়ে একই দেশের অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে বিচারের অন্যতম মাপকাঠি হইবে সংশ্লিষ্ট অধিবাসিগণের আপেক্ষিক ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ। অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে একই সময়ে দুই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে যে দেশের অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভোগ-উদ্বৃত্ত লাভ করে সেই দেশের অধিবাসিগণেরই আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নততর। সেইরূপ আবার একই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে যে সময়ের অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত বেশি উদ্বৃত্ত লাভ করিয়া থাকে তাহারাই অন্য সময়ের অধিবাসিগণের তুলনায় উন্নততর আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার অধিকারী হইয়া থাকে।

প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

1. Define the concepts of "indifference curve" and "indifference map" of a consumer. Analyse the equilibrium of a consumer spending a given amount of money income on two commodities with a fixed-ratio.

ভোগকারীর "নিরপেক্ষতা-রেখা" ও "নিরপেক্ষতা-মানচিত্র" ধারণা দুইটির সংজ্ঞা দাও। দামের স্থির নির্দিষ্ট অনুপাতসম্পন্ন দুইটি দ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট আয়ের পরিমাণ ব্যয় করিতেছে এমন একজন ভোগকারীর ভারসাম্য অবস্থা বিশ্লেষণ কর। [পৃঃ ৮৬-৮৯ ; ১০০-১০২]

2. A consumer has a given money income and can buy two goods at fixed prices. Draw a diagram showing his equilibrium position. Show also the equilibrium position after (a) a decrease in his money income and (b) increase in the price of one of the goods.

জনৈক ভোগকারীর একটি নির্দিষ্ট আর্থিক আয় আছে এবং নির্দিষ্ট দামে দুইটি দ্রব্য কিনিতে পারে। তাহার ভারসাম্য অবস্থা দেখাইয়া একটি রেখাচিত্র অঙ্কন কর। তাহার (ক) আয় কমিলে এবং (খ) একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে তাহার ভারসাম্য অবস্থা কিরূপ হইবে দেখাও।

[পৃঃ ১০০-১০২, ১০৪-১০৫, ১০৯-১১০]

3. If the consumer is at a point on his consumption possibility line where it crosses an indifference curve, explain why he cannot have reached equilibrium and which way would he move ?

যদি কোন ভোগকারী তাহার ভোগ সম্ভাবনা রেখাকে যেখানে তাহার নিরপেক্ষতা-রেখা ছেদ করিতেছে এমন একটি বিন্দুতে অবস্থান করে, তাহা হইলে সে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে না কেন তাহা ব্যাখ্যা কর এবং সে কোন্ দিকে যাইবে তাহা বল। [পৃঃ ৯৮-১০৪]

৭

চাহিদা-রেখা
(Demand Curve)

চাহিদার অর্থ
(Meaning of Demand)

দ্রব্য ও সেবাকার্যের চাহিদা আসে ভোগকারীর নিকট হইতে। প্রতিদিন বাজারে দ্রব্য ও সেবাকার্য ক্রয় করে বিভিন্ন পরিবার (household) অথবা উহাদের প্রতিনিধিগণ। পরিবারই ভোগের একক (consuming unit)। পরিবারের চাহিদা বলিতে শুধু দ্রব্যসংগ্রহ বা দ্রব্য পাইবার ইচ্ছা বুঝায় না। পরিবারের দ্রব্য সংগ্রহ করিবার মত অর্থ-মূল্য দিবার ইচ্ছা ও শক্তি থাকা চাই। দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ইচ্ছার সহিত বিনিময়-মূল্য প্রদানের সামর্থ্য যদি ভোগকারী পরিবারের থাকে তাহা হইলে উহাকে অর্থবিদ্যায় চাহিদা বলা হয়। ভোগকারী দ্রব্য চাহে তাহার কারণ উহার উপযোগ আছে। তাহার কাছে দ্রব্যটির উপযোগ আছে বলিয়াই সে যখন উহা চাহে বা ক্রয় করে, তখন উহার জন্য অর্থব্যয় করিতে রাজী হয়। সুতরাং, ভোগকারীর চাহিদা অর্থই কোন নির্দিষ্ট দামে একটি দ্রব্য বা 'সেবাকার্যের চাহিদা বুঝায়। ভোগকারী একটি দ্রব্যের কতটা পরিমাণ চাহিবে তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির বাজার দামের উপর। কিন্তু চাহিদা কেবলমাত্র বাজার দামের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে। ইহা সময়ের সহিতও সম্পর্কযুক্ত। দ্রব্যের চাহিদা একদিনে, না এক সপ্তাহে, না এক মাসে তাহা প্রকাশ করিতে হয়।

সুতরং চাহিদা বলিতে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, চাহিদা বলিতে বুঝায় ভোগকারী দ্রব্যটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ও উহার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, চাহিদার অর্থ ভোগকারী নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে প্রস্তুত। তৃতীয়ত, চাহিদা বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবাকার্যের চাহিদা বুঝাইয়া থাকে। চাহিদা সম্পর্কে এই তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখিলে আমরা এইভাবে উহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে করিতে পারি: কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারী বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে

একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহাই ঐ দ্রব্যের চাহিদা।[১]

চাহিদা-সূচী ও চাহিদা-রেখা
(Demand Schedule and Demand Curve)

চাহিদা বলিতে বিশেষ দামে চাহিদার পরিমাণকে বুঝায়। আবার, চাহিদা সময়ের সহিতও সম্পর্কিত। দাম-নিরপেক্ষ বা সময়-নিরপেক্ষ চাহিদা সম্পূর্ণ অর্থহীন। চাহিদা বলিতেই দাম ও সময় উল্লেখ করিতে হয়। ভোগকারী কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ বিভিন্ন দামে কিনিতে প্রস্তুত থাকিতে পারে। যেমন, রাম ১ কিলোগ্রাম চা ১২৲ টাকায় কিলোপ্রতি কিনিতে পারে; কিলোপ্রতি ১০৲ টাকায় ২ কিলো এবং কিলোপ্রতি ৮৲ টাকায় ৩ কিলো কিনিতে রাজী থাকিতে পারে। এইভাবে রাম বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ চা কিনিতে পারে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। এই তালিকাকে রামের চাহিদা-সূচী বলা হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিমাণ কিনিতে চাহে তাহাকেই ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী (Individual Demand Schedule) বলিয়া নির্দেশ করা হয়। নিচের সারণীতে কাল্পনিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করিয়া একটি ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর উদাহরণ দেওয়া হইল :

ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী

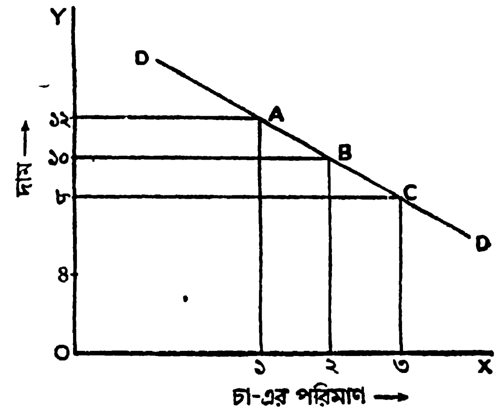
কিলোপ্রতি চা-এর দাম	রামের ক্রয়ের পরিমাণ
১৮৲ টাকা	১ কিলোগ্রাম
১০৲ টাকা	২ কিলোগ্রাম
৮৲ টাকা	৩ কিলোগ্রাম
৬৲ টাকা	৪ কিলোগ্রাম

১ Benham : "The demand for anything, at a given price, is the amount of it which will be bought per unit of time at that price."

চাহিদা-সূচী হইতে দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্ক ধরা পড়ে। উপরের কাল্পনিক চাহিদা-সূচী হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে, ভোগকারী কোন দ্রব্যের দাম কমিলে উহা বেশি পরিমাণে কিনিবে, আর উহার দাম বাড়িলে কম পরিমাণে কিনিবে। যেমন ১২৲ টাকায় ভোগকারী ১ কিলো চা ক্রয় করে, কিন্তু ১০৲ টাকাতে সে ২ কিলো চা কিনিতে রাজী:

ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা

ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর ভিত্তিতে ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা (Individual Demand curve) অঙ্কন করা যায়। চাহিদা-রেখা আর কিছুই নহে, ইহা চাহিদা-সূচীর একটি ছবি বা চিত্র। নিচে রামের চা-এর চাহিদা-সূচী রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল:



উপরের রেখাচিত্রে OX অক্ষরেখা দ্বারা চা-এর চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষদ্বারা দাম নির্দেশ করা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, ক্রেতা ১২৲ টাকা, ১০৲ টাকা ও ৮৲ টাকা দামে যথাক্রমে ১ কিলো, ২ কিলো ৩ কিলো চা ও কিনিতে রাজী আছে। এখন A, B ও C বিন্দুগুলি যোগ করিলে রামের চাহিদা-রেখা D D পাওয়া যাইবে। ইহাই ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা। চাহিদা-রেখা বাম দিক হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখে ঢালু হইয়া নামে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, চা-এর দাম যতই কমিতে থাকিবে, ক্রেতা আরও বেশি পরিমাণে চা কিনিতে রাজী থাকিবে। চাহিদা-রেখায়

A B ও C বিন্দুগুলি বিভিন্ন দাম ও দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়া থাকে। চাহিদা-রেখা হইতে আমরা যে কোন দাম ধরিয়া বলিতে পারি ঐ দামে কতটা পরিমাণ দ্রব্য ভোগকারী কিনিতে রাজী হইবে। আবার, দ্রব্যটির যে কোন চাহিদার পরিমাণ ধরিয়া লইয়া বলা যায়, ভোগকারী কি দামে উহা ক্রয় করিবে। এইজন্য চাহিদা-রেখাকে দাম-পরিমাণ রেখাও (price-quantity curve) বলা চলে। কি দামে, কতটা পরিমাণে দ্রব্যের চাহিদা হইবে তাহার সম্পর্ক দাম-পরিমাণ রেখা নির্দেশ করিয়া থাকে।

বাজার চাহিদা-সূচী

ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী হইতে বাজার চাহিদা-সূচী (Market Demand Schedule) প্রস্তুত করা যায়। বাজারের প্রত্যেক ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর সমষ্টি গ্রহণ করিলেই বাজার চাহিদা-সূচী পাওয়া যায়। মনে কর, বাজারে কোন দ্রব্যের A, B, C ও D বলিয়া চারিজন মাত্র ক্রেতা আছে। ধরা যাক ৫৲ টাকা দামে উহারা যথাক্রমে ২, ৫, ৩ এবং ৮ কিলো দ্রব্য কিনিয়াছে। তাহা হইলে ৫৲ টাকা দামে মোট চাহিদা হইবে ১৮ কিলো। এইভাবে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে A, B, C ও D-এর ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ণয় করিয়া বাজারের চাহিদা-সূচী নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন দামে বাজারের প্রত্যেকটি ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা যোগ করিলেই বাজার চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করা যায়। 'এই সূচী হইতে জানা যায়, বাজারের সকল ভোগকারিগণ কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে একটি দ্রব্যের কতটা পরিমাণ কিনিতে ইচ্ছুক।

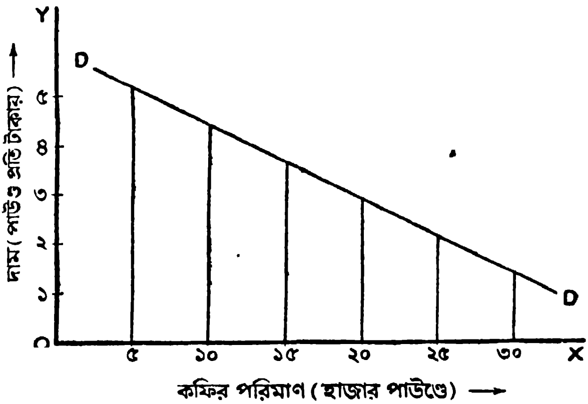
বাজার চাহিদা-সূচী প্রণয়নের আর একটি পদ্ধতি আছে। বাজারের একজন গড় বা প্রতিনিধিমূলক ভোগকারীর ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচী প্রস্তুত করিয়া উহাকে বাজারের সকল ভোগকারীর সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে বাজার চাহিদা-সূচী পাওয়া যায়। অবশ্য এইভাবে চাহিদা-সূচী প্রণয়ন করিতে হইলে বাজারের বিভিন্ন ক্রেতার মধ্যে আয়, রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ও অপছন্দ প্রভৃতি সম্পর্কে যে পার্থক্য আছে তাহা অবজ্ঞা করিতে হইবে। মনে কর, একজন গড বা প্রতিনিধিমূলক ভোগকারী প্রতি ৫৲ টাকা দামে ১ পাউণ্ড কফি কিনিবে, পাউণ্ড প্রতি ৪'৫০ টাকায় ২ পাউণ্ড কিনিবে ইত্যাদি। ধরা যাক, বাজারে ৫০০০ ভোগকারী বা ক্রেতা

আছে। তাহা হইলে পাউণ্ড প্রতি ৫৲ টাকা দামে মোট বাজার চাহিদা হইবে ৫০০০ পাউণ্ড, এবং পাউণ্ড প্রতি ৪'৫০ টাকা দামে মোট বাজার চাহিদা হইবে ১০,০০০ পাউণ্ড। নিচের সারণীতে একটি কাল্পনিক বাজার চাহিদা-সূচীর উদাহরণ দেওয়া হইল :

পাউণ্ড প্রতি কফির দাম (টাকায়)	কফি ক্রয়ের পরিমাণ (পাউণ্ডে)
৫.০০	৫,০০০
৪'৫০	১০,০০০
৪'০০	১৫,০০০
৩.৫০	২০,০০০
৩'০০	২৫,০০০
২'৫০	৩০,০০০

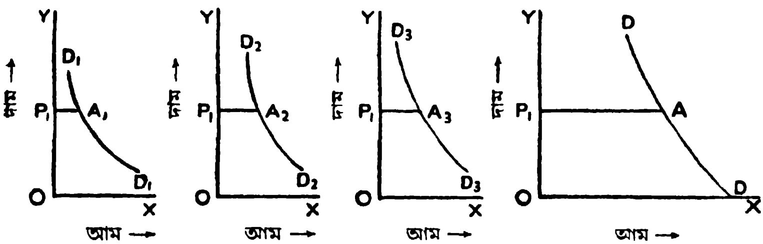
এই সারণীতে প্রদত্ত বাজার চাহিদার ভিত্তিতে নিচে বাজার চাহিদা-রেখা (Market Demand Curve) অঙ্কন করা হইল। বাজার চাহিদা-রেখা বাজার চাহিদা-সূচীর ছবি বা চিত্ররূপ। বাজার চাহিদা-রেখা বলিতে বাজারের বিভিন্ন ক্রেতাগণের ব্যক্তিগত চাহিদা-সূচীর সমষ্টি বুঝাইয়া থাকে।

বাজার চাহিদা-রেখা



লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার ন্যায় বাজার চাহিদা-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখে ঢালু হইয়া নামে। বাজার চাহিদা-রেখাকে শিল্প চাহিদা-রেখাও (Industry Demand Curve) বলা চলে। ইহাকে শিল্প চাহিদা-রেখা বলা চলে এই অর্থে যে, ইহা একটি শিল্পের উৎপাদিত সকল দ্রব্যের জন্য বাজারের সকল ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার যোগফলকে বুঝাইয়া থাকে।

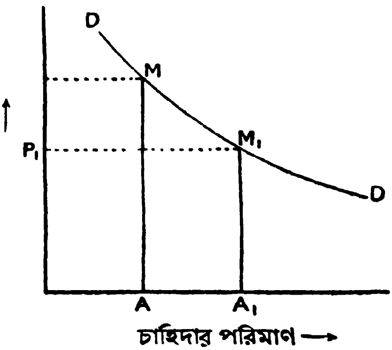
বাজারের সকল ভোগকারীর ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পাশাপাশি (laterally) যোগ করিয়াও বাজার চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা যায়। ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা কি ভাবে পাশাপাশি যোগ করা যায়, নিচের চিত্রে তাহা দেখানো হইল :



উপরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চিত্র যথাক্রমে D_1D_1, D_2D_2 ও D_3D_3 তিনজন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা। আমের দাম যখন OP_1 এখন প্রথম ক্রেতা P_1A_1, দ্বিতীয় ক্রেতা P_1A_2 এবং তৃতীয় ক্রেতা P_1A_3 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে। এখন বাজারে যদি মোট তিনজন মাত্র ক্রেতা থাকে তাহা হইলে বাজারে আমের মোট চাহিদার পরিমাণ হইবে : $P_1A_1 + P_1A_2 + P_1A_3$-এর যোগফল। চতুর্থ চিত্রে OP_1 দামে বাজারের মোট চাহিদা P_1A দেখানো যায়। মোট চাহিদা P_1A হইল P_1A_1, P_1A_2 ও P_1A_3-এর সম্মিলিত যোগফলের সমান। A বিন্দুর মধ্য দিয়া যে DD চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায় উহাই বাজার চাহিদা রেখা। ইহা D_1D_1, D_2D_2 ও D_3D_3—এই তিনটি ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখার পাশাপাশি যোগফল।

চাহিদার বিধি
(Law of Demand)

ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা ও বাজার চাহিদা-রেখা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দ্রব্যের দাম ও উহার চাহিদার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ককে ক্রিয়াগত সম্পর্ক (functional relation) বলা হয়। সম্পর্কটি হইল এই : কোন নির্দিষ্ট সময়ে, অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহার চাহিদার পরিমাণ কমে, আবার, দাম কমিলে উহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে। অর্থাৎ দামের যে দিকে পরিবর্তন হয়, চাহিদার পরিবর্তন হয় তাহার বিপরীত দিকে। ইহাকেই চাহিদার নিয়ম বা বিধি বলা হয়। চাহিদার বিধিটি চাহিদার গতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেয়—দাম কমিলে চাহিদা কোন্‌দিকে যায়, আবার দাম বাড়িলেই বা চাহিদা কোন্‌দিকে যায় চাহিদার বিধি সেই সন্ধান দেয়। কিন্তু দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ কতটা অনুপাতে বাড়ে, কিংবা দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কতটা অনুপাতে কমে তাহার উল্লেখ চাহিদাব নিয়মে পাওয়া যায় না। নিচে রেখাচিত্রের দ্বারা চাহিদার বিধি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল।



চিত্রে OX অক্ষরেখায় চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় দাম নির্দেশ করা হইয়াছে। OP দামে চাহিদার পরিমাণ OA হইয়াছে। দাম কমিয়া OP_1 হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া OA_1 পরিমাণে দাঁড়াইয়াছে। এখন M ও M_1 বিন্দু দুইটিকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে *DD* চাহিদা-রেখা পাওয়া যাইবে। এই রেখা ইহাই বুঝায় যে, দাম যখন কমে, তখন ভোগকারীর চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, আর দাম যখন বাড়ে, তখন তাহাব চাহিদার পরিমাণ কমে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণে যখন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তখন ক্রেতার চাহিদা-রেখার কোন স্থান পরিবর্তন হয় না। সে একই চাহিদা-রেখার উপর থাকিয়া জিনিসটির

দাম যখন বেশি হয়, তখন উহা কম পরিমাণে কেনে, আবার জিনিসটির দাম যখন কম হয়, তখন উহা বেশি পরিমাণে কেনে। জিনিসটির দাম বাড়িলে ক্রেতা চাহিদা-রেখার উপরেব দিকে উঠে, আর দাম কমিলে একই রেখার নিচেব দিকে নামে। এইভাবে ক্রেতা যখন একই চাহিদা-রেখার উপর থাকিয়া জিনিসটির কম পবিমাণ কেনে, তখন উহাকে চাহিদার সঙ্কোচন বলে (Contraction of Demand or Decrease in the quantity demanded), আবার যখন বেশি পরিমাণ কেনে, তখন উহাকে চাহিদার সম্প্রসাবণ (Expansion of Demand or Increase in the quantity demanded) বলা হয়।

চাহিদার বিধিটি নির্দেশ করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য অবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা পরিমাণের বিপরীত পবিবর্তন ঘটে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে—ইহার অর্থ এই যে, বিধিটি কতকগুলি অনুমিত শর্তের উপর নির্ভরশীল। এই শর্তগুলি হইল :

চাহিদা-বিধির অনুমিত শর্তাবলী

(ক) ভোগকারিগণের আর্থিক আয় একই সমান থাকিবে, (খ) ভোগকারিগণের অভ্যাস, রুচি, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকিবে, (গ) বাজারে ভোগকারিগণের সংখ্যাব কোন পরিবর্তন হইবে না, এবং (ঘ) অন্যান্য দ্রব্যের দামে হ্রাস-বৃদ্ধি না ঘটে। এই অনুমানগুলি মানিয়া লইলে বিধিটি কার্যত সত্য হইবে।

চাহিদার রেখা ডান দিকে নিম্নমুখী কেন ?
(Why does the demand curve slope downwards to the right ?)

চাহিদা-রেখার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা বামদিক হইতে দক্ষিণে ও নিচের দিকে ঢালুভাবে নামিতে থাকে। চাহিদা-রেখার ঢাল ঋণাত্মক (The demand curve has a negative slope)। ইহার কারণ কি সন্ধান করিতে গেলে আমাদের দেখিতে হইবে, চাহিদা-বিধিটির পশ্চাতে কি কি শক্তির প্রভাব আছে। সহজ কথায় আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, কেন দাম কমিলে ভোগকারী দ্রব্যের পরিমাণ বেশি কিনিতে চাহে, আবার দাম বাড়িলেই বা সে কেন কম পরিমাণ কিনিতে

চাহে। এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে :

(১) **প্রান্তিক উপযোগের হ্রাস :** অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে ক্রেতা একটি দ্রব্যেব যতই অতিরিক্ত পরিমাণ কিনিবে ততই উহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকিবে। প্রত্যেক ভোগকারীব লক্ষ্য, তাহার আয় এমনভাবে ব্যয় করা যাহাতে সে ভোগ হইতে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করিতে পাবে। সে সর্বাধিক উপযোগের অবস্থায় তখনই পৌঁছিতে পারে যখন দ্রব্যেব দাম ও প্রান্তিক উপযোগেব অনুপাত পবস্পব সমান হয়। সে সেই পরিমাণ দ্রব্য কেনে যে পবিমাণ কিনিলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হয। দ্রব্যেব দাম যদি কমে তাহা হইলে তাহাকে বেশি পরিমাণ দ্রব্যটি কিনিয়া দাম ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে সমান অনুপাত বজায় রাখিতে হয়। সেইজন্য দাম কমিলে দ্রব্যের চাহিদার পবিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেইরূপ দাম যদি আবাব বাডে তাহা হইলে কম পবিমাণ দ্রব্য কিনিলে দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমানুপাতিক হইয়া থাকে। সেইজন্য দাম বাডিলে ভোগকারীর নিকট দ্রব্যটির চাহিদাব পবিমাণ কমে।

(২) **আয়-প্রভাব :** কোন দ্রব্যেব দাম কমিলে ক্রেতার আয় বাড়িয়াছে বলা চলে। আবাব দাম বাডিলে ক্রেতাব আয কমিযাছে বলা চলে। ইহাকে দামের আয় প্রভাব বলে। মনে কর, বাজারে মাছেব দাম যদি ৬৲ টাকা কিলো হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি ২ কিলো মাছ কেনে। আবাব ঐ দাম যদি নামিয়া ৫৲ টাকা কিলো হয়, তাহা হইলে ২ কিলো মাছ কিনিলে তাহার ২টি টাকা বাঁচিয়া যায়। এই ২৲ টাকার কিছুটাও যদি ঐ ব্যক্তি অতিরিক্ত মাছ ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে মাছের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অন্যদিকে দ্রব্যের দাম বাড়িলে, যখন ক্রেতার আয় কমে, তখন তাহার চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

(৩) **পরিবর্তন-প্রভাব :** কোন একটি দ্রব্যের যদি দাম কমে, আর অন্যান্য দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে ক্রেতাগণ স্বভাবতই চড়া দামের দ্রব্যটি কম পরিমাণে কিনিবে এবং সস্তা দামের দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে কিনিবে। যেমন, কলার তুলনায় যদি কমলালেবুর দাম সস্তা হয়, তাহা হইলে ভোগকারিগণ কমলালেবুই অধিক সংখ্যায় ক্রয় করিবে।

এইভাবে সস্তা দামের দ্রব্যটির পরিমাণ অধিক ক্রয়ের ফলে উহার চাহিদা সম্প্রসারিত হইবে। অন্যদিকে, অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় একটি দ্রব্যের দাম যদি চড়া হয়, তাহা হইলে ঐ চড়া দামের দ্রব্যটির চাহিদার সঙ্কোচন হইবে।

(৪) **আর একটি প্রভাব :** দ্রব্যের দাম কমিলে আর এক প্রকারে চাহিদার পরিমাণ বাড়িতে পারে। পূর্বে দাম বেশি থাকার দরুণ যাহারা ক্রয় করিতে পারিত না, দ্রব্যটির দাম সস্তা হওয়ায় তাহারাও এখন উহা কিনিতে পারিবে। ফলে চাহিদার সম্প্রসারণ হইবে। অপর পক্ষে, দ্রব্যটির দাম যদি আগের চেয়ে বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আগেকার ক্রেতারা অনেকে উহা কিনিতে পারিবে না। ফলে, চাহিদার সঙ্কোচন হইবে।

চাহিদার বিধির ব্যতিক্রম
(Exceptions to the Law of Demand)

চাহিদার বিধিটি সাধারণভাবে কার্যকর হইলেও অনেক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় চাহিদা-রেখা ডানদিকে ঢালুভাবে না নামিয়া দক্ষিণে ও উপরের দিকে উঠিতে পারে। তখন চাহিদা-রেখার ঢাল ঋণাত্মক (negative) না হইয়া ধনাত্মক (positive) হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদার বিধিটি খাটে না এবং ঐ রেখার ঢাল নিম্নমুখী না হইয়া উর্ধ্বমুখী হইতে দেখা যায়।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চাহিদা-রেখা নিম্নমুখী না হইয়া উর্ধ্বমুখী হয়?

প্রথমত, চাহিদার বিধিতে অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, যদি অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে দাম কমিলে চাহিদার সম্প্রসারণ হইবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার সঙ্কোচন হইবে। কিন্তু এই অনুমান বাস্তবসম্মত নহে। ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন, তাহার অভ্যাস, রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, বাজারে নূতন পরিবর্তক সামগ্রীর অবির্ভাব প্রভৃতির জন্যও চাহিদার সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন হইতে পারে। এই সকল অবস্থার যে কোনটির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন দাম পরিবর্তনের বিপরীতমুখী না হইয়া একই দিকে ঘটিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের বেলায় দাম বাড়িলেও চাহিদার

পরিমাণ না কমিয়া বরং বাড়িয়া থাকে। যেমন, দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, মোটরগাড়ি, মূল্যবান গহনা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্যের ভোগকে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ ভোগ (conspicuous consumption) বলা হয়। এই সকল দ্রব্যের দাম বাড়িলে উহারা বেশি পরিমাণে বিক্রয় হয় তাহার কারণ এই যে, এই সকল দ্রব্য যাহারা ভোগ করে তাহাদের নিকট উহাদের দাম বাড়িলে উহাদের মর্যাদাও যেন বাড়িয়া যায়। যাহারা এই সকল দ্রব্য কেনে তাহারা উহাদের অধিক দামে কিনিতে পারিয়াছে বলিয়া যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং গর্বভরে অপরকে দেখায়। এই সকল দ্রব্যের দাম সস্তা হইলে উহাদের ভোগের পরিমাণ আবার কমিয়া যায়।

তৃতীয়ত, চাহিদার নিয়মে আমরা দেখি যে, কোন জিনিসের দাম কমিলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়ে। তাহার ফলে সে ঐ জিনিসটি অধিক পরিমাণে কিনিতে রাজী হয়। কিন্তু তাহার আয় বাড়াব পর উহা যদি তাহার কাছে নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior goods) বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দ্রব্যটির দাম কমা সত্ত্বেও উহার চহিদার পরিমাণ না বাড়িয়া কমিয়া যাইবে।

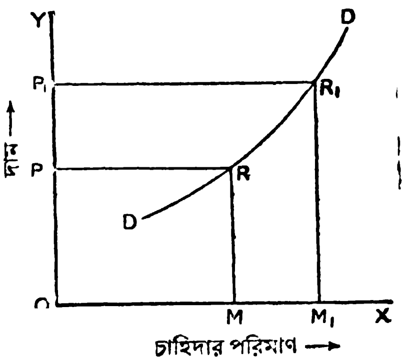
চতুর্থত, কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্য আছে যাহাদের বেলায় চাহিদার নিয়মটি খাটে না। অতি দরিদ্রশ্রেণীর ক্রেতাদের নিকট চাল, ডাল, নুন, আলু, তেল ইত্যাদি জিনিসগুলির ক্ষেত্রে দাম বাড়িলে ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আর দাম কমিলে ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায়। এই সকল দ্রব্যকে গিফেন দ্রব্য (Giffen goods) বা বিশেষ ধরনের নিকৃষ্ট দ্রব্য (a special kind of inferior goods) বলা হয়। স্যর রবার্ট গিফেন (Sir Robert Giffen) প্রথম এই ধরনের দ্রব্যের অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিগণ আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও (আয়ারল্যাণ্ডে আলু একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য), মাংস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সস্তা দ্রব্য বেশি না কিনিয়া অধিক পরিমাণে আলু কিনিতে বাধ্য হইয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই দরিদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিগণ, যখন চাল, ডাল, আলু, নুন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায়, তখন বাধ্য হইয়া মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি সামান্য উৎকৃষ্টতর দ্রব্যের ক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় এবং সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া অধিক মূল্যে প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যাদি

ক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে যখন সামান্য নিকৃষ্টতর আবশ্যকীয় আহার্য দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে দাম কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমিয়া যায় তখন দামের এই অস্বাভাবিক প্রভাবকে 'গিফেন প্রতিক্রিয়া' (Giffen effect) বলা হয়। দামের এইজাতীয় অস্বাভাবিক প্রভাব তখনই দেখা যায়, যখন ঋণাত্মক আয়-প্রভাব অধিক শক্তিশালী হইয়া (negative income effect) ধনাত্মক পরিবর্তন-প্রভাবকে (positive substitution-effect) ছাড়াইয়া যায়।

পঞ্চমত, অনেক ক্রেতা আছে যাহারা ভোগ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে অক্ষম। তাহাদের নিকট দ্রব্যের দামই উহার গুণাগুণের নির্দেশক। দ্রব্যটির দাম চড়া হইলে তাহারা মনে করে উহা উৎকৃষ্ট ; আবার, দাম সস্তা হইলে মনে করে দ্রব্যটি নিকৃষ্টতর। এই সকল ক্রেতার ক্ষেত্রে দাম বাড়িলে চাহিদার সম্প্রসারণ হয়, আর দাম কমিলে চাহিদার সঙ্কোচন ঘটে।

পরিশেষে, প্রত্যাশিত দাম বা আয়ের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন ঘটিতে পারে। ক্রেতা যদি আশঙ্কা করে যে, ভবিষ্যতে জিনিসের দাম আরও বাড়িবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃত আয় কমিবে, তাহা হইলে বর্তমানে জিনিসের দাম বাড়িলেও সে উহা বেশি পরিমাণে ক্রয় করিবে। সেইরূপ, সে যদি মনে করে যে, ভবিষ্যতে জিনিসের দাম কমিবে অর্থাৎ তাহার প্রকৃত আয় বাড়িবে, তাহা হইলে বর্তমানে জিনিসের দাম কমিলেও সে জিনিসটি বেশি পরিমাণে ক্রয় করিবে না।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাম বাড়িবার ফলে চাহিদার পরিমাণও বাড়িয়া থাকে ; আবার, দাম কমিবার ফলে চাহিদার পরিমাণও কমিয়া থাকে। সেইজন্য চাহিদার সাধারণ নিয়মটি খাটে না এবং চাহিদা-রেখা উপর হইতে ডানদিকে নিচে না নামিয়া নিচু থেকে ডানদিকে উপরে উঠিয়া থাকে। পার্শ্বে এইরূপ ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা হইল



যখন দাম OP অথবা MR ছিল তখন চাহিদার পরিমাণ ছিল OM। অর্থাৎ কম দামে চাহিদার পরিমাণও কম ছিল। যখন দাম বাড়িয়া OP_1 অথবা M_1R_1 হইল তখন চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া OM_1 হইল। R ও R_1 বিন্দু দুইটিকে যোগ করিলে DD চাহিদা রেখা পাওয়া যাইবে। DD চাহিদা-রেখার ঢাল ধনাত্মক।

চাহিদার পরিবর্তনের কারণ ঃ চাহিদার নির্ধারকসমূহ

(Causes of changes in Demand : Determinants of Demand)

দ্রব্য ও সেবাকার্যের চাহিদা নিম্নলিখিত একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই বিষয়গুলিই চাহিদা পরিবর্তনের কারণ, আবার চাহিদার নির্ধারকও বটে।

(ক) **দ্রব্যের দাম ঃ** দ্রব্য বা সেবাকার্যের দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার চাহিদা কম-বেশি হইয়া থাকে। দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম কমিয়া গেলে সাধারণত চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, আবার দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে। কোন কিছুর চাহিদার পরিমাণ উহার দামের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কীত।

কিন্তু দ্রব্য বা সেবাকার্যের দাম যদি স্থিরও থাকে, তাহা হইলেও অনেক কারণে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে। এই সকল কারণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ

(খ) **ক্রেতার আয় ঃ** যদি ভোগকারীর আয় বাড়ে তাহা হইলে চাহিদাও সাধারণত বাড়িয়া থাকে, আবার আয় কমিলে চাহিদাও কমিতে পারে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন দ্রব্য যদি ক্রেতার নিকট নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উহার চাহিদা বাড়িবে না।

(গ) **জনসংখ্যা ঃ** দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিও চাহিদাকে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে ভোগকারীর চাহিদা সম্প্রসারিত হয়। আবাব জনসংখ্যা কমিলে ভোগকারীর সংখ্যা কমিয়া পণ্যের চাহিদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

(ঘ) **পরিবর্তক পণ্যের দাম ঃ** কোন দ্রব্যের পরিবর্তক পণ্যের দাম যদি উঠা-নামা করে, তাহা হইলে দ্রব্যটির চাহিদার সম্প্রসারণ-সঙ্কোচন

ঘটিতে পারে। রেডিও যদি গ্রামোফোনের পরিবর্তক হয়, আর রেডিওর বাজার দাম অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়, তাহা হইলে ভোগকারিগণ গ্রামোফোনের পরিবর্তে রেডিওই ক্রয় করিবে। ফলে, গ্রামোফোনের চাহিদা হ্রাস পাইবে।

(ঙ) **ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও উৎপাদন-পদ্ধতি:** ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও কম-বেশি হইতে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা যদি সচ্ছল হয় কিংবা উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতি ঘটে, তাহা হইলে সাধারণ লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারিগণের চাহিদাও সম্প্রসারিত হইবে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি মন্দা দেখা দেয়, তাহা হইলে জাতীয় আয় হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। ফলে, ভোগকারিগণের চাহিদাও সঙ্কুচিত হইবে।

(চ) **ভোগকারীর পছন্দ:** ভোগকারীর পছন্দ-অপছন্দও চাহিদা নির্ধারণে বিশেষ সহায়তা করে। তাহার পছন্দ বা অপছন্দ আবার একাধিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। তাহার স্বভাব, অভ্যাস, আচরণ, রুচিবোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা, আচার ইত্যাদি ভোগকারীর পছন্দক্রম গঠনও চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

(ছ) **ধনবণ্টন:** দেশের ধনবণ্টনের পরিবর্তনও ভোগকারীর চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রাজস্ব সংক্রান্ত ও অন্যান্য ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধনবণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে সাধারণ ভোগকারিগণের আর্থিক আয়ের উন্নতি ঘটিবে। ইহার ফলে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া ভোগকারিগণের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে। অপর পক্ষে, দেশের ধনবণ্টন-বৈষম্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাধারণ লোকের আর্থিক আয়ের অবনতি ঘটিয়া সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

(জ) **দামের ভবিষ্যৎ গতি:** ক্রেতা যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা হইলে বর্তমান দামে তাহার চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে। অপর পক্ষে, সে যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম কমিবে, তাহা হইলে বর্তমান মূল্যে সে কম পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে।

চাহিদার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি

(Increase and Decrease in the Amount Demanded and Increase and Decrease in Demand)

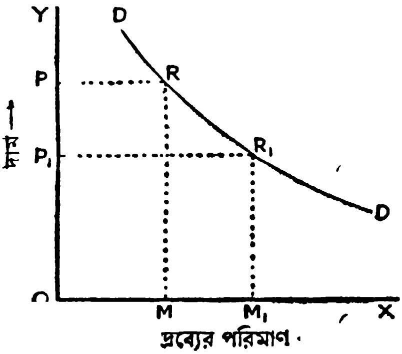
আমরা চাহিদার বিধি অনুযায়ী দেখিয়াছি যে, যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাব পরিমাণ কম-বেশি হয়। অর্থাৎ দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, আবার দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমে। এইভাবে যখন দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে ও কমে ইহাকে যথাক্রমে চাহিদার সম্প্রসারণ (Extension of Demand)এর চাহিদার সঙ্কোচন (Contraction of Demand) বলা চলে। এইভাবে যখন চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পায়, উহা একই চাহিদা-রেখা দ্বারা দেখানো হইয়া থাকে। ভোগকারী তখন একই চাহিদা-রেখার উপর অবস্থান করে। দাম কমিলে সে ঐ একই চাহিদা-রেখার নিচের দিকে নামিয়া বেশি পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়া থাকে। আবার দাম বাড়িলেও ঐ একই রেখার উপরের দিকে উঠিয়া কম পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়া থাকে।

কিন্তু আমরা জানি জিনিসের চাহিদা কেবলমাত্র উহার দামের উপর নির্ভর করে না। দাম ছাড়া ভোগকারীর আয়, তাহার রুচি, অভ্যাস, পছন্দ, অন্যান্য দ্রব্যের দাম, বাজারে ক্রেতার সংখ্যা, দামের ভবিষ্যৎ গতি ইত্যাদি বিষয়ও তাহার চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। যখন দাম ছাড়া, অন্যান্য যে কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন ঘটে, তখন চাহিদারও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যেমন, ভোগকারীর যদি আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সে একই দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে কিংবা বেশি দামে একই পরিমাণ দ্রব্য কিনিবে। আবার তাহার যদি আয় হ্রাস পায়, তাহা হইলে একই দামে কম পরিমাণে দ্রব্য কিনিবে কিংবা কম দামে একই পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে চাহিবে। এইভাবে যখন একই দামে ভোগকারীর আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বাড়ে বা কমে উহাকে যথাক্রমে চাহিদার বৃদ্ধি (Increase in Demand) এবং চাহিদার হ্রাস (Decrease in Demand) বলা হয়। দাম ছাড়া ভোগকারীর আয় অথবা চাহিদার আর যে কোন নির্ধারকের পরিবর্তনের ফলেই এইরূপ চাহিদার বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিতে পারে। চাহিদার এইরূপ পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা-রেখা স্থান

পরিবর্তন করে। চাহিদা বাড়িলে ভোগকারী পুরাতন চাহিদা-রেখার ডানদিকে ও উপরে নূতন চাহিদা-রেখায় সরিয়া যায়। আবার চাহিদা কমিলে ভোগকারী পুরাতন চাহিদা-রেখার বামদিকে ও নিচে নূতন চাহিদা-রেখায় চলিয়া যায়।

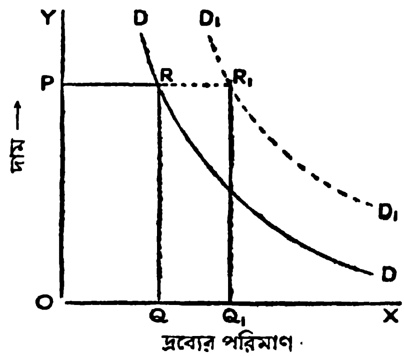
চাহিদার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি এবং চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যটি আরও ভালভাবে বুঝিবার জন্য রেখাচিত্র অঙ্কন করা হইল।

চাহিদার পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি



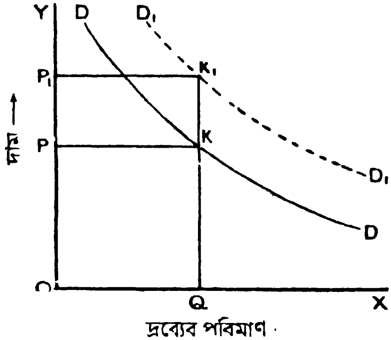
পার্শ্বের চিত্রে OX অক্ষরেখায় দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখায় দাম নির্দেশ করা হইয়াছে। যখন দাম OP হইতে কমিয়া OP_1 হইল, তখন চাহিদার পরিমাণ OM হইতে বাড়িয়া OM_1 দাঁড়াইল। দাম কমিবার ফলেই চাহিদার পরিমাণে এই বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ইহাকেই চাহিদার সম্প্রসারণ বলে। আবার, দাম যখন OP_1 হইতে বাড়িয়া OP হইল, তখন চাহিদার পরিমাণ OM_1 হইতে কমিয়া OMএ দাঁড়াইল। দাম বাড়িবার ফলেই চাহিদার পরিমাণে এই হ্রাস ঘটিয়াছে। ইহাকেই চাহিদার সঙ্কোচন বলা হয়।

চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি



পার্শ্বের চিত্রে দেখানো হইয়াছে, দাম একই থাকা সত্ত্বেও চাহিদা কিভাবে বাড়িতে পারে। চাহিদা-রেখা DDতে OP দামে OQ পরিমাণ চাহিদা নির্দেশ করা হইয়াছে। চাহিদা-রেখা D_1D_1তে দেখানো হইয়াছে দাম একই (OP) থাকা সত্ত্বেও চাহিদার

পরিমাণ বাড়িয়া OQ_1 হইয়াছে। এই চাহিদা বৃদ্ধি দাম কমার ফলে ঘটে নাই, ভোগকারীর আয় কিংবা চাহিদার অন্যান্য নির্ধারকসমূহের পরিবর্তনের জন্য ঘটিয়াছে। আবার নিচের চিত্র-দ্বারা একই বিষয় অন্যভাবে দেখানো যায়। অর্থাৎ ভোগকারী কিভাবে বেশি দামে একই পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়া থাকে।

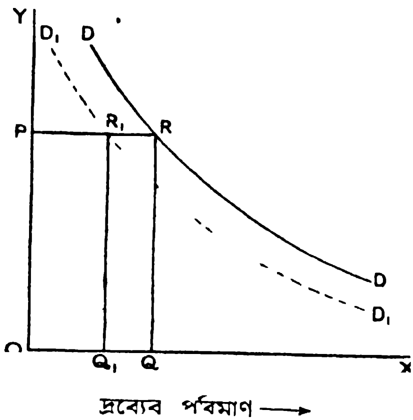


পার্শ্বের চিত্রে দেখানো হইয়াছে, দাম যখন OP ছিল, চাহিদার পরিমাণ ছিল OQ। দাম যখন বাড়িয়া OP_1 হইল তখনও চাহিদার পরিমাণ একই সমান অর্থাৎ OQ রহিল। তাহা হইলে বলা চলে যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি তখনই ঘটিবে যখন :

(ক) ভোগকারী একই দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং

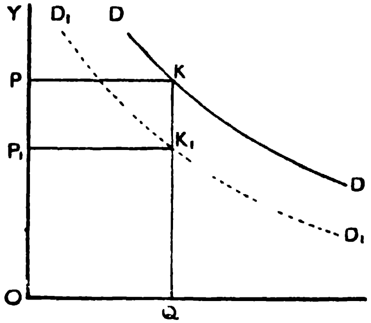
(খ) সে, একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য বেশি দাম দিতে রাজী থাকে।

নিচের চিত্রে দাম একই থাকা সত্ত্বেও চাহিদা কিভাবে হ্রাস পায় দেখানো হইল :



যখন দাম PO তখন চাহিদার পরিমাণ OQ ছিল। ইহা DD চাহিদা-রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার একই দামে চাহিদা

কমিয়া OQ_1 হইয়াছে। ইহা নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1 দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই চাহিদার হ্রাস হয়তো ভোগকারীর আয়, রুচি, অভ্যাস, পছন্দ প্রভৃতি যে কোন বিষয় পরিবর্তনের ফলে ঘটিয়াছে। নিচের চিত্রটি দ্বারা একই বিষয় বিভিন্নরূপে দেখানো হইল। অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে দাম কমা সত্ত্বেও চাহিদার পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।



যখন দাম PO, তখন চাহিদার পরিমাণ OQ ছিল। দাম পূর্বের চেয়ে কমিয়া P_1O হওয়ায়, চাহিদার পরিমাণ একই (OQ) রহিয়াছে। তাহা হইলে বলা চলে যে, কোন দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস তখনই হইবে যখন :

(ক) একই দামে ভোগকারী কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে এবং (খ) একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য ভোগকারী কম দাম দিতে রাজী থাকিবে।

বিভিন্ন প্রকার বাজারে ফার্ম ও শিল্পের চাহিদা-রেখার প্রকৃতি

(Nature of Demand Curves of the Firm and Industry under different Market Forms)

যখন কোন উৎপাদক ফার্ম বা শিল্প পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে, তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে ফার্ম বা শিল্পকে ভোগকারিগণের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। সুতরাং, ভোগকারিগণের চাহিদা-রেখার আকৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা রাখা সকল উৎপাদক ফার্ম ও শিল্পের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

শিল্পের চাহিদা-রেখা
(Demand curve of the Industry)

শিল্পের চাহিদা-রেখা বলিতে কোন শিল্পের পণ্যের জন্য চাহিদা-রেখা বুঝায়। ইহাকে শিল্পের বিক্রয় সম্ভাবনা-রেখাও (Sales possibility curve of the Industry) বলা চলে। মনে রাখিতে হইবে, শিল্প বলিতে একটি বা একাধিক উৎপাদন ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি বুঝায়। যখন একাধিক ফার্মের সমষ্টিদ্বারা একটি শিল্প গঠিত হয় তখন ঐ ফার্মগুলি সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে কিংবা পার্থক্যবিশিষ্ট (differentiated) দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। কোন শিল্পের চাহিদা-রেখার অর্থ বাজারের সকল ভোগকারী কি কি সম্ভাব্য দামে ঐ শিল্পের পণ্য কিনিতে রাজী আছে তাহার চিত্ররূপ বুঝায়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বাজারের সকল ভোগকারীর সমষ্টিগত চাহিদা-সূচীর চিত্রকে বাজার চাহিদা বলে। সুতরাং, কোন শিল্পের পণ্যের চাহিদা-রেখা বাজার চাহিদা-রেখারই অনুরূপ। বাজার চাহিদা-রেখার ন্যায় শিল্পের চাহিদা-রেখা ও ডানদিকে নিম্নগামী অর্থাৎ ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে, কোন শিল্প যদি অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে চায়, তাহা হইলে ঐ পণ্যের দাম কমাইতে হইবে ; নতুবা দ্রব্যটি বিক্রয় হইবে না। শিল্পের চাহিদা-রেখার আকৃতি বিভিন্ন প্রকার বাজারে একই রকম হইয়া থাকে।

ফার্মের চাহিদা-রেখা
(Demand Curve of a Firm)

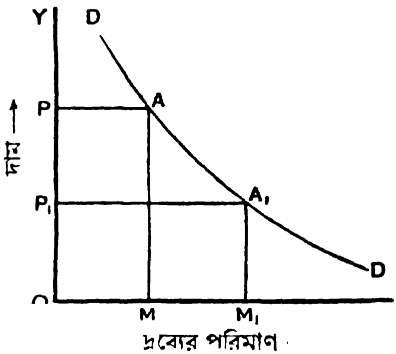
একটি শিল্পের পণ্যের জন্য চাহিদা এবং একটি ফার্মের অথবা একজন বিক্রেতার পণ্যের জন্য চাহিদা এক নহে। শিল্পের পণ্যের জন্য চাহিদা বলিতে এই নির্দেশ পাওয়া যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে বাজারের সকল ভোগকারী ঐ শিল্পের কি কি পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে রাজী আছে। কিন্তু একটি ফার্মের চাহিদা-রেখা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতাগণ বিভিন্ন দামে ঐ বিশেষ ফার্মের নিকট হইতে কি কি পরিমাণ পণ্য কিনিতে চায়। একটি উৎপাদক ফার্ম বা একজন বিক্রেতার দিক হইতে শিল্পের চাহিদা-রেখার গুরুত্ব খুবই কম। যেমন,

একটি দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠান (a dairy) মাখনের জন্য দেশে মোট চাহিদা কত তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিতে মোটেই ব্যস্ত নহে। কিন্তু বিভিন্ন সম্ভাব্য দামে ভোগকারিগণ ঐ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত মাখন কি কি পরিমাণ ক্রয় করিতে চায়, তাহা জানিতে খুবই উৎসুক।

বাজারের বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী উৎপাদক ফার্মের বা ব্যক্তিগতভাবে বিক্রেতার নিকট পণ্যের চাহিদা-রেখার আকৃতি ও অবস্থান বিভিন্ন হইয়া থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার বাজারে ফার্ম বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল :

(১) একচেটিয়া বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা
(Demand Curve of the Firm under Monopoly)

একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা মাত্র একজন বা একটি মাত্র ফার্ম, কিন্তু ক্রেতা অনেক। এই বাজারে শিল্পে একটিমাত্র ফার্ম থাকে বলিয়া, ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। সুতরাং এই বাজারের ক্ষেত্রে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা কিংবা ফার্মের চাহিদা-রেখা এবং বাজারের চাহিদা-রেখা অভিন্ন। একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা বা ফার্ম কতটা পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিবে তাহা বাজার বা শিল্পের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। একচেটিয়া বাজারে ফার্মই একমাত্র উৎপাদক ও বিক্রেতা বলিয়া ফার্মের মোট উৎপাদনই বাজারের মোট জোগান বলিয়া ধরা হয়। ফলে, একচেটিয়া ফার্ম যদি বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে চায় তাহা হইলে উহা কম দামে বিক্রয় হইবে। এই জন্য একচেটিয়া বাজারে ফার্মের পণ্যের চাহিদা-রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয় অর্থাৎ বাম দিক হইতে ডানদিকে ঢালুভাবে নামিতে থাকে। পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়া ফার্মের চাহিদা-রেখা দেখানো হইল।

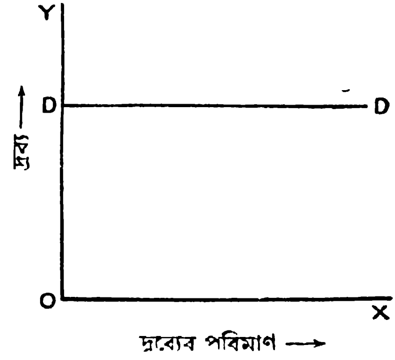


DD কোন দ্রব্যের বাজারের চাহিদা-রেখা। একচেটিয়া বাজারে একটি

মাত্র ফার্ম কিংবা একজন মাত্র বিক্রেতা থাকাতে, ঐ ফার্মের বা বিক্রেতার চাহিদা-রেখাও DD। যখন একচেটিয়া ফার্মটি OM পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে তখন দাম OP। বিক্রয় বাড়াইয়া OM_1 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম হ্রাস পাইয়া OP_1 হইবে।

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা
(Demand Curve of the firm under Perfect Competition)

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য উৎপাদক বিক্রেতা ফার্ম এবং ক্রেতা থাকে এবং সকল বিক্রেতাই সমজাতীয় (homogeneous) বা একই প্রকারের দ্রব্য বিক্রয় করে। এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা এত বেশি যে, কোন একটি ফার্মের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাজারের মোট বিক্রয়ের তুলনায় অতি নগণ্য। সেইজন্য কোন ফার্ম বা একজন বিক্রেতা তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া বাজারের মোট পণ্য যোগানকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ফলে, এই বাজারে কোন বিক্রেতা বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া যথাক্রমে বাজার দাম বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। প্রত্যেক ফার্ম বা বিক্রেতাকে একই নির্দিষ্ট দামে পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়। আবার, প্রত্যেক ক্রেতাও একই নির্দিষ্ট দামে যত খুশি দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একটি উৎপাদক ফার্ম বা একজন বিক্রেতার চাহিদা-রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic) হইয়া থাকে। রেখাচিত্রদ্বারা দেখাইলে এই বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা ভূমিতল রেখার সহিত সমান্তরাল সরলরেখা (horizontal straight line) হইবে। শিল্পের চাহিদা-রেখার ন্যায় ইহার ঢাল ঋণাত্মক হইবে না। পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রের সাহায্যে ফার্মের চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা হইল।



এখানে DD কোন একটি উৎপাদক ফার্ম বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা। এই চাহিদা-রেখা ভূমিতল রেখা OXএর সমান্তরাল। চাহিদা-রেখার এই আকৃতি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, কোন ফার্ম বা বিক্রেতা একই নির্দিষ্ট দামে ইচ্ছামত কম-বেশি দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে।

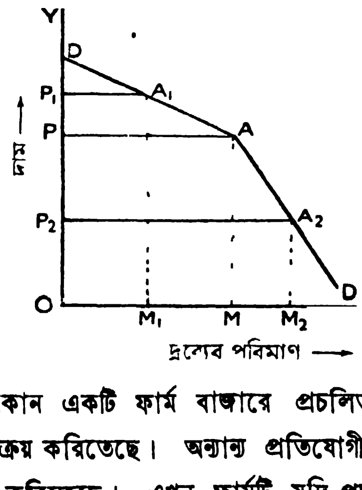
অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা
(Demand Curve of a firm under Imperfect Competition)

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারকে দুই চরম সীমা বলিয়া (extreme) গণ্য করা হয়। একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতার পূর্ণ প্রতিপত্তি থাকে বলিয়া সে বাজার দাম প্রভাবিত করিতে পারে। অন্যদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য বিক্রেতার মধ্যে একজন বিক্রেতার বিক্রয় অতি নগণ্য বলিয়া বাজার দামের উপর তাহার কোন প্রভাব নাই। কিন্তু অধিকাংশ বাজারে দেখা যায় বিক্রেতার সংখ্যা এক ব্যক্তি বা একটি ফার্ম নহে কিংবা বহু সংখ্যক ব্যক্তি বা ফার্ম নহে। বেশির ভাগ বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা পরিমিত। বাজারের এই অবস্থাকে অনিখুঁত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition) বলে। অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে আবার একাধিক স্বতন্ত্র বাজার দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন, ডুয়োপলি, অলিগোপলি, মনোপলিস্টিক কম্পিটিশান, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া কারবার ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন বাজারে প্রত্যেক ফার্ম বা বিক্রেতা কম-বেশি একচেটিয়া প্রভাব বা আধিপত্য ভোগ করিয়া থাকে। ফলে, এই সকল বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার চাহিদা-রেখা বামদিক হইতে দক্ষিণে ঢালুভাবে নামিয়া থাকে।

অলিগোপলিতে ফার্মের চাহিদা-রেখা
(Demand curve of a firm under Oligopoly)

বাজারে কতিপয় ফার্ম বা বিক্রেতা যদি দ্রব্য যোগান দেয় এবং অসংখ্য ক্রেতা ঐ দ্রব্য ক্রয় করে তাহাকে অলিগোপলি বলে। এইরূপ বাজারে যে কয়েকটি ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে উহাদের প্রত্যেকটি এ বিষয়ে সচেতন যে, একটি ফার্মের দ্রব্য যোগানের পরিমাণ, দাম-নীতি, মুনাফা প্রভৃতি অপর একটি ফার্মের আচরণের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কোন একটি ফার্ম দাম পরিবর্তন করিলে বাজারের অপরাপর প্রতিযোগী ফার্মগুলি বিশেষভাবে

প্রভাবান্বিত হয়। তাহারাও তখন দ্রব্যের দাম বা যোগানের পবিমাণ পরিবর্তন করিয়া নিজেদের মুনাফা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। এই বাজারে একটি ফার্মের ক্রিয়াকলাপের প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ফার্মগুলির কাজের উপর নানাভাবে দেখা দেয় বলিয়া কোন ফার্ম নির্দিষ্ট দাম-নীতি গ্রহণ করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন দাম-নীতি গ্রহণ করিতে হয়। ফলে, ফার্মের চাহিদা-রেখা বিভিন্ন আকৃতির হয়। কোন ফার্ম যদি বেশি পরিমাণ দ্রব্য বেচিবার আশায় বাজারে প্রচলিত বা বর্তমান দামের (existing price) চেয়ে দাম সামান্য কমাইয়া দেয়, তাহা হইলে বাজারের অন্যান্য ফার্মগুলিও তাহাদের বিক্রয় বাড়াইবাব জন্য দাম হ্রাস করিবে। ফলে, ঐ ফার্মটি যতটা বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারিবে ভাবিয়াছিল তাহা কার্যত সম্ভব হইবে না। যে পরিমাণে দাম কমানো হইয়াছে, বিক্রয়ের পরিমাণ সে তুলনায় কমই বাড়িবে। আবার, একটি ফার্ম যদি প্রচলিত বা বর্তমান দামের চেয়ে দাম সামান্য বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে কিন্তু প্রতিযোগী ফার্মগুলি তাহাদের দ্রব্যের দাম বাড়াইবে না। ফলে, ঐ ফার্মটির বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। অলিগোপলিতে কোন একটি ফার্ম দাম সামান্য কমাইলে এবং বাড়াইলে চাহিদা-রেখা যে আকৃতি গ্রহণ করে নিচে রেখাচিত্রেব সাহায্যে তাহা বুঝানো হইল :



মনে কর, কোন একটি ফার্ম বাজারে প্রচলিত দাম OPতে OM পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে। অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্মগুলিও এই একই দামে পণ্য বিক্রয় করিতেছে। এখন ফার্মটি যদি প্রচলিত দাম OP হইতে সামান্য দাম বাড়াইয়া OP_1 করে, তাহা হইলে প্রতিযোগী ফার্মগুলি তাহাদের

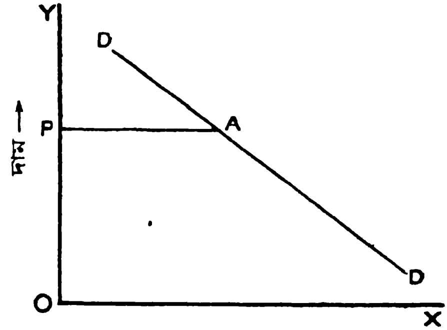
দাম বাড়াইবে না। কিন্তু দাম OP_1 হওয়ার ফলে ফার্মটির দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে কমিয়া OM_1 দাঁড়াইবে। ইহাতে ঐ ফার্মটির মুনাফার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। অর্থাৎ দেখা যায় যে, দাম বাড়াইলে ফার্মের চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে DA। এই চাহিদা-রেখা স্থিতিস্থাপক। অপর দিকে ফার্মটি যদি প্রচলিত দাম হইতে দাম কমাইয়া OP_2 করে তখন প্রতিযোগী বিক্রেতাগণও দাম কমাইবে। ফার্মটি বিক্রয়ের পরিমাণ যতটা বাড়াইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল কার্যত তাহা পারিবে না অর্থাৎ দাম কমাইলে ফার্মের চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে AD। এই চাহিদা-রেখা অস্থিতিস্থাপক। তাহা হইলে অলিগোপলিতে ফার্মের মোট চাহিদা-রেখার আকৃতি হইবে DAD। এই চাহিদা-রেখা A বিন্দুতে কোণ-যুক্ত বা মোচড়ানো (kinked) হইয়াছে। প্রচলিত দাম OP অপেক্ষা অধিকতর দামে (OP_1) চাহিদা রেখা কম ঢালু হইয়াছে। ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক। আবার প্রচলিত দাম OP অপেক্ষা স্বল্পতর দামে চাহিদা-রেখা বেশি ঢালু হইয়াছে। ফলে চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতি-স্থাপক। এইভাবে অলিগোপলিতে ফার্মেব চাহিদারেখাকে কোণযুক্ত চাহিদা-রেখা বলিয়া নির্দেশ করা হইলেও অনেক ক্ষেত্রে এই চাহিদা-রেখা নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

(খ) একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের চাহিদা-রেখা

(Demand Curve of a Firm under Monopolistic Competition)

একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা-ফার্ম অনেক। কিন্তু ক্রেতার নিকট প্রত্যেক বিক্রেতা-ফার্মের দ্রব্য অন্যান্য বিক্রেতা-ফার্মের দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তক (perfect substitute) হওয়ায় কোন বিক্রেতা-ফার্ম দ্রব্যের দাম কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। এইরূপ বাজারে কোন ফার্ম যদি পণ্যের দাম কমায় তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্ম তাহাদের পণ্যের দাম কমাইবে না। ফলে, প্রথমোক্ত ফার্মের বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে। আর অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্মগুলির বিক্রয়ের পরিমাণও কমিবে না ; কেন না, কোন কোন ক্রেতার ঐ সকল ফার্মের পণ্যের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত থাকিতে পারে, কিংবা

ফার্মগুলি ক্রেতাগণের খুব নিকটে অবস্থিত থাকিতে পারে। অপর দিকে, এক-চটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একটি ফার্ম যদি পণ্যের দাম বাড়ায়ও তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্ম তাহাদের পণ্যের দাম বাড়াইবে না। যেমন, একজন দর্জি যদি কোট প্রস্তুতের মজুরি কমায় তাহা হইলে তাহার বিক্রয় বাড়িবে কিন্তু তাহাতে অন্যান্য দর্জি তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। সেইরূপ কোন দর্জি যদি কোট তৈরিব মজুরি বাড়ায়- তাহা হইলে তাহার বিক্রয় বিশেষ কমিয়া যাইবে না। অর্থাৎ এইরূপ বাজারে একটি ফার্মের দাম-নীতি ও দ্রব্য-যোগান অপরাপর ফার্মের দাম-নীতি ও দ্রব্য-যোগানের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। নিখুঁত প্রতিযোগিতার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও কোন একটি ফার্ম বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ণয়ের সময় বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগী ফার্মের পণ্যমূল্য স্থির ধবিয়া লওয়া চলে। নিচে রেখাচিত্রেব সাহায্যে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মের চাহিদা-রেখার আকৃতি নির্দেশ করা হইল :



চিত্রে DD ফার্মের সংশ্লিষ্ট চাহিদা-রেখা। এই চাহিদা-বেখা খুব কম ঢালু আকৃতির হইবে। এই ধরনের রেখা চাহিদার খুব বেশি স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

Show why the demand for a commodity increases when its price falls. Are there any exceptions to this rule? [C. U., B. A. 1962]

৮ | চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

(Elasticity of Demand)

কোন দ্রব্য বা সেবাকার্যের চাহিদা মুখ্যত উহার দামের উপর নির্ভর করে। দাম ছাড়া, ভোগকারীর আয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম প্রভৃতি বিষয়ও কোন দ্রব্য বা সেবাকার্যের চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।[১] কোন দ্রব্যের চাহিদা যেমন ঐ দ্রব্যটির দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, সেইরূপ ভোগকারীর আয়-পরিবর্তন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিমাণ বাড়িতে-কমিতে পারে। এই ভাবে একটি দ্রব্যের-দাম পরিবর্তন, ভোগকারীর আয়-পরিবর্তন কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দামের হ্রাস-বৃদ্ধির দরুণ চাহিদা যে পরিমাণে বা মাত্রায় সাড়া দেয় (Degree of Responsiveness to Demand) উহাকেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে ?

একটি দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের জন্য উহার চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে দাম-স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand) বলে। ভোগকারীর আয়-পরিবর্তনের জন্য তাহার চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে আয়-স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand) বলে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে পারস্পরিক-স্থিতিস্থাপকতা (Cross Elasticity of Demand) বলে। স্থিতিস্থাপকতার এইরূপ প্রকারভেদ করা গেলেও, সাধারণভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে আমরা দাম স্থিতিস্থাপকতাই বলিয়া থাকি। দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাহা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা পরিমাপ করা হয়। দামের পরিবর্তনে চাহিদা যে পরিমাণে বা মাত্রায় সাড়া দেয় উহাই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা।[২]

১. 'The demand for a good is a function of price, income and the price of related goods.'

২. Stonier & Hague : "Elasticity of demand is a technical term used by economists to describe the degree of responsiveness of demand for a good to a fall in price."

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এক হইতে পারে না। বিভিন্ন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে চাহিদা পরিবর্তনের মাত্রা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সেইরূপ একই দ্রব্যের বিভিন্ন দামে, ভোগকারীর বিভিন্ন আয়ে এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের বিভিন্ন দামে চাহিদার মাত্রা বিভিন্নরূপে সাড়া দিয়া থাকে।

চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা
(Price Elasticity of Demand)

অর্থবিদ্যায় যখন আমরা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলি তখন উহার দ্বারা সাধারণত চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাই বুঝিয়া থাকি। কোন দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের ফলে ঐ দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাই চাহিদার-দাম স্থিতিস্থাপকতা।[১] দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিলে উহার চাহিদা কতটা পরিমাণে বাড়িবে, আবার দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট পরিমাণে বাড়িলে উহার চাহিদা কতটা পরিমাণে কমিবে, দাম-স্থিতিস্থাপকতা সেই সন্ধান দিয়া থাকে। এই সন্ধান চাহিদা-বিধি বা চাহিদা-রেখা হইতে পাওয়া যায় না। চাহিদা-বিধি দাম ও চাহিদার মধ্যে ক্রিয়াগত বিপরীত সম্পর্ক বুঝাইয়া থাকে। দাম কমিলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে এবং দাম বাড়িলে চাহিদার পরিমাণ কমিবে—চাহিদার বিধি এই ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কতটা পরিমাণে দাম কমিলে কতটা পরিমাণ চাহিদা বাড়িবে, আবার, কতটা পরিমাণ দাম বাড়িলে কতটা পরিমাণে চাহিদা কমিবে তাহার নির্দেশ চাহিদা-বিধি দিতে পারে না, তাহার ইঙ্গিত দেয় দাম স্থিতিস্থাপকতা। দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তন এবং উহার দরুণ যে চাহিদার পরিবর্তন—এই দুইএর তুলনামূলক পরিমাপ হইল দাম-স্থিতিস্থাপকতা। দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে তাহা ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া স্থির করা যায়। ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল: দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ। দামের পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনা করিয়া দাম-স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা চলে। আবার চাহিদা-পরিবর্তনের হার

১. Ryan : "The responsiveness of the quantity demanded of any good X to a change in its price is called the price elasticity of demand for X."

এবং দাম-পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা দাম-স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তন এবং উহার ফলে চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন—এই দুইএর অনুপাতই চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে। ইহা এইভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন চাহিদার পরিমাণ}} \div \frac{\text{দামেব পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন দাম}}$$

আবার, চাহিদার পরিমাণকে যদি Q ধরা হয়, চাহিদার পরিমাণে সামান্য পরিবর্তনকে ΔQ, দামকে P এবং দামের সামান্য পরিবর্তনকে ΔP ধরা যায়, তাহা হইলে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্ত সাংকেতিক দ্বারা নির্দেশ করা চলে:

$$Ep = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta Q}{P}$$ [১]

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। মনে কর, প্রতিটি কাঁঠালের দাম ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা হইল। ইহাতে কাঁঠালের চাহিদা ১০০টি হইতে কমিয়া ৬০টিতে দাঁড়াইল। এখানে চাহিদার পরিমাণ শতকরা পরিবর্তন হইয়াছে: $\frac{৪০}{১০০}$; এবং দামের শতকরা পরিবর্তন হইয়াছে: $\frac{১}{২}$।

সুতরাং দামের স্থিতিস্থাপকতা হইবে: $\frac{৪০}{১০০} \div \frac{১}{২} = \frac{৪}{৫}$। [২]

দাম-স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ ২

(Different Types of Price Elasticity)

অর্থনীতিবিদ্‌গণ নিম্নলিখিত পাঁচ প্রকারের চাহিদাব দাম-স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করিয়া থাকেন:

---

১. $$Ep = \frac{\text{Percentage change in the quantity demanded}}{\text{Percentage change in price}}$$

$$= \frac{\dfrac{\text{Very small change in the quantity demanded}}{\text{Original quantity demanded}}}{\dfrac{\text{Very small change in price}}{\text{Original price}}}$$

২. Joan Robinson: "The elasticity of demand at any price or at any output is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price, divided by the proportional change of price."

(ক) **চাহিদার সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা** (Unit Elasticity of Demand) : দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয়, ঠিক একই হারে যদি চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে উহাকে বলা হয় চাহিদার সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা (Unit Elasticity of Demand)। যেমন, দ্রব্যের দাম যদি শতকরা ৪% হারে পরিবর্তন হয় এবং চাহিদারও পরিবর্তন শতকরা ৪% হারেই ঘটে—এইক্ষেত্রে দাম ও চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত হইবে ১এর সমান অর্থাৎ

$$ed = \frac{\text{Percentage change in dd}}{\text{Percentage change in price}} = \frac{4\%}{4\%} = 1.$$

(খ) **চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা** (Elasticity of Demand) : দাম-পরিবর্তন যে হারে হয়, তাহার চেয়ে বেশি হারে যদি চাহিদার পরিবর্তন হয়, উহাকে বলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। যেমন, জিনিসের দাম শতকরা ৪% হারে পরিবর্তিত হইয়াছে কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ৬% হারে। এ ক্ষেত্রে চাহিদা ও দামের পরিবর্তনের হারের অনুপাত ১এর চেয়ে বেশি, অর্থাৎ

$$ed = \frac{\text{Percentage change in dd}}{\text{Percentage change in price}} = \frac{6\%}{4\%} = 1\tfrac{1}{2}.$$

(গ) **চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতা** (Inelasticity of Demand) : দাম পরিবর্তন যে হারে হয় তাহার চেয়ে যদি কম হারে চাহিদার পরিবর্তন হয় উহাকে বলা হয় চাহিদার অস্থিতিস্থাপকতা। যেমন, দাম শতকরা ৪% হারে পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ২% হারে। এ ক্ষেত্রে চাহিদা হইবে অস্থিতিস্থাপক। এখানে চাহিদা ও দামের পরিবর্তন হারের অনুপাত ১এর চেয়ে কম, অর্থাৎ

$$ed = \frac{\text{Percentage change in dd}}{\text{Percentage change in price}} = \frac{2\%}{4\%} = \tfrac{1}{2}.$$

(ঘ) **চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা** (Infinite Elasticity or Perfect Elasticity of Demand) : দামের কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও যদি চাহিদার পরিবর্তন ধনাত্মক (positive) হয় তাহাকে চাহিদার অসীম স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যেমন, দামের পরিবর্তন হইয়াছে শূন্য, কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন হইয়াছে শতকরা ৪%, অর্থাৎ

$$ed = \frac{\text{Percentage change in dd}}{\text{Percentage change in price}} = \frac{4\%}{0} = \text{Infinity.}$$

(৬) **চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা** (Infinite or Absolute Inelasticity of Demand) : দামের পরিবর্তনে চাহিদা যদি একেবারেই সাড়া না দেয়, অর্থাৎ চাহিদার যদি কিছুমাত্র পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে উহাকে চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। যেমন, যখন দামের পরিবর্তন ঘটিয়াছে শতকরা ৪% কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন ঘটিয়াছে শূন্য, অর্থাৎ

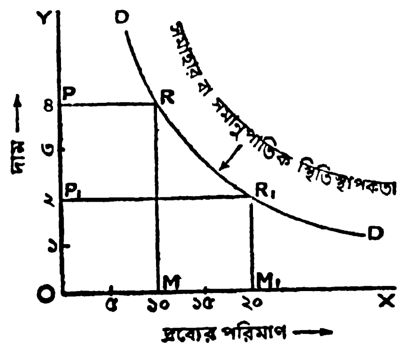
$$ed = \frac{\text{Percentage change in dd}}{\text{Percentage change in price}} = \frac{0}{4\%} = \text{Zero.}$$

উপরের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতাকে নিম্নোক্তরূপে নির্দেশ করা যায় :

(১) একের সমান ($E = 1$)—সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক
(২) একের বেশি ($E > 1$)—স্থিতিস্থাপক
(৩) একের কম ($E < 1$)—অস্থিতিস্থাপক
(৪) অসীম ($E = \infty$)—অসীম স্থিতিস্থাপক
(৫) শূন্য ($E = 0$)—অসীম অস্থিতিস্থাপক

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই পাঁচরকম দাম-স্থিতিস্থাপকতা প্রকাশ করা হইল :

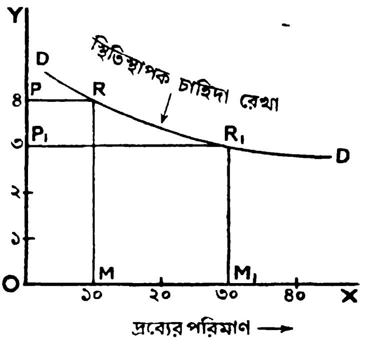
সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা



উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, দাম যখন OP তখন OM পরিমাণ দ্রব্য কেনা হইয়াছে। ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে :

দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ = OM × OP = OMRP ক্ষেত্রের সমান। আবার, দাম যখন কমিয়া OP_1 হইল তখন OM_1 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইল : $OP_1 \times OM_1 = OM_1R_1P_1$ ক্ষেত্রের সমান। এখন দেখা যাইতেছে যে, দুইবারেই ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরস্পর ($OMRP = OM_1R_1P$) সমান। অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের সমান।

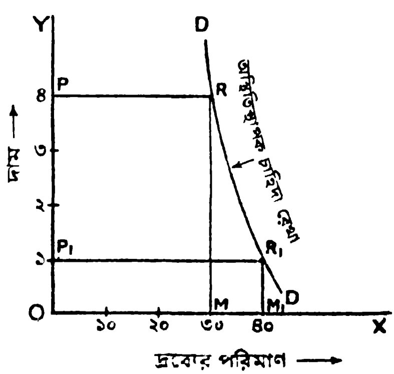
স্থিতিস্থাপকতা



পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, OP দামে OM পরিমাণ দ্রব্য কেনা হইয়াছে। ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে, OMRP ক্ষেত্রের সমান। এখন যদি দাম কমিয়া OP_1 হয়, তাহা হইলে ক্রেতার মোট ব্যয়ের পরিমাণ হইবে $OM_1R_1P_1$ ক্ষেত্রের সমান। এ ক্ষেত্রে $OM_1R_1P_1$ ক্ষেত্রটি OMRP ক্ষেত্রের চেয়ে বড় বলিয়া চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের বেশি।

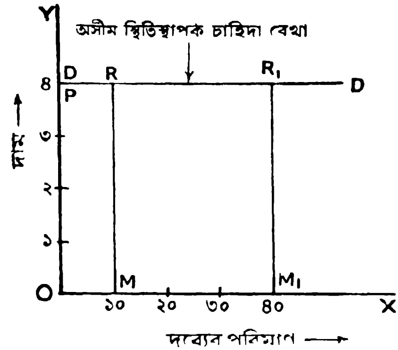
অস্থিতিস্থাপকতা

দাম যখন OP তখন মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল OMRP ক্ষেত্রের আয়তনের সমান। দাম কমিয়া OP_1 হইলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ $OM_1R_1P_1$ ক্ষেত্রের সমান হইল। আগের মোট ব্যয় OMRP ক্ষেত্রের আয়তন পরের মোট ব্যয়ের পরিমাণ $OM_1R_1P_1$ ক্ষেত্রের আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশি বলিয়া এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের কম।



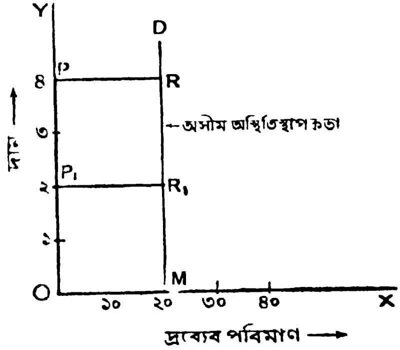
অসীম স্থিতিস্থাপকতা

এখানে একই দামে ক্রেতা দ্রব্যটির যে কোন পরিমাণ কিনিতেছে। একই দাম OP কিংবা MR কিংবা M_1R_1এতে ক্রেতা যথাক্রমে OM কিংবা OM_1 পরিমাণ দ্রব্য কিনিতে পারে। কিন্তু এই দাম অপেক্ষা দাম সামান্য বেশি হইলে ক্রেতা আর কিনিবে না। R ও R_1 বিন্দু যোগ করিয়া যে DD চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় উহা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমান্তরাল সরলরেখা হইবে। এই চাহিদা-রেখা DD-এর ঢাল অসীম বলিয়া ইহা চাহিদার অসীম স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করিয়া থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে এইরূপ চাহিদা-রেখা দেখা যায় না। নিখুঁত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি ফার্ম বা বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অসীম স্থিতিস্থাপক হইতে পারে বলিয়া কল্পনা করা হয়।



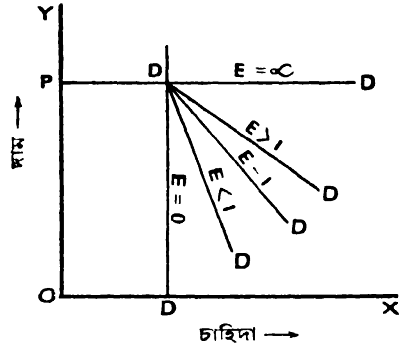
অসীম অস্থিতিস্থাপকতা

এখানে অসীম স্থিতিস্থাপক অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা নির্দেশ করা হইয়াছে। OP দামে ক্রেতা OM পরিমাণ দ্রব্য কিনিয়াছে। দাম কমিয়া OP_1 হওয়াতেও ক্রেতা OM পরিমাণ দ্রব্যই কিনিতেছে। অর্থাৎ দাম



বাড়িলে কিংবা কমিলে চাহিদার কোনই পরিবর্তন হইতেছে না। R ও R_1 বিন্দু যোগ করিয়া যে DD চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় উহাই চাহিদার অসীম অস্থিতিস্থাপকতা বুঝাইতেছে। এই চাহিদা-রেখাটি OY অক্ষরেখার সমান্তরাল একটি লম্বরেখার আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এই রেখার কোন ঢাল নাই বলিয়া ইহার স্থিতিস্থাপকতাও নাই।

উপরি-উক্ত পাঁচ প্রকারের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না দেখাইয়া একই রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হইল :



দাম স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ
(Measurement of Price Elasticity)

দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতিটি হইল, দামের পরিবর্তনের দরুণ ক্রেতার মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাহার তুলনা করা। দ্বিতীয়টি হইতেছে, জ্যামিতিক পদ্ধতি—চাহিদা-রেখার যে কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা। আর তৃতীয় পদ্ধতিটি হইতেছে, চাহিদা-রেখার উপর দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের গড়পড়তা স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা। ইংরেজীতে এই তিনটি পদ্ধতিকে যথাক্রমে (1) Total Outlay Method, (2) Point Method এবং (3) Arc Method বলা হয়।

মোট ব্যয়ের তুলনার ভিত্তিতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ
(Total Outlay Method)

অধ্যাপক মার্শাল এই পদ্ধতির দ্বারা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ

করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দামের পরিবর্তনে চাহিদার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ফলে, ক্রেতার মোট ব্যয়িত অর্থের পরিবর্তনও ঘটিয়া থাকে। দামের পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের তুলনা করিয়া স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়। দাম পরিবর্তনের পূর্বে ক্রেতার যাহা মোট ব্যয় ছিল, দাম পরিবর্তনের পরও মোট ব্যয় যদি একই সমান থাকে তাহা হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের সমান হইবে। যেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন সমানুপতিক হয় সেক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না। নিচে উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝানো হইল:

দ্রব্যের একক প্রতি দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
৫·০০ টাকা	২০০ একক	১০০০.০০ টাকা	
৪·০০ টাকা	২৫০ একক	১০০০·০০	$=\frac{১০০০}{১০০০}=১$ একের সমান[১]

এক্ষেত্রে চাহিদা সমাহার বা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক হইয়াছে বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, দাম কমিবার ফলে ক্রেতা যদি কোন দ্রব্যের উপর পূর্ব অপেক্ষা অধিক ব্যয় করে তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা একের অধিক হইবে। যে ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতার মোট ব্যয় পূর্বের ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে—

দ্রব্যের একক প্রতি দাম	ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ	ক্রেতার মোট ব্যয়	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
৪·০০ টাকা	২৫০ একক	১০০০·০০ টাকা	$\frac{১২০০}{১০০০}=\frac{৬}{৫}=$ ১এর চেয়ে বেশি
৩·০০ টাকা	৪০০ একক	১২০০·০০ টাকা	

এ ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

তৃতীয়ত, দাম কমিবার ফলে ক্রেতা যদি কোন দ্রব্যের উপর পূর্ব অপেক্ষা কম ব্যয় করে তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা একের কম হইবে।

১. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{\text{দাম কমিবার পর মোট ব্যয়}}{\text{দাম কমিবার পূর্বে মোট ব্যয়}}$

যেক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদা-পরিবর্তনের অনুপাত কম হয় সেক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ব্যয় পূর্ব অপেক্ষা কম হইবে। যেমন,

দ্রব্যের একক প্রতি দাম	ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ	ক্রেতার মোট ব্যয়	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
৩'০০ টাকা	৪০০ একক	১২০০'০০ টাকা	$\frac{৯০০}{১২০০} = \frac{৩}{৪}$ = ১এর চেয়ে কম
২'০০ টাকা	৪৫০ একক	৯০০'০০ টাকা	

এক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

উপরে তিনপ্রকার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সহজ উপায় নির্দেশ করা হইল।

(২) চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ[১]
(Point Method)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল, চাহিদা-রেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা। সাধারণত একই চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন প্রকার স্থিতিস্থাপকতা হইতে পারে।

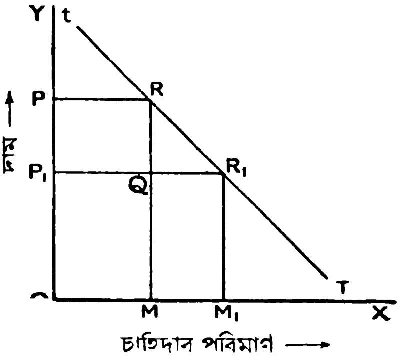
যেসকল চাহিদা-রেখার ঢাল সকল বিন্দুতে সমান উহাদের ক্ষেত্রে বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায় না। কেন না, উহাদের চাহিদা-রেখার সকল বিন্দুতেই স্থিতিস্থাপকতা একপ্রকার। চাহিদা-রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতে হইলে এমন একটি চাহিদা-রেখা বাছিয়া লইতে হইবে যাহার প্রত্যেকটি বিন্দুতে নির্দিষ্ট দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা নির্দেশ করা চলে এবং ফলে, বিভিন্ন বিন্দুর চাহিদা স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন হয়। ১৬৫ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত রেখাচিত্রে এইরূপ একটি স্বাভাবিক চাহিদা-রেখা লইয়া উহার একটি বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিভাবে পরিমাপ করা যায় তাহা নির্দেশ করা হইল:

মনে কর tT একটি সরল চাহিদা-রেখা। R ও R_1 এই চাহিদা-রেখার উপর অবস্থিত পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্তী দুইটি বিন্দু। পূর্বে OP দামে চাহিদার পরিমাণ ছিল OM। দাম কমিয়া OP_1 হওয়ার ফলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া OM_1 হইয়াছে। এখন R বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

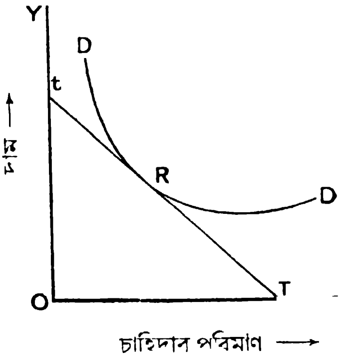
---

১. Measurement of Point Elasticity of Demand.

১নং চিত্র



২নং চিত্র



কতটা তাহাই পবিমাপ করিতে হইবে। আমবা জানি, চাহিদার দাম

$$\text{স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{চাহিদাব পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন চাহিদার পরিমাণ}} \div \frac{\text{দামেব পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন দাম}}$$

সুতরাং ১ম চিত্র হইতে আমরা লিখিতে পাবি,

$$\text{চাহিদাব দাম স্থিতিস্থাপকতা (}Ep\text{)} = \frac{QR_1}{OM} \div \frac{RQ}{RM}$$

$$= \frac{QR_1}{OM} \times \frac{RM}{RQ}$$

$$= \frac{QR_1}{RQ} \times \frac{RM}{OM}$$

এখন RQR ও RMT ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ (similar triangles), কেন না, উহাদের কোণগুলি পরস্পর সমান।

অতএব $\frac{OR_1}{RQ}$ এর স্থানে $\frac{MT}{RM}$ বসানো চলে।

তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতার সমীকরণটি এই দাঁড়াইবে :

$$Ep = \frac{MT}{RM} \times \frac{RM}{OM}$$

$$= \frac{MT}{OM}$$

আবার RMT ও tPR ত্রিভুজ দুইটি সদৃশ,

সুতরাং, $\frac{MT}{OM}=\frac{TR}{Rt}$

অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{TR}{Rt}$

$$=\frac{\text{R বিন্দু হইতে চাহিদা-রেখার নিম্নাংশ}}{\text{R বিন্দু হইতে চাহিদা-রেখার উর্ধ্বাংশ}}$$

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে, R বিন্দুর নিম্নাংশ যদি উর্ধ্বাংশের চেয়ে দৈর্ঘ্যে বেশি হয়, তাহা হইলে R বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১এর চেয়ে বেশি হইবে। দ্বিতীয়ত, নিচের অংশ যদি উপরের অংশ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কম হয়, তাহা হইলে R বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১এর চেয়ে কম হইবে। তৃতীয়ত, R বিন্দুর নিচের অংশ ও উপরের অংশ যদি পরস্পরের সমান হয় তাহা হইলে ঐ বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান হইবে।

চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সূত্রটি জানা থাকিলে চাহিদা-রেখা সরল না হইয়া বক্র হইলেও উহার যে কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা মাপা যায়। ২নং চিত্রে বক্র চাহিদা-রেখা DDর উপর R বিন্দুতে tT স্পর্শক রেখা টানা হইয়াছে। এখানে R বিন্দুতে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হইবে : $\frac{TR}{Rt}$

চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ
(Arc Method)[১]

চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের অসুবিধা এই যে, ইহা বাস্তব-সম্মত নহে। এই পদ্ধতি দ্বারা স্থিতিস্থাপকতা মাপিবার সময় ধরিয়া লওয়া হয় যে, চাহিদা-রেখার উপর দুইটি বিন্দুর দূরত্ব অত্যন্ত নগণ্য এবং দামের পরিবর্তন এবং দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনও হইয়াছে অতি সামান্য (infinitesi-mal)। কিন্তু সাধারণত বাস্তব জীবনে যে সকল চাহিদা-সূচী বিশ্লেষণ করিতে হয় তাহাতে আমরা দাম কিংবা দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণের অনেক বেশি পরিবর্তন ধরিয়া লই। বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের এই অসুবিধা দূর করিবার সমাধান হিসাবে চাহিদা-রেখার কোন একটি বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা না

১. Measurement of Arc Elasticity of Demand.

মাপিয়া একই চাহিদা-রেখার উপর দুইটি বিন্দুর মধ্যে অবস্থিত অংশের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হইয়া থাকে। ইহাকে চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ বলা হয়। ইহাই দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিবার তৃতীয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতির দ্বারা নূতন চাহিদার পরিমাণ ও পুরাতন চাহিদার পরিমাণের যোগফলের ভিত্তিতে চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত এবং নূতন দাম ও পুরাতন দামের যোগফলের ভিত্তিতে দাম পরিবর্তনের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়। কার্যত রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা-রেখায় দুইটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্বের গড়পড়তা স্থিতিস্থাপকতা বুঝায়। কেন না, ইহা হিসাব করিবার সময় পুরাতন দাম ও চাহিদার পরিমাণ এবং নূতন দাম ও চাহিদার পরিমাণ ধরা হয়। চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সমীকরণ নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায়:

চাহিদার রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা =

$$= \frac{\dfrac{\text{চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন চাহিদার পরিমাণ} + \text{নূতন চাহিদার পরিমাণ}}}{\dfrac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন দাম} + \text{নূতন দাম}}}$$

[অথবা, $Ep = \frac{Q - Q_1}{Q + Q_1} \div \frac{P - P_1}{P + P_1}$

যেখানে Q = Original quantity demanded,

Q_1 = Quantity after change

P = Original price

P_1 = Price after change.]

একটি উদাহরণ দিলে রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি আরও সুস্পষ্ট হইবে। মনে কর, একটি দ্রব্যের দাম ১০·০০ টাকা ছিল এবং এই দামে ১০০ একক কেনা হইয়াছিল। ধরা যাক, দাম কমিয়া ৮·০০ টাকা হওয়ায় দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া ১৪০ একক হইয়াছে। তাহা হইলে এক্ষেত্রে রেখাংশ স্থিতিস্থাপকতা হইবে:

$$\frac{১০০ - ১৪০}{১০০ + ১৪০} \div \frac{১০ - ৮}{১০ + ৮}$$

$$= \frac{-৪০}{২৪০} \div \frac{২}{১৮}$$

$$= \frac{-৪০}{২৪০} \times \frac{১৮}{২}$$

$$= -১.৫ \quad *$$

$$= ১.৫$$

এখানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে বেশি অর্থাৎ চাহিদা এখানে স্থিতিস্থাপক।

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা
(Income Elasticity of Demand)

ভোগকারীর আয় পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। দ্রব্যের চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে ভোগকারীর আয় পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের চাহিদাতে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাহারই পরিমাপক হইল আয় স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ভোগকারীর আয় পরিবর্তন এবং চাহিদা পরিবর্তনের আনুপাতিক তুলনা নির্দেশ করিয়া থাকে। আয় পরিবর্তনে চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাই চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা।[১] দাম স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, চাহিদা দাম পরিবর্তনের বিপরীত দিকে সাড়া দেয়। কিন্তু আয় স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদা সাধারণত ভোগকারীর আয় পরিবর্তনের একই মুখে সাড়া দিয়া থাকে। অর্থাৎ ভোগকারীর আয় পরিবর্তন বাড়িলে তাহার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে, আবার, আয় কমিলে চাহিদার পরিমাণও কমে। চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার সমীকরণ নিম্নরূপে নির্দেশ করা যায়:

চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা (E*i*)

$$= \frac{\text{দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণে আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{আয়ের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$

* এই ঋণাত্মক চিহ্ন তুলিয়া দেওয়া চলে।

১. Bober: "Income elasticity of demand measures the responsiveness of the reaction in the quantity of a commodity demanded to a change in consumer income."

আয় স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ
(Different Types of Income Elasticity)

নিম্নলিখিত চার প্রকারের আয় স্থিতিস্থাপকতা কল্পনা করা যায় :

(১) আয়ের পরিবর্তনে চাহিদা একেবারে সাড়া নাও দিতে পারে। এইরূপে আয়ের পরিবর্তনে চাহিদার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, উহাকে অসীম আয় অস্থিতিস্থাপকতা (Infinite Income Inelasticity) বলা হয়।

(২) যদি আযেব পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা ভোগকাবীর চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হয় উহাকে আয়ের স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity) বলে। সাধারণত ধনী শ্রেণীর ভোগকারিগণ যখন বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করে তখন চাহিদার এই অবস্থা দেখা যায়। তাহাদের আয় যে অনুপাতে বাড়ে তাহা অপেক্ষা বেশি অনুপাতে তাহারা বিলাস-দ্রব্য (উৎকৃষ্টতর দ্রব্য) ক্রয় করিযা থাকে।

(৩) আযের পরিবর্তনের অনুপাত ও চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত যদি সমান হয় সেক্ষেত্রে আয় স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক (Unit Income Elasticity) হইযা থাকে।

(৪) আযের পবিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনেব অনুপাত যদি কম হয়, তাহাকে আয়ের অস্থিতিস্থাপকতা (Income Inelasticity) বলে। সাধারণত নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয় ব্যাপারে চাহিদার এই অবস্থা দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, ভোগকারীর আয় বৃদ্ধির সহিত চাহিদার পরিমাণ যদি কমিতে থাকে, তাহা হইলে উহাকে ঋণাত্মক আয় স্থিতিস্থাপকতা (Negative Income Elasticity) বলে। ক্রেতা তাহার আয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোন দ্রব্যকে নিকৃষ্টজাতীয় (inferior) বলিয়া গণ্য করে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের ক্ষেত্রে তাহার আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হইবে।

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা
(Cross Elasticity of Demand)

অনেক সংশ্লিষ্ট দ্রব্য (related goods) আছে যাহাদের মধ্যে কিছু কিছু পরস্পরের পরিবর্তক (substitutes)। আবার কিছু কিছু দ্রব্য

পরস্পরের অনুপূরক (complementary) দেখা যায়। যেমন, চা ও কফি, মাছ ও মাংস পরস্পর পরিবর্তক দ্রব্য। রুটি ও মাখন, কলম ও কালি পরস্পর অনুপূরক দ্রব্য। এই সকল পরিবর্তক ও অনুপূরক দ্রব্যের দাম এবং চাহিদা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইহাদের একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইলে, আর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তক দ্রব্যের বেলায় একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে অপর দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে। চা-এর দাম বাড়িলে কফির চাহিদা বাড়ে। অনুপূরক দ্রব্যের বেলায় একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে দুইটি দ্রব্যের চাহিদাই কমে। রুটির দাম বাড়িলে কেবল রুটির চাহিদাই কমে না, সঙ্গে সঙ্গে মাখনের চাহিদাও কমিয়া থাকে। এইরূপ সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে আর একটি দ্রব্যের চাহিদা যে মাত্রায় সাড়া দেয় উহাকে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে। মনে কর, X ও Y দুইটি পরস্পর পরিবর্তক সামগ্রী। এখন Y দ্রব্যের দামেব পবিবর্তন যে অনুপাতে ঘটে এবং তাহার ফলে X দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন যে অনুপাতে ঘটে—এই দুইএর তুলনার পরিমাপই হইল চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা। অর্থাৎ

$$\text{চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{X দ্রব্যের চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{Y দ্রব্যের দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$$ [১]

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি দুইটি দ্রব্য পরস্পর পরিবর্তক হয় তাহা হইলে একটি দ্রব্যের দাম বাড়িলে অপর দ্রব্যটির চাহিদা বাড়িবে—যদি অবশ্য দ্বিতীয় দ্রব্যটির দাম না বাড়ে। এইভাবে যখন একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে আর একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হয়, তাহা হইলে **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক** হইবে। যদি দুইটি দ্রব্য পরস্পর সম্পূর্ণ পরিবর্তক হয় (Perfect substitutes) তাহা হইলে চাহিদার **পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা** অসীম হইবে। কেন না, এক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দাম একটু বাড়িলেই ক্রেতা অপর দ্রব্যটি যত

চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার প্রকারভেদ

১. Ryan : "The cross elasticity of demand for X is the responsiveness of the quantity of X that is demanded to a change in the price of some good Y."

পরিমাণে ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারে। চাহিদার এই অবস্থা কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় না। দুইটি দ্রব্য যদি পরস্পর অনুপূরক হয় অর্থাৎ উহাদের সংযুক্ত চাহিদা (joint demand) থাকে, তাহা হইলে একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে উভয় দ্রব্যের চাহিদার বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটে। এই অবস্থাতে **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হইবে।** যেসকল দ্রব্য পরস্পব একেবারেই পরিবর্তক নহে কিংবা একটি আর একটির সহযোগী (অনুপূরক) হিসাবে ব্যবহার করা চলে না, উহাদের ক্ষেত্রে **চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা** শূন্য হইয়া থাকে।

বাস্তবক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা অসীম হইতে পারে না, আবার শূন্যও হইতে পারে না।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(Factors determining Elasticity of Demand)

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

১। **দামের স্তর** (Price Level) **:** উচ্চ দাম-স্তরে জিনিসের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, আবার নিম্ন দাম-স্তরে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। ইহা চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুর অবস্থান হইতেই বেশ লক্ষ্য করা যায়। চাহিদা-রেখার উপরের দিকের বিন্দুগুলিতে (বেশি দাম-স্তরে) চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং নিচের দিকের বিন্দুগুলিতে (কম দাম-স্তরে) চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে।

২। **আয়-স্তর** (Income Level) **:** ভোগকারীর আয়ের স্তর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ণযে বিশেষ সহাযতা করে। উচ্চ আয়ের ধনী ব্যক্তিগণের নিকট চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে তাহাদের চাহিদার পরিমাণে তেমন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু অল্প আযের গরিব ব্যক্তিগণের কাছে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। দ্রব্যের দামের পরিবর্তনে তাহাদের চাহিদার খুব বেশি পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

৩। **দ্রব্যের প্রকৃতি :** সাধারণভাবে বলা চলে যে, বিলাস-দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক, অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং

অভ্যাসবশত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (conventional goods) চাহিদা সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যে দ্রব্য একজনের কাছে বিলাস দ্রব্য অপরের নিকট তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে। অবশ্য প্রয়োজনীয দ্রব্যের চাহিদা সাধারণত অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু অতি নিম্ন আয-স্তরের ব্যক্তিগণের নিকট ইহা অস্থিতিস্থাপক নহে। কেন না, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের আয় অত্যন্ত কম থাকা কালে তাহাদের অনেকেই অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিতে পারে না। তাহাদের আয় যতই বাড়িতে শুরু করে ততই ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িতে থাকে। এইভাবে যতক্ষণ আয় বাড়িতে থাকে ততক্ষণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা নিম্ন আয় শ্রেণীর নিকট স্থিতিস্থাপক হয়।

৪। **পরিবর্তক দ্রব্যের অস্তিত্ব:** যে দ্রব্যের বাজারে যত বেশি পরিবর্তক সহজলভ্য, উহার চাহিদা তত বেশি স্থিতিস্থাপক হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের একেবারে কোন পরিবর্তক নাই উহা ভোগকারীকে যে কোন দামে কিনিতে হয। এইরূপ দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তকহীন দ্রব্য বাস্তবে দেখা যায় না।

৫। **একাধিক বা বিকল্প ব্যবহারের সম্ভাবনা:** যে দ্রব্য নানারূপ বিকল্প ব্যবহারে প্রযোগ করা যায় উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যে দ্রব্য বিভিন্ন রকমের চাহিদা মিটাইতে পারে উহার পরিবর্তক সাধারণত বাজারে পাওয়া যায। যেমন, বিদ্যুৎ-শক্তি আলো জ্বালায়, পাখা চালায়, রন্ধনকার্যে সহায়তা করে। এই প্রত্যেকটি ব্যবহারেই বিদ্যুৎ-শক্তির পরিবর্তক রহিয়াছে। রন্ধনকার্যে বিদ্যুৎ-শক্তির পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করা চলে, আলো জ্বালিতে বিদ্যুৎ-শক্তির পরিবর্তে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা চলে। যদি বিদ্যুৎ-শক্তির বাজার-দাম কমে, (আর যদি পরিবর্তক দ্রব্যের দাম একই থাকে), তাহা হইলে পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়া বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে।

৬। **ভোগ স্থগিত রাখার সম্ভাবনা:** যেসকল দ্রব্যের সাম্প্রতিক ভোগ স্থগিত রাখা সম্ভব, উহাদের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, মনে কর, কোন ব্যক্তির পাঁচজোড়া জুতা আছে। জুতার দাম বাড়িলে ষষ্ঠ জোড়া জুতার চাহিদা সে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রাখিতে পারে। সুতরাং তাহার নিকট ষষ্ঠ জোড়া জুতার চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

৭। **দ্রব্যটির উপর আয়ের কতটা পরিমাণ ব্যয় হইবার সম্ভাবনা :** যে সকল দ্রব্যের উপর ক্রেতা তাহার মোট আয়ের অতি সামান্য অংশই ব্যয় করে সেই সকল দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। যেমন, লবণের উপর ভোগকারী খুবই সামান্য ব্যয় করে, অতএব লবণের চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক।

৮। **সময় :** সময়ের ব্যবধানেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতায় তারতম্য দেখা দেয়। বাজার যত স্বল্পকালীন হইবে, চাহিদাও তত বেশি অস্থিতিস্থাপক হইবে; আর বাজার যত বেশি দীর্ঘকালীন হইবে চাহিদাও তত বেশি স্থিতি-স্থাপক হইবে। ইহার একাধিক কারণ আছে। প্রথমত, অল্প সময়ের মধ্যে ভোগ-কারিগণ কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইলে নিজেদের ভোগের অভ্যাস তাড়াতাড়ি বদলাইয়া ফেলিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাগণ উহার খবরাখবর জানিতে পারে না। বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে চাহিদার উপর দাম হ্রাসের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তৃতীয়ত, কোন স্থায়ী দ্রব্যের ব্যবহার কালে যদি দ্রব্যটির দাম কমিয়াও যায়, তাহা হইলে ভোগকারী ঐ দ্রব্যটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করিযা নিঃশেষ না করা পর্যন্ত দ্বিতীয় আর একটি ঐ দ্রব্য ক্রয় করে না। অন্যদিকে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে লোকের প্রচলিত ভোগের ধরন বদলায়, দাম সম্পর্কে তাহারা ভালভাবে ওয়াকিবহাল হয়। ফলে, দীর্ঘকালে দামের পরিবর্তনের অনুপাত অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের অনুপাত বেশি হইতে দেখা যায়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এইরূপ একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কোন দ্রব্যের বেলায় সুজাসুজি স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব
(Importance of Elasticity of Demand)

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ :

১। **উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণে গুরুত্ব :** একচেটিয়া ও বিভিন্ন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন উৎপাদক ফার্ম যখন পণ্যের উৎপাদন পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করে তখন উহাকে পণ্যের চাহিদার প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক খবর রাখিতে হয়। পণ্যটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার

মাত্রা যদি বেশি হয় তাহা হইলে ফার্মটি কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। আবার, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা যদি কম হয় তাহা হইলে ফার্ম বেশি দামে কম পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে।

২। **কর নির্ধারণ ব্যাপারে গুরুত্ব :** সরকার যখন কোন কর ধার্য করে তখন করের ভার যাহাতে বিভিন্ন কর দাতাগণের মধ্যে সুবণ্টিত হয় তাহা দেখিতে হয়। করভারের বণ্টন আবার নির্ভর করে যে দ্রব্যটির উপর কর স্থাপন করা হইয়াছে উহার চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। রাজস্ব সংগ্রহের দিক হইতে দেখিতে গেলেও সরকারকে দেখিতে হইবে যে, দ্রব্যটির উপর সরকার কত কর ধার্য করিতে চায়, উহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক না অস্থিতিস্থাপক। সাধারণত অস্থিতিস্থাপক চাহিদার বিশিষ্ট দ্রব্যের উপর অধিক হারে কর ধার্য করাই সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক। তবে এই সকল দ্রব্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলিয়া ইহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিলে গরিবদের উপরই করের ভার বেশি পড়িবে।

৩। **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্ব :** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের শর্তাবলী (terms of trade) ও বিনিময় হার নিরূপিত হয়, তখন দুই দেশের দ্রব্যের পরস্পরের চাহিদা স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

৪। **উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম নির্ধারণে গুরুত্ব :** উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের পারিশ্রমিক বা মূল্য নির্ণয়ে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব আছে। উৎপাদনকারিগণের নিকট যে উপাদানের চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক, সে উপাদানের পক্ষে বেশি পারিশ্রমিক লাভ করার সম্ভাবনা তত কম; আবার, যে উপাদানের চাহিদা যত কম স্থিতিস্থাপক, সে উপাদানের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা তত বেশি।

৫। **জাতীয়করণ প্রশ্ন নির্ধারণে গুরুত্ব :** দেশের কোন শিল্প জাতীয়করণের পক্ষে উপযোগী কি না তাহা নির্ধারণেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব আছে। যদি দেশের কোন একটি শিল্প বেসরকারী একচেটিয়া কারবারীর অধীনে আসে এবং ঐ শিল্পোৎপন্ন পণ্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে ঐ কারবারীর পক্ষে দ্রব্যের যোগান হ্রাস করিয়া ভোগকারিগণের নিকট হইতে অত্যধিক দাম আদায় করার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে শিল্পটির জাতীয়করণ করা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

৯ | # জমি
(Land)

জমির সংজ্ঞা
(Definition of Land)

সাধারণ অর্থে জমি বলিতে মাটি কিংবা ভূত্বক বুঝায়। কিন্তু অর্থবিদ্যায় জমি কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মানুষের ব্যবহারে লাগে এমন যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদকেই জমি আখ্যা দেওয়া যায়। জমির এই ব্যাপক অর্থ ধরিলে ইহা শুধু ভূখণ্ডের উপরিস্থ মাটিকে বুঝায় না—নদ-নদী, সমুদ্র, বন, খনি, বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির সকল দানই জমি। অবশ্য প্রকৃতির যেসকল দান মানুষ নিজের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে পারে না উহাদের জমির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। যেমন, বায়ুপ্রবাহ, সূর্যালোক প্রভৃতি প্রকৃতির দানগুলির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নাই। সেইজন্য ইহাদের জমি বলা চলে না। জমি বলিতে সেই সকল প্রকৃতির দানকে বুঝায় যেগুলি মানুষের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়া আয় উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে।

জমির বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Land)

উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসাবে জমির কতকগুলি বিশেষ গুণ নির্দেশ করা যায়। জমির এই বিশেষ গুণগুলি নিচে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল:

(১) জমির যোগান সীমাবদ্ধ

প্রথমত, জমি প্রকৃতির দান এবং সেই হেতু ইহার যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ। জমির উৎপাদিকা শক্তিও আদিম ও অক্ষয় (original and indestructible) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। কেন না, জমির যোগান বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে হ্রাস-বৃদ্ধি পাইতে পারে। যেমন, ভূমিকম্প, বৃষ্টিপাত

বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির জন্য জমির যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। আবার অনাবাদী জমির পুনরুদ্ধার, মরু-অঞ্চলকে কৃষি আবাদে পরিণত করা প্রভৃতি পদ্ধতির দ্বারা জমির যোগান বৃদ্ধি পাইতে পারে। তাহা ছাড়া, জমির উৎপাদিকাশক্তিও সম্পূর্ণভাবে অক্ষয় নহে। বছরের পর বছর কৃষি উৎপাদনের ফলে জমির এই উপাদানটির ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। আবাব, বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার দ্বারা জমির আদিম ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। সুতরাং, একথা বলা চলে যে, জমির যোগান ও উৎপাদিকাশক্তি স্বল্পকালে সীমাবদ্ধ হইলেও দীর্ঘকালে পরিবর্তনশীল।

(২) জমির গতিশীলতা অবাধ নহে

দ্বিতীয়ত, জমির গতিশীলতা অবাধ নহে। ফলে, ইহার ব্যবহারান্তর ঘটা সম্ভব নহে। যে জমিতে পাট উৎপাদন করা যায়, সেই একই জমিতে সহজে চা বা কফি উৎপাদন করা চলে না।

কিন্তু জমির একটিমাত্র ব্যবহার অনুমান করাও ঠিক নহে। অনেক ক্ষেত্রেই জমির ব্যবহারান্তর ঘটা সম্ভব। যে জমি ধান উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছে, চেষ্টা করিলে সেই জমি পাট উৎপাদনের উপযোগী হইতে পারে। জমির ব্যবহারান্তর ঘটা প্রধানত নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের আপেক্ষিক মূল্যের উপর।

(৩) জমি ভিন্নজাতীয়

তৃতীয়ত, উর্বরতা ও অবস্থানের দিক হইতে জমি ভিন্নজাতীয় (Land is heterogeneous in composition and situation)। উর্বরতার দিক হইতে দেখিতে গেলে, কতকগুলি জমির একেবারে উৎপাদিকা শক্তি নাই, আবার কতকগুলি জমি খুবই উর্বর। অবস্থানের দিক দিয়াও অনেক রকম জমি আছে। কতকগুলি জমি আছে যাহাতে উৎপাদন করিয়া ফসলের যে বাজার মূল্য পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা উহার উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে। এই শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক-অধম জমি (sub-marginal land) বলে। এই শ্রেণীর জমির চাষাবাদ বাস্তবক্ষেত্রে বড় একটা দেখা যায় না। আবার, এক শ্রেণীর জমি আছে যাহার উৎপাদন ব্যয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার-দাম সমান হয়। এই ধরনের জমি চাষাবাদ করিলে লাভও হয় না, লোকসানও হয় না। ইহাকে প্রান্তিক জমি (marginal land) বলে। আবার প্রান্তিক জমির চেয়ে সেরা পর্যায়ের জমি আছে যাহার

উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে কম হয়। এই ধরনের জমির চাষাবাদ স্বভাবতই লাভজনক। এই শ্রেণীর জমিকে প্রান্তিক-সেরা জমি (intra-marginal land) বলা হয়।

(৪) জমির উৎপাদন ব্যয় নাই

চতুর্থত, জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নাই (Land has no cost of production)। জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বলিয়া উহা উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করিতে কাহাকেও শ্রম করিতে হয় না। সমাজের দিক হইতে জমির যোগান বাজার-দামের উপর নির্ভর করে না। বাজার-দাম অধিক হইলে জমির যোগান বাড়ে না, আবার, বাজার-দাম কমিয়া গেলে জমির যোগান হ্রাসও পায় না। কিন্তু মূলধন বা শ্রমের বেলায় উৎপাদন ব্যয় আছে।

(৫) জমির উপর উৎপাদন বিশেষ-ভাবে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধির নিয়মাধীন

পরিশেষে, বলা হয় যে, জমির ক্ষেত্রে উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধিটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া যদি উহাতে উৎপাদন বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়। উহার ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে।

জমির যে বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচনা করা হইল, উহারা কেবল জমির বেলায়ই প্রযোজ্য নহে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ মনে করেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও কম-বেশি প্রযোজ্য। বিশেষ করিয়া জমি ও মূলধন—এই দুইটি উপাদানের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য (fundamental difference) নাই।

জমি ও মূলধন
(Land and Capital)

প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ্‌গণ জমি ও মূলধনের মধ্যে প্রধানত নিম্নলিখিত পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন :

(ক) জমি প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ কিন্তু মূলধন মানুষের পরিশ্রম-লব্ধ সম্পদ।

(খ) জমির কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই কিন্তু মূলধনের উৎপাদন-ব্যয় আছে।

(গ) জমির যোগান প্রকৃতি দ্বারা নির্দিষ্ট কিন্তু মূলধনের যোগান পরিবর্তনশীল।

কিন্তু জমি ও মূলধনের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি মূলগত পার্থক্য নহে। কেন না, জমির যে সকল বিশেষ গুণ আছে সেই গুণগুলি মূলধনের বেলায়ও কম-বেশি প্রযোজ্য।

জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। কিন্তু জমিতে উৎপাদন কার্য করিবার জন্য সেচ-ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সার, উন্নত ধরনের বীজ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। জমিতে এই ধরনের নিয়োগ মানুষের শ্রম ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং, জমিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিদত্ত সম্পদ বলা চলে না; জমি উৎপাদনকার্যে ব্যবহার করিতে হইলেই উহাতে মানুষের শ্রম নিয়োগ করিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নাই, একথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমির যোগানে কেহ কোন ব্যয় বা পরিশ্রম করে নাই। জমি আপনা হইতে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হইবার জন্য পড়িয়া আছে। কিন্তু ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে জমির অবশ্যই উৎপাদন ব্যয় আছে।

তৃতীয়ত, জমির যোগানও সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট নহে। পতিত জমির পুনরুদ্ধার ও অন্যান্য পদ্ধতি দ্বারা জমির যোগান বৃদ্ধি করা যায়। আবার মূলধনের যোগানও স্বল্পকালে নির্দিষ্ট থাকিতে পারে। জমি ও মূলধনের মধ্যে শুধু এইমাত্র প্রভেদ যে, মূলধন যেমন স্বল্পকালের মধ্যেই বাড়ানো-কমানো যায়, জমির যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইলে কিন্তু দীর্ঘ সময় লাগে।

পরিশেষে, উপাদান হিসাবে জমিই কেবল ভিন্নজাতীয় (heterogeneous) নহে। মূলধনও ভিন্নজাতীয় হইতে পারে। দুইখণ্ড জমি যেমন গঠন ও অবস্থানের দিক হইতে কোন মতেই পরস্পরের সহিত সমান নহে, তেমনি দুইটি ক্ষেত্র বা কারখানাও গঠন ও উৎপাদনশীলতার দিক হইতে পরস্পর সমগোত্রীয় নহে।

উপরের আলোচনা হইতে এই মন্তব্য করা চলে যে, জমি ও মূলধনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য এই উপাদান দুইটির মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ,

জমির যোগান অত্যন্ত মন্থর গতিতে হ্রাস-বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মূলধনের যোগান খুব তাড়াতড়ি পরিবর্তনশীল।

প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

What are the characteristics of land? Is the distinction between land and capital fundamental?

জমির বৈশিষ্ট্য কি কি? জমি ও মূলধনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য আছে কি? [পৃঃ ১৭৬-১৮০]

১০ | শ্রম

শ্রম
(Labour)

শ্রমের অর্থ
(Meaning of Labour)

অর্থশাস্ত্রে শ্রম বলিতে কেবল কায়িক মেহনত বুঝায় না। সকল রকম কায়িক ও মানসিক মেহনত, যাহা দ্বারা উপযোগ বৃদ্ধির সহায়তা হয়, তাহাই শ্রম বলিয়া গণ্য করা হয়। সামান্য দিন-মজুর কুলির কায়িক পরিশ্রম যেমন শ্রম, সেইরূপ মানসিক কর্মচারী, উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তার প্রভৃতির কাজকর্মও শ্রমপদবাচ্য। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল বকম কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমকেই শ্রম বলা চলে না। পীড়াগ্রস্ত সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননী যে সেবাকার্য বা পরিশ্রম করেন তাহাকে অর্থবিদ্যায় শ্রম বলা যায় না। সেইরূপ যখন অধ্যাপক বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে অন্য বিদ্যায়তনে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করেন তাহার সেই মেহনতও শ্রম নয়। কেবল সেই কায়িক ও মানসিক মেহনত ও সেবাকার্যই শ্রমপদবাচ্য যাহা অর্থমূল্যে বিনিময় হইয়া থাকে।

শ্রমের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Labour)

শ্রম উৎপাদনের একটি মৌলিক উপাদান। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উৎপাদনে নিয়োগ করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে শ্রমের যোগান দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। উৎপাদনের অন্যতম উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমত, শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে বটে, কিন্তু নিজেকে বিক্রয় করে না। শ্রমিক অপরের জন্য কাজ করে ; কিন্তু তাহার এই কাজ করার অর্থ ইহা নহে যে, তাহার নিজের কোন স্বাধীনতা নাই। সে কাজ করিলেও নিজে নিজেরই সম্পত্তি থাকিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, শ্রম সর্বাপেক্ষা ধ্বংসশীল (perishable) উপাদান। অবশ্য জমি, মূলধন প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানও ধ্বংসশীল। কিন্তু শ্রমিক যদি একদিন কাজে না লাগে তাহা হইলে তাহার শ্রম যেমন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, জমি ও মূলধনের বেলায় তাহা হয় না। শ্রম অত্যধিক ধ্বংসশীল বলিয়া শ্রমিককে অনেক সময় ভালভাবে দামদস্তুর না করিয়াই শ্রম বিক্রয় করিতে হয়।

তৃতীয়ত, শ্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার যোগান জিনিসের যোগানের মত পরিবর্তনশীল নহে। কোন দ্রব্যের দাম বাড়িলে যেমন উহার যোগান বৃদ্ধি পায়, আবার দাম কমিলে তেমন উহার যোগান হ্রাস পায়। শ্রমের বেলায় তাহা খাটে না। মজুরি বৃদ্ধি পাইলে শ্রমের যোগান যে বাড়িবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনেক সময় দেখা যায়, মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক স্বল্প পরিশ্রমে কিংবা পূর্বের মত কঠোর পরিশ্রমের পরিবর্তে অবসর উপভোগ কাম্য মনে করিতে পারে। ইহার ফলে শ্রমের মোট যোগান আগের চেয়ে হ্রাস পাইতে পারে। অপর পক্ষে, মজুরির হার যদি কমে তাহা হইলে পূর্বেকার জীবনযাত্রা বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিক অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে পারে। ইহাতে শ্রমের মোট যোগান বাড়িতে পারে।

চতুর্থত, স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের চাহিদার সহিত শ্রমের যোগানের সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। যদি হঠাৎ দেখা যায় অস্বাভাবিকরূপে শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে স্বল্পকালে যোগানবৃদ্ধি দ্বারা উহা পূরণ করা সম্ভব নহে। সেইরূপ যদি আর্থিক মন্দা দেখা দেয় এবং উহার দরুণ শ্রমের চাহিদা অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পায় তাহা হইলে শ্রমের যোগান হ্রাস করাও সম্ভব নহে। শ্রমের যোগান জনসংখ্যা ও শ্রমিকের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য কেবলমাত্র দীর্ঘকালের ভিত্তিতেই শ্রমের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সঙ্গতি সাধন সম্ভবপর।

শ্রমের যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে আলোচনা করা হইল উহারা অন্যান্য উপাদানের বেলাতেও কম-বেশি প্রযোজ্য। অবশ্য শ্রমের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষমাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্য শ্রমকে অন্যান্য উপাদান হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। শ্রমকে পৃথক একটি উপাদান ধরিলে শ্রমের মূল্য নির্ণয় পৃথকভাবে করিবার সুবিধা হয়।

শ্রমের গতিশীলতা
(Mobility of Labour)

শ্রমিকের এক স্থান হইতে অপর স্থানে অবাধ চলাচল কিংবা এক কাজ হইতে বাধাহীন ভাবে কার্যান্তর গ্রহণকে শ্রমের গতিশীলতা বলে। এক স্থান হইতে অপর স্থানে চলাচলকে ভৌগোলিক গতিশীলতা (geographical mobility of labour) এবং এক কাজ হইতে কার্যান্তর গ্রহণকে বৃত্তিগত গতিশীলতা (occupational mobility of labour) বলে। বৃত্তিগত গতিশীলতা আবার দুই ধরনের হইতে পারে—অনুভূমিক গতিশীলতা (horizontal mobility) এবং উল্লম্ব গতিশীলতা (vertical mobility)। এক বৃত্তি হইতে সমপর্যায়ের (same grade) অপর এক বৃত্তিতে শ্রমের সচলতাকে অনুভূমিক গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন টাইপিস্ট যদি চিনি-শিল্পের কোন কারখানা পরিত্যাগ করিয়া ইস্পাত-শিল্পের কোন কারখানায় একই ধরনের টাইপিস্টের কাজ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে অনুভূমিক গতিশীলতা বলা হয়। অপর পক্ষে, যদি কোন শ্রমিক একই শিল্পের এক স্তর হইতে অপর স্তরে উন্নীত বা অবনীত হয়, তাহা হইলে ঐ সচলতাকে উল্লম্ব গতিশীলতা বলা যায়। যেমন, কোন চিনি-শিল্পের কারখানায় নিযুক্ত একজন টাইপিস্ট যদি ঐ প্রতিষ্ঠানেরই ম্যানেজার বা প্রচারকর্তা পদে উন্নীত হয়, তাহা হইলে উহাকে ঐ শ্রমিকের উল্লম্ব গতিশীলতা বলা চলে।

শ্রম-গতিশীলতার প্রতিবন্ধক
(Obstacles to Mobility of Labour)

শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার পথে নিম্নলিখিত একাধিক প্রতিবন্ধক দেখা যায় :

(১) জলবায়ু, আচার-পদ্ধতি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির বৈষম্যের জন্য শ্রমিকের সচলতা অবাধ হইতে পারে না।

(২) অনেকদিন একস্থানে বসবাস করিলে পারিপার্শ্বিকের উপর শ্রমিকের একটা ভালবাসা বা স্বাভাবিক টান জন্মে, যাহার জন্য তাহার অবাধ গতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে নূতন অজানা পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ যাইয়া কাজ করিতেও শ্রমিক সাধারণত রাজী হয় না।

(৪) নিত্য নূতন বৃত্তি শিক্ষা করা বা গ্রহণ করাও শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য যে বৃত্তি সে একবার শিক্ষা করে, তাহা ধরিয়াই সে স্বভাবত থাকিতে চায়। এক বৃত্তি আশ্রয় করিয়া কিছুকাল থাকিলে শ্রমিক উহাতে এতটা রপ্ত হইয়া যায় যে, সহজে উহা ত্যাগ করিয়া অন্য কাজ গ্রহণ করিতে চাহে না।

(৫) জাতীয় বা আঞ্চলিক আইনের বাধার জন্যও অনেক সময় একদেশের শ্রমিক অন্যদেশে সহজে যাতায়াত বা ভিন্নবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে না।

(৬) যাতায়াত বা পরিবহণের অসুবিধা ও ব্যয়ভার অনেক সময় শ্রমিকের সচলতা নষ্ট করে।

(৭) বিভিন্ন স্থান ও বৃত্তি সম্পর্কে শ্রমিকের অজ্ঞতা তাহার অবাধ গতিশীলতা অনেকখানি প্রতিরোধ করে।

এইরূপ বিভিন্ন কারণে শ্রমিকের অবাধ সচলতা ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই শ্রমের বাজার (labour market) বাস্তবক্ষেত্রে নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ (perfect) হইতে পারে না।

শ্রমের যোগান
(Supply of Labour)

কোন দেশে শ্রমের যোগান নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর : (১) জনসংখ্যা ও (২) শ্রমের দক্ষতা। সাধারণত জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে শ্রমের যোগানও বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রমের যোগান অর্থ দেশের মোট জনসংখ্যা নহে। দেশের মোট জনসংখ্যাই উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয় না। যেমন, শিশু, বৃদ্ধ কিংবা কর্মে অক্ষম অনেক নর-নারী উৎপাদনকার্যে যোগ দেয় না। দেশের মোট শ্রমের যোগান হিসাব করিবার সময় ইহাদের শ্রমকে বাদ দিতে হয়। কোন দেশে শ্রমের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে একদিকে যেমন উৎপাদন-কার্যে নিযুক্ত কর্মক্ষম শ্রমশীল নর-নারীর সংখ্যা ধরিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি তাহারা দিনে কত ঘণ্টা পরিশ্রম করে তাহাও হিসাবে ধরিতে

হয়। শ্রমশীল নর-নারীর দৈনিক পরিশ্রমের মেয়াদ বাড়িয়া গেলে তাহাদের সংখ্যা না বাড়িলেও শ্রমের পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়া থাকে।

শ্রমের যোগান আবার নির্ভর করে শ্রমের দক্ষতার উপর। শ্রমশীল নর-নারীর সংখ্যা না বাড়িলে কিংবা তাহাদের কাজের সময় না বাড়িলেও, শ্রমের যোগানের মোট পরিমাণ বাড়িতে পারে, যদি অবশ্য উহারা পূর্বের চেয়ে অধিক দক্ষতার সহিত কাজ করে। অধিক কার্যকুশলী হইলে একই সংখ্যক শ্রমশীল নর-নারী একই সময়ের মধ্যে শ্রম যোগানের মোট পরিমাণ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি করিতে পারে।

সাধারণভাবে বলা চলে যে, অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে জনসংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাইবে শ্রমের যোগানও তত বাড়িবে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি নিয়ম দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, সে সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ বিভিন্ন তত্ত্বের নির্দেশ দিয়াছেন। জনসংখ্যার এই বিভিন্ন তত্ত্বগুলির মধ্যে (১) **ম্যালথুসীয়-তত্ত্ব** (Malthusian theory), (২) **কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব** (Optimum theory) এবং (৩) **নীট পুনরুৎপাদন হার-তত্ত্ব** (Net Reproduction Rate Theory) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ম্যালথুসীয়-তত্ত্ব
(Malthusian Theory)

ইংরাজ ধর্মযাজক ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত এক পুস্তকে জনসংখ্যা-তত্ত্বের এক ব্যাখ্যা দেন। এই তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

প্রকৃতি মানুষ এবং অন্যান্য জীবকে সন্তান উৎপাদনের বিশেষ ক্ষমতা দান করিয়াছে। ইহার ফলে, জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ম্যালথাস বলেন, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (geometrical progression) বাড়িতে থাকে, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বাড়ে পাটিগাণিতিক প্রগতিতে (arithmetical progression)।[1] জমিতে ক্রম-হ্রাসমান উৎপন্ন

১. যখন ১, ২, ৪, ৮, ১৬ ইত্যাদি গুণিতক হারে (by multiplication) বাড়ে, উহাকে বলা হয় জ্যামিতিক প্রগতি।

যখন ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি যোগের হারে (by addition) বাড়ে, উহ কে বলা হয় পাটিগাণিতিক প্রগতি।

বিধি কার্যকর হওয়ার দরুণ খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত তাল রাখিতে পারে না। জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করিলেও দেখা যায়, প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে জনসংখ্যার হার খাদ্যোৎপাদনের দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যখন খাদ্যোৎপাদনের হারকে ছাড়াইয়া যায়, তখনই দেশে জনাধিক্য (over population) সমস্যা দেখা দেয়।

জনাধিক্য সমস্যার কারণ

এই ভাবে জনাধিক্য ঘটিলে দেশে খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দেয়। এই সকল বিপর্যয়কর অবস্থার ফলে জনসংখ্যার অতিরিক্ত কিছুটা অংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং জনসংখ্যাও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে যখন দুর্ভিক্ষ, খাদ্যাভাব, মহামারী প্রভৃতি দ্বারা জনসংখ্যা নিশ্চিহ্ন হয়, ম্যালথাস এই অবস্থাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অধিক সংখ্যক সন্তানোৎপাদন মানুষের পাপ। প্রকৃতি মানুষের এই পাপের প্রতিশোধ লইয়া থাকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলির কার্যকারিতার মাধ্যমে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়

কিন্তু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কার্যকর হওয়ার ফলে খাদ্য যোগান ও জনসংখ্যার মধ্যে যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তাহা খুবই স্বল্পস্থায়ী। মানুষের সন্তানোৎপাদনের স্পৃহা এত প্রবল যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাহা খাদ্য যোগানকে ছাড়াইয়া যায়। ম্যালথাস মনে করেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কার্যকর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই উপায়গুলি অ-মানবোচিত ও দুঃখবহ। আবার, এই উপায়গুলি জনসংখ্যা ও খাদ্য যোগানের মধ্যে স্থায়ী ভারসাম্য স্থাপনে সক্ষমও নহে। সেইজন্য, ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রতিরোধমূলক বাধা (preventive checks) অবলম্বন করা উচিত। বাল্যবিবাহ পরিহার, নৈতিক সংযম অবলম্বন, জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি উপায় দ্বারা মানুষ সাফল্যের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশে খাদ্যসামগ্রীর অভাব ও দারিদ্র্য দূর করিতে পারে। ১৮৭ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত রেখাচিত্রের সাহায্যে

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক বাধা

ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা-তত্ত্বটিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝানো যায়। এই রেখাচিত্রটিকে ম্যালথুসীয় চক্র (Malthusian cycle) বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

চিত্রে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু জনসংখ্যার সর্বদাই খাদ্য যোগানকে ছাড়াইয়া যাইবার দিকে ঝোঁক দেখা দেয়। ফলে, শীঘ্রই জনাধিক্য ঘটে। তখন জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কাজ করিতে থাকে এবং অতিরিক্ত জন-সংখ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা পুনরায় স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ভারসাম্য মাত্র। আবার জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেয়।



ম্যালথুসীয়-তত্ত্বের সমালোচনা
(Criticisms of the Malthusian Theory)

ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ত্বের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত একাধিক সমালোচনা করা হইয়াছে :

(১) ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশসমূহে মোটেই ফলে নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কৃষি ও শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের উৎকর্ষ এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছে যে, ঐ সকল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা দেখা দেয় নাই। তাহাছাড়া, পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্রুত প্রচলন হওয়াতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিলাভ না ঘটিয়া ম্যালথাসের বাণী পাশ্চাত্য দেশসমূহে মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ম্যালথাসের বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে

(২) ম্যালথাস ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধির কার্যকারিতা অনুমান করিয়া লইয়া জনসংখ্যা-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিরও যে সম্ভাবনা থাকে তাহা তিনি

বিচার করেন নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন করিবার মত যে অতিরিক্ত হস্ত বা শ্রমের যোগান পাওয়া যায়, ম্যালথাস ইহা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন রকমের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা কৃষি উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধির ক্রিয়াকে বেশ কিছু সময় স্থগিত রাখা যায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে

(৩) ম্যালথাস জনসংখ্যার আয়তন ও খাদ্য যোগানের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহাও অভ্রান্ত নহে। জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা কেবলমাত্র দেশের খাদ্য-যোগান বৃদ্ধির পটভূমিকায় বিচার্য নহে; জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মোট ধনোৎপাদন বৃদ্ধির পটভূমিকায় বিচার করিতে হয়। কোন দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য হয়তো খাদ্যসামগ্রীর যোগানে টান পড়িতে পারে, তাহাতে জনসংখ্যা সমস্যা বাস্তবত দেখা দেয় না, যদি না সে দেশে ধনসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির বাধা সৃষ্টি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশে ধনোৎপাদনও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই দেশের খাদ্য সামগ্রীর ঘাটতি বিদেশ হইতে আমদানি করিয়া মিটানো যায়। অতএব, জনসংখ্যা সমস্যার মূলসূত্র দেশের জনসমষ্টির বৃদ্ধিতে নয়, সমস্যার আসল সমাধান হইল দেশে ধনসম্পদ উৎপাদন দক্ষতায় এবং উৎপাদিত সম্পদের ন্যাষ্য বণ্টনে। (The problem of population is not one of mere size, but of efficient production and equitable distribution.)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আসল সমস্যা খাদ্য যোগান বৃদ্ধির পটভূমিকায় বিচার্য নহে, ধন-উৎপাদন বৃদ্ধি ও উহার ন্যায্য বন্টনে বিচার্য

(৪) পরিশেষে, ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করিয়া দেখেন নাই। শিক্ষার প্রসার ও সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নত রাখিতে সচেষ্ট হয়। উন্নত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার জন্য তাহারা বাল্যবিবাহ পরিহার, জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার সীমিতকরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য অনেক দেশে সম্প্রতি ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যার সমস্যা দেখা দিয়াছে।

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিচার করেন নাই

উপরি-উক্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ত্বের

মূল সত্য অস্বীকার করা যায় না। একথা অবশ্য সত্য যে, বিজ্ঞানের উন্নতি, শিক্ষার প্রসার এবং জীবনযাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আয়তন সর্বত্র ছোট হইয়া আসিতেছে এবং তাহার ফলে ম্যালথুসীয়-তত্ত্বটির কার্যকারিতা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

তথাপি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে বলা চলে যে, ম্যালথাসের জনসংখ্যার তত্ত্বটি সকল দেশেই একদিন-না-একদিন কার্যকর হইতে বাধ্য।

ম্যালথুসীয়-তত্ত্বের মূল সত্য ও উহার কারণ

উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার ফলে জন্মের হার ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু ঐ সকল দেশেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি একদিন-না-একদিন অবশ্য কার্যকরী হইবে। তখন ম্যালথাসের তত্ত্বটি কালের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবে।

দ্বিতীয়ত, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি দ্বারা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা সমাধান করাও স্বল্পকালে সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালের ভিত্তিতে দেখিতে গেলে দেখা যায়, কোন দেশই আমদানির মাধ্যমে ইচ্ছামত খাদ্য-যোগান বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিল্পপ্রসার যত বাড়িতে থাকিবে, যতই বিভিন্ন দেশের মধ্যে শিল্প-অগ্রগতির আপেক্ষিক পার্থক্য হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই কোন দেশ আমদানির উপর নির্ভর করিয়া বেশি দিন চলিতে পারিবে না।

তৃতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি অনেক সময় কার্যকর হইতে দেখা যায়। দেখা গিয়াছে, যুদ্ধের ফলে অনেক উন্নত দেশও প্রচুর লোকক্ষয়ের মাধ্যমে ক্রমহ্রাসমান জনসংখ্যা সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফ্রান্সের কথা বলা চলে।

পরিশেষে, সাম্প্রতিক পৃথিবীর জনসংখ্যায় যে সমীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা বিচার করিলে বলা চলে যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয় দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর অনগ্রসর ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে গণবিস্ফোরণ (population explosion) জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ইউরোপের দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে এবং কৃষি ও শিল্পোৎপাদন অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত ও অর্ধোন্নত অঞ্চলগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব উচ্চ এবং খাদ্যাভাব চরম আকার

ধারণ করিয়াছে। জনসংখ্যাধিক্য এই সকল দেশের প্রকৃত সমস্যা। এই সকল দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনা প্রণেতাগণ ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্‌বাণীর মোকাবিলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

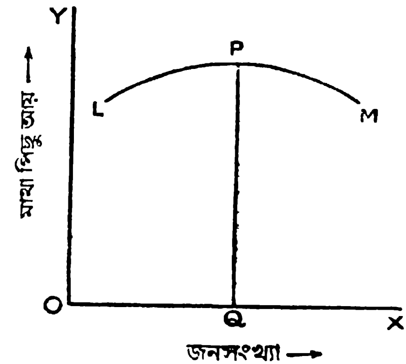
কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব
(The Optimum Theory of Population)

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহা এক হিসাবে ম্যালথাসের নৈরাশ্যমূলক জনসংখ্যা-তত্ত্বের জবাব হিসাবে গ্রহণ করা চলে। কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটিকে অর্থনৈতিক উন্নতির প্রমাণবিচার (test of economic progress) বলা হইয়া থাকে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ধনোৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে তাহা হইলে ভয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। জনসংখ্যার সমস্যাকে কেবলমাত্র খাদ্যোৎপাদনের ভিত্তিতে তুলনা না করিয়া দেশের মোট ধনোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। লোকের মাথা-পিছু আয় যতক্ষণ বাড়িতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে জনাধিক্য সমস্যা দেখা দিতে পারে না।

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব জনসংখ্যার সমস্যাকে খাদ্যযোগানের ভিত্তিতে বিচার না করিয়া ধনোৎপাদনের ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকে। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিবার জন্য একটি বিশেষ সংখ্যার জনসমষ্টির প্রয়োজন হয়। যে জনসংখ্যা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাইতে পারে, উহাকে কাম্য জন-সংখ্যা বলা হয়। দেশের জনসংখ্যা যদি এই কাম্য জনসংখ্যা হইতে কম হয় তাহা হইলে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে না, লোকের মাথাপিছু আয়ও (per capita income) সর্বাধিক হইতে পারে না। আবার, দেশের জনসংখ্যা যদি কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে মোট জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইবে।

সুতরাং, কাম্য জনসংখ্যা এমন একটি সংখ্যা যাহা কাজে লাগাইলে মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হইবে। এই জনসংখ্যা দ্বারা উৎপাদন করিলে সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থায় (point of maximum return) পৌঁছানো যায়। এই

অবস্থায় দেশের জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলি ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভারসাম্য অবস্থাতে জনসংখ্যা বা শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিলে উৎপন্নের হার সর্বাধিক থাকিতে পারে না। সর্বাধিক উৎপন্নের অবস্থায় যে জনসংখ্যা প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে কাজে লাগায় সেই জনসংখ্যাই কাম্য জনসংখ্যা। এই সংখ্যার চেয়ে জনসংখ্যাকে বাড়িতে দিলে মাথাপিছু আয় আর সর্বাধিক থাকিবে না, উহা কমিতে থাকিবে এবং জনাধিক্য সমস্যা দেখা দিবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটিকে আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝানো যায়:



OX অক্ষটি জনসংখ্যা এবং OY অক্ষটি মাথাপিছু আয় নির্দেশ করিতেছে। LM মাথাপিছু আয়ের রেখা। জনসংখ্যা OQ পর্যন্ত বাড়িয়া গেলে মাথাপিছু আয়ও বাড়িয়া যায়। কিন্তু জনসংখ্যা OQ সংখ্যার চেয়ে বেশি বাড়িলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইতে থাকিবে। অতএব OQ পরিমাণ জনসংখ্যা নিয়োগ করিলে মাথাপিছু আয় উৎপাদন PQ সর্বাধিক হইবে। OQ পরিমাণ জনসংখ্যাই কাম্য জনসংখ্যা। OQএর চেয়ে কম পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার চেয়ে কম হইবে, আবার OQএর চেয়ে বেশি জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যার চেয়ে বেশি হইয়া জনাধিক্য ঘটাইবে।

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের সমালোচনা
(Criticisms of the Optimum Theory of Population)

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটি একাধিক কারণে সমালোচিত হইয়াছে:

এই তত্ত্বটির প্রধান গলদ এই যে, ইহা একটি কল্পনাপ্রসূত স্থিতিশীল

(static) ধারণা। গতিশীল অর্থব্যবস্থার সহিত ইহা সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে না। পরিবর্তনশীল উন্নয়নমান অর্থব্যবস্থার পক্ষে ইহা মোটেই উপযোগী নহে। কাম্য জনসংখ্যা কোন ক্রমেই অপরিবর্তনীয় সংখ্যা হইতে পারে না। কাম্য জনসংখ্যার বিন্দু স্থিতিশীল নহে। দেশে নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে, মূলধনের বৃদ্ধিতে, উৎপাদনের নূতন নূতন সাজ-সরঞ্জাম প্রচলনে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কাম্য জনসংখ্যা নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে না। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির যোগান বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এবং উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতির ফলে কাম্য জনসংখ্যা আর কাম্য থাকে না, কমিয়া কাম্য সংখ্যার চেয়ে কম হয়।

(১) ইহা একটি স্থিতিশীল ধারণা

দ্বিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব। জনসাধারণের মাথাপিছু আয়ের উঠা-নামা পরিমাপ করা সহজ ব্যাপার নহে। দেশের পুঁজি-সঙ্গতির পরিবর্তন ও উৎপাদন পদ্ধতির রদ-বদল সর্বক্ষণ ঘটিয়া থাকে। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকে কোন্ পরিমাণ জনসংখ্যা কাম্য তাহা সঠিকভাবে ধার্য করা যায় না।

(২) কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ করা অসম্ভব

পরিশেষে, কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব ব্যবহারিক জীবনে নীতি নির্ধারণ সম্পর্কেও কোন নির্দেশ দিতে পারে না। আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, উপযুক্ত রাজস্বসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ দ্বারা দেশের কর্ম নিয়োগ, উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু এই নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে কাম্য জনসংখ্যার ধারণাটি কোন কাজে আসে না।

এই তত্ত্বটির ব্যবহারিক জীবনে উপযোগিতা নাই

কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বটি সম্পূর্ণ মূল্যহীন নহে। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্‌বাণী যে নৈরাশ্যমূলক চিত্রের সৃষ্টি করে সে তুলনায় কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্ব অনেকটা আশাপ্রদ। তত্ত্বটি এই আশাই বহন করে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন দেশের শঙ্কার কারণ নাই। যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত উৎপাদন বৃদ্ধিও চলিতে থাকে, তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় বলা চলে। তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার হিসাবেও কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের মূল্য আছে। ইহা

দ্বারা লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বিচার করা যাইতে পারে।

ম্যালথুসীয়-তত্ত্ব ও কাম্য-তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য
(Differences between Malthusian Theory and Optimum Theory)

ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ত্ব এবং কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পার্থক্য নির্দেশ করা যায় :

(১) ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমাজের উপর উহার ফলাফল সম্পর্কে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কাম্য-তত্ত্বটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির তত্ত্ব নহে। ইহা দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ এবং উৎপাদনের সম্পদসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া থাকে।

(২) ম্যালথাস খাদ্য যোগানের ভিত্তিতে জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা বিচার করিয়াছেন। যদি কোন দেশ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন না করিতে পারে তাহা হইলে জনসংখ্যাধিক্য সমস্যার সম্মুখীন হইবে। কিন্তু কাম্য-তত্ত্ব জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যা উৎপাদনের ভিত্তিতে বিচার করিয়াছে। যদি কোন দেশে উৎপাদনের সম্পদগুলি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ জনসংখ্যা প্রয়োজন হয় তাহার চেয়ে অধিক সংখ্যক জনসমষ্টি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ দেশ সংখ্যাধিক্য সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে বলা চলে। ম্যালথাস খাদ্য যোগান বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কাম্য-তত্ত্ব দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়াছে।

(৩) ম্যালথাস তাঁহার তত্ত্বে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়গুলি কার্যকর হইলেও জনসংখ্যা ও খাদ্যযোগানের মধ্যে স্থায়ী সাম্যাবস্থা বজায় রাখা অসম্ভব। প্রত্যেক দেশেরই জনসংখ্যাধিক্যের সমস্যার সম্মুখীন হইবার দিকে ঝোঁক রহিয়াছে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব আশাব্যঞ্জক তত্ত্ব। দেশে যে জনসংখ্যা উৎপাদনের সম্পদগুলি উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য প্রয়োজন হয় উহার চেয়ে যদি বাড়িয়া না যায়, তাহা হইলে জনসংখ্যাধিক্যের আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

(৪) ম্যালথাসের জনসংখ্যা-তত্ত্ব গতিশীল (dynamic) তত্ত্ব। ইহা দীর্ঘকালব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্ব একটি স্থিতিশীল (static) ধারণা। ইহা দেশের উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরের জনসংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। কোন বিশেষ সময়ে বর্তমান উৎপাদনের সম্পদগুলির ভিত্তিতে কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয়।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ প্রায় সকলেই কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বে আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। এখনও পর্যন্ত অনেকে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা-তত্ত্বকে সমর্থন করিয়া থাকেন।

নীট্ পুনরুৎপাদন হার
(Net Reproduction Rate)

কেবলমাত্র জন্মমৃত্যুর হার তুলনা দ্বারা দেশের জনসংখ্যাধিক্যের প্রবণতা পরিমাপ করা যায় না। দেশে জন্মহার যদি মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হয় তাহা হইলেই দীর্ঘকালীন সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, একথা বলা চলে না। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ভালভাবে পরিমাপ করিতে হইলে কুক্জীনস্‌কী (Kuczynski) প্রদত্ত নীট পুনরুৎপাদন হার তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে। কুক্জীনস্‌কীর মতবাদের সারমর্ম হইল, কি হারে সন্তান ধারণক্ষম স্ত্রীলোকের বিভিন্ন সময়ে পুনরুৎপাদন হয়। ধরা যাক, কোন দেশে এক সময়ে সন্তান ধারণক্ষম (১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে) স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০০ জন। যদি ঐ দেশে পরবর্তী যুগে একই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঐ ১০০ই থাকে, তাহা হইলে পুনরুৎপাদনের হার হইবে ১। যদি ১০০ না হইয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যা পরবর্তী যুগে ১১০ হয়, তাহা হইলে পুনরুৎপাদনের হার হইবে ১·১। অর্থাৎ ঐ যুগে শতকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে ১০ জন। অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০০ না হইয়া যদি ৯০ জন হয়, তাহা হইলে নীট পুনরুৎপাদনের হার হইবে ·৯ । ইহার অর্থ পরবর্তীযুগে জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে।

কুক্জীনস্‌কীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সন্তান ধারণক্ষম স্ত্রীলোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

(Population Control)

দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্র্যের লক্ষণ; ইহা লোকের জীবন-যাত্রার মান হ্রাস করিয়া থাকে। অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থই জমির উপর অত্যধিক পরিমাণে চাপ পড়া, খাদ্যাভাবে বেকার সমস্যা প্রভৃতি অর্থনীতিক বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। এই সকল কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অধুনা আর দ্বিমত নাই।

ম্যালথাস তাঁহার জনসংখ্যা তত্ত্বে যে হতাশাব্যঞ্জক চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে শঙ্কিত হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল নব্য ম্যালথুসীয় পন্থী (Neo-Malthusianists) বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহার দ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করিবার অসুবিধা এই যে, এই সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কেবলমাত্র ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ফলে, দেশের জনসংখ্যার গুণগত অবনতি ঘটে। যে-কোন দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে পরিমাণগত ও গুণগত, উভয় দিকের উন্নয়নের পরিকল্পনাই গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা মোকাবিলার জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে:

(১) পরিবার সীমিতকরণ সম্পর্কে জ্ঞান ও নিয়ম-প্রণালী জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। জন্মনিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম যাহাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(২) বাল্যবিবাহ পরিহার এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন প্রাপ্তির পূর্বে বিবাহ পুরাপুরি বন্ধ করিতে হইবে। জনসংখ্যার গুণগত উন্নতিবিধানের জন্য যাহারা বংশগত রোগ বা মানসিক পীড়ায় ভুগিতেছে এমন যুবক-যুবতীর বিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(৩) জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও উচ্চ জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা বিস্তার করিতে হইবে। জনসাধারণ যতই শিক্ষিত হইয়া উঠিবে, ততই তাহারা উন্নত জীবনযাত্রার উপযোগিতা সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবে, ততই তাহাদের মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংক্রিয় হইয়া পড়িবে।

(৪) দেশে ব্যাপক ও আত্যন্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে

হইবে। অর্থনৈতিক উন্নতি দ্রুত তালে চলিতে থাকিলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে লোকের আয়-স্তর ও জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে।

শ্রমের দক্ষতা
(Efficiency of Labour)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, শ্রমের যোগান কেবল জনসংখ্যার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের দক্ষতাও দেশের শ্রমের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। অন্যান্য বিষয়ে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে শ্রমের দক্ষতা যত বাড়িবে শ্রমের যোগানও তত বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমের দক্ষতা আবার বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকের দৈহিক শক্তিসামর্থ্য ও নৈপুণ্য একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, জলবায়ু, খাদ্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা, কাজের শর্ত, মজুরি, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা, কারখানার পরিবেশ প্রভৃতি শ্রমিকের ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও গুণ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া থাকে।

উষ্ণ জলবায়ু শ্রমিকের কর্মনৈপুণ্য ক্ষুণ্ণ করে এবং অলসপ্রবণতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অপর পক্ষে, শীতপ্রধান জলবায়ু শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রম শক্তি বাড়াইয়া তাহাকে অধিকতর কর্মদক্ষ করিয়া তোলে।

উপযুক্ত পরিমাণ ও পুষ্টিকর খাদ্য, জলবায়ু ও কার্যের উপযোগী পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্যসম্মত প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত বাসগৃহ, চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট সহায়তা করে।

সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিবার মত জ্ঞান ও দায়িত্বশীলতা শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে কম প্রভাব বিস্তার করে না।

উপযুক্ত মজুরি, পরিপূরক আয়লাভের সুযোগ-সুবিধা, ভবিষ্যতে সত্বর উন্নতির সম্ভাবনা প্রভৃতি শ্রমিকের কর্মস্পৃহা বাড়াইয়া থাকে ও তাহার উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

কারখানার নির্মল পরিবেশ, শ্রমিকের ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধে সুযোগ-সুবিধা, কর্মে নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয়গুলিও শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক।

এই সকল বিষয় ছাড়া শ্রমের দক্ষতা উহার সংগঠন ও পরিচালনার উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সংগঠক যদি নৈপুণ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত কাজে উপযুক্ত শ্রমিককে নিয়োগ না করেন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহারের ব্যবস্থা না করেন, উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন না করেন, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মোৎসাহ সহজেই হ্রাস পাইয়া দক্ষতা হ্রাস পাইবে।

১১ | মূলধন
(Capital)

মূলধনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
(Definition and Nature of Capital)

উৎপাদনের উপদান হিসাবে মূলধনের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করা খুবই কঠিন। যেসকল অর্থনীতিবিদ্‌গণ মূলধন লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একটা করিয়া ভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।

অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ্ বম্ ওয়ার্ক (Bohm Bawerk) মূলধনকে 'উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান' (produced means of production) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেসকল দ্রব্য মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত এবং উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে উহাই মূলধন। মানুষের পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত যে সকল সম্পদ প্রত্যক্ষভাবে ভোগে ব্যবহৃত হয়, বম্ ওয়ার্ক উহাদের মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তাঁহার সংজ্ঞা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, কারখানা-গৃহ প্রভৃতিকে মূলধন বলা চলে।

বম্ ওয়ার্কের সংজ্ঞা

কিন্তু বম্ ওয়ার্ক প্রদত্ত মূলধনের সংজ্ঞাটি একাধিক কারণে সমালোচনা করা যায়। প্রথমত, তিনি মূলধনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) এবং উৎপাদন দ্রব্যের (production goods) মধ্যে অবাস্তবভাবে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। যে-সকল সম্পদ সরাসরিভাবে ভোগে ব্যবহৃত হয় তাহাকে তিনি মূলধন বলিতে রাজী নহেন। কিন্তু এইভাবে ভোগ্যদ্রব্য ও উৎপাদন দ্রব্যের মধ্যে চুলচেরা বিভেদ করা অসম্ভব। একই দ্রব্য ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে ভোগ্যদ্রব্য কিংবা উৎপাদন দ্রব্য হইতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য মোটরগাড়ি ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা তাহার নিকট ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু ডাক্তার যদি রোগী দেখিবার জন্য মোটরগাড়ি ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা

বম্ ওয়ার্ক প্রদত্ত সংজ্ঞার সমালোচনা

তাহার নিকট উৎপাদন দ্রব্য। বম্ ওয়ার্ক অযৌক্তিকভাবে মূলধনকে কেবলমাত্র উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, বম্ ওয়ার্ক প্রদত্ত সংজ্ঞাতে মূলধনকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করা হয় নাই। ব্যবসায়ীর নিকট মূলধন বলিতে কেবলমাত্র কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম কিংবা কাঁচামাল বুঝায় না। ব্যবসায়ীর মূলধনের মধ্যে জমি, তমসুক-ঋণপত্র, বিনিয়োজিত টাকা ও অন্যান্য সম্পদ প্রভৃতি ধরা হয়। উৎপাদনের জন্য যেসকল বাস্তব সম্পদ (physical assets) ব্যবহৃত হয় উহার মোট অর্থমূল্যকেই ব্যবসায়ীর দৃষ্টিকোণ হইতে মূলধন বলা হইয়া থাকে।

মার্শালের অভিমত

অধ্যাপক মার্শাল মূলধনকে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মত অনুযায়ী, মূলধন হইল সেই সকল সম্পদ যাহা আয় উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু মূলধনকে এইভাবে আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, আয়ের ব্যাপক অর্থ ধরিলে কেবল অর্থ আয় (money income) বুঝায় না। সম্পদ হইতে যে তৃপ্তি বা উপযোগ স্রোত পাওয়া যায় তাহাও আয়ের মধ্যে ধরা উচিত। যেমন, কেহ যদি বাড়ি নির্মাণ করিয়া ভাড়া দেয় তাহা হইলে উহা তাহার অর্থ-আয়। কিন্তু আবার কেহ যদি বাড়ি নির্মাণ করিয়া নিজে বসবাস করে, তাহা হইলে যে তৃপ্তি সে লাভ করে তাহাও তাহার আয়। সুতরাং যে কোন সম্পদকেই মূলধন বলা উচিত।

অধ্যাপক হায়েকের[১] মতে, উৎপাদনে যেসকল সম্পদ নিযুক্ত হয় তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে :

হায়েকের অভিমত

(১) চিরস্থায়ী সম্পদ (Permanent Resources) এবং (২) অস্থায়ী সম্পদ (Non-permanent Resources)। যে সম্পদ উদ্যোক্তার ইচ্ছানুযায়ী আগাগোড়া উৎপাদন কার্যে টিকিয়া থাকে, উহাকে চিরস্থায়ী সম্পদ বলা হয়। উদ্যোক্তা নিজেই চিরস্থায়ী সম্পদের একটি উদাহরণ। আবার যে সকল সম্পদকে পুনর্বার উৎপাদন করিতে হয়, কিংবা পুনর্বার পূর্ণ (replenish) করিতে হয়, তাহাকে

১. Hayek : The Pure Theory of Capital

অস্থায়ী সম্পদ বুঝায়। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন এবং কাঁচামাল প্রভৃতি চলতি মূলধনকে অস্থায়ী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। হায়েক মনে করেন যে, মূলধন হইল অস্থায়ী সম্পদসমূহের সমষ্টি (aggregate non-permanent resources)। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি সম্পদ অস্থায়ী বলিয়াই উহাদের উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কিছু কিছু উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করা দরকার হইয়া পড়ে। এই উপকরণগুলি উৎপাদনে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাহাতে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন বিলম্বিত হয়। এইভাবে বর্তমানে অস্থায়ী সম্পদের উৎপাদন বাড়াইয়া ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়। হায়েকের মতে মূলধনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহা নহে যে, ইহা পরিশ্রমের ফলে উৎপাদিত হইয়াছে; ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহা সেইসকল অস্থায়ী সম্পদকে বুঝাইয়া থাকে যাহার পুনরুৎপাদন প্রয়োজন হয়।

মূলধন সম্পর্কে ধারণায় অর্থনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য ও অস্পষ্টতা থাকায় অনেকে মনে করেন যে, যে সকল সম্পদকে সাধারণত মূলধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় উহাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একটি করিয়া পৃথক পৃথক নাম ব্যবহার করা উচিত। কেয়ার্ণক্রশ মূলধন বলিতে তিন প্রকারের বিভিন্ন সম্পদকে নির্দেশ করিয়াছেন: দ্রব্যাদি, টাকাপয়সা এবং সম্পত্তির মালিকানা নির্দেশক ঋণপত্র-তমসুক। এই তিন প্রকারের সম্পদকে তিনি যথাক্রমে (ক) বস্তুগত মূলধন; (খ) অর্থগত মূলধন এবং (গ) ঋণগত মূলধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

মূলধনের প্রকৃতি সম্পর্কে আধুনিক অভিমত

(ক) **বস্তুগত মূলধন** (Concrete Capital): বস্তুগত মূলধন বলিতে সেই সকল দ্রব্যাদিকে বুঝায় যাহার অর্থমূল্য আছে এবং যাহা আয় উৎপাদনে সহায়তা করে। বস্তুগত মূলধন উৎপাদকের হইতে পারে কিংবা ভোগকারীরও হইতে পারে। উৎপাদকের মূলধন বলিতে সেইসকল দ্রব্যসমষ্টি বা সম্পদ বুঝায় যাহা দ্বারা আয় উপার্জনের সম্ভাবনা আছে। যেমন, কারখানা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ভোগকারীর মূলধন বলিতে সেই সকল দ্রব্যকে বুঝায় যাহা হইতে তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করা যায়। যথা, বাসগৃহ, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ি, রেডিও ইত্যাদি। অধ্যাপক মার্শাল

১. Cairncross: Introduction to Economics, Ch. 3

উৎপাদকের বস্তুগত মূলধনকে ব্যবসায়িক মূলধন (trade capital) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভোগীর বস্তুগত মূলধনকে অধ্যাপক টড (Todd) বলিয়াছেন, ভোগ্য মূলধন (enjoyment capital)। সাধারণত উৎপাদকের মূলধনকে মূলধনী-দ্রব্য (capital goods) এবং ভোগীর মূলধনকে ভোগ্য-মূলধন (consumption capital) বলিয়া অভিহিত করা চলে। গোটা সমাজের বা দেশের দিক হইতে দেখিতে গেলে বস্তুগত মূলধনকে সমস্ত উৎপাদকের মূলধন এবং সমস্ত ভোগীর মূলধনের সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে।

(খ) **অর্থগত মূলধন** (Money or Finance Capital): উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত টাকাপয়সাকে অর্থগত মূলধন বলা হয়। আমরা টাকা-পয়সার মাধ্যমেই সম্পদ বা মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রকাশ করিয়া থাকি। কোন ব্যবসায়ী বা যৌথ শিল্প-প্রতিষ্ঠান যখন উৎপাদনকার্যে মূলধন বিনিয়োগ করে তখন উহার পরিমাণ টাকার অঙ্কে হিসাব করা হয়। তবে অনেক সময় বিনিয়োজিত টাকার সমস্তটাই আয় উপার্জনের জন্য উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত নাও হইতে পারে। ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠানের মালিক কিছু টাকা নিজস্ব ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য পৃথক করিয়া রাখিয়া দিতে পারেন। এইরূপ টাকাকে অর্থগত মূলধন বলা চলে না। কেবলমাত্র সেই বিনিয়োজিত টাকাকড়িকেই অর্থগত মূলধন বলা হয় যাহা দ্বারা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আয় সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) **ঋণগত মূলধন** (Debt Capital): শেয়ার, ঋণগত পুঁজিপাটা (stock) প্রভৃতিকে ঋণপত্র মূলধন বলা হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্পদের মালিকানা (title to wealth) নির্দেশ করে। যাহারা এই ধরনের সম্পদে টাকা বিনিয়োগ করে, তাহারা ইহা হইতে অর্থ আয় উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই ধরনের সম্পদকে ইচ্ছা করিলে বস্তুগত মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া সরাসরিভাবে উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা চলে।

অনেকে মূলধনকে স্থায়ী (fixed) এবং চলতি (circulating) এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন। স্থায়ী মূলধন একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায় না। ইহা বহুকাল অবধি টিকিয়া থাকিয়া উৎপাদন কার্যে একাধিকবার নিযুক্ত হইতে পারে (It can fulfil its office in

production more than once and its utility is not exhausted by a single use)। কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। চলতি মূলধন সেই সকল দ্রব্যাদিকে বুঝায় যাহা উৎপাদনে একবারমাত্র ব্যবহৃত হইয়াই আকার বদলাইয়া ফেলে। (Circulating capital fulfils the whole of its office by a single use in production in which it is enjoyed)। যেমন, কয়লা, পাট, তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল।

স্থায়ী ও চলতি মূলধন

মূলধন কি টাকাপয়সা ?

(Is Capital Money ?)

সাধারণত আমরা মূলধন ও টাকাপয়সার মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই না। মূলধনকে আমরা টাকাপয়সার মাধ্যমে নির্ধারণ ও প্রকাশ করিয়া থাকি। কাহারও সম্পত্তি, পুঁজিপাটা প্রভৃতি মূলধন আমরা টাকাপয়সার অঙ্কে পরিমাপ করিয়া থাকি। কিন্তু টাকাপয়সার মাধ্যমে মূলধন প্রকাশ ও পরিমাপ করা এবং টাকাপয়সা ও মূলধন একই ভাবা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে।

আমরা যখন মূলধন বৃদ্ধি করিতে চাহি তখন স্বভাবতই টাকাপয়সার পুঁজি বাড়াইয়া থাকি। টাকাপয়সা আমরা সঞ্চয় করি কিংবা ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করি। কিন্তু এইভাবে টাকাপয়সার পুঁজি বাড়াইলেই মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ব্যক্তিগত ভাবে টাকাপয়সার পুঁজি-বৃদ্ধি অবশ্যই কাম্য; কেন না, ব্যক্তিবিশেষের টাকা-পয়সা বৃদ্ধি অর্থ তাহার চলতি সম্পত্তি (liquid assets) বৃদ্ধি। ইহা সে ইচ্ছামত বস্তুগত মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে টাকা পয়সা মূলধন নহে। কেন না, সমাজ টাকা পয়সাকে বস্তুগত মূলধনে রূপান্তরিত করিতে পারে না। সমাজ কাহার কাছে টাকাপয়সা ব্যয় করিবে।

টাকাপয়সা বৃদ্ধি অর্থ মূলধন বৃদ্ধি নহে

টাকাপয়সা উৎপাদনের উপাদান নহে। তবে টাকাপয়সাকে বস্তুগত মূলধনে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা চলে। বস্তুগত মূলধনকে আবার টাকাপয়সায় রূপান্তরিত করা যায়। উৎপাদক

যখন টাকাপয়সা ঋণ করে, দোকানদার যখন পণ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করে, ব্যবসায়ী যখন টাকাপয়সা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে—এই সকল কার্যের মূল উদ্দেশ্যই থাকে টাকাপয়সা রূপান্তরিত করিয়া বস্তুগত মূলধন উৎপাদন করা। টাকা পয়সাকে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয় না করিলে উহা মূলধনের আকার গ্রহণ করিতে পারে না।

ব্যবসায়ী মহলে টাকাপয়সাকে মূলধন বলিয়া অভিহিত করিবার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা মনে করেন যে, সকল আধুনিক সমাজেই টাকাপয়সাকে প্রকৃত সম্পদে (real resources) রূপান্তরিত করিয়া উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা চলে। ব্যবসায়িগণের ধারণা অনুযায়ী মূলধনকে অর্থগত মূলধন (money or finance capital) বলিয়া বর্ণনা করাই ভাল মনে হয়।

মূলধনের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Capital)

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়:

(১) **মূলধন অতীত শ্রমের ফল** (Capital is the result of past labour): কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল প্রভৃতি দ্রব্য, যাহাকে আমরা মূলধন বলিয়া থাকি, সেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের সহযোগিতায় মানুষের শ্রমের ফলে সৃষ্ট হইয়া থাকে।

(২) **মূলধন উৎপাদনশীল** (Capital is productive): শ্রম মূলধনের সহায়তা ছাড়া যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে, মূলধনের সহযোগে তাহার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদন করিতে পারে। উৎপাদনে মূলধনের পরিমাণ যত বেশি বাড়ানো যায়, উৎপাদনের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) **মূলধন সম্ভাব্য** (Capital is prospective): মূলধনের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, মূলধন গঠনের জন্য ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করিতে হয়। মূলধন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আয় উৎপাদন সম্ভব হয় না। যেমন, কোন একটি যন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে আয় সৃষ্টি হয় না। যন্ত্রকে উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়া উহা দ্বারা আয় সৃষ্টি করিতে ভবিষ্যতের আশায় অপেক্ষা করিতে হয়।

(৪) **মূলধন সঞ্চয়ের ফল** (Capital is the result of saving) : মূলধন বলিতে অতীতে উৎপন্ন সেইসকল দ্রব্যকে বুঝায় যেগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে ভোগে নিযুক্ত না হইয়া উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য যদি ভোগে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সঞ্চয় একেবারেই সম্ভব নহে। সঞ্চয় অর্থই বর্তমান ভোগে অর্থ ব্যয় না করিয়া উহা ভবিষ্যতে আয় সৃষ্টির জন্য উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করা। আধুনিক কালে সঞ্চয় বলিতে দ্রব্যগত সঞ্চয় না বুঝাইয়া অর্থগত সঞ্চয় বুঝায়। কোন দেশে মূলধন বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা দুইই থাকা এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি করার জন্য বিনিয়োগ করার মত যথেষ্ট সুযোগ ও প্রতিষ্ঠান থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

(৫) **মূলধন অস্থায়ী** (Capital is non-permanent) : মূলধন সেইসকল সম্পদ যাহা পুনর্বার উৎপাদন বা পূর্ণ করিতে হয়। মূলধন অস্থায়ী বলিয়াই উহা উৎপাদনের জন্য বর্তমানে কিছু কিছু উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

মূলধনের কার্যাবলী
(Functions of Capital)

মূলধন নিম্নলিখিত কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে :

(১) মূলধনের ব্যবহার উৎপাদন কার্যকে চক্রাকারে রূপান্তরিত (round-about process) এবং দীর্ঘমেয়াদী করে। কি করিয়া মূলধন উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে দীর্ঘমেয়াদী করে, বম্ ওয়ার্ক প্রদত্ত একটি উদাহরণের দ্বারা তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝানো যায়। প্রাচীন সমাজে মানুষের যখন মূলধনের সঞ্চয় ছিল না তখন তৃষ্ণা পাইলে জলের সন্ধানে সে ঝরণার দিকে দৌড়াইয়া যাইত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রতিবার ঝরণার দিকে ছুটিবার অসুবিধা যখন সে বুঝিল, তখনই জলভাণ্ডার নির্মাণের চিন্তা তাহার মাথায় আসিল। সঙ্গে সঙ্গে জলভাণ্ডার নির্মাণের উপাদান সংগ্রহ করিতে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রতিবার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সরাসরি ঝরণায় না দৌড়াইয়া, সে হয়তো দিনের প্রয়োজন মত জল একবার মাত্র আনিয়া একটি উপযুক্ত পাত্রে রাখিল। পাত্র তৈরির মত উপযুক্ত মূলধন

মূলধন উৎপাদন কার্যকে চক্রাকার ও দীর্ঘমেয়াদী করে

ও সময় অবশ্য তাহাকে নিয়োগ করিতে হইল। জল-সরবরাহের প্রাচুর্যের কথা যখন তাহার মনে আসিল, তখন সে আরও মূলধন ও সময় নিয়োগ করিয়া, হয়তো নল পুঁতিয়া ঝরণা হইতে তাহার বাসগৃহ পর্যন্ত নিয়মিত জল যোগানের ব্যবস্থা করিল। যতই মূলধনের নিয়োগ সম্ভব হইল, ততই উৎপাদন প্রক্রিয়া চক্রাকার এবং দীর্ঘকালমেয়াদী হইতে লাগিল। অবশ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চক্রাকার ও দীর্ঘমেয়াদী হওয়ার ফলে সে গড়পড়তা কম ব্যয়ে অধিক জল সরবরাহের সুযোগ লাভ করিল।

মূলধন ব্যবহার উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরের কার্যকে স্বল্পমেয়াদী করে

(২) মূলধনের ব্যবহার উৎপাদক কার্যকে চক্রাকার ও দীর্ঘমেয়াদী করে বটে, কিন্তু উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরের কার্যকে স্বল্প-মেয়াদী করে। মূলধন ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মবিভাগ যতই প্রসার লাভ করে, ততই গোটা উৎপাদন কার্য বহু স্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক একটি স্তরের কার্য সম্পাদনে যতই বিশিষ্ট (specialised) শ্রমিক নিযুক্ত হয় ততই একদিকে যেমন উৎপাদনশীলতা বাড়ে, অন্যদিকে প্রত্যেক স্তরের উৎপাদন কার্যও অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মূলধন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে

(৩) মূলধন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকের এই কর্মদক্ষতার উপর আবার সাধারণ উৎপাদন কার্যের সাফল্য নির্ভর করে। মূলধন বিনিয়োগের ফলে শ্রমিক বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন রকমের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পায়। ইহাতে একদিকে যেমন তাহার দৈহিক কর্ম-ক্লান্তির চাপ খানিকটা লঘু হয়, অন্যদিকে উৎপাদনকার্যের দক্ষতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আর একভাবে মূলধনের ব্যবহার শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারে। আধুনিক উৎপাদন কার্য দীর্ঘকালমেয়াদী। উৎপাদন কার্য আরম্ভ এবং তৈরি পণ্য বাজারে বিক্রয়—এই দুইয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইতে পারে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রমিকের মজুরি না দিয়া কাজ আদায় করা চলে না। কবে তৈরি মাল বাজারে চালু হইবে ও বিক্রয়লব্ধ আয় পাওয়া যাইবে এবং সেই আয়ের একাংশ মজুরিরূপে দেওয়া সম্ভব হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। শ্রমিকের উপযুক্ত কর্মদক্ষতা বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা কাজ আদায় করিতে হইলে, তৈরি মাল বাজারে বিক্রয় হইবার আগেই অগ্রিম মজুরি দিতে হয়। এই আগাম মজুরি দেওয়া

সম্ভব হয় মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে।

(৪) মূলধনের সহায়তায় একদিকে যেমন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সকল রকম উপকরণ ও তৈজসপত্র কেনা সম্ভব হয়, অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা, তৈয়ারী মাল সম্পর্কে প্রচার ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও সহজ হয়। মালিকের সমস্যা শুধু উৎপাদন কার্যকে আশ্রয় করিয়া নহে, কিভাবে বাজারে উপযুক্ত দামে তৈয়ারী মালের ব্যাপক চাহিদা হইবে, এ সমস্যাও উৎপাদনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদককে অনেক সময় উৎপাদন কার্য শুরু হইবার আগেই প্রচারকার্যের খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই প্রচুর অর্থব্যয় সম্ভব হয় শুধু সেই উৎপাদকের পক্ষে যাহার প্রচুর মূলধন বর্তমান।

মূলধন পণ্য বিক্রয়ের সহায়তা করে

(৫) পরিশেষে, মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা উৎপাদন কার্যকে চালু রাখা সম্ভব হয়। স্বল্প মূলধনের মালিক একযোগে উৎপাদন কার্য অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না। মূলধনের অভাবে তাহার কার্যক্রমের গতি কখনও হয়তো স্থিতিশীল অবস্থায় আসিতে পারে, তখন সে তৈয়ারী মাল বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা আবার উৎপাদন কার্যের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়। যে উৎপাদনের ক্রমগতি অব্যাহত নহে, যেখানে কিছুদিন কার্য চলার পর মূলধনের অভাবে হঠাৎ উৎপাদনের গতি কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, সেক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারেই অচল।

মূলধন উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখিতে সহায়তা করে

মূলধন বৃদ্ধির কারণ

(Causes of Growth of Capital)

সঞ্চয় হইতে মূলধনের উৎপত্তি হয়। উপার্জিত আয়ের সবটা ভোগ না করিয়া কিছুটা জমাইয়া রাখার নাম সঞ্চয়। মানুষের সঞ্চয় নির্ভর করে, একদিকে তাহার আয়ের উপর, আর একদিকে ভোগপ্রবণতার উপর। মানুষের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু আয় যে অনুপাতে বাড়ে, ভোগ-ব্যয় সাধারণত তাহা অপেক্ষা কম অনুপাতে বাড়ে। মানুষ যদি তাহার মোট আয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করে তাহা হইলে তাহার কোন সঞ্চয় হইবে না। সে তাহার মোট আয় ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে না;

সঞ্চয় হইতে মূলধন সৃষ্টি

তাহার কারণ এই যে, ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে মূলধনী সামগ্রী (Capital goods) তৈয়ারীরও প্রয়োজন আছে। যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য মানুষ তাহার আয়ের একটা অংশ ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করে। সে ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়-সংকোচ করে এই আশায় যে, সঞ্চয় দ্বারা ভবিষ্যতে মূলধনী দ্রব্য তৈয়ারীর পথ সুগম হইবে এবং উহার ব্যবহার দ্বারা নূতন আয় সৃষ্টি সম্ভব হইবে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চয় হইতে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন অসম্ভব হয়, উহাকে বিনিয়োগ (Investment) বলা হয়।

সঞ্চয় হইতে কেমন করিয়া মূলধনের উৎপত্তি হয়, একটি উদাহরণ দ্বারা তাহা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায়। ইতিহাসের আদিমতম যুগে মানুষ পশুপক্ষী শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। প্রথমে তাহার শিকার করিবার মত ভাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। সে যাহা যখন যেভাবে শিকার করিত, তাহাই আহার করিত। আবার শিকার না জুটিলে সে অনাহারেও থাকিত। তাহার শিকার-জীবনের উন্নতি-বিধানের জন্য ভাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। আর ভাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করিতে হইলে তাহাকে কিছুদিন শিকার স্থগিত রাখিতে হইত। শিকার স্থগিত রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য পরিশ্রম করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত তখনই, যখন তাহার শিকারের সঞ্চয় হাতে আসিত। অস্ত্রশস্ত্র তৈযারী করিতে যে সময় লাগে সেই সময়টা যদি শিকারের সঞ্চয় দ্বারা আহারাদি চালাইয়া নিতে পারিত, তবেই তাহার পক্ষে অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করা সম্ভব হইত। এই অস্ত্রশস্ত্রই শিকারীর মূলধন। শিকারী যাহা শিকার করিত তাহাই যদি আহার করিয়া ফেলিত, তাহার যদি শিকারের সঞ্চয় কিছু উদ্বৃত্ত না থাকিত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে মূলধন সৃষ্টি করা সম্ভব হইত না। আর এই মূলধন সৃষ্ট না হইলে তাহার পক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধি করাও সম্ভব ছিল না। অতএব সঞ্চয় হইতেই মূলধনের উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত সঞ্চয় দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:
(১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা

মানুষের ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (১) সঞ্চয়ের ক্ষমতা (power to save) এবং (২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা (will to save)। সঞ্চয়ের ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর। লোকের মাথাপিছু আয় যত বাড়িবে, তাহার সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বাড়িবে। ধনী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঞ্চয় স্বয়ংক্রিয় (automatic) হয়। বর্ধিত আয় দ্বারা আর

কিছু করিবার নাই বলিয়াই তাহারা সঞ্চয় করিয়া থাকে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা ভোগপ্রবণতা দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকে। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ও বাড়ে, তাহা হইলে সঞ্চয় বাড়িতে পারে না।

কেবলমাত্র সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেই যথেষ্ট নহে। বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা না বাড়াইলে ভবিষ্যতে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় না। সঞ্চয়ের ইচ্ছা নানা বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সব সময়ই কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে। সন্তান-সন্ততির উপর মমত্ববোধ হইতে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অনেকে সঞ্চয় করিয়া থাকে। আশ্রয় ও অবলম্বনের আশায় অনেকে অর্থ সঞ্চয় করে, অনেকে সমাজে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভের স্পৃহায় সঞ্চয় করে। লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছা দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। যে সমাজে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নাই, সেখানে কাহারও সঞ্চয়-প্রবৃত্তি জাগে না। আবার, যেখানে টাকা বিনিয়োগ করিবার মত সুযোগ-সুবিধা নাই সেখানেও সাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম হয়। যে দেশে ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি প্রভৃতি যত বেশি, সে দেশে লোকের সঞ্চয়ের ইচ্ছাও তত বেশি। সুদের হারের উপরও সঞ্চয় বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুদের হার যদি বেশি হয়, তাহা হইলে লোকে ভোগব্যয়ে অধিক খরচ না করিযা বেশি আয়ের আশায় অধিক পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(২) সঞ্চয়ের ইচ্ছা

ব্যক্তিগত সঞ্চয় ছাড়া যৌথ কারখানাগুলির সঞ্চয় বৃদ্ধিও মূলধন সৃষ্টির সহায়তা করে। যৌথ কারবারের সঞ্চয় বৃদ্ধির মূলে থাকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গতিবৃদ্ধি এবং কারখানার প্রসার ও আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা। যৌথ-কারবারী প্রতিষ্ঠান সমস্ত মুনাফা অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন না করিয়া দিয়া কিছু সঞ্চয় করে। বর্তমানে সরকারও দেশে মূলধন গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সরকার নানা উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা মূলধন সামগ্রী উৎপাদন করেন এবং মূলধন গঠনে সহায়তা করেন।

সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সুদের হার

(Propensity to save and the rate of interest)

প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিবিদ্‌গণের অভিমত এই যে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও সুদের

হারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সুদের হার বাড়িলে লোকে ভোগ-ব্যয়ে অধিক পরিমাণ অর্থ খরচ না করিয়া বেশি আয়ের আশায় অধিক পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। আবার, সুদের হার কমিলে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা হ্রাস পায় বলিয়া লোকে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমাইয়া থাকে।

কিন্তু আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ সুদের হার ও সঞ্চয়ের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করেন না। মানুষ সঞ্চয় ব্যাপারে বুদ্ধি-বিবেচনা বা পরিকল্পনা দ্বারা বড় একটা পরিচালিত হয় না। সঞ্চয় ব্যাপারে মানুষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ যতটা না করে, মনোবৃত্তির তাড়না তাহাকে প্রভাবিত করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি। অনেক ধনী ব্যক্তি আছেন যাঁহাদের নিকট উচ্চ সুদের হার সঞ্চয় করিতে মোটেই উৎসাহ প্রদান করে না। ইহারা অনেকে সুদের হার শূন্য হইলেও টাকাপয়সার নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। অনেকে আবার উন্নত জীবনযাত্রার মানে এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, উচ্চ সুদের হার সত্ত্বেও উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয় কমাইয়া অধিক সঞ্চয় করিতে চাহেন না। তাহা ছাড়া, যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় সুদের হার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না। কেইনস্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণের ধারণা এই যে, সঞ্চয়ের উপর সুদের হারের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। তাঁহারা মনে করেন, সঞ্চয় প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে লোকের আয়ের উপর। লোকের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় বাড়িবে, আবার আয় হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ও কমিবে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, বিনিয়োগ হ্রাস পাইয়া, আয় ও সঞ্চয় কমে।

মূলধন গঠন
(Capital Formation)

কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন সমাজ যখন মূলধনী দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তখন ঐ সমাজে মূলধন গঠিত হইয়াছে বলা যায়।[১] মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে সমাজের সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও ইচ্ছা যত বেশি

১. Boulding : "Saving is perhaps the least rational—i.e. the least planned, of all the forms of disposal of income."

প্রবল হইবে মূলধন গঠনের হারও তত বৃদ্ধি পাইবে। সঞ্চয় আবার নির্ভর করে আয়ের উপর। আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বাড়িয়া থাকে, আয় হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ও কমিয়া থাকে।

কিন্তু কেবলমাত্র সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন গঠিত হয় না। লোকের সঞ্চিত অর্থ যদি অলসভাবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা হইলে সেই সঞ্চয় হইতে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। অর্থনীতিবিদ্‌গণ মূলধন গঠন কার্যের তিনটি পৃথক স্তর (stages) নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই তিনটি স্তর হইল: (১) সঞ্চয়ের উৎপত্তি, (২) সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ব্যবস্থা এবং (৩) বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন। প্রথম স্তরে, লোকের সঞ্চয় গঠিত হয় বর্তমান ভোগ ব্যয় কমাইবার ফলে। দ্বিতীয় স্তরে, এই সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি, শেয়ার বাজার প্রভৃতির হাতে আসে এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ অর্থ বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে। তৃতীয় স্তরে, বিনিয়োজিত অর্থের ফলে যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন বিভিন্ন রকমের মূল শিল্পের প্রসারলাভ এবং বস্তুগত মূলধন গঠিত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সঞ্চিত অর্থ উপযুক্তভাবে বিনিয়োগ এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের সুব্যবস্থা সকল সময় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশে সঞ্চয় সৃষ্টি এবং সঞ্চিত অর্থকে সুবিনিয়োগ দ্বারা মূলধন দ্রব্য উৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ সরকারকেই সক্রিয়ভাবে করিতে হয়। সরকার সুপরিকল্পিত করনীতি ধার্য এবং করলব্ধ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে মূল শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া মূলধন গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে।

মূলধন গঠনের তিনটি স্তর

১. Benham: "The amount which a community adds to its capital during a period is known as the amount of its investment or capital formation during that period."

১২

সংগঠন
(Organisation)

আজিকার দিনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাদনের আয়তন বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, পদ্ধতিতেও নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ বাজারের চাহিদার উপর ভরসা করিয়া কার্য শুরু করিতে হয়। উৎপাদনের গোড়াতে হয়তো চাহিদা-বাজার খুব ভাল থাকিতে পারে, উৎপাদনের শেষে যখন মাল বাজারে ছাড়া হয় তখন চাহিদা বাজার একেবারে নরম হইয়া পড়িল। ইহা সমূহ লোকসানের কারণ হইতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎপাদনে প্রতিপদে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বর্তমান। এই সকল ঝুঁকি কাহাকে-না-কাহাকেও বহন করিতে হয়। উৎপাদনের এই ঝুঁকি বহনকে সংগঠন বলা হয়। আবার, উৎপাদন বৃহদায়তন হওয়ায় প্রচুর কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে হয়, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করিতে হয়, সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট বিশেষীকরণও লক্ষ্য করা যায়। যে যন্ত্রপাতি কোন একটি শিল্পে ব্যবহার করা হয়, অন্য একটি শিল্পে উহা ব্যবহার করা চলে না। উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে এই বিশেষীকরণ বর্তমান থাকায় উৎপাদন ব্যবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে একত্র করিয়া উহাদের কাজের মধ্যে কাহাকেও সমন্বয় বিধান করিতে হয়। এই কাজকেও উৎপাদনের সংগঠন বলা হয়। এইভাবে যিনি উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন উপাদানগুলির একত্রীকরণ ও সমন্বয়সাধন করেন এবং সকল রকম অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন করেন তাঁহাকে উদ্যোক্তা বা সংগঠক (entrepreneur) বলা হয়। অনেকে অবশ্য সংগঠককে উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, কিছু পরিমাণ সংগঠন কার্য শ্রমিককেও করিতে হয়। কিন্তু তথাপি আধুনিক জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। উৎপাদন কার্যের সম্যক ঝুঁকি তাঁহাকে বহন করিতে হয় এবং

সংগঠন কাহাকে বলে?

সেইহেতু উৎপাদনের পৃথক উপাদান হিসাবে তাঁহাকেই স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।

সংগঠকের কার্যাবলী
(Functions of the Entrepreneur)

বর্তমান জটিল উৎপাদন-ব্যবস্থায় সংগঠক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিভিন্ন কার্যাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রধান অংশ গ্রহণ থাকেন। নিচে তাঁহার প্রধান প্রধান কাজগুলি আলোচনা করা হইল :

(১) আধুনিক সংগঠন-কর্তার একটি প্রধান দায়িত্ব হইল উৎপাদনের পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ করা। কোন্ সামগ্রী কোন্ সময়ে, কি পরিমাণ, কি গুণের তৈয়ারী করিতে হইবে ইহা তিনি নির্ণয় করিয়া থাকেন। কোন্ কাঁচামাল ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্ যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিতে হইবে, কি ধরনের দক্ষ শ্রমিক কাজে লাগাইতে হইবে প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলি যথোপযুক্ত ভাবে নির্বাচন করাও সংগঠকের অন্যতম কার্য।

উৎপাদনের পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ

(২) তাঁহার আর একটি প্রধান কাজ, অন্যান্য উপাদানগুলিকে একত্রিত করিয়া উহাদের মধ্যে সমন্বয় বিধান করা। তাঁহাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে কাম্য অনুপাত (optimum proportion) নির্ধারণ করিতে হয়। কখনও কোন উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া, কখনও বা কমাইয়া তাঁহাকে বিভিন্ন উপাদান-সমন্বয় এমনভাবে ধার্য করিতে হয় যাহাতে ব্যয়ের দিক দিয়া ন্যূনতম হয়, এবং মুনাফা হয় সর্বাধিক। উপাদান-সমূহের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধনের সময় তাঁহাকে একাধারে দুইটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিতে হয় : প্রথমত, সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন করা ; দ্বিতীয়ত, সর্বাধিক মুনাফা লাভ হয়।

অন্যান্য উপাদান-গুলির একত্রীকরণ ও সমন্বয় বিধান

(৩) সংগঠকের সর্বপ্রধান কার্য হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা পদে পদে।

বিভিন্ন উদ্যোক্তার রেষারেষিতে ঝুঁকির বোঝা স্বভাবত বেশি হয়। প্রত্যেকেই ন্যূনতম ব্যয়ে মাল তৈয়ারী করিয়া বাজার-দাম হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক উদ্যোক্তা ভবিষ্যৎ বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা অনুমান করিয়া পণ্য উৎপাদন করে। কিন্তু বাজারের চাহিদা স্থির থাকে না, বেচা-কেনাও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। উৎপাদন শুরু হইবার কালে কোন পণ্যের হয়তো বাজার-চাহিদা খুব ভাল ছিল। কিন্তু পণ্যটি উৎপাদনের শেষে যখন বাজারে আসিল, তখন দেখা গেল উহার চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। চাহিদার অনবরত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ-লোকসানেরও যে সকল সময়ই সম্ভাবনা আছে, উহার ঝুঁকি সংগঠন কর্তাকে বহন করিতে হয়।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন

(৪) সংগঠকের আর একটি কাজ হইল, পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য বা উৎপাদন কার্য পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করা। অধুনা বড় বড় কারবার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনার কাজ উদ্যোক্তা নিজে গ্রহণ করেন না। বেতনভুক কর্মচারীর দ্বারা পরিচালনার কাজ করানো হইয়া থাকে। কিন্তু ছোট কারবারে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ সংগঠন-কর্তা নিজে করেন। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ঝুঁকি বহন ও পরিচালনার কার্য বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের হাতে অর্পণ করিয়া থাকে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বহন করে অংশীদারগণ। অংশীদারগণই প্রতিষ্ঠানের মালিক বলিয়া কোম্পানির লাভ-লোকসান তাহাদের বহন করিতে হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকে অংশীদারগণের কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিচালকমণ্ডলী। ইহাকে ডিরেক্টর সভা বলা হয়। এই পরিচালকমণ্ডলী যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত সংগঠক। ইহারাই উৎপাদন ক্ষেত্রে সকল রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ঝুঁকি ও সংগঠনকার্য পরিচালকমণ্ডলী গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান

আবার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ডিরেক্টর সভার সদস্যগণও কোম্পানির সংগঠন ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপার লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন না। বেতনভোগী ম্যানেজার ও কোম্পানির উচ্চপদস্থ অন্যান্য কর্মচারিগণ পরিচালনা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ঘুমন্ত ডিরেক্টর বোর্ড তাহাই

মানিয়া লয়। এই সকল কর্মচারিগণ কোম্পানির শেযারক্রেতা নহেন, কোম্পানির লাভ বা লোকসান—কোনটাই ইহাদের স্পর্শ করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাদেরই কোম্পানির সংগঠক বলা চলে।

অধুনা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা-উদ্যোগ প্রসারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিগণও উদ্যোক্তা শ্রেণীর কাজ করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রীয় শিল্প-বাণিজ্যে উৎপাদন, পরিচালনা, দাম নির্ধারণ, ঝুঁকি বহন প্রভৃতি সম্পর্কীয় যাবতীয় দায়িত্ব পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে আয় বণ্টন

(৫) পরিশেষে, উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে প্রত্যেকের প্রাপ্য আয় বণ্টনের ভারও সংগঠকের দায়িত্ব। সংগঠক অন্যান্য উপাদানের সহযোগে আয় উৎপন্ন করিয়া থাকে। এই আয় আবার উৎপাদনে নিযুক্ত জমি, শ্রম, মূলধন—এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রত্যেকের পারিশ্রমিক হিসাবে বণ্টন করিয়া দিতে হয। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয করিয়া যদি লোকসানও হয, তাহা হইলেও অন্যান্য উপাদানের পাওনা পারিশ্রমিক সংগঠন কর্তাকে বণ্টন করিয়া দিতেই হইবে। উহাদের প্রত্যেকের পারিশ্রমিক আগামচুক্তি দ্বারা ধার্য হইযা থাকে। মোট আয হইতে উহাদের পারিশ্রমিক মিটাইয়া দিয়া যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা সংগঠন-কর্তা নিজে মুনাফা ,হিসাবে গ্রহণ করে।

বিভিন্ন রকমের ব্যবসায় সংগঠন

(Different Forms of Business Organisation)

পূর্বে সংগঠক বলিতে কোন এক ব্যক্তিকে বুঝাইত। তখন ব্যবসায় সংগঠনের রূপ অত্যন্ত সরল ছিল বলিয়া এক-মালিক ব্যবসায়ই ছিল প্রচলিত রীতি। এইরূপ ব্যবসায় সংগঠনে একজন মালিক বা ব্যবসায়ী জমি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতি অন্যান্য উপাদানসমূহ সংগ্রহ করিয়া উৎপাদন বা ব্যবসায পরিচালনা করিত। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন বা ব্যবসায় সংগঠনের রীতি এবং উদ্দেশ্য দুই-এরই আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুনা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষই উৎপাদন বা ব্যবসায পরিচালনা করে না, অনেকে মিলিযা যৌথভাবে সংগঠন কার্য করিয়া থাকে। আবার, যেমন পূর্বে ব্যবসাযের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা লাভ, সে অবস্থারও বিশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুনা অনেক

ক্ষেত্রেই উৎপাদন বা ব্যবসায় পরিচালিত হয় পারস্পরিক স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কিংবা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য। এই সকল পরিবর্তনের ফলে সম্প্রতি উৎপাদন-ব্যবস্থা বা ব্যবসায় সংগঠন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে এক-মালিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী ব্যবসায়, যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠান, জোট-কারবার, সমবায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক-মালিক প্রতিষ্ঠান
(Single-owner Firm)

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায়ের মালিক ও সংগঠনকর্তা এক ব্যক্তি। উৎপাদনের উপাদানগুলির সংগঠন ও সকল রকম বিধি-ব্যবস্থা তিনি একাই তদারক করেন। তিনি ব্যবসায়ের পরিকল্পনা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সমস্ত ভারই নিজে গ্রহণ করেন। দৈনন্দিন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের কাজও তিনিই দেখাশুনা করেন। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের সমস্ত দায়িত্বই তিনি বহন করেন। সাধারণত এইরূপ সংগঠন ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচলিত।

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের সুবিধা

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সুবিধা আছে। গোটা ব্যবসাযে মালিকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত বলিয়া তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সংগঠন ও পরিচালনা কার্য তদারক করেন। তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ব্যবসায়ের সর্বত্র বিরাজমান। সেইজন্য ব্যবসায় সুপরিচালিত হয়, কোনরূপ অযথা অপচয় ঘটিতে পারে না। ব্যবসাযের মালিকানা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলিয়া এক-মালিক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনানুরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ের নীতি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারে, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করিতে পারে। ব্যবসায় এক-মালিকাধীন থাকায় কারবারের গোপন খুঁটিনাটি বিষয়ও আর কেহ জানিতে পারে না। এইরূপ ব্যবসায় সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয় না এবং মালিকের পক্ষে শ্রমিকের সহিত ব্যক্তিগতভাবে নিকট ও মধুর সম্পর্ক গড়িয়া তোলা সহজ হয়। পরিশেষে, ক্ষুদ্রায়তন এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্রেতার রুচিমাফিক বিশিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করাও সুবিধাজনক।

কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় এইরূপ ব্যবসায়-সংগঠন

একরূপ অচল। বৃহদায়তন উৎপাদনে যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহা একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। কোন এক-মালিক ব্যবসায়ী যদি প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিতে সক্ষমও হন, তাহা হইলেও তাঁহার একার পক্ষে বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। প্রচুর মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণ—এই দুইটি সমস্যার জন্য বিশেষ করিয়া এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠানের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। কেবলমাত্র চাষ-আবাদ, খুচরা মুদীর দোকান প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক-মালিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত দেখা যায়।

এক-মালিক প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায়
(Partnership Firm)

পরস্পর পরিচিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি নিজেদের মূলধন ও বুদ্ধি দ্বারা সম্মিলিতভাবে ব্যবসায় গড়িয়া তোলে তাহা হইলে তাহাকে অংশীদারী ব্যবসায় বলা হয়। অংশীদারী ব্যবস্থায় ব্যবসায়ের আর্থিক লেন-দেনের জন্য অংশীদারগণ সমষ্টিগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। এমন কি যে কোন একজন অংশীদার সমগ্র আর্থিক লেন-দেনের জন্য দায়ী হইতে পারেন। পাওনাদার ঋণের সম্পূর্ণ টাকা অংশীদারগণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। এই ব্যবসায়ে অংশীদারগণের দায়িত্ব অ-সীমাবদ্ধ (unlimited)। কারবার ফেল পড়িলে মহাজন ঋণের মোট টাকা আদায় করার জন্য প্রত্যেক অংশীদারের সম্পত্তি এবং একযোগে সকল অংশীদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসাতেই অংশীদারী প্রথা সাধারণত অধিক প্রচলিত, তবে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনেও এই প্রথার নজির আছে।

এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অংশীদারী কারবারে অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারের ঋণ গ্রহণ করিবার সুবিধা বেশি এই জন্য যে, মিলিতভাবে সকলের নিকট হইতে বা যে-কোন অংশীদারের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায় করা চলে। সম্মিলিত বিনিয়োগ বলিয়া এই কারবারে মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকি বহনও অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহা ছাড়া, সম্মিলিত বিচার-বুদ্ধি, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার দৌলতে

অংশীদারী ব্যবসায়ের সুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায় এক-মালিকানা ব্যবসায় অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ও কর্মকুশল হইয়া থাকে।

অংশীদারী ব্যবসায়ের অসুবিধা

অংশীদারী ব্যবসায়ের বড় গলদ হইল অংশীদারগণের মধ্যে সংগঠন, পরিচালনা ও ব্যবসায়ের নীতি সম্পর্কে মতের অমিল হওয়া। মতানৈক্যের জন্য ব্যবসায় সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ আয়ের লোকের পক্ষে অংশীদার হইয়া ব্যবসায়ে বেশি মূলধন বিনিয়োগ করা বড় সহজসাধ্য নহে। প্রতিষ্ঠানের ঋণের দরুণ অংশীদারগণের অ-সীমাবদ্ধ দায়িত্ব থাকায়, অনেক অর্থবান ব্যক্তিও ঝুঁকি লইয়া এই ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করিতে অসম্মত হন। অংশীদারের মৃত্যু হইলে বা কেহ অংশ ত্যাগ করিলে অংশীদারী ব্যবসায় উঠিয়া যায়। অংশীদারগণের মতের অমিল হইলে এই ব্যবসায়ের পরিচালনা দক্ষতাও এক-মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় হ্রাস পায়।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান
(Joint Stock Company)

যখন কতিপয় ব্যক্তি সমবেতভাবে মূলধন সংগ্রহ ও সম্মিলিত পরিচালনা দ্বারা উৎপাদন বা ব্যবসায় সংগঠন করে তখন উহাকে যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান বলা হয়। প্রথমে উদ্যোক্তাগণ কোম্পানির অনুষ্ঠান-পত্র (Articles of Association) প্রস্তুত করে। ইহাতে কোম্পানির নাম, ধাম, উদ্দেশ্য, মূলধন প্রভৃতি সম্পর্কে বিবরণ থাকে। এই পত্রে সরকার অনুমতি দিলে কোম্পানি নিয়মাবলী সংক্রান্ত স্মারকলিপি (Articles of Memorandum) জনসাধারণের নিকট প্রচার করে এবং শেয়ার বিক্রয় দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করে। যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের একটি পৃথক সত্তা থাকে যাহার বলে কোম্পানি নিজের নামে লেন-দেন, ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি প্রভৃতি ব্যবসায়ে আবদ্ধ হইতে পারে।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানেব বৈশিষ্ট্য

অংশীদারী ব্যবসায়ের তুলনায় এ কারবারের বড় গুণ এই যে, কোম্পানিব ঋণের জন্য অংশীদারগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)। প্রত্যেক অংশীদার যত টাকার শেয়ার কেনে, কারবারের ঋণের জন্য প্রত্যেকের দায়িত্বও ঠিক সেই শেয়ারের মূল্যের সমান। কারবার ফেল পড়িলে, অংশীদারগণের কেবল ব্যক্তিগত শেয়ারের মূল্যই লোকসান হইবে। কোম্পানির পাওনাদার-

গণ ঋণের দাবিতে অংশীদারগণের আর কোন ধনসম্পত্তিতে হাত দিতে পারিবে না।

ভারতে দুই প্রকারের যৌথ কারবারের প্রচলন দেখা যায়। এক, পাবলিক লিমিটেড যৌথ কারবার (Public Limited Joint Stock Company), আর এক প্রাইভেট লিমিটেড (Private Limited) কারবার। পাবলিক লিমিটেড যৌথ কারবার সাত বা সাতের অধিক সংখ্যক অংশীদাব লইয়া গঠিত হয। এই কারবারে যে কেহ শেয়াব ক্রয কবিতে পারে। অংশীদার প্রযোজন হইলে শেযার বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কারবারে দুই হইতে পঞ্চাশজন অংশীদারের মধ্যে মালিকানা সীমাবদ্ধ। পাবলিক লিমিটেড কারবারে অংশীদারগণের ঊর্ধ্ব-সংখ্যার কোন সীমা নাই; কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কারবাবের ঊর্ধ্বসংখ্যা ৫০ জনের বেশি হইবে না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির অংশীদারগণেরও দাযিত্ব সীমাবদ্ধ। অংশীদারদেব দায়িত্ব সীমাবদ্ধ এবং ২ হইতে ৫০ জন অবধি অংশীদারের নিকট হইতে মূলধন সংগ্রহ করা যায বলিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অংশীদাবী কারবাব অপেক্ষা অধিক জনপ্রিয। এই কারবারের জনপ্রিয়তাব আর একটি কারণ এই যে, উদ্যোগী ব্যবসায়িগণ এই ব্যবসায়ে নিজেদের ক্ষমতা কাযেমী রাখিতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে উদ্যোগী ব্যবসাযীর ক্ষমতা দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ নাও থাকিতে পারে; বার্ষিক সাধারণ সভায অংশীদারগণেব দ্বারা তিনি পরিচালকমণ্ডলীতে পুনরায় নির্বাচিত নাও হইতে পারেন।

পাবলিক লিমিটেড ও প্রাইভেট লিমিটেড যৌথ কারবারেব পার্থক্য

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠানের মূলধন প্রধানত শেযার বিক্রয কবিযা সংগ্রহ করা হয। যাহারা শেয়ার ক্রয় করে তাহারা কোম্পানির অংশীদার (shareholders) ও মালিক। কোম্পানির চরম ঝুঁকি তাহাদেরই বহন করিতে হয়। কোম্পানির লাভ হইলে লাভের অংশীদার তাহারাই। আবার, লোকসান হইলে সে লোকসান তাহাদেরই বহন করিতে হয। যদিও অংশীদারগণই কোম্পানিব মালিক ও চরম ঝুঁকি বহনকারী, তথাপি আসলে কোম্পানির সংগঠন, তত্ত্বাবধান ও কর্মসূচী নির্ধারণ প্রভৃতি কাজ তাহাদের মনোনীত প্রতিভূ ডিরেক্টরগণ বা পরিচালকমণ্ডলী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করিযা থাকেন।

মূলধন সংগ্রহ ও পরিচালনা

কোম্পানির শেয়ারপত্র সাধারণত দুইপ্রকারের হইতে পারে : (ক) সাধারণ ও (খ) পক্ষপাতমূলক শেয়ার (ordinary and preference shares)। সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ বন্টনের কোন হার নির্দিষ্ট থাকে না। কোম্পানি যদি কোন বৎসর লাভ না করে, তাহা হইলে সাধারণ শেয়ারের উপর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। পক্ষপাতমূলক শেয়ার ইস্যু (issue) করিবার সময় কোম্পানি নির্দিষ্ট হারে উহার উপর লাভ প্রদানের উল্লেখ করিয়া থাকে। সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের পূর্বেই পক্ষপাতমূলক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ কোম্পানিকে বন্টন করিতে হয়। তবে পক্ষপাতমূলক শেয়ার যদি স্তূপীকৃত বা সঞ্চয়মূলক (cumulative preferential shares) হয়, তাহা হইলে কোন বৎসর লভ্যাংশ না দেওয়া হইলে পরবর্তী বৎসরে পূর্ববৎসরের বাকী লভ্যাংশ দিতে হয়। সাধারণ অংশীদারগণের লভ্যাংশ পক্ষপাতমূলক অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে কম বা বেশি হইতে পারে ; কোম্পানির লাভের পরিমাণ অনুযায়ী উহা কমে ও বাড়ে।

যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান ডিবেঞ্চার (debenture) বা ঋণপত্র ইস্যু করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। যাহারা কোম্পানির ঋণপত্র ক্রয় করে তাহারা কোম্পানির ঋণদাতা। তাহারা অংশীদারগণের ন্যায় কোম্পানির মালিক নহে। ঋণপত্রের আয় হিসাবে নির্দিষ্ট সময়ে সুদ পাইযা থাকে কিন্তু কোম্পানির লভ্যাংশের উপর তাহাদের কোন দাবি নাই। কোম্পানির সংগঠন ও পরিচালনায় তাহারা কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কোন বৎসর কোম্পানির লোকসান হইলেও ঋণপত্র ক্রেতাগণ তাহাদের প্রাপ্য সুদ পুরা মাত্রায় পাইয়া থাকে। কোম্পানি উঠিয়া গেলেও ঋণপত্র-ক্রেতাগণের পাওনা প্রথমে মিটাইতে হয়। সুতরাং, শেয়ারপত্র-ক্রেতাগণের চেয়ে ঋণপত্র-ক্রেতাদের মূলধন বিনিয়োগের ঝুঁকি অনেক কম।

মূলধন সংগ্রহের সুবিধা

যৌথ কারবারের সুবিধা

(Advantages of Joint Stock Company)

যৌথ কারবারের প্রথম ও প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে পরম উপযোগী। এই ব্যবস্থায় প্রচুর

পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। অল্প মূল্যের বহুসংখ্যক শেয়ারপত্র বিক্রয় ও ঋণপত্র ইস্যু দ্বারা কোম্পানি প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। যৌথ কারবার দেশের বিনিয়োগ উৎসাহিত করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়তা করে। কোম্পানির অল্প মূল্যের শেয়ার অতি সাধারণ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রয় করিতে পারে। যৌথ কারবারে শেয়ার-ক্রেতাগণের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব থাকার দরুণ শেয়ার ক্রয় দ্বারা টাকা বিনিয়োগ করিবার ঝুঁকিও এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম।

(১) মূলধন সংগ্রহের সুবিধা

কোম্পানির শেয়ারপত্র হস্তান্তরযোগ্য (transferable) বলিয়া সাধারণ আয়ের লোকের কাছে যৌথ কারবারে টাকা বিনিয়োগ করা খুবই লোভনীয়। শেয়ার-ক্রেতাগণ, নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে, বিনিময় বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া উহার অর্থমূল্য ফিরিয়া পাইতে পারে। কোন শেয়ার-ক্রেতার মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারীরা শেয়ারের মালিকানা পাইয়া থাকে। ফলে, শেয়ার-ক্রেতাগণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির উৎপাদন-ধারা ব্যাহত হয় না। সেইজন্য অংশীদারী কারবারের তুলনায় এই ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা অধিক।

(২) সাধারণ আয়ের লোকের পক্ষে বিনিয়োগের সুবিধা

যৌথ কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে। শেয়ার-ক্রেতাগণের সীমাবদ্ধ দায়িত্বের জন্য পরিচালকমণ্ডলী প্রচুর সাহসিকতার সহিত বিনিয়োগ ও উৎপাদনের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারে, প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও সুষ্ঠু দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে।

(৩) বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ

অনেক অর্থবান লোক আছেন যাঁহারা ব্যবসায়-বুদ্ধির ধার ধারেন না। যৌথ কারবার এইরূপ ব্যক্তিগণের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। আবার, মূলধনবিহীন কিন্তু ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের এই কারবারে সংগঠন ও পরিচালনা নৈপুণ্য দেখাইবারও যথেষ্ট সুযোগ আছে।

(৪) ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন অর্থবান লোকের অথবা বুদ্ধিসম্পন্ন মূলধনবিহীন লোকের বিনিয়োগের সুবিধা

যৌথ কারবারের অসুবিধা

(Disadvantages of Joint Stock Company)

যৌথ কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সত্ত্বেও বহু ত্রুটি ও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়া থাকে। মতবাদের দিক হইতে ইহা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ কোম্পানিতেই একটি ক্ষুদ্র পরিচালকমণ্ডলী প্রকৃত তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। শেয়ার হস্তান্তর করিবার সহজ উপায় থাকায় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব দলীয় স্বার্থান্ধ মুষ্টিমেয় চতুর ব্যক্তির হাতে আসিয়া পড়ে। ইহাতে সমাজে ধনবন্টনের অসাম্য বৃদ্ধি পায়।

( ) কারবার দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হয়

দ্বিতীয়ত, অনেক পরিচালকমণ্ডলী সাধারণ শেয়ার ক্রেতাগণের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া ফটকা ব্যবসায়ে কোম্পানির অর্থ খাটাইয়া উহার প্রকৃত স্বার্থের হানি করে। কারবারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার দরুণ ডিরেক্টরগণ কোম্পানির আসন্ন বিপদ পূর্ব হইতে অনুমান করিতে পারে। ফলে, তাহারা জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করিয়া অনিবার্য লোকসানের হাত হইতে রেহাই পায়। আবার, যখন তাহারা অনুমান করে যে, কোম্পানি অধিক লভ্যাংশ বন্টন করিতে সমর্থ হইবে তখন তাহারা বহু পরিমাণ শেয়ার খরিদ করিয়া উহা উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে।

(২) কোম্পানির অর্থ ফটকা কারবারে খাটে

যৌথ কারবারে আর একটি গলদ এই যে, ডিরেক্টর ও অংশীদারগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব কম। অংশীদারগণের সংখ্যাধিক্য হেতু এবং শেয়ারপত্র প্রায়ই হস্তান্তরিত হওয়ার দরুণ পারস্পরিক সংযোগবোধ ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা যৌথ কারবারে খুব বিরল। কোম্পানির কর্তৃত্ব যাহাদের হাতে তাহাদের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যই প্রবল হয়—অংশীদারগণের সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) ডিরেক্টর ও অংশীদারগণের মধ্যে যোগাযোগের অভাব

(৪) অনেক সময় যৌথ কারবারে পরিচালনা-দক্ষতার অভাব দেখা যায়। বেতনভোগী কর্মচারিগণের হাতে পরিচালনার ভার থাকায় সুষ্ঠু তদারকের যেমন অভাব হয়, তেমনি আবার অতিমাত্রায় ব্যয় ও

আর্থিক অপচয়ও বেশ ঘটে। বাঁধা মাহিনার কর্মচারিগণ অধিক অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি গ্রহণ করিতে যেমন নারাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল কার্যপদ্ধতি প্রবর্তন করিতেও তেমন উৎসাহী নহে।

(৪) সুষ্ঠু পবিচালনাব অভাব ও অতিমাত্রায় আর্থিক অপচয়

যৌথ কারবারে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কও মধুর নহে। কোম্পানিব অংশীদারগণ দেশের মধ্যে ছড়াইয়া থাকে বলিয়া ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণত উদাসীন থাকে। শ্রমিকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রক্ষা করাই তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে, শ্রমিক-মালিক মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকে।

(৫) শ্রমিক-মালিক মনোমালিন্য ও বিবাদ

পরিশেষে, ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, যৌথ কারবারের মাধ্যমেই আধুনিক একচেটিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। যৌথ কারবারেব ফলে কতিপয় ব্যক্তি দেশের বিভিন্ন শিল্পের এবং একই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু শেয়ার ক্রয় করিয়া দেশেব গোটা অর্থনৈতিক জীবনের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং কর্তৃত্ব করিতে পারে।

(৬) একচেটিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাব সৃষ্টি

জোট-কারবার
(Combination)

অনেক সময় কতকগুলি যৌথ কারবারের একত্রীকরণের ফলে বৃহৎ এক যৌথ কারবারের সৃষ্টি হয়। ইহাকে জোট-কারবার বলা হয়। এইরূপ একত্রীকরণের উদ্দেশ্য হইল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করা এবং একচেটিয়া মুনাফা লাভ করা। জোট-কারবার প্রায়ই একচেটিয়া ব্যবসায় গড়িয়া তোলে। অনেক সময় রাষ্ট্রের আইনও একচেটিয়া জোট-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে। জনসাধারণের আনুকূল্যে রাষ্ট্র অনেক সময় শিল্প উৎপাদনে প্রতিযোগিতা রোধ করিয়া জোট-সৃষ্টি উৎসাহিত করে। ব্যয়-সঙ্কোচের উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ ঘটে ও তাহাতে জোট-ব্যবসায় উৎপত্তি হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এক জোট হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় লাভ করা যায়। অনেক সময় জোট-উৎপত্তির উদ্দেশ্য হয় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ ধার্য

জোট কারবার উৎপত্তির কারণ

করা, উৎপন্ন পণ্যের বাজার-দাম নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজন হইলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিক্রয়-বাজার পৃথকীকরণ করা। প্রচুর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতেও জোট-কারবারের উৎপত্তি হইতে পারে। ভারতে Cement Marketing Board এবং India Sugar Syndicate জোট-কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একচেটিয়া জোট-কারবার বৃহদায়তন উৎপাদন-ব্যবস্থার সকল রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের কারবার সমাজ-কল্যাণ বিরোধী হইতে পারে। জোট কারবার বাজারে পণ্য যোগানের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দ্বারা ভোগকারিগণের অসুবিধার কারণ হইতে পারে। সেইজন্য সরকারকে অনেক সময় বাধ্য হইয়া পণ্যের বাজার দাম এবং এইরূপ কারবারের মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

সমবায়
(Co-operation)

আর্থিক দুঃস্থ ও স্বল্প-আয়বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি পরস্পরের কল্যাণের ভিত্তিতে স্ব-ইচ্ছায় সম্মিলিতভাবে যে বিশেষ ধরনের ব্যবসায় সংগঠন গড়িয়া তোলে, তাহাকে সমবায় কারবার বলে। সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠিত হইলে উহাকে সমবায় সমিতি (co-operative society) বলা হয়। সমবায়ের মূলসূত্র হইল, ধনতন্ত্রবাদের কুফল দূর করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উৎপাদনের গলদ উচ্ছেদ করা এবং সাম্যের ভিত্তিতে শ্রমিক ও অল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মিলিত ব্যবসায় গড়িয়া তোলা। সমবায় কারবারের গোড়াপত্তন হয় অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে। এই কারবারের মূলধন যোগায় শ্রমিক বা অল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। ইহারাই ব্যবসায়ের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন এবং ইহারাই মুনাফারও অংশীদার। সমবায় কারবার একদিকে যেমন ধনিক-মালিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর, তেমনি অপরদিকে ফড়িয়া শ্রেণীকে নির্মূল করিয়া ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপনে কৃতসংকল্প হয়। ক্ষুদ্রায়তন কৃষি উৎপাদনে, কুটিরশিল্প, ঋণদান, ভোগ্যপণ্য সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় ব্যবসায় বিশেষ সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা যায়।

সমবায়ের নীতি বা বৈশিষ্ট্য

সমবায় ব্যবসায় কতকগুলি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সংগঠিত হইয়া থাকে। প্রথমত, সমবায় ব্যবসায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘবদ্ধতার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। কোন বাধ্য-বাধকতার চাপে কাহাকেও সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আপন ইচ্ছায় নিজের স্বার্থে লোকে সমবায় সমিতির সভ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, সমবায়ের আর একটি মূলনীতি হইল ঐক্য। অল্প-আয়বিশিষ্ট কৃষক, কারিগর প্রভৃতি দুঃস্থ ব্যক্তিগণ পরস্পরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। এই ঐক্যের ভিত্তিতে তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আর্থিক এবং নৈতিক উন্নতি সম্ভব হয়।

তৃতীয়ত, সমবায় কারবার অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত। সেইজন্য সকল সদস্যই মর্যাদাসম্পন্ন। সমিতি প্রত্যেক সদস্যের স্বার্থ সমান ভাবে দেখে, আবার প্রত্যেক সদস্যের সমিতি পরিচালনা করিবার ক্ষমতাও সমান।

পরিশেষে, সমবায়ের আর একটি মূলনীতি এই যে, পরিচালনা ব্যাপারে অযথা ব্যয়বাহুল্য পরিহার করা হয়। দুঃস্থ অল্প-আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর্থিক উন্নতিবিধানই সমবায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সেইজন্য সমিতির পক্ষে মিতব্যয়িতা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

সমবায়ের সুবিধা

সমবায় কারবারের প্রধান উপযোগিতা এই যে, এই ব্যবস্থায় স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পরস্পরের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত হয়। যে সকল ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য নাই, যাহারা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে এই ব্যবসায় সংগঠন করিলে আর্থিক উন্নতি করিতে পারে। এই ব্যবসায় দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতে পারে। প্রত্যেকেরই ব্যবসায়ে মালিকানা বর্তমান বলিয়া উৎসাহ ও যত্নের সহিত কাজ করিয়া থাকে। কাহারও মনে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ধারণা না থাকায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু সমবায় ব্যবসায়ের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্রথমত, সমবায় সমধিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে না বলিয়া বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার ব্যয়-সংক্ষেপের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সমবায় কারবার

সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হইলে যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও ঝুঁকি গ্রহণের প্রয়োজন তাহা সমবায় সমিতির সকল সভ্যের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণত ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমবায় কারবারে সভ্য হইতে চাহে না; কেন না, তাহারা স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া অনেক বেশি আয় অর্জন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, সমবায় ব্যবসায় সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে হইলে সভ্যগণের কতকগুলি গুণ থাকা প্রয়োজন। সততা, আনুগত্য, ঐক্যবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি সভ্যদের মধ্যে না থাকিলে সমবায় সাফল্যলাভ করিতে পারে না। সমবায় সমিতির অধিকাংশ সদস্যগণের মধ্যে এই গুণগুলি কদাচিৎ দেখা যায়।

সমবায়ের অসুবিধা

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ
(State Enterprise)

বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বহু ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালনা ও সংগঠনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছে। জনকল্যাণমূলক কার্যের পরিচালনা ছাড়া শিল্প-বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধান একাধিক কারণে সমাজ কল্যাণের অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক ব্যবসায়ের ন্যায় রাষ্ট্র পরিচালিত ব্যবসায়-উদ্যোগের মুনাফা লাভই একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে না। জনসাধারণের কল্যাণ বিধানই রাষ্ট্রীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যক্তিতান্ত্রিক কারবারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সকল রকম কুফল ও আর্থিক অপচয় দূর করে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়নের সহায়তা করে। এমন অনেক শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করিতে হয়, মুনাফা লাভের সম্ভাবনাও তেমন সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ নহে। যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্প। এই ধরনের ব্যবসায়-উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তত্ত্বাবধান অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে দেশের উৎপাদনের উপকরণগুলি সুপরিকল্পিতভাবে কাম্য ও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করিতে পারে। ইহাতে অবাঞ্ছিত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া থাকে। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রচারকার্য বাবদ অথবা

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগের সপক্ষে যুক্তি

অর্থের অপচয় ঘটে না, এবং দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস-বৃদ্ধিও অনেকটা কমে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-ব্যবসায় সরকারী আয়েরও একটি বড় উৎস। দেশের আর্থিক মন্দা অবস্থা প্রতিকারের জন্য এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্যও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ সম্প্রসারণের সার্থকতা আছে। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-বৃদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন করিবার বিশেষ যৌক্তিকতা আছে।

বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠন করার অসুবিধাও আছে। রাষ্ট্র পরিচালিত শিল্প-বাণিজ্যে সাধারণত উদ্যম ও কর্মতৎপরতার অভাব দেখা যায়। এই ধরনের ব্যবসায়-উদ্যোগে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা কম বলিয়া পরিচালকগণ উৎসাহ ও যত্ন লইয়া উৎপাদন সংগঠন করে না; গতানুগতিক রুটিন-মাফিক কার্য সম্পাদন করা ছাড়া নূতন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা প্রগতিশীল কার্যপদ্ধতি প্রবর্তন করিতে আগ্রহশীল হয় না। উদ্যমহীন পরিচালনা ও ব্যবসায়িক দক্ষতার অভাব হেতু রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ প্রায়ই লোকসানগ্রস্ত হইয়া থাকে। আবার কার্যে উদ্যম ও দক্ষতা দেখাইলেও ভবিষ্যতে উন্নতি ও পুরস্কারের সম্ভাবনা না থাকায় পরিচালকগণের মধ্যে স্বজনপ্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ এবং আরও অনেক রকম দুর্নীতি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শিল্প-বাণিজ্য সুপরিচালিত হইতে পাবে না। অনেক সময় রাষ্ট্র শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের তত্ত্বাবধানের ভার প্রত্যক্ষভাবে নিজ হাতে না রাখিয়া একটি সরকারী সংস্থার (Public Corporation) হাতে ন্যস্ত করিয়া থাকে। এইরূপ সংস্থা সাধারণত ব্যবসায়িক দক্ষতা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠন করা হয়। তাহাদের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইয়া থাকে।

১৩ | উৎপাদন সংগঠন

(Organisation of Production)

আমরা জানি যে উৎপাদন সংগঠন কবিতে হইলে বিভিন্ন উৎপাদনগুলির একত্রীকরণ ও সমন্বয় বিধান কবিতে হয়। যেসকল উপাদানের সহযোগে উৎপাদন সংগঠিত হইষা থাকে উহাদেব প্রত্যেকটি একাধিক কার্যে নিযুক্ত হইতে পাবে। যেমন, যে জমিতে ধান উৎপাদন কবা যায, সে জমি পাট উৎপাদন কার্যেও নিযুক্ত হইতে পাবে। যে শ্রমিক পাটশিল্পে কাজ করে, তাহাকে তুলাবস্ত্র শিল্পেও নিযুক্ত করা চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আবার ধানের জমিতে কেবল ধানই উৎপাদন কবা হয, পাটেব জমিতে কেবল পাটই উৎপাদন কবা হইয়া থাকে। সেইরূপ যে শ্রমিক পাটশিল্পে কাজ করে তাহাকে তুলাবস্ত্র শিল্পে নিযোগ কবা হয় না। এইভাবে বিভিন্ন উৎপাদনের মধ্যে বিশেষিকরণ (specialisation) লক্ষ্য করা যায।

বিশেষিকরণ

(Specialisation)

যখন কোন উৎপাদনের উপাদান নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী একটি বিশেষ দিকে কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে তখন উহাকে বিশেষিকরণ বলে। বিশেষিকবণ আধুনিক অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি সকল উপাদানের মধ্যে কিছু-না-কিছু বিশেষিকরণ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, উদ্যোক্তার সংগঠন কার্যেরও বিশেষ বিশেষিকরণ দেখা যায়।

শ্রম-বিভাগ

(Division of Labour)

যে উপাদানটিতে সর্বপ্রথম বিশেষিকরণ দেখা দিযাছিল উহা হইল শ্রম। শ্রমের বিশেষিকরণকেই শ্রম-বিভাগ বলা হয়। আদিতে একটি পেশা বা কার্যকে ভিত্তি করিযা শ্রম-বিভাগনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। এই পেশাগত শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি কাজের প্রথম

হইতে শেষ পর্যন্ত সবটাই নিজে একার পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন করিত। যেমন, লাঙ্গল তৈরি, ক্ষেত চাষ, জলসেচ, ফসল তোলা যাবতীয় কাজ কৃষক নিজে একা করিত।

বর্তমানে শ্রম-বিভাগনীতির আরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। অধুনা প্রত্যেকটি পেশা বহু ভাগে ভাগ করা হয়। আজ বৃহদায়তন উৎপাদনের জটিল অবস্থায় একটি কাজকে বহু অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এক একটি অংশের কাজ বিশেষ নিপুণ ব্যক্তিদ্বারা সম্পন্ন করা হয়। যেমন,

বর্তমান শ্রম-বিভাগ

অধুনা জুতা তৈরির কারখানায় জুতা তৈরির কাজ বহু অংশে বিভক্ত। কেহ চামড়া শোধন করে, কেহ গোড়ালি তৈরি করে, কেহ জুতার তলা তৈরি করে, কেহ জুতা সেলাই করে, কেহ ফিতা লাগায়, কেহ পালিশ করে, কেহ বাক্সে প্যাকিং করে, ইত্যাদি। সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগের ফলে কাজ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়া থাকে যে, উহার কোন একটি অংশই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতার ফলে তবে গোটা কাজটি ভালভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শ্রম-বিভাগের ফলেই দ্রব্য বিনিময় প্রয়োজন হয়। যেমন, মুচি কেবল জুতা এবং চামড়ার জিনিস তৈরি করে। অন্যান্য জিনিসের অভাব মিটাইতে তাহাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। সে চামড়ার জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পায় তাহা দ্বারা অপরের নিকট হইতে দ্রব্য বিনিময় করে।

অধুনা আর একপ্রকারের শ্রম-বিভাগ দেখা যায়। কেবল শ্রমিকের বেলায় নহে, দেশ বা অঞ্চলের বেলায়ও শ্রম-বিভাগ বা বিশেষিকরণ নীতি সমান ভাবে প্রযোজ্য। যে দেশ বা যে অঞ্চল যে দ্রব্য তৈরি করিতে

আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক শ্রম বিভাগ

উপযুক্ত, সেই দেশ বা সেই অঞ্চল সেই দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। বাংলাদেশে পাট উৎপাদনের সুবিধা আছে বলিয়া উহা পাট উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। আবার পাঞ্জাবে গম উৎপাদনের সুবিধা আছে বলিয়া উহা গম উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। শুধু এক দেশের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল নহে, বিভিন্ন দেশও বিশেষ বিশেষ সুবিধার দরুণ বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারে। যেমন, ক্যালিফোর্নিয়ার ফিল্ম তৈরির

বিশেষ সুবিধা আছে, ডেনমার্কের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপন্ন করিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে। সেইজন্য ক্যালিফোর্নিয়া ফিল্ম তৈয়ারি করে, ডেনমার্ক দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈয়ারি করে। এইরূপ বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশের বেলায় যখন শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগ লাভ করে তখন উহাকে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ (Territorial or Geographical Division of Labour) বলে।

শ্রম-বিভাগের উপকারিতা
(Advantages of Division of Labour)

বর্তমান শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার উন্নতি প্রধানত শ্রম-বিভাগের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। যে যে কাজের উপযুক্ত সে তাহাতে নিযুক্ত হওরার জন্য উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতিরও গতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের ফলে শ্রমিকের ব্যক্তিগত দক্ষতা ও উদ্ভাবনীশক্তি বাড়ে এবং উৎপাদনের পরিমাণও বিস্তৃতি লাভ করে। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত সেই কাজে নিযুক্ত হইলে সে তাহার দক্ষতা দেখাইতে পারে। আবার, একই কাজে নিযুক্ত থাকিবার ফলে শ্রমিক অনেক রকম যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সহায়তা করিতে পারে।

তৃতীয়ত, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন স্বল্পমেয়াদী হয়। কোন শ্রমিকের পক্ষে গোটা কাজের চেয়ে কাজের একটি অংশ সম্পন্ন করিতে কম সময় লাগে। শ্রম-বিভাগ উৎপাদনে যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎসাহিত করে। ইহাতে শ্রম-সংক্ষেপ (economy of labour) হয়।

চতুর্থত, শ্রম-বিভাগের ফলে বহু রকমের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। উৎপাদন কার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের চাকুরির সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে, শ্রম-বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং বাজারে অল্প দামে জিনিস বিক্রয় করা সম্ভব হয়। ফলে, ভোগকারিগণ অপেক্ষাকৃত সস্তায় জিনিস ক্রয় করিতে পারে। সুদক্ষ শ্রমিকদ্বারা দ্রব্য উৎপাদন উৎসাহিত করে বলিয়া শ্রম-বিভাগ উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে।

শ্রম-বিভাগের অপকারিতা
(Disadvantages of Division of Labour)

শ্রম-বিভাগের যেমন উপকারিতা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহার অপকারিতাও অস্বীকার করা যায় না। সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগের ফলে কাজে একঘেয়েমি আসে, শ্রমিক কাজে উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। ইহাতে শ্রমিকের কর্ম-কুশলতাও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রম-বিভাগ শ্রমিকের দায়িত্বজ্ঞান পঙ্গু করে। প্রত্যেক শ্রমিক কাজের ক্ষুদ্র একটি অংশ সম্পাদন করে বলিয়া উৎপাদন কার্যের সামগ্রিক দায়িত্ব তাহাকে স্পর্শ করে না। শ্রমিক একটি বিশেষ কাজে বিশিষ্টতা অর্জন করে বটে, কিন্তু অন্যান্য কার্যে তাহার বুদ্ধিশক্তির স্ফূরণ হয় না। শ্রমিক যন্ত্রবৎ এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়ে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না।

তৃতীয়ত, সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগের আর একটি কুফল হইল, অনেক সময় শ্রমিকের বেকার হইবার সম্ভাবনা থাকে। শ্রম-বিভাগের ফলে শ্রমিক কোন একটি কাজের একটি বিশেষ অংশ সম্পাদন করিতে নিপুণতা লাভ করে। একখানি চেয়ারের সে হয়তো একখানা পা তৈরি করিতে পারে। যদি চেয়ারের পা তৈরি কাজের চাহিদা না থাকে, তাহা হইলে ঐ শ্রমিক বেকার হইবে।

পরিশেষে, শ্রম-বিভাগের ফলে বড় বড় কারখানা গড়িয়া উঠে সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কারখানা সংশ্লিষ্ট অনেক রকম গলদ ও কুফলও দেখা দেয়। লোকের ঘনবসতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নৈতিক আদর্শের বিচ্যুতি প্রভৃতি অনেক রকম অমঙ্গলকর কুফল শ্রমিকের জীবনকে বিষময় করিয়া তোলে।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার
(Use of Machinery)

শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগের সহিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের নিবিড় সম্পর্ক আছে। শ্রম-বিভাগ যত সূক্ষ্মতর হইবে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও ততই বৃদ্ধি পাইবে। আবার যন্ত্রপাতির ব্যবহার যত বাড়িবে শ্রমের বিশেষকিরণও ততই সূক্ষ্মতর হইবে। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনে বহু সুফল পাওয়া যায়।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুফল

প্রথমত, যন্ত্রপাতি ব্যবহার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উপর অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছে এবং বহু রকমের শক্তি কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাছাড়া, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের দেহের খাটুনি অনেক কমিয়াছে, যন্ত্রশক্তির সহায়তায় সে অনেক ভারী কাজ সহজেই করিতে পারিতেছে।

দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কাজের গতি দ্রুত হইয়াছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূক্ষ্ম এবং একই ধরনের দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব হইতেছে। আবার, একই মানের দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধা হওয়ায় উৎপাদকের ঝুঁকির পরিমাণও অনেক কমিয়াছে। একই মানের দ্রব্যের চাহিদা বাজারে অনেকটা সুনিশ্চিত বলিয়া দ্রব্য বিক্রয়ের অসুবিধা ও হ্রাস দেখা দিতে পারে না।

তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কারিগরি ব্যয়-সংক্ষেপ (technical economy) করা সম্ভব হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সস্তায় দ্রব্য উৎপাদন করা সহজ হইয়াছে। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা প্রবর্তনের ফলে যানবাহন ও যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধাও বাড়িয়াছে।

পরিশেষে, শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মনৈপুণ্যের উৎকর্ষ বিধানে যন্ত্রপাতির ব্যবহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার অধুনা শ্রমিককে অধিকতর কর্মদক্ষ ও দায়িত্বশীল করিয়া তাহার মজুরি বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কুফল

কিন্তু ব্যাপক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের খারাপ দিকও আছে। কলকব্জার হঠাৎ প্রচলন শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। একটি কাজ হাতে করিতে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই কাজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে করিলে বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিককে চাকুরি হইতে সরাইয়া দিতে হয়।

দ্বিতীয়ত, কলকব্জা ব্যবহার দ্বারা কেবল একই মানের দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। যন্ত্রযুগে ব্যক্তিগত রুচিমাফিক দ্রব্য উৎপাদন বিরল হইয়া পড়িয়াছে। যন্ত্রপাতির প্রচলনে রকমারি চারুশিল্পের উৎপাদনও ব্যাহত হইয়াছে।

পরিশেষে, কলকব্জার ব্যবহার কারখানা-জীবনে বহু কুফল আনয়ন করে। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, কুরুচিপূর্ণ নৈতিক পরিবেশ, কায়িক ও মানসিক

বৃত্তিস্ফুরণের প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতি শ্রমিকের জীবনের উপর বিষবৎ ক্রিয়া করে।

যন্ত্রপাতি ও বেকারত্ব
(Machinery and Unemployment)

যন্ত্রপাতির ব্যবহার শ্রমিকের নিয়োগের উপর বিপরীতমুখী প্রভাব বিস্তার করে। কতকগুলি যন্ত্রপাতি শ্রম-হারক (labour-saving), আবার, কতক-গুলি যন্ত্রপাতি মূলধন-হারক (capital-saving)। শ্রম-হারক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে মানব-শক্তির (man power) অতি সামান্যই প্রয়োজন হয়। যেমন, কোন জমিতে চাষাবাদ করিতে ৩০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হইত। সেই জমিতে ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে মাত্র একজন শ্রমিকই কাজ চালাইতে পারে। বাকী ২৯ জনের নিয়োগ প্রয়োজন হয় না। আবার, মূলধন-হারক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলেও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। যেমন, এমন একটি নূতন বয়লার আবিষ্কার করা হইল যাহাতে কয়লার কম প্রয়োজন হয়। এই বয়লারটি ব্যবহারের ফলে কারখানার মূলধন বাবদ ব্যয় অবশ্যই হ্রাস পাইবে। কিন্তু যেহেতু কয়লার প্রয়োজন কম হইবে, সেইহেতু কয়লার উৎপাদন হ্রাস পাইয়া কয়লা খনি-শিল্পে শ্রমিকের কিছুটা বেকারত্ব ঘটিবে।

শ্রমহারক ও মূলধন-হারক যন্ত্রপাতি দুইই বেকারত্ব বৃদ্ধি করে

কিন্তু অপরদিকে আবার দেখা যায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার নূতন নিয়োগ সৃষ্টি করে। যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য নূতন কারখানা গড়িয়া উঠে। ইহাতে বেকার শ্রমিকের কিছুটা কর্ম-সংস্থান হয়। দ্বিতীয়ত, যন্ত্রপাতির ব্যবহার যতই বৃদ্ধি পায় ততই উৎপাদনের কৌশলগত উন্নয়ন ও কারিগরি দক্ষতা প্রসার লাভ করিতে থাকে। যেমন, ট্রাক্টর নিয়োগ করিলে অনেক পতিত ও অকর্ষিত জমি কৃষির অধীনে আসিতে পারে। এইভাবে যন্ত্রের সহায়তায় চাষাবাদ বৃদ্ধি করিতে হইলে কৃষির কৌশলগত উন্নয়ন, যথা, বৈজ্ঞানিক সারের সরবরাহ, জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই সকল কার্যে শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তৃতীয়ত, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়। ইহার ফলে, লোকের ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিবার

অন্যদিকে যন্ত্রপাতি নিয়োগ বৃদ্ধি করে

ক্ষমতা বাড়ে। লোকের এই ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত করিয়া কিছু শ্রমিকের নিয়োগ সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনা হইতে এই মন্তব্য করা চলে যে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং উৎপাদনের কৌশলগত উন্নয়নের ফলে বেকারত্ব আপাত-দৃষ্টিতে সাময়িকভাবে প্রসারলাভ করে বটে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ হইতে এ কথা বলা যায় যে, যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়োগের সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। সমাজের সামগ্রিক ব্যয়প্রবাহ (total flow of spending) যদি হ্রাস না পায়, তাহা হইলে যন্ত্রপাতি নিয়োগের ফলে বেকারত্ব প্রসার লাভ করিতে পারে না।

শিল্প স্থানীয়করণ
(Localisation of Industries)

বিভিন্ন লোক যেমন বিভিন্ন কাজে বিশিষ্টতা অর্জন করিতে পারে, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশেরও বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষিকরণ ঘটিতে পারে। কোন অঞ্চল বা দেশ যখন একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করে, তখন আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক শ্রম-বিভাগ নীতি প্রয়োগ হইয়াছে বলা চলে। এই নীতি প্রয়োগের ফলে যখন কোন বিশেষ স্থানে কোন একটি বিশেষ শিল্পের অধীন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তখনই শিল্প স্থানীয়করণ ঘটে। যেমন, ক্যালিফোর্নিয়ায় বহু প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি ফিল্ম-শিল্প উৎপাদনে নিযুক্ত আছে। সেখানে ফিল্ম-শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ
(Causes of Localisation of Industries)

শিল্প স্থানীয়করণ একাধিক সুবিধার জন্য ঘটিতে পারে। এই সুবিধা-গুলিকে নিম্নোক্ত ভাগে ভাগ করা চলে :

(১) **প্রাকৃতিক সুবিধা** (Natural Advantage): প্রাকৃতিক বহু-রকমের সুযোগ-সুবিধার জন্য শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিতে পারে। প্রাকৃতিক সুবিধাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় :

(ক) উপযুক্ত জলবায়ু—কোন স্থানের সাধারণ জলবায়ু বা আবহাওয়া কোন বিশেষ শিল্পোৎপাদনের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যেমন,

ক্যালিফোর্নিয়ার সারাবৎসরব্যাপী উজ্জ্বল সূর্যকিরণ, বিশেষ করিয়া ঐ স্থানের ফিল্ম-শিল্পের স্থানীয়করণের প্রধান কারণ। সেইরূপ বোম্বাই-এর আর্দ্রবায়ু ঐ স্থানের বয়ন-শিল্পের স্থানীয়করণের অন্যতম কারণ।

(খ) উপযুক্ত ভূমি—ভূমির বৈশিষ্ট্য অনেক সময় শিল্পের স্থানীয়করণের সহায়তা করে। যেমন, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা তুলা উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী।

(গ) কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা—যে স্থানে কাঁচামালের সস্তা যোগান পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প-স্থানীয়করণ বিশেষভাবে উৎসাহিত হয়। কলিকাতার আশেপাশে পাটশিল্পের যে স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে, উহার প্রধান কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় কাঁচাপাট সহজেই আমদানি করা যায়।

(ঘ) শক্তির নৈকট্য—যে স্থানে সহজে ও অর্থব্যয়ে শক্তি-সম্পদের সরবরাহ পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প স্থানীয়করণের বিশেষ সুবিধা। জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে ; উহার অন্যতম কারণ এই যে, অতি নিকটেই কয়লা-শক্তির কেন্দ্র আছে। অধুনা ভারতে বহু বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রের নিকটে বড় বড় শিল্পাঞ্চল গড়িয়া উঠিতেছে।

(ঙ) শ্রমের যোগান—যে স্থানে প্রচুর সস্তা শ্রম সরবরাহের সুবিধা আছে, সেখানে শিল্প-স্থানীয়করণের বিশেষ সুযোগ হয়। যেমন, উত্তরবঙ্গে ডুয়ার্স অঞ্চলে চা-শিল্প স্থানীয়করণ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, ঐ অঞ্চলে বিহার ও ছোটনাগপুর হইতে সস্তায় কুলি আমদানি করিবার সুবিধা আছে।

(চ) বাজারের নৈকট্য—যে স্থান চাহিদা-বাজারের খুব কাছাকাছি, যে স্থান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সহজে প্রেরণ করা যায় বা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যায়, সেখানে শিল্প স্থানীয়করণ সহজেই ঘটে। কলিকাতার আশপাশে পাটের কল স্থাপিত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, কলিকাতা বন্দর হইতে বিদেশে অনেক স্থানে সহজে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা যায়।

(ছ) উপযুক্ত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা—ভাল যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার উপরেও শিল্প স্থানীয়করণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। কোনস্থানে যদি ভাল যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে ঐ স্থানে অল্প ব্যয়ে কাঁচামাল আমদানি করিবার সুবিধা হয় এবং ঐ স্থান হইতে উৎপন্ন পণ্য বাজারে প্রেরণ করা সহজ হয়।

(২) **অর্জিত সুবিধা** (Acquired Advantages) : একটি স্থানে শিল্প স্থানীয়করণ ঘটিলে ঐ অঞ্চলে বহু সহায়ক শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠে। এই সকল সহায়ক শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রসারণের ফলে যে শিল্পটির স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে উহা নানারকমে সুযোগ-সুবিধা অর্জন করিয়া থাকে। সহায়ক শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পটি নিকটেই ব্যাঙ্ক, গুদাম, পরিবহন-ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণের সরবরাহ, সুদক্ষ শ্রমিক যোগান প্রভৃতির সুবিধা অতি সহজে পাইয়া থাকে। একটি শিল্পের কোন স্থানে স্থানীয়করণ ঘটিলে উহার খ্যাতি এমনভাবে ছড়াইয়া পড়ে যাহাতে বহু সহযোগী শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান প্রসার লাভ করে। ফলে, সংশ্লিষ্ট শিল্পটির অর্জিত সুবিধাগুলি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার বেগে ("momentum of the early start") অর্জিত সুবিধাগুলি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(৩) **আপেক্ষিক সুবিধা** (Relative or Comparative Advantages) : আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধার গুরুত্বের উপরও শিল্পের স্থানীয়করণ নির্ভর করে। প্রত্যেক অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের উপাদানসমূহ সংগ্রহের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রত্যেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকেই কাঁচামাল, জমি, শ্রমিক, মূলধন প্রভৃতি উপাদান দাম দিয়া কিনিতে হয়। কেবলমাত্র সেই শিল্পেরই সেই অঞ্চলে স্থানীয়করণ ঘটে যে অঞ্চলে উহা উপযুক্ত দাম দিয়া উৎপাদনের উপাদানগুলি কিনিতে সক্ষম।

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা
(Advantages of Localisation)

কোন স্থানে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে বহু রকমের সুবিধা সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধার জন্য যদি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটে, তাহা হইলে দ্রব্য উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় কম পড়ে। কাঁচামাল, শক্তির উৎস ও চাহিদা-বাজার যদি স্থানীয়কৃত শিল্পের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতই কম হইবে।

দ্বিতীয়ত, কোন একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিলে ঐ শিল্পে নিয়োজিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের খ্যাতি বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে, ইহা বিক্রয়-ব্যবস্থার উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

তৃতীয়ত, একটি অঞ্চলে শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে ঐ শিল্পের আশপাশে বহু সহযোগী শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। যেমন, বস্ত্রবয়ন-শিল্প কোথাও স্থানীয়কৃত হইলে, উহার আশপাশে রং-শিল্প, বয়ন-শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতির অংশ তৈরি ও মেরামত করিবার মত বহু সহায়ক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ইহার ফলে স্থানীয়কৃত ও সহযোগী শিল্পগুলির উভয়েরই নানা রকম সুবিধা হয়।

চতুর্থত, কোন অঞ্চলে একটি শিল্প কেন্দ্রীভূত হইলে সেখানে শ্রমিক যোগানের সুবিধা হয়। যেমন, বোম্বাইএ তুলাবয়ন-শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে বহু কারখানা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কাজের সম্ভাবনায় বহু দক্ষ শ্রমিক ঐ অঞ্চলে যাইয়া ভিড় করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প মজুরিতে সুদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারে।

পরিশেষে, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করিবার সুযোগ পায়। শিল্পের একই ধরনের সমস্যা প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সম্মিলিত চেষ্টা, বিষয়-বুদ্ধি ও কার্য দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধান করিতে পারে।

স্থানীয়করণের অসুবিধা

(Disadvantages of Localisation)

শিল্প স্থানীয়করণের কতকগুলি অসুবিধাও আছে। প্রথমত, স্থানীয়কৃত শিল্প বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিকের কাজ যোগায়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল রকম শ্রমিকের জন্য কর্ম সংস্থান করিতে পারে না। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিলে উহা কেবলমাত্র পুরুষ-শ্রমিকের কর্মসংস্থান করে, স্ত্রী-শ্রমিকের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার আর একটি অসুবিধা এই যে, স্থানীয়কৃত শিল্পে যদি মন্দা দেখা দেয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের শ্রমিকগণের কর্মচ্যুতি ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কর্মচ্যুত শ্রমিকগণকে অন্য শিল্পে সহজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। স্থানীয়করণের এই দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় হইল, ঐ অঞ্চলে রকমারি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা।

তৃতীয়ত, শিল্প স্থানীয়করণের ফলে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পকেন্দ্র

ঘনবসতিপূর্ণ হয়; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, উপযুক্ত বাসস্থানের অনটন প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, স্থানীয়কৃত শিল্পকেন্দ্রের আর্থিক অবস্থা কোনক্রমেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ঐ অঞ্চলকে বহু দ্রব্য বাহির হইতে আমদানি করিতে হয়। কোন রকমে যদি বাহিরের যোগসূত্র ছিন্ন হয়, এবং নিয়মিত সরবারাহ বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে শিল্পকেন্দ্রের দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে।

স্থানীয়করণের অসুবিধা দূরীকরণ

শিল্প স্থানীয়করণের এই সকল অসুবিধা ও বিপদ দূরীকরণের উপায় হইল শিল্পগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকরণ (decentralisation) করা। দেশের শিল্প যদি কোন বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত না করিয়া দেশময় ছড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে স্থানীয়করণের কিছু কিছু সুবিধা না পাওয়া গেলেও শ্রমিকের বেকারত্ব অনেকটা দূর করা সম্ভব হয় এবং শিল্পোন্নয়নের উপকারিতা সর্বত্র অনেকটা সমভাবে বণ্টন কবা যায়। সমগ্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প বিকেন্দ্রীকরণেব ফলে জনাধিক্য, অস্বাস্থ্যকর ঘনবসতি প্রভৃতি সমস্যার হাত হইতেও বক্ষা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত

1. What are the advantages and disadvantages of localisation of industries?

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা-অসুবিধা কি কি? [পৃঃ ২৩৬-২৩৯]

2. What do you mean, by Division of Labour? Discuss the advantages and disadvantages of division of labour.

শ্রম-বিভাগ বলিতে কি বুঝায়? শ্রম বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। [পৃঃ ২২৯-২৩২]

১৪ ফার্ম ও উৎপাদনের মাত্রা
(Firm and Scale of Production)

ভোগ যেমন অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের একটি প্রধান অঙ্গ, তেমনি উৎপাদনও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আর একটি প্রধান অঙ্গ। ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিবার, সেইরূপ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। উৎপাদনকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে পরিবারের ভোগতৃপ্তির জন্য। এই দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজেরই বিভিন্ন উপকরণ থাকিতে পারে। যেমন, কারখানা গৃহের জমি, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। আবার, অনেক সময় প্রতিষ্ঠানকে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনের জন্য অনেক উপকরণ অন্যান্য ব্যবসায়ী বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বা পরিবারের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয়। যেমন, কাপড় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তুলা, যন্ত্রপাতি, সুতা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কিনিতে হইতে পারে। প্রত্যেক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানই একাধারে ক্রেতা ও বিক্রেতা (buyer-seller)। উৎপাদনের অনেক উপকরণ প্রতিষ্ঠানকে কিনিতে হয়। আবার ঐ উপকরণগুলির ব্যবহার দ্বারা যে জিনিস উৎপন্ন হয় তাহা উহাকে বিক্রয় করিতে হয়।

ফার্ম সম্পর্কে ধারণা
(Concept of the Firm)

কোন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করিতে হইলে জমি, শ্রম ও মূলধন এই তিনটি উপাদান বা উপকরণকে (input) একসঙ্গে সংযুক্ত করিতে হয়। উৎপন্ন সামগ্রী (output) তৈয়ারীর জন্যই উপাদানগুলির ব্যবহার প্রয়োজন। উপাদানগুলিকে কোন-না-কোনরূপে সংযুক্ত করিয়া যিনি বা যে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কার্যের পরিচালনা করেন তাহাকে অর্থবিদ্যায় উদ্যোক্তা বা ফার্ম বলা হয়। ফার্মই উৎপাদন সংগঠন করিয়া থাকে। ফার্মই উৎপাদনের একক (production unit)। একজন সামান্য চাষী

তাহার পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সহায়তায় যখন চাষ-আবাদ করে তাহাকেও ফার্ম বলা যায়। আবার, কোন শিল্প ব্যবসায় বা আর্থিক সংস্থাকেও—সে সংস্থা এক-মালিক প্রতিষ্ঠান হউক, কিংবা অংশীদার প্রথায় পরিচালিত হউক কিংবা যৌথ মূলধন কারবার হউক কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় চলুক—তাহাকেও ফার্ম বলা হয়।[১] সহজ কথায়, যে প্রতিষ্ঠানে দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন হয় উহাকেই ফার্ম বলা চলে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ফার্ম যখন দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করে তখন ঐ দ্রব্য বা সেবা বাজারে বিক্রয় করাই উহার লক্ষ্য থাকে। সুতবাং, ফার্মের কাজ শুধু দ্রব্য বা সেবা উৎপাদন করা নহে, উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাও ফার্মের কর্তব্য।[২] ভোগকারীর আচরণ যেমন যুক্তিবাদ (rationality) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, ফার্মের আচবণও যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়। ভোগীর উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক পরিতৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করা। ইহাই তাহার আচরণের যৌক্তিকতা। ফার্মের আচরণের যৌক্তিকতা হইল উৎপাদন ও বিক্রয় নীতি এমনভাবে গ্রহণ করা যাহাতে ব্যয় সর্বনিম্ন হয় এবং মুনাফা লাভ হয় সর্বাধিক।

ফার্ম কাহাকে বলে ?

এইখানে মনে রাখা ভাল যে, সাধারণ লোক ফার্ম (firm) ও শিল্প (industry) এই দুইটি কথা একই অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু অর্থবিদ্যায় এই দুইটি কথার অর্থ এক নহে। একই মালিকানাযুক্ত সমজাতীয় উৎপাদন এককের (units of production in plants) সমষ্টিকে ফার্ম বলে। বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে কোন একটি ফার্ম কম-বেশি জিনিস বিক্রয় করিয়া বাজার-দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। কিন্তু একটি শিল্প যদি বাজারে বেশি জিনিস বিক্রয় করে, তাহা হইলে বাজার-দাম হ্রাস পাইবে। কতকগুলি ফার্ম যদি একই ধরনের জিনিস উৎপাদন করে তাহা হইলে উহাদের একযোগে শিল্প বলা হয়। যেমন, কতিকাতায় বহু প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা সাবান তৈয়ারি করে।

ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য

১. Henderson & Quandt—Micro-economic Theory: "A firm is a technical unit in which commodities are produced."

২. Ryan—Price Theory: "The economic unit for the sale of goods and services is the firm."

কলিকাতার সাবান শিল্প বলিতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিকে বুঝাইবে। একটি শিল্পের অধীনে সকল ফার্ম একই জাতীয় পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে, একটি শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম দ্রব্যের পৃথকীকরণ দ্বারা পণ্য (product differentiation) উৎপাদন করিতে পারে। ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে এইভাবে যে পার্থক্য করা হয় উহা কেবল পণ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না।

ভোগী ও ফার্মের আচরণে মিল দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে এক নহে

ফার্মের আচরণ ও ভোগীর আচরণের মধ্যে দুই একটি বিষয়ে মিল দেখা যায়। ভোগী দ্রব্য ক্রয় দ্বারা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করিতে চায়। ফার্মেরও লক্ষ্য দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের দ্বারা সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। ক্রেতা যখন দ্রব্য ক্রয় করে তখন উহার সহিত তাহার আয়ের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সেইরূপ ফার্ম যখন বিভিন্ন উপাদান ক্রয় করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে তখন উহার সহিত উৎপাদন ব্যয়ের সম্পর্ক আছে বুঝিতে পারা যায়। তবে ভোগী যে দ্রব্য ক্রয় করে উহার উপযোগ অর্থের মাপদণ্ডে সঠিক পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে উহা সহজেই পরিমাপ করা চলে। ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। ঐ সীমাবদ্ধ আয় বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়া সে সর্বাধিক তৃপ্তিলাভের লক্ষ্য গ্রহণ করে। কিন্তু ফার্মের ব্যয় সাধারণত পরিবর্তনীয়, ঐ ব্যয়কে ন্যূনতম রাখিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের উৎপাদন স্তরে পৌঁছাইবার লক্ষ্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

সর্বোচ্চ মুনাফালাভের অনুমান
(Profit maximisation hypothesis)

ফার্মের আচরণ বা ফার্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে গেলে অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, উহা সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া উৎপাদন সংগঠন করে। মুনাফার পরিমাণ সর্বাধিক করাই ফার্মের যুক্তিসঙ্গত আচরণ (rational behaviour)।

কিন্তু অধুনা ফার্মের এই আচরণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অর্থবিদ্যায় নূতন আলোক-সম্পাত করা হইয়াছে। উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ইচ্ছা নাও থাকিতে পারে। অধ্যাপক সিটোভ্স্কির (Skitovski) অভিমত এই যে, ফার্ম যখন উৎপাদন করে তখন মুনাফা সর্বাধিক করার চাইতে পরিতৃপ্তি সর্বাধিক করার দিকেই অধিকতর লক্ষ্য থাকে। অধ্যাপক বাউমল (Boumal) তাঁহার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে দেখাইয়াছেন যে, ফার্ম কতটা পরিমাণ মুনাফা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহা আগে হইতেই ধার্য করা হয়। মুনাফার পরিমাণ একবার এইভাবে নির্ধারিত হইলে, বিক্রয়ের পরিমাণ সর্বাধিক করিবার দিকে ফার্মের প্রধান লক্ষ্য থাকে। অবশ্য নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে হইলে ফার্মকে বাধ্য হইয়াই সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরেই দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন রকম অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে দ্রব্য উৎপাদন নাও করিতে পারে। এইরূপ বাজারে ফার্মের দ্রব্য উৎপাদনের পিছনে অন্যান্য প্রেরণা বা লক্ষ্য থাকিতে পারে। কোন ফার্ম হয়তো দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দিতে পারে, কোন ফার্ম ক্ষমতা অর্জনের দিকে বেশি নজর দিতে পারে, কোন ফার্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারে, কোন ফার্ম আবার শান্তি ও আরামে থাকিয়া গতানুগতিক ভাবে উৎপাদন চালাইয়া যাইতে চায়।

ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের পথে বাধা-নিষেধ

বহু ক্ষেত্রে ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ক্ষমতা নানারকম বাধা-নিষেধের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর হইতে পারে না। দেশের আইন-কানুন এবং সামাজিক রীতি-নীতি ফার্মকে সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে বাধাপ্রদান করিয়া থাকে। যেমন, শ্রমিক-সঙ্ঘের চাপ কিংবা রাষ্ট্র

কর্তৃক প্রবর্তিত আইন যদি ফার্মকে উচ্চ হারে মজুরি প্রদান করিতে বাধ্য করে এবং সর্বোচ্চ মুনাফা সকল স্তরেই যথারীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ফার্মের পক্ষে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ সম্ভব নাও হইতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে চাহিদা বাজারের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার জন্য ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। ভবিষ্যতে দ্রব্যের চাহিদা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা হইবে সে সম্পর্কে ফার্ম নিছক পকিল্পনাদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে।

অনেক সময় আবার উপযুক্ত আয়তন ও শক্তিসম্পন্ন যন্ত্রপাতির অভাবে ফার্ম কাম্য পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে পারে না। মনে কর, কোন একটি ফার্ম যদি আরও ৫০০০ মিটার বস্ত্র উৎপাদন করে, তাহা হইলে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে পারে। কিন্তু বাজারে যে যন্ত্র পাওয়া যায় তাহা ৭০০০ মিটার বস্ত্র উৎপাদন করিতে সক্ষম। এই রকম একটি যন্ত্র ব্যবহার করিলে ফার্মের পক্ষে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে না; কেন না, যন্ত্রটি কাজে লাগাইলে উহার কিছুটা উৎপাদন শক্তি অলস ও অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে।

পরিশেষে, অনেক ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বার্থের বিরোধিতা ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা লাভের লক্ষ্যকে সীমিত করিয়া রাখে। এমনও হইতে পারে যে, ফার্ম যদি স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে তাহা হইলে বাজারে উহার সুনাম নষ্ট হইয়া যাইবে। সেক্ষেত্রে ফার্মের পক্ষে ভবিষ্যৎ বাজারে টিকিয়া থাকাই কঠিন। সেইজন্য অনেক ফার্মই দীর্ঘকালীন বাজার যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার জন্য স্বল্পকালীন বাজারে সর্বাধিক মুনাফা লাভের চেষ্টা করে না।

ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায়

(Causes and Motives of the growth of a Firm)

অধুনা ফার্মের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধির দিকেই সাধারণত ইচ্ছা থাকে। যদিও ক্ষুদ্র আয়তনের ফার্ম যে টিকিয়া নাই তাহা নহে, তথাপি ফার্মের সাধারণ লক্ষ্যই হইল, কি ভাবে বিভিন্ন উপকরণ বাড়াইয়া উৎপাদনের প্রসার লাভ করা যায়।

ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি দুইভাবে সম্ভব হইয়া থাকে। এক, ফার্ম মূলধন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উপকরণ বা উপাদানগুলি বাড়াইয়া নিজস্ব আয়তন বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, একটি ফার্ম অন্যান্য ফার্মের সহিত মিলিত হইয়া একটি সংযুক্ত নূতন ফার্ম (combined firm) গঠন করিয়াও নিজের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। একটি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির পিছনে নিম্নলিখিত কারণ বা অভিপ্রায় থাকিতে পারে :

(১) **ব্যয়-সঙ্কোচের অভিপ্রায় :** একটি ফার্ম আয়তন বৃদ্ধিদ্বারা উহার উৎপাদন মাত্রা বাড়াইতে পারিলে নানারকমে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিতে পারে। এই ব্যয়-সঙ্কোচের লোভে অনেক সময়ই ফার্মের সম্প্রসারণের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। ফার্ম যদি উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে শ্রম-বিভাগজনিত সুবিধা, যন্ত্রগত সুবিধা, মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে সুবিধা, বাজার ঘটিত সুবিধা, ঝুঁকি বণ্টনজনিত সুবিধা প্রভৃতি লাভ করিয়া ইউনিট প্রতি ব্যয় হ্রাস করিতে পারে। কিন্তু এইভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ লাভের অভিপ্রায়ে যদিও ফার্মের সম্প্রসারণের দিকে সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়, তথাপি অনেক সময়ে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধির এই গতি নানা কারণে ব্যাহতও হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাজার-জনিত বাধা, মূলধন সম্পর্কীয় অসুবিধা, পরিচালনা জনিত অসুবিধা ফার্মের সম্প্রসারণের পথ এমনভাবে রোধ করে যে উহার আয়তন বৃদ্ধি সর্বোন্নত স্তরে পৌঁছাইতে পারে না।

(২) **একচেটিয়া অধিকার লাভের অভিপ্রায় :** ফার্ম অনেক সময় একচেটিয়া অধিকার লাভ ও স্থাপনের উদ্দেশ্যেও উৎপাদন মাত্রা বাড়াইতে পারে। উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা ফার্ম যদি বাজারে পণ্য যোগানের এক মোটা অংশ সরবরাহ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগী বিক্রেতা স্বভাবতই সরিয়া পড়িবে। তখন ফার্মের পক্ষে চাপ

দিয়া অধিক দাম আদায় ও মুনাফা লাভ করা সহজ হইয়া পড়িবে। আবার, ফার্ম যদি একবার সম্প্রসারণ দ্বারা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে উহার পক্ষে অন্য বহু রকমের ব্যয়-সঙ্কোচনের সুবিধা গ্রহণ করাও সহজ হইবে।

(৩) **ক্ষমতালাভের অভিপ্রায় :** বহুক্ষেত্রে ফার্ম ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় উৎপাদন মাত্রার প্রসার করিয়া থাকে। বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক হইতে পারিলে আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রভাব লাভের সুযোগ হয়। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলে ফার্মের উদ্যোক্তার পক্ষে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা ও উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন করাও সুবিধা হয়।

(৪) **অর্থসংগ্রহের অভিপ্রায় :** ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি পাইলে উহার পক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা সুবিধা হয়। প্রতিষ্ঠান বৃহৎ হইলে উহার সুনাম বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। জনসাধারণ তখন ঐ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে খুবই উৎসাহ প্রকাশ করে। ফলে ঐ ফার্মের পক্ষে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়।

উপরি-উক্ত কারণ ছাড়া, আরও অন্যান্য অভিপ্রায়ে ফার্মের উৎপাদন-মাত্রার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যেমন, দেশে নূতন কোন আইন প্রচলিত হইলে ফার্মের আয়তন প্রসার লাভ করিতে পারে। মনে কর, সরকার এইরূপ একটি আইন প্রণয়ন করিল যাহার ফলে যৌথ কোম্পানিগুলিকে উহাদের অবণ্টিত মুনাফার উপর আয়কর প্রদান করিতে হইবে না। ইহার ফলে ফার্মগুলি অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ কম বণ্টন করিবে এবং বেশির ভাগ লাভের টাকা ফার্মের সম্প্রসারণের জন্য নিয়োগ করিবে। এইভাবে মুনাফা পুনর্নিয়োগের সুযোগ পাইলে ফার্মের উৎপাদনমাত্রা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ব্যয়-সঙ্কোচ

(Internal and External Economies)

ফার্ম ও শিল্পের উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কতকগুলি ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। ইহাদিগকে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বা ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Scale) বলা হয়। অধ্যাপক মার্শাল বৃহদায়তন উৎপাদনের এই ব্যয়-সঙ্কোচগুলিকে (১) আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ এবং (২) বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ
(Internal Economies)

কোন ফার্ম যদি উহার আয়তন বা উৎপাদনমাত্রা বৃদ্ধি করে তাহা হইলে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করিতে পারে। যেমন, বড় ফার্ম ব্যাপক শ্রম-বিভাগ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, সস্তা কাঁচামাল প্রভৃতির সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পাবে। এই সুযোগ-সুবিধার ফলে ফার্মের ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। এই ভাবে যখন কোন ফার্ম নিজের চেষ্টায় উৎপাদন বৃহদায়তন করিয়া সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তখন উহাকে আভ্যন্তরীণ ব্যয-সঙ্কোচ বলা হয়। ফার্মের আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ বাহিরের কোন কার্যকলাপ, কোন আবিষ্কার বা শিল্পের সাধারণ উন্নতি দ্বারা একেবারেই প্রভাবিত হয না। আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ নিম্নলিখিত বহু রকমে সম্ভব হইতে পারে :

(ক) যন্ত্রগত ব্যয়-সঙ্কোচ (Technical Economies)—আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ প্রধানত হয় যন্ত্রগত বা 'কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচের মাধ্যমে। এই কারিগরি ব্যয-সঙ্কোচ আবার ঘটে বহু রকমে। প্রথমত, বড ফার্ম বিশিষ্ট ধরনের অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ন্যূনতম গডপড়তা ব্যয়ে অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল ও উপজাত দ্রব্য (bye product) ব্যবহার ব্যাপাবেও বায়-সঙ্কোচ করিতে পারে। তৃতীয়ত, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শ্রম-বিভাগ নীতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা চলে। উৎপাদনেব প্রত্যেকটি স্তরে বিশিষ্ট নিপুণতাসম্পন্ন মজুর নিয়োগের ফলে ব্যয়-সঙ্কোচ সুগম হয়। চতুর্থত, বৃহদাযতন ফার্ম হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাদি দ্বারা অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার ও উহার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে।

(খ) পরিচালিত ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Management)—উৎপাদনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দিক হইতেও বৃহৎ ফার্ম ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে। বৃহদায়তন ফার্মের উদ্যোক্তার একার পক্ষে সমস্ত খুঁটিনাটি সুষ্ঠুভাবে তদারক করা সম্ভব নহে। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কাজ বহু বিভাগে বিভাগীকরণ এবং বিশিষ্ট নিপুণতাসম্পন্ন বিভাগীয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ইহাতে কেবল যে ব্যবস্থাপনার নৈপুণ্যই বাড়ে তাহা নহে, ব্যয়-সঙ্কোচও যথেষ্ট হয়।

(গ) বাণিজ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ (Commercial Economies)—বৃহৎ ফার্মকে অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয় এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে পাঠাইতে হয়। ইহা এক সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় করে বলিয়া অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে খরিদ করিতে পারে। আবার সুদক্ষ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া উৎপন্ন পণ্যের প্রচার ও বিক্রয় ব্যয় কমাইতেও পারে।

(ঘ) আর্থিক ব্যয়-সঙ্কোচ (Financial Economies)—বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূলধন ও পুঁজি সংগ্রহ করাও সুবিধাজনক। ইহা বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্র সহজেই বিক্রয় করিয়া অধিক পরিমাণে মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বৃহৎ ফার্ম অপেক্ষাকৃত কম সুদে ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নিকট হইতে মূলধন ধার করিতে পারে।

(ঙ) ঝুঁকি বণ্টনগত ব্যয়-সঙ্কোচ (Risk-bearing Economies)—বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঝুঁকি বহনের সুবিধাও বেশি। বৃহৎ ফার্ম রকমারি দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা ঝুঁকি বণ্টন করিয়া থাকে। মন্দা বাজারে ফার্মেব বক্রয় ঘাটতি হইলে তেজী বাজারে বাড়তি বিক্রয় দ্বারা তাহা পোষাইয়া লয়। তাহা ছাড়া, বৃহৎ ফার্ম এক বাজারে সমস্ত পণ্য বিক্রয় করে না। বিভিন্ন বাজারে মাল বিক্রয় করিয়াও ইহা ঝুঁকি বহনের ভার হ্রাস করে।

বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ
(External Economies)

কোন শিল্পের আয়তন বা উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধির ফলে কতকগুলি ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে। ইহাদের বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ বলা হইয়া থাকে। শিল্পের বৃদ্ধির ফলে যখন এইভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে, তখন ঐ শিল্পের অন্তর্গত সকল উৎপাদনকারী ফার্মই উহার সুযোগ-সুবিধা কম-বেশি লাভ করিয়া থাকে। ধর, কোন একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে। উহার ফলে ঐ স্থানে পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উন্নতি ঘটিবে। তখন ঐ স্থানের ছোট-বড সকল ফার্মই কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ সাধারণত তিন রকমে ঘটিতে পারে :

(ক) স্থানিকতাজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Concentration)—কোন শিল্পের যদি স্থানিকতা ঘটে এবং তাহার ফলে যোগাযোগ বা পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়, তাহা হইলে ঐ শিল্পের

অন্তর্গত ফার্মগুলি সস্তায় কাঁচা মাল ক্রয়, সুদক্ষ শ্রমিক যোগান ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে পারে। এইরূপ স্থানিকতাজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ ফার্মগুলির বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ।

(খ) সংবাদ সম্পর্কীয় ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Infoımation)—বৃহৎ শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি সকলে মিলিয়া গবেষণার কাজ এবং বাণিজ্যিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার ফলে ফার্মগুলি যন্ত্রপাতি ও বাজার সম্পর্কে বহু তথ্য ও খববাখবর পাইয়া থাকে। তাহাতে প্রত্যেকেবই সুবিধা হয়।

(গ) বিশেষায়ণজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (Economies of Disintegration)—শিল্পের উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে বিশেষায়ণজনিত ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে। শিল্প খুব বৃহৎ হইয়া গডিয়া উঠিলে উহার অন্তর্গত এক একটি ফার্ম এক একটি বিশেষ দ্রব্যে উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে। যেমন, বস্ত্র-শিল্প বৃহদায়তন ধারণ করিলে উহার অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠান ধুতি তৈয়ারি, আর একটি শাডী তৈয়ারি, তৃতীয়টি হয়ত সার্টেব কাপড তৈয়ারি করিতে বিশিষ্টতা অর্জন করে। ইহার ফলে, একদিকে যেমন গোটা শিল্পেব উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে, অপর দিকে আবার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া থাকে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, আভ্যন্তবীণ ব্যয়-সঙ্কোচ ও বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নাই। যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা কেবল মাত্রার পার্থক্য। [The difference is not a qualitative difference or difference in kind, but difference in degree only.] একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পবিষ্কাব হইবে। মনে কর, কোন একটি স্থানে একটি শিল্পের স্থানীয়করণ ঘটিয়াছে; উহার ফলে আশপাশে অনেক সহায়ক শিল্প (subsidiary industries) গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানীয়কৃত শিল্পটি এই সকল সহায়ক শিল্পের নিকট হইতে অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা লাভ কবিতে পারে। যাহার ফলে উহার বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিবে। কিন্তু স্থানীয়কৃত শিল্পটি যদি সহায়ক শিল্পগুলিকে সংযুক্তি দ্বারা একটি মাত্র ফার্মের গঠন করে, তাহা হইলে আগে যে ব্যয়-সঙ্কোচগুলি বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচ বলিয়া গণ্য হইত তাহা এখন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটির আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচে পরিণত হইবে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের সীমা
(Limits to Large-scale Production)

কোন ফার্ম উৎপাদন মাত্রা অথবা আয়তন বৃদ্ধি করিলে বহুরকমে সুযোগ-সুবিধা লাভ ও ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে। কিন্তু ফার্মের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম অসুবিধা ও ব্যয়-বাহুল্যও দেখা দেয়, যাহার জন্য প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামত আয়তন বিস্তৃত করিতে পারে না। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা আসে বলিয়াই একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত উহার উৎপাদন মাত্রা বাড়ানো চলে।

প্রথমত, কর্ম-বিভাগ ও বৃহদাকার যন্ত্র ব্যবহারের সুফল সুনিশ্চিত, কিন্তু সীমাহীন নহে। উৎপাদনের বিশেষ একটি মাত্রা পর্যন্ত কর্ম-বিভাগের সুবিধা ও কারিগরি ব্যয়-সঙ্কোচ লাভ করা যায়। সেই বিশেষ মাত্রা অতিক্রম করিলে ফার্মের ব্যয়-বাহুল্য ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়ত, ফার্মের আয়তন সুবিস্তৃত হইলে উদ্যোক্তার পক্ষে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্দেশ করা অসম্ভব ও কঠিন হইয়া পড়ে। উৎপাদনের মাত্রা বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়া সুবিস্তৃত কার্যপরিধি পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

তৃতীয়ত, উপযুক্ত পরিমাণ পুঁজির অভাব ও আর্থিক অসচ্ছলতাও ফার্মের আয়তন সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে। অধুনা যৌথ মূলধনী কারবারের মাধ্যমে যথেষ্ট পুঁজি ও মূলধন সংগ্রহ করিবার সুযোগ আছে বটে। কিন্তু অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা নিজেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া যৌথ মূলধনী কারবার গঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে মোটেই আগ্রহশীল নহে। প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে ফার্মকে উপযুক্ত জামিন ও সুদ দিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়, যাহা অনেকেই সক্ষম নহে।

চতুর্থত, বিস্তৃত বাজার ও স্থির চাহিদার অভাবে কোন ফার্মের পক্ষেই অনির্দিষ্টভাবে সম্প্রসারণ করা লাভজনক নহে। উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা যদি ব্যাপক না হয়, কিংবা পণ্যের চাহিদা যদি সকল সময়ই উঠা-নামা করে, তাহা হইলে উৎপাদন বৃহদায়তন করিলে অসুবিধায় পড়িতে হয়। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি করিলে কার্যপরিধি সাধারণত সুবিস্তৃত ও সংগঠন ব্যবস্থাও বিশিষ্টতাসম্পন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থাতে ফার্ম বাজার চাহিদা

পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া উৎপাদন ব্যবস্থা সহজে অদল-বদল করিতে পারে না।

সাধারণত কোন ফার্ম উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করিলে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইয়া প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে প্রান্তিক আয় বেশি লাভ করা সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আয়তন সম্প্রসারণ করা লাভজনক। সম্প্রসারণের কাম্য সীমা নির্ধারিত হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে যে স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান।

ফার্মের আয়তন কি কি বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়
(Factors which determine the size of a Firm)

প্রত্যেক ফার্মের লক্ষ্য সেই স্তরে উৎপাদন করা যে স্তরে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ হয়। সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে পৌঁছাইতে হইলে ফার্মকে উৎপাদন মাত্রা বাড়াইয়া সকল রকম ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হয়। আবার উৎপাদন মাত্রা বাড়াইতে হইলেই ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি আবার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) উৎপাদনের অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে বৃহৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নহে। এই সকল ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি অবশ্যই লাভজনক। আবার, অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ছোট ছোট যন্ত্র ব্যবহার ব্যয়-সঙ্কোচ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন ছোট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(২) ফার্মের আর্থিক সংগতির উপর আয়তন বিশেষভাবে নির্ভর করে। যে প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই বাজারে শেয়ার বিক্রয় দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে আর্থিক মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে উহার পক্ষে আয়তন বৃদ্ধি করার সুযোগ অনেক বেশি। অপরপক্ষে, যে ফার্মের আর্থিক সঙ্গতি নাই উহার আয়তন স্বভাবতই ছোট হইতে বাধ্য।

(৩) যেখানে পরিচালনার কাজ ব্যাপক ও জটিল আকার ধারণ করে, সেখানে অধিক সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে হয়। ফার্মের আয়তন বড় না করিলে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নহে। আবার,

যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ সহজ ও ব্যয়বহুল নহে, সেখানে প্রতিষ্ঠানের আয়তন ছোট কবিয়া পরিচালনার ব্যয়াধিক্য যাহাতে না ঘটে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিলেই চলে।

(৪) ফার্মের আয়তন উৎপন্ন পণ্যের বাজারের অবস্থার উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। পণ্যের বাজার যদি বিস্তৃত ও ব্যাপক হয় এবং বাজার দাম যদি উঠা-নামা না করে, তাহা হইলে উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করা লাভজনক। অপর পক্ষে, পণ্যের বাজার যদি সীমাবদ্ধ হয় এবং উহার বাজার দাম খুব বেশি উঠা-নামা করে, তাহা হইলে বৃহৎ মাত্রায উৎপাদন অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল হইয়া পড়িবে। সে ক্ষেত্রে ফার্মের আয়তন ক্ষুদ্র রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

(৫) ফার্মের আয়তন ক্ষুদ্র থাকিলে উহার নমনীয়তা বেশি থাকে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান নূতন অবস্থার সহিত সহজেই খাপ খাওয়াইতে পারে। ক্ষুদ্র আয়তনের ফার্মের পক্ষে কাঠামোগত পরিবর্তন আনা যত সহজ বৃহদায়তন ফার্মের পক্ষে ততটা সম্ভব নহে। সেইজন্য বাণিজ্য মন্দার সময় বৃহদায়তন ফার্মের পক্ষে টিকিয়া থাকাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

উপরি-উক্ত বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি নির্ধারণ করিতে সহায়তা করে বটে। কিন্তু সব চাইতে প্রধান বিষয়, যাহার উপর নির্ভর করিয়া ফার্ম আযতন স্থির করে তাহা হইল সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির লক্ষ্যই হইল, সর্বোন্নত মুনাফাস্তরে পৌঁছানো।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের সুবিধা
(Advantages of Small-scale Production)

বৃহদায়তন উৎপাদানে বহু সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, কোন ফার্মই উহার উৎপাদন মাত্রা ইচ্ছামত বাড়াইয়া যাইতে পারে না। প্রত্যেক ফার্মেরই একটি করিয়া সর্বোচ্চ উৎপাদনের মাত্রা আছে। ঐ মাত্রা অতিক্রম করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে,ফার্মকে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ফার্মের গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয়ও বাড়িতে থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের বহু প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা আছে বলিয়াই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা কোনো দেশেই একেবারে উঠিয়া যায় নাই—বৃহদায়তন উৎপাদনের পাশাপাশি টিকিয়া আছে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের নিজস্ব কতকগুলি সুবিধা আছে, যাহার জন্য অধুনা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও উহা টিকিয়া আছে। প্রথমত, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে উদ্যোক্তা নিজে কাজের খুঁটিনাটি তদারক, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন করিতে পারে। (The master's eye is everywhere.) উৎপাদক স্বাধীনভাবে কাজের নীতি নির্ধারণ করিতে পারে বলিয়া সে উদ্যম, দায়িত্ববোধ ও তৎপরতার সহিত পণ্য উৎপাদন করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিবার সুযোগ থাকায় শ্রমিক-মালিক বিরোধ বা পরস্পর ভুল বোঝাবুঝি ঘটিবার সম্ভাবনা কম থাকে। ইহাতে উৎপাদনে অপচয় কম হয় এবং উৎপাদনের ধারাও অব্যাহত থাকে।

তৃতীয়ত, যে সকল দ্রব্যেব চাহিদা-বাজার স্থানিক (local) ও সীমাবদ্ধ কিংবা যখন-তখন উঠা-নামা করে, উহাদের উৎপাদন ক্ষুদ্র মাত্রায় হওয়াই সুবিধাজনক। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনযোগ্যতা বেশি। পণ্যের বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

চতুর্থত, ক্ষুদ্রায়তন ফার্মের পক্ষে সূক্ষ্ম ও চারু দ্রব্য উৎপাদনেব সুবিধা অধিক। যে সকল দ্রব্য ফ্যাসনদুরস্ত উহারা প্রমিত (standardised) হইতে পারে না এবং সেইজন্য উহারা বৃহদায়তন কারখানায় তৈয়ারি হইবার অযোগ্য। ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রতিটি কাজে ভিন্নভাবে তাহার নিপুণতা প্রয়োগ করিয়া সূক্ষ্ম, রুচিসম্মত ও ফ্যাসনদুরস্ত দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। যে শিল্পে উৎপাদন ধরাবাঁধা বা গতানুগতিক নয়, সেখানেই ক্ষুদ্র ফার্মের বিশেষ সুবিধা।

পঞ্চমত, বৃহদায়তন উৎপাদনের তুলনায় ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থির-ব্যয় কম হয়। ক্ষুদ্রায়তন ফার্মকে কারখানা, যন্ত্রপাতি, স্থায়ী কর্মচারী প্রভৃতি বাবদ অত্যাধিক ব্যয় করিতে হয় না। শ্রমিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যও ছোট প্রতিষ্ঠানের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে।

পরিশেষে, অধুনা উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু সুফল ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনেও সহায়তা করিয়া থাকে। যেমন, ক্ষুদ্রায়তন ফার্ম উৎপাদন কার্যে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগ দ্বারা বিশেষভাবে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে।

কাম্য-আয়তনের ফার্ম

(Optimum Firm)

প্রায় সকল অবস্থাতে প্রত্যেক উৎপাদক ফার্মেরই উদ্দেশ্য সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা অর্জন করা। ইহা লাভ করিতে হইলে ফার্মকে উৎপাদন মাত্রা বা আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়। ফার্মের মুনাফা নির্ভর করে একদিকে চাহিদার বিস্তৃতির উপর আর একদিকে উৎপাদন ব্যয়ের উপর। ফার্ম মুনাফা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত চেষ্টা করে উৎপাদন ব্যয় সঙ্কোচ করিতে। উৎপাদন ব্যয় আবার নির্ভর করে ফার্ম উহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া কতটা পরিমাণ ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে তাহার উপর। কিন্তু ফার্ম উহার উৎপাদন মাত্রা বাড়াইলেই যে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, ফার্ম উৎপাদন মাত্রা বাড়ানোর ফলে যন্ত্রগত ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হয়তো সক্ষম হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনাগত ব্যয়-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ফার্মের নীট ব্যয়-সঙ্কোচ সর্বাধিক হইয়াছে, একথা মোটেই বলা চলে না। সুতরাং, ফার্ম যখন উহার আয়তন বাড়াইবে তখন উহাকে একই সঙ্গে ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধি— উহাদের নীট ফলাফল হিসাব করিয়া তবে উৎপাদন মাত্রা নির্ধারণ করিতে হইবে। ফার্ম ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধির নীট ফলাফল হিসাব করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত দেখিবে যে ইউনিট প্রতি ব্যয় বা গড়পড়তা ব্যয় হ্রাস পাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্তই উৎপাদনের আয়তন বাড়াইয়া যাইবে। এই অবস্থাতে ফার্ম যতক্ষণ উৎপাদন করিতে থাকিবে ততক্ষণ ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইবে। উৎপাদনের যে মাত্রায় পৌঁছাইলে ফার্মের গড়পড়তা ব্যয় সর্বনিম্ন হইবে সেই মাত্রাকে ফার্মের কাম্য-আয়তন বা কাম্য উৎপাদন মাত্রা বলা যায়। ফার্ম যখন কাম্য উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন করে তখন তাহাকে কাম্য-আয়তনের ফার্ম বলা হয়। কাম্য মাত্রায় উৎপাদন করিলে ফার্মের নীট ব্যয়-সঙ্কোচ সর্বাধিক হয় এবং উহার ফলে ফার্মের গড়পড়তা ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। এই মাত্রায় উৎপাদন করিলে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে। ইহাই ফার্মের উৎপাদনের কাম্য-আয়তন বা মাত্রা। ফার্ম যদি এই মাত্রা ছাড়াইয়া আবার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে ব্যয়-সঙ্কোচের তুলনায়

ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধির নীট ফলাফল হিসাব করিয়া ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি করিতে হয়

ব্যয়-বৃদ্ধি অধিক ঘটিবে; ফলে, গড়পড়তা উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে থাকিবে এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইবে।

ইহা মনে রাখা দরকার যে, সর্বোন্নত ফার্ম সকল দেশে, সকল কালে এবং সকল শিল্পে এক আয়তনের হইতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠান আজ সর্বোন্নত বলিয়া স্বীকৃত, তাহা কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বা উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল পরে সর্বোন্নত নাও থাকিতে পারে। বিভিন্ন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মের কাম্য-আয়তনও একরূপ নহে। আবার, একই শিল্পের অধীন বিভিন্ন ফার্মের কাম্য-আয়তনও সকল অবস্থায় একরূপ থাকিতে পারে না।

কাম্য-আয়তনের ফার্মের ধারণাটি তত্ত্ব হিসাবে অনুমান করা যায় বটে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ফার্ম কাম্য-আয়তনে বা উৎপাদন মাত্রায় পৌঁছাইতে পারে না। কাম্য-আয়তনে উৎপাদন করিতে হইলে ফার্মকে সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হয়। কিন্তু সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিলেই যে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেন না, এমনও হইতে পারে যে, সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে হইলে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে হয়, বাজারে সেই পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা নাই। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে কাম্য-আয়তনে উৎপাদন করিয়া ফার্মের কোন লাভ নাই। বাস্তব-ক্ষেত্রে, ফার্ম সেই আয়তনে দ্রব্য উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে যে আয়তনে ফার্মের পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। নিখুঁত পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে তখনই সক্ষম হইবে যখন উহা এমন মাত্রায় উৎপাদন করে যেখানে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়, প্রান্তিক আয় ও বাজার-দাম পরস্পর সমান হয়। আবার একচেটিয়া এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় এবং প্রান্তিক আয় সমান হইলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়।

কাম্য উৎপাদনের মাত্রা এবং সর্বাধিক মুনাফার মাত্রা এক নহে

ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ

(Growth and Expansion of a Firm)

প্রত্যেক ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পিছনে দুইটি প্রধান

কারণ থাকে—একদিকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস আর একদিকে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি। অবশ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদিও প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

সাধারণত ফার্মের আয়তন সম্প্রসারণ দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘটিতে পারে। প্রথমত, ফার্ম কাঠামোগত পরিবর্তন (structural changes) দ্বারা নিজস্ব আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। ফার্ম যে পণ্য উৎপাদন করিবে উহার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, মূলধন, শ্রমিক প্রভৃতির পরিমাণ বাড়াইয়া আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের আর একটি পথ হইল সমজাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তিসাধন (Integration)। ইহাকে জোট কারবার (Business Combination) গঠন বলে। এই সংযুক্তি বা জোট-গঠন নিম্নলিখিত যে কোন প্রকারে হইতে পারে :

ফার্মের আযতন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের পদ্ধতি

(১) **পশ্চাৎমুখী সংযুক্তি** (Backward Integration) : যে কোন পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া একাধিক স্তর বা ধাপে বিভক্ত থাকে। যদি কোন ফার্ম পশ্চাৎবর্তী এক বা একাধিক স্তরে আপন কার্যক্ষেত্র বিস্তার দ্বারা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে উহাকে পশ্চাৎমুখী সংযুক্তি বলা হয়। যেমন, যদি একটি কাপড় তৈরির প্রতিষ্ঠান তুলা চাষের কাজও নিজেই গ্রহণ করে।

(২) **অগ্রমুখী সংযুক্তি** (Forward Integration) : যদি কোন ফার্ম নিজে যাহা উৎপাদন করে উহা ছাড়া মধ্যবর্তী স্তরের উৎপাদনের দায়িত্বও গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহাকে অগ্রমুখী সংযুক্তি বলা হয়। যেমন, কোন লোহার কারখানা যদি ইস্পাত উৎপাদন আরম্ভ করে।

(৩) **পার্শ্বীয় সংযুক্তি** (Lateral Integration) : যখন কোন ফার্ম বিভিন্ন রকম দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পণ্যের বৈচিত্র্যকরণের সহায়তা করে, তাহাকে পার্শ্বীয় সংযুক্তি বলা হয়। যেমন, রেল প্রতিষ্ঠান যদি বাস চালাইবার কাজ, খাদ্য ও পানীয় সরবরাহের কাজ প্রভৃতি নিজে শুরু করে।

(৪) **লম্বমুখী সংযুক্তি** (Vertical Integration) : প্রতিষ্ঠান

সম্প্রসারণের আর একটি উপায় হইল উহা যে স্তরে দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে ঐ স্তরের পশ্চাৎবর্তী ও অগ্রবর্তী এক বা একাধিক স্তরে উহার কার্যক্ষেত্র বিস্তার করিতে পারে। এইভাবে প্রতিষ্ঠানটি যখন নিজের উৎপাদন স্তরের পশ্চাৎবর্তী ও অগ্রবর্তী উভয় ধাপেব উৎপাদন ধারাকে সংযুক্ত করে, তখন উহাকে বলা হয় লম্বমুখী সংযুক্তি। যেমন, একটি জুতা তৈয়ারির কাবখানা যদি চামডা পাকা করা, জুতাব তলা তৈয়ারি কবা, জুতার ফিতা লাগানো, জুতা বিক্রয় প্রভৃতি উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরগুলি নিজ হাতে গ্রহণ করে।

(৫) **আঞ্চলিক সংযুক্তি** (Territorial Integration): যদি কোন ফার্ম দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন স্থানে শাখা খুলিয়া উৎপাদনের উপকরণ সংগ্রহ করে, কিংবা উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়েব সুবিধা ভোগ কবে, তাহা হইলে উহাকে আঞ্চলিক সংযুক্তি বলা হয়।

(৬) **সমান্তরাল সংযুক্তি** (Horizontal Integration): ফার্ম আব এক পথে ইহার আয়তন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারে। ইহা পশ্চাৎবর্তী উৎপাদন স্তর কিংবা মধ্যবর্তী উৎপাদন স্তবেব সহিত সংযুক্ত না হইয়া একই দ্রব্য উৎপাদনকাবী এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইতে পারে। এইরূপ গঠনকে সমান্তরাল সংযুক্তি বলা হয়।

একচেটিয়া জোট-কারবার
(Monopolistic Combination)

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানত আয়তনজনিত ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা লাভ করিবার জন্যই সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়। ঐ উদ্দেশ্যে হয় তাহারা উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি দ্বারা ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি কবিয়া থাকে, না হয় এক জাতীয় অপর একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত মিলিত হইয়া জোট গঠন করে। ফার্মের আয়তন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে কিংবা জোট গঠনের ফলে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র হইতে থাকে। উহার ফলে প্রত্যেক ফার্মের মুনাফা কমিতে থাকে এবং বাজাবে বিক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। তখন ফার্মগুলির পক্ষে মিলিত হওয়া ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই শক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং, বলা চলে

যে, ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা লাভ এবং কঠিন প্রতিযোগিতার বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যেই একচেটিয়া জোট-কারবারের উদ্ভব হইয়া থাকে।

একচেটিয়া জোট-কারবার উৎপত্তির কারণ

(Causes of Monopolistic Combination)

একচেটিয়া জোট-কারবার উৎপত্তির পশ্চাতে একাধিক কারণ ও উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এই কারণ ও উদ্দেশ্যগুলি আরও বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :

(১) **একচেটিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য** (Monopoly Motive) : বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়া জোট-কারবার গড়িয়া তুলিলে বাজারে প্রতিযোগিতার বিলোপ হয় এবং একচেটিয়া প্রভাবের মাত্রা বাড়িতে থাকে। ফলে, একচেটিয়া কারবারের পক্ষে বাজারে পণ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল্য বৃদ্ধি ও মুনাফা বৃদ্ধি করা খুবই সহজ হয়। একচেটিয়া জোটের পক্ষে অল্প মূল্যে উৎপাদনের উপাদান নিযুক্ত করিয়া উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া রাখাও সহজ। জোট-কারবার এই ভাবে উৎপাদন ব্যয় কমাইয়া রাখিয়া মুনাফা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। জোট-ব্যবস্থা যখন মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়, তখন উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলির কর্ম-নিয়োগ সঙ্কুচিত হইতে পারে এবং ভোগকারিগণ চড়াদামে দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিপর্যস্ত হইতে পারে।

(২) **ব্যয়-সঙ্কোচের উদ্দেশ্য** (Economic Motive) : ব্যয়-সঙ্কোচের উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক সময় জোট-কারবারের উৎপত্তি হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম মিলিত হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে। তাহার ফলে ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটে। জোট উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে লোকসানগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একেবারে গুটাইয়া ফেলা চলে। জোট গঠনের পর ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি হয় বলিয়া শ্রম-বিভাগের সুযোগ-সুবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা চলে ; পরিচালনা ও প্রচারকার্যের বাবদ গড়পড়তা ব্যয়ও সঙ্কুচিত করা সহজ হয়।

(৩) **আত্মরক্ষা ও ঝুঁকিহ্রাসের উদ্দেশ্য** (Self-defence and Risk Reduction Motive) জোট কারবার গঠনের আর একটি উদ্দেশ্য হইল, আত্মরক্ষার জন্য প্রতিযোগিতার ঝুঁকি হ্রাস করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফার্ম মিলিয়া যখন জোট সৃষ্টি করে তখন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কাঁচামাল ক্রয়

করিবার ঝুঁকি অথবা পণ্য-বাজারে দাম-দস্তুর সংক্রান্ত ঝুঁকির বোঝা অনেক কমিয়া যায়। জোট সৃষ্টি হইলে মন্দা বাজার সংক্রান্ত ঝুঁকি, চাহিদার পরিবর্তন হেতু ঝুঁকি প্রভৃতির পরিমাণও হ্রাস পায়। জোট-কারবার উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অতি-উৎপাদন বা অব-উৎপাদন দোষও অনেকটা দূর করিতে পারে।

(৪) **আর্থিক উদ্দেশ্য** (Financial Motive) : প্রচুর পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতেও একচেটিয়া জোট-কারবারের সৃষ্টি হইতে পারে। একচেটিয়া জোটের সৃষ্টি হইলে ব্যবসায়ের সুনাম ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; তাহার ফলে জোট অতি সহজেই ব্যাঙ্ক কিংবা বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে কিংবা বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া অথবা ঋণপত্র ইসু করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

(৫) **ক্ষমতা-লাভের উদ্দেশ্য** (Power Motive) : অনেকে মনে করেন, ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির পশ্চাতে মূল আকর্ষণ হইল ক্ষমতা-লাভ। জোট-কারবার গঠনের মাধ্যমে ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি শিল্পপতিগণের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কর্তৃত্ব লাভের অন্তর্নিহিত বাসনা বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

উপরি-উক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি বিষয় আছে যেগুলি জোট সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা করে। প্রথমত, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সংখ্যায় কম হয় এবং উহারা যদি একই আকারের হয়, তাহা হইলে উহাদের পক্ষে মিলিত হইয়া জোট-কারবার সৃষ্টি করিবার সুবিধা হইবে। বহু-সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও মিলন কদাচিৎ সম্ভব হয়। আবার প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট বড় বিভিন্ন আকারেব হইলেও উহাদের মিলনের সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, ফার্মগুলি যদি একধরনের ও সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলেও জোট উৎপত্তির পক্ষে অনুকূল। তৃতীয়ত, শিল্পের স্থানীয়করণও জোট উৎপত্তি উৎসাহিত করে। যদি শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ভৌগোলিক দূরত্ব উহাদের মধ্যে যোগাযোগের বাধা সৃষ্টি করিয়া জোট উৎপত্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়। পরিশেষে, সরকারের সংরক্ষণ নীতিও অনেক সময় জোট গঠনে উৎসাহ যোগাইতে পারে। তবে সংরক্ষণ নীতিদ্বারা দেশের

আমদানি বন্ধ করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেই কেবল ঐ নীতিই জোট উৎপত্তির অনুকূল হইতে পারে। সংরক্ষণ নীতি এমন হইবে যে, আমদানি শুল্কের আধিক্যে একদিকে যেমন বিদেশের দ্রব্য আমদানি বন্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চমূল্যে এক-চেটিয়া মুনাফায় পণ্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে।

একচেটিয়া জোট-কারবারের প্রকারভেদ
(Different Forms of Monopolistic Combination)

বিভিন্ন ফার্মের সংযুক্তির মাধ্যমে যে জোট কারবার গঠিত হয় উহা একাধিক রূপ গ্রহণ করিতে পারে। উহাদের মধ্যে ট্রাষ্ট এবং কার্টেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ট্রাস্ট (Trusts) : ট্রাষ্ট হইল পুরাদস্তুর সংহত জোট-কারবার। বিভিন্ন স্বতন্ত্র ফার্মের সংহতি সাধনের ফলেই ইহার উৎপত্তি হয়। যে সকল ফার্ম ট্রাষ্ট জোটে মিলিত হয় উহাদের পূর্ণমাত্রায় নূতন সৃষ্ট একটি কারবার সংযুক্তি ঘটে। বিভিন্ন ফার্মের ব্যক্তিগত স্থিতি বা স্বাধীনতা একেবারে মুছিয়া যায়। বিভিন্ন ফার্মের অংশীদারগণেরও নিজেদের স্বাধীনতা কায়েমী থাকে না। সকল প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণই এক ট্রাষ্ট-জোটের অংশীদার হইতে বাধ্য হয়। এই জোটের একই পরিচালকমণ্ডলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল কারখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ট্রাষ্ট সাধারণত পশ্চাৎ উৎপাদন ধাপ এবং পরবর্তী উৎপাদন ধাপের সংযুক্তি। গত শতাব্দীর শেষদিকে আমেরিকার ট্রাষ্ট জোট-কারবারের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই কারবার একচেটিয়া ক্ষমতার কেন্দ্রী-করণে সহায়তা করে বলিয়া মার্কিণ সরকার ইহাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়।

কার্টেল (Cartels) : একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কিংবা উৎপাদনের একই ধাপে নিযুক্ত বিভিন্ন ফার্মের সংযুক্তি ঘটিলে উহাকে কার্টেল বলা হয়। এই ধরনের জোট উৎপত্তির মূলে প্রধানত থাকে দ্রব্য উৎপাদন, যোগান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। যেসকল ফার্ম কার্টেল জোটে মিলিত হয়, উহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে। প্রত্যেক ফার্ম নিজ নিজ কারখানায় দ্রব্য উৎপাদন করে, প্রত্যেক ফার্মের বিভিন্ন অংশীদার ও

পরিচালকমণ্ডলীর কোন অদল-বদল হয় না। কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল উহারা চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া জোটের সদস্য হইয়া থাকে। কার্টেল জোট প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ বাঁধিয়া দেয়, পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে কিংবা বিক্রয়-বাজার সংগঠন করে। কার্টেল সাময়িক চুক্তি বিশেষ; চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ফার্মগুলি আবার নূতন করিয়া চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া কার্টেল জোট সৃষ্টি করিতে পারে। কার্টেল জোট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এই উভয় ভিত্তিতেই গঠিত হইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কার্টেল জোট ব্যবসায় জার্মানীতে খুব প্রসার-লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে এইরকম কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইল সিমেণ্ট মার্কেটিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া।

কার্টেল ও ট্রাষ্টের আপেক্ষিক গুণাবলী
(Comparative Advantages of Cartel and Trust)

জোট হিসাবে ট্রাষ্ট কার্টেল অপেক্ষা নিবিড়তর সংযুক্তি। ট্রাষ্ট এককেন্দ্রিক চিরস্থায়ী জোট, কার্টেল স্বাধীন ফার্মের মেয়াদী সঙ্ঘ বিশেষ। এই দুই প্রকার জোটের উদ্দেশ্যই একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে উচ্চ পণ্যমূল্য লাভ করা। উভয়েরই ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ-সুবিধা আছে। কার্টেলে ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটে সুপরিচালনা এবং বহুল বিস্তৃত বিক্রয়ের মাধ্যমে। ট্রাষ্টের ব্যয়-সঙ্কোচ হয় অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধাগুলি পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া।

ট্রাষ্টের সুবিধা

তবে ট্রাষ্টের বিশেষ কতকগুলি সুবিধা আছে যাহা কার্টেল জোটে লাভ করা সম্ভব নয়। প্রথমত, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা যে ক্ষেত্রে অধিক, সেখানে কার্টেলের চেয়ে ট্রাষ্ট জোট সৃষ্টি করাই লাভজনক। কার্টেলে প্রত্যেকটি ফার্মের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে—এমন কি, অনিপুণ প্রতিষ্ঠানেরও উচ্ছেদ করা হয় না। কিন্তু ট্রাষ্টে অনিপুণ ফার্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত সম্প্রসারণ দ্বারা গোটা জোটের নৈপুণ্য বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটানো সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ট্রাষ্টের স্থিতিশীলতা কার্টেলের চেয়ে বেশি। কার্টেল স্বল্পমেয়াদী অনিশ্চিত সংহতি। বিভিন্ন ফার্মের সমবেত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই কার্টেল জোট সৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন সেই স্বার্থসিদ্ধির

প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়, তখন বিভিন্ন ফার্ম আবার নিজ নিজ স্বার্থ ও কর্মপন্থা স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করিতে পারে, যাহার ফলে কার্টেল জোট ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু ট্রাস্টে একত্রীকরণ হয় নিবিড়ভাবে; সকল ফার্মের এক কর্মপন্থা ও পরিচালনা ব্যবস্থা ট্রাস্টের স্থায়িত্বের প্রধান কারণ। তৃতীয়ত, ট্রাস্টের আর একটি সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জোট-কারবার বলিয়া বাজারে ইহার পরিচিতি অধিক। অপর পক্ষে, কার্টেলের বিভিন্ন ফার্ম সাধারণত ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া বাজার-পরিচিতিও সীমাবদ্ধ। বাজার-পরিচিতির সুযোগ লইয়া ট্রাস্ট প্রয়োজনমত প্রচুর মূলধন সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু কার্টেলের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়।

কার্টেলের সুবিধা

তবে কার্টেলের একটি বড় সুবিধা এই যে, ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া এই জোট-কারবারের পক্ষে দ্রব্য যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা সহজ। দ্বিতীয়ত, কার্টেলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের প্রধান প্রধান প্রায় সকল ফার্মেরই সংযুক্তি ঘটে বলিয়া ইহার পক্ষে অধিক একচেটিয়া মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, ট্রাস্টের তুলনায় কার্টেলে সংগঠন ব্যয়ও কম পড়ে। ট্রাস্টের পুরাতন অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইতে পারে। কিন্তু কার্টেলে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া সংগঠনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। পরিশেষে, ট্রাস্টের আয়তন অনেক সময় এত বৃহৎ হইয়া পড়িতে পারে যাহার দরুন বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ইহা আর লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কার্টেলে ঐ পরিণতি অসম্ভব।

একচেটিয়া জোট-কারবারের সুবিধা
(Advantages of Monopolistic Combination)

একচেটিয়া জোট-কারবারের সুফল নির্ভর করে কি ভাবে উহারা গঠিত হয় তাহার উপর। একচেটিয়া জোট যদি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের জোট হয় কিংবা মৌখিক বোঝাপড়া দ্বারা গঠিত শিথিল জোট হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় অপেক্ষা বড় বেশি সুবিধা লাভ করার আশা করা যায় না। কিন্তু একচেটিয়া কারবার যদি পূর্ণ সংযুক্তি ব্যবসায়ের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে উহার পক্ষে বৃহদায়তন

উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধা ও ব্যয়-সঙ্কোচ ভোগ করা সম্ভব হয়। এইরূপ জোট-কারবারের পক্ষে অনিপুণ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কারিগরি সুবিধা লাভ করার যথেষ্ট সুযোগ হয়।

দ্বিতীয়ত, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি বহন ও পুঁজি সংগ্রহ ব্যাপারে বৃহদায়তন উৎপাদন যে সকল সুবিধা লাভ করে, তাহার প্রায় সবই জোট-কারবারে পাওয়া যায়।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া জোট-কারবারে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্যের প্রয়োজন হয় না বলিয়া বিক্রয়-ব্যয় বিশেষভাবে সংক্ষেপে করা সম্ভব হয়।

চতুর্থত, উৎপাদনের কতকগুলি ক্ষেত্রে সামাজিক প্রয়োজনে একচেটিয়া জোট-কারবারের প্রয়োজন হয়। যেমন, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতা থাকিলে, একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদক সম্পদগুলির অযথা আধিক্য ও অপচয় ঘটে, অন্যদিকে প্রত্যেকের স্থায়ী মূলধন অধিক পরিমাণে লাগে। এই সকল ক্ষেত্রে সরকারী আইন দ্বারা জোট উৎপাদন সংগঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে, অনেকে বলেন যে, একচেটিয়া জোট-কারবার শিল্প উৎপাদনের স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। ইহা পণ্য যোগান ও মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রতিযোগিতা হ্রাস করে ও ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা দূর করে। তবে জোট উৎপত্তির মূলে যদি কেবল মুনাফা লাভ, ফটকা কারবার প্রভৃতি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দাম-স্তর ও শিল্পের স্থিতিশীলতা আসিতে পারে না।

একচেটিয়া জোট-কারবারের অসুবিধা
(Disadvantages of Monopolistic Combination)

একচেটিয়া জোট-কারবার সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। যদিও এই ধরনের কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে পারে, তথাপি এই ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা ভোগকারিগণ লাভ করিতে পারে না। কেন না, জোট কারবার পণ্যের বাজার-দাম নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার-দাম অপেক্ষা উর্ধ্বস্তরে ধার্য করিয়া

থাকে। তাহা ছাড়া, জোট-কারবার অনেক সময় তারতম্যমূলক বাজার-দাম নির্ধারণ করিয়া ক্রেতাগণকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া বাজারে পণ্য যোগানের পরিমাণ সাধারণত প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের পণ্য যোগানের পরিমাণ হইতে কম হইয়া থাকে। বিভিন্ন বিক্রেতা ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন এবং নূতন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্মের উদ্ভব ব্যাহত করিয়া জোট-কারবার সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য যোগানের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, অনেক জোট-কারবার উহার অধীন বিভিন্ন ফার্মের দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়া দেয়। ইহার ফলে কোন ফার্মই কাম্য উৎপাদন মাত্রায় দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে না। ইহাতে ফার্মের উৎপাদনের উপকরণের কিছু কিছু অযথা অপচয় ঘটে এবং অলস উৎপাদন ক্ষমতার (idle capacity) সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত, একচেটিয়া জোট ব্যবসায় কেবল যে দ্রব্যের উচ্চ মূল্য নির্ধারণ দ্বারাই ভোগকারিগণকে বিপর্যস্ত করে তাহা নহে। জোট কারবার উৎপাদনের উপাদানগুলির কর্ম নিয়োগ সঙ্কোচ করে অথবা নিখুঁত প্রতি-যোগিতার বাজার-দাম অপেক্ষা কম দামে উপাদানগুলিকে নিয়োগ করে।

পঞ্চমত, প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ ও ফটকা কারবারের আনুসাঙ্গিক কুফলগুলি জোট ব্যবসায়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। প্রচুর আর্থিক ক্ষমতা ও সংহতির ফলে একচেটিয়া কারবার নূতন প্রতিযোগী ফার্মের বাজারে প্রবেশ সীমিত করিয়া দিয়া ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও সাহস খর্ব করে। ইহাতে পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদানসমূহের কাম্য বিলি-বণ্টন হইবার পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে, আধুনিক একচেটিয়া জোট-কারবারের সম্পদ ও পুঁজিপাটা এত অধিক যে, উহারা সরকারী কর্মচারী ও দেশের আইন প্রণয়নকারিগণকে অর্থ লোভ দেখাইয়া কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

একচেটিয়া জোট-কারবারের নিয়ন্ত্রণ
(Control of Monopolies)

একচেটিয়া কারবার সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে

জোট-কারবারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে Sherman Act এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে Clayton Anti-Trust আইন পাশ করা হইয়াছে। উপযুক্ত আইনের দ্বারা একচেটিয়া কারবারিগণের অবাঞ্ছনীয় কার্যকলাপ দমনের ব্যবস্থা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, সমাজ-কল্যাণের স্বার্থে সরকারের উচিত একচেটিয়া বাজারে পণ্যমূল্য ও মুনাফার হার নিয়ন্ত্রণ করা। প্রয়োজন হইলে সরকার সর্বোচ্চ পণ্যমূল্য ও সর্বোচ্চ মুনাফার হার বাঁধিয়া দিবে। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে যাহাতে একচেটিয়া কারবার শোষণ না করে তাহার জন্য সরকারের উচিত উহাদের সর্বনিম্ন দাম বাঁধিয়া দেওয়া। অত্যধিক উন্নত শিল্পে উৎপাদনেব উপকরণগুলি যাহাতে অকাম্যভাবে প্রবেশ না করিতে পারে এবং অনুন্নত শিল্পে যাহাতে প্রবেশ করিতে উৎসাহিত হয়, তাহার জন্য সরকার যথাক্রমে কর নির্ধারণ ও সহায়ক বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করিতে পারে।

তৃতীয়ত, জোট-কারবার যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার জন্য নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। কারবারের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের বহুল প্রচার জোট-কাববার নিয়ন্ত্রণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

পরিশেষে, একচেটিয়া জোট-কারবারের অনেক গলদ দূর করা সম্ভব হইতে পারে উহার রাষ্ট্রীয়করণ দ্বারা। জনহিতকব পণ্য যোগানের ক্ষেত্রে, কিংবা পণ্যের বাজার যে ক্ষেত্রে নিশ্চিত নহে সেক্ষেত্রে জোট-কারবারের রাষ্ট্রীয়করণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৫ | উৎপাদন-তত্ত্ব
(Theory of Production)

আমরা চাহিদা-তত্ত্বে ভোগকারীর আচরণ বিশ্লেষণ করিয়াছি। ভোগকারী কখন কিভাবে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়—তাহার চাহিদার পিছনে কি কি শক্তিগুলি কাজ করে, চাহিদা-তত্ত্বে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। উৎপাদন-তত্ত্বে ঠিক একইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, কিভাবে উৎপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা ঘটে এবং ফার্মের দ্রব্য যোগানের পশ্চাতে কি কি শক্তিগুলি কাজ করে। দ্রব্য উৎপাদন বা যোগানের পরিমাণ কেবল বাজার-দাম ও চাহিদার উপর নির্ভর করে না। যোগানের পরিমাণ উৎপাদন ব্যয়ের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। উৎপাদন ব্যয় আবার নির্ভর করে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন উপাদানের বাজার দাম এবং উৎপাদন পদ্ধতির উপর।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের উৎপাদন-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণ দ্বারা কিভাবে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। উপাদান সমষ্টির সহিত উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণের কার্য-কারণ সম্পর্ক (functional relation) নির্দেশ করাই উৎপাদন-তত্ত্বের প্রধান আলোচনার বিষয়। উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণকে ইন্‌পুট (input) বা কারক বলা হয়। এই ইন্‌পুট বা কারকসমষ্টির ক্রিয়ার শেষ ফলই হইল উৎপন্ন দ্রব্য (output)। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাদানের এককগুলি বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয় হয় না। প্রত্যেক উপাদানের এককগুলির মধ্যে গুণ ও দক্ষতার দিক দিয়া বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সেইজন্য ফার্ম যখন পণ্য উৎপাদন করে তখন ঐ পণ্য উৎপাদনে উপযোগী উপাদানটি বাছিয়া নিয়োগ করিয়া থাকে। যেমন, যদি কোন ফার্ম চিনি উৎপাদন করিতে চাহে, তাহা হইলে উহার পক্ষে ইস্পাত কারখানায় কাজের উপযুক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা চলে না। তাহা ছাড়া, আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উৎপাদন-তত্ত্ব কাহাকে বলে ?

ফার্ম যখন উপাদানসমূহের বিভিন্ন এককগুলি উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করে, তখন বিশেষভাবে উহাদের সেবাকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন একক হইতে যে পরিমাণ সেবা পাওয়া যায়, উহাই উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া উৎপন্ন পণ্যে রূপান্তরিত হয়।

উৎপাদন সূত্র বা অপেক্ষক
(Productive Function)

ফার্ম যখন উৎপাদন করে তখন উহাকে উৎপাদনের কর্মসূচী অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানের এককসমূহ বা কারকসমষ্টি সংগ্রহ করিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কি পণ্য, কতটা পরিমাণে, কিভাবে উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্ভর করে উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত উপাদান বা কারকসমষ্টির উপর। উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ কারকসমষ্টি ব্যবহারের শেষ ফলশ্রুতি। ফার্মে নিয়োজিত কারকসমষ্টি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ এই দুইএর মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক উহাকে উৎপাদনসূত্র বা উৎপাদন অপেক্ষক বলা হয়। সম্পর্কটি নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়:

$$X = f(a, b, c, d \cdots\cdots\cdots)$$

উপরের সমীকরণে নির্দিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণকে X প্রতীক দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমষ্টির ক্রিয়াকে f প্রতীক ব্যবহার-করিয়া বুঝানো হইয়াছে এবং উপাদান বা কারকগুলি a, b, c, d,·········ব্যবহার করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সমীকরণটি দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ ঐ সময়ে নিযুক্ত বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমূহের ক্রিয়ার ফল। ইহা দ্বারা আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ফার্ম যদি উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে চায়, তাহা হইলে উহাকে নিয়োজিত কারকসমষ্টির অনুপাত অদল-বদল করিতে হইবে অথবা সমস্ত কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণ সমানভাবে বাড়াইতে বা কমাইতে হইবে।

কারকসমষ্টি ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক উৎপাদনসূত্র নির্দেশ করিয়া থাকে, উহা বিশেষভাবে যন্ত্রবিদ্যার (engineering) এক্তিয়ারভুক্ত। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানীরা সঠিক বলিয়া

দিতে পারেন, বিভিন্ন কারকগুলির কি কি বিভিন্ন সংমিশ্রণদ্বারা, ফার্মের বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি ও কারিগরি কৌশলের কি পরিমাণ সহায়তায় কতটা দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু উৎপাদনসূত্র এইভাবে যন্ত্রবিদ্যার অন্তর্গত বিষয় হইলেও ইহার অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট আছে। ইহার কারণ এই যে, ফার্ম যখন বিভিন্ন কারক নিয়োগ করিয়া উহাদ্বারা কোন সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে চায়, তখন সর্বাধিক মুনাফালাভের লক্ষ্যটি উহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে। সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে হইলেই ফার্মকে সর্বাধিক দক্ষ কারকসমষ্টির সংমিশ্রণ বাছাই করিয়া উৎপাদন ব্যয় যাহাতে সর্বনিম্ন হয় সেইদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। ফলে, অনেক সময় দেখা যায়, ফার্ম উৎপাদিত পদ্ধতি ও কারিগরী কর্মকৌশল কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়াই কারকসমষ্টির অনুপাত সংমিশ্রণে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। কারসমষ্টির নিয়োগের এই আনুপাতিক পরিবর্তন ঘটিতে পারে একাধিক প্রকারে। অনেক সময় সকল কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিতে পারে। আবার, কখনও বা একটি বা কয়েকটি কারকের নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অপর একটি বা কয়েকটি কারক নিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটানো চলিতে পারে।

উৎপাদন-তত্ত্বের প্রচলিত ব্যাখ্যা

(Traditional Approach to the Theory of Production)

ক্ল্যাসিক্যাল ও নয়া-ক্ল্যাসিক্যাল (Neo-classical) অর্থবিজ্ঞানিগণ সাধারণত এই ভাবে উৎপাদনের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যদি অন্যান্য উপাদান ও কারকগুলির নিয়োগের পরিমাণ স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে একটি উপাদান বা কারক নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করিলে উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে। অন্যান্য উপাদান স্থির আছে ধরিয়া লইয়া, ফার্ম যদি একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের (one variable factor) বাড়াইতে পারে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলে ফার্মটি কিভাবে আচরণ করিবে সেই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদনের বিভিন্ন বিধি এবং ফার্ম কোন্ অবস্থায় ভারসাম্যে পৌঁছিবে তাহার আলোচনা করা যায়। নিচে সেই আলোচনা করা হইতেছে।

উৎপন্নের বিধি
(Laws of Returns)[১]

পণ্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করিতে হইলেই বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমূহের সংমিশ্রণ করিতে হয়। এই কারকসমূহের সংমিশ্রণের উপর ফার্মের উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন কারকসমূহের সংমিশ্রণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের মধ্যে যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক দেখা যায় উহাই বিভিন্ন উৎপন্ন বিধি নির্দেশ করিয়া থাকে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ তিন প্রকার উৎপন্ন বিধির উল্লেখ করিয়াছেন—ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি, সমানুপাতিক উৎপন্নের বিধি এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি। তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া এই বিধি তিনটির দুইটি পৃথক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এক, কারকের দরুন উৎপন্ন বিধিগুলি (Laws of Returns to Factors) বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, মাত্রার দরুন উৎপন্ন বিধিগুলি (Laws of Returns to Scale) বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

কারকের দরুন উৎপন্ন বিধিগুলির ব্যাখ্যানে নিম্নলিখিত শর্তগুলি অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে :

(ক) উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে কোন একটি বা একাধিক উপাদান স্থির অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় ধরা হয়।

(খ) অন্যান্য উপাদানগুলি পরিবর্তনীয়।

(গ) উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য একটি বা একাধিক উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া যদি একটি উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো হয়, তাহা হইলে ঐ পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যবহারের দরুন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি একই হারে ঘটে না—প্রথমে মোট উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িবে, পরে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িবে।

(ঘ) গড় উৎপন্ন এবং প্রান্তিক উৎপন্ন প্রথমে বাড়িয়া সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইবে, আবার হ্রাস পাইতে থাকিবে।

আমরা প্রথমে কারকের দরুন তিনটি উৎপন্ন বিধি কি ভাবে কার্যকর হয় তাহা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন—উৎপাদন সম্পর্কীয় এই তিনটি ধারণা ভালভাবে বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

---

১. The laws of increasing returns, of constant returns and of diminishing returns.

মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন
(Total Product, Average Product and Marginal Product)

একটি উপাদান বা কারকের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া, উহার সহিত এক একক পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করা হইলে উৎপাদনের মোট পরিমাণ যাহা হয় উহাকে মোট উৎপন্ন বলে। মোট উৎপন্নকে পরিবর্তনীয় উপাদান (মনে কর, শ্রম) দ্বারা ভাগ করিলে শ্রমের গড় উৎপন্নের পরিমাণ পাওয়া যায়। পরিবর্তনীয় উপাদানের এক মাত্রা বাড়াইলে (এখানে শ্রমের একমাত্রা), মোট উৎপাদন যেটুকু বাড়ে উহাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন বলে। নিচে উদাহরণের সাহায্যে মোট উৎপন্ন, গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হইল।

অপরিবর্তনীয় উপাদান ভূমি	পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রম	মোট উৎপন্ন	শ্রমের গড় উৎপন্ন (মোট উৎপন্ন ÷শ্রমের কারক সংখ্যা)	শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন (মোট উৎপন্নের সামান্য বৃদ্ধি ÷ শ্রমের সামান্য বৃদ্ধি)[১]
১ বিঘা	১	১০ মণ	১০	১০
১ „	২	২২ মণ	১১	১২
১ „	৩	৩৬ মণ	১২	১৪
১ „	৪	৫২ মণ	১৩	১৬
১ „	৫	৬৬ মণ	১৩'২	১৪
১ „	৬	৭৬ মণ	১২'৭	১০
১ „	৭	৮২ মণ	১১'৭	৬
১ „	৮	৮৫ মণ	১০'৬	৩
১ „	৯	৮৫ মণ	৯'৪	০
১ „	১০	৮৩ মণ	৮'৩	-২

১. গাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করিয়া গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্ন এইভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$AP = \frac{TP}{b}$$

$$MP = \frac{\Delta TP}{\Delta b}$$

[এখানে b হইল পরিবর্তনীয় উপাদান এবং গ্রীক অক্ষর Δ (ডেল্টা) সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন বুঝায়।]

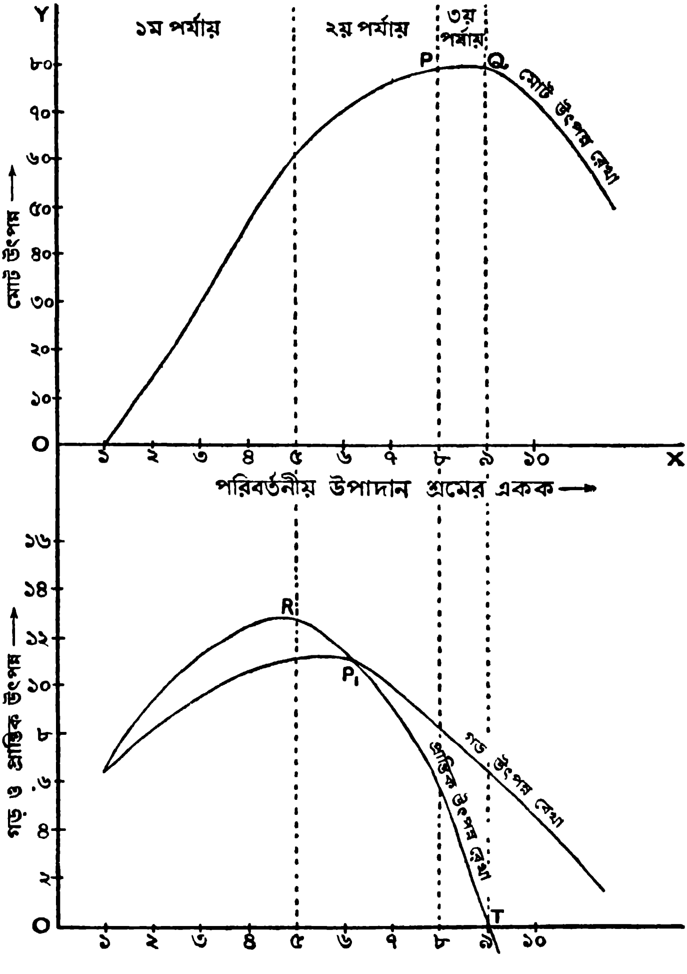
উপরের সারণীতে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমের চতুর্থ একক নিয়োগ পর্যন্ত যে হারে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক হারে মোট উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন না, শ্রমের চতুর্থ একক নিয়োগ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহার পরও মোট উৎপন্ন বাড়িয়া ৮৫ মণ পর্যন্ত উঠিয়াছে। কিন্তু এই মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধিহারের চেয়ে কম। অর্থাৎ চতুর্থ একক শ্রম নিয়োগের পর হইতেই প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাস পাওয়ার দরুন মোট উৎপন্ন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িয়াছে।

এখন যতক্ষণ অবধি পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা মোট উৎপন্ন অধিক হারে বাড়িতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের গড় উৎপন্নের পরিমাণও বাড়িতে থাকিবে। আবার, মোট উৎপন্ন যখন শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হারে বাড়িতে থাকিবে, তখন গড় উৎপন্নের পরিমাণ কমিতে থাকিবে।

গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের মধ্যে সম্পর্ক এই সারণীতে লক্ষ্য করা যায়। প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় উৎপন্নও বাড়িয়া থাকে, তবে গড় উৎপন্নের বৃদ্ধির হার প্রান্তিক উৎপন্ন বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম। আবার, প্রান্তিক উৎপন্ন যখন কমিতে থাকে, গড় উৎপন্নও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়, তবে গড় উৎপন্ন হ্রাসের হার প্রান্তিক উৎপন্ন হ্রাসের হার অপেক্ষা কম। তৃতীয়ত, প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন পরস্পর সেই স্তরে সমান হয় যেখানে গড় উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি।

উপরের সারণীর তথ্যগুলি পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দেখানো হইল :

এই রেখাচিত্রে দুইটি অংশ দেখানো হইয়াছে—উপরের অংশে মোট উৎপন্ন রেখা এবং নিচের অংশে প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্নের রেখা আঁকা হইয়াছে। দুইটি অংশেই সমান্তরাল অক্ষরেখা OX দ্বারা পরিবর্তনীয় উপাদান (শ্রমের) নিয়োগের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ নির্দেশ করা হইয়াছে। অপর উপাদানটির (ভূমির) নিয়োগের পরিমাণ অপরিবর্তিত ধরা হইয়াছে। নির্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রকৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদিও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে দেখা যায় যে, গড় উৎপন্ন রেখা P_1 বিন্দু পর্যন্ত দক্ষিণে উর্ধ্বদিকে উঠিতেছে। কিন্তু P_1 বিন্দুর পর হইতে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো সত্ত্বেও গড় উৎপন্ন রেখাটি ক্রমশ নিচে নামিয়াছে। আবার, P_1 বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা গড় উৎপন্ন রেখাটিকে উপর হইতে ছেদ করিয়াছে।



এই বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন পরস্পর সমান। P_1 বিন্দুর পর গড উৎপন্ন রেখা প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার উপরে রহিয়াছে। চিত্রের প্রথম অংশে মোট উৎপন্ন রেখা P বিন্দু পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান। কিন্তু প্রান্তিক উৎপন্নের রেখা R বিন্দু পর্যন্ত (অর্থাৎ ৫ম একক শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত) ক্রমবর্ধমান। সুতরাং R বিন্দু পর্যন্তই মোট উৎপন্নের হার শ্রমের একক বৃদ্ধির হার-অপেক্ষা বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। R বিন্দু পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধির

ফলে মোট উৎপন্ন, প্রান্তিক উৎপন্ন ও গড় উৎপন্ন তিনটিই বৃদ্ধি পাইতেছে। উৎপাদনের এই পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে P_1 বিন্দুর পর হইতে গড় উৎপন্ন রেখা দক্ষিণে নিচের দিকে নামিতেছে। উপরের অংশে মোট উৎপন্ন রেখা Q বিন্দুর পর হইতে নিম্নমুখী হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার পর পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমের যোগান বাড়াইলেও মোট উৎপন্ন আর বাড়িবে না—কমিতে থাকিবে। P ও Q বিন্দুর মধ্যে পর্যায়টিতে গড় উৎপন্ন কমিতেছে এবং এই পর্যায়ে প্রান্তিক উৎপন্নের রেখা গড় উৎপন্ন রেখার নিচে রহিয়াছে বলিয়া প্রান্তিক উৎপন্ন গড় উৎপন্ন অপেক্ষা কম। উৎপাদনের এই পর্যায়ে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইয়াছে।

তৃতীয় পর্যায়ে Q বিন্দুর পর গড় উৎপন্নের রেখা আরও নিচের দিকে নামিতেছে। ইহার কারণ এই যে, Q বিন্দুর সমরেখায় নিচে T বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপন্ন শূন্যে পরিণত হইয়াছে। T বিন্দুর পর প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা সমান্তরাল অক্ষরেখা OXকে ছেদ করিয়া আরও নিম্নমুখে গিয়াছে। কিন্তু R বিন্দুর পর হইতে প্রান্তিক উৎপন্ন রেখার ঢাল ঋণাত্মক। অতএব বলা চলে যে, Q বিন্দুর পর হইতেই ক্ষীয়মাণ মোট উৎপন্নের পর্যায়।

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি
(Law of Increasing Returns)

উৎপাদনের একটি বা একাধিক কারকের নিয়োগ, যন্ত্রকৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি অপরিবর্তিত আছে ধরিয়া লইয়া যদি অপর একটি কারকের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে মোট উৎপন্ন ঐ কারকটি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হারে বাড়িতে থাকিবে অথবা ঐ কারকটির গড় উৎপন্ন ও প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। ইহাকেই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি বলে। বিধিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে কিভাবে কার্যকর হয় তাহার প্রধানত দুইটি কারণ নির্দেশ করা যায়।

ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের কারণসমূহ

প্রথমত, উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে এমন সকল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কারক ব্যবহার করা হয় যাহা স্থির (lumpy) কিংবা অবিভাজ্য (indivisible)। এমন অনেক উপাদান আছে, যাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে ভাগ করিলে হয়

উৎপাদনের পক্ষে একেবারে অনুপযোগী হইয়া পড়ে কিংবা কাজের দক্ষতা অংশত হারাইয়া ফেলে। এই স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলি প্রায় একই ব্যয়ে কম কিংবা বেশি দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। কারখানা, কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজি, ব্যবস্থাপনা, পণ্য বিক্রয়, গবেষণা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি উপাদানের কম-বেশি অবিভাজ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন উৎপাদক ফার্ম যখন একটি পরিবর্তনীয় কারকের ক্রমাগত নিয়োগ বাড়াইয়া দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে থাকে, তখন পরিবর্তনীয় কারকটির অধিকতর নিয়োগের ফলে স্থির ও অবিভাজ্য উপাদান বা কারকগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর ব্যবহৃত হইতে থাকে। পূর্বের সারণীতে ব্যবহৃত দৃষ্টান্ত হইতে বেশ লক্ষ্য করা যায় যে, স্থির কারক এক বিঘা জমির উপর যখন ৫ একক পরিবর্তনীয় কারক শ্রম নিয়োগ করা হইয়াছে, তখনই জমিটির সর্বাধিক সার্থক বা দক্ষ ব্যবহার ঘটিয়াছে। ১ বিঘা জমি ও ৫ একক শ্রমের সংমিশ্রণই উৎপাদনের উৎকৃষ্টতম সংমিশ্রণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং ইহার আগে স্থির উপাদান জমিটির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটে নাই; কেন না, তখন স্থির উপাদান জমির তুলনায় পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমের পরিমাণ কম ছিল। সেইজন্য শ্রমের গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নও তখন কম ছিল। যতই পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই স্থির ও অবিভাজ্য কারকগুলি আরও সার্থক ভাবে ব্যবহৃত হইবে। ফলে, পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক ও গড় উৎপন্নও বাড়িতে থাকিবে। এই-ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনীয় উপাদানটির গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমবর্ধমান বিধিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে। উৎপাদনের যে বিন্দুতে আসিয়া স্থির ও অবিভাজ্য কারকগুলির সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার ঘটে, সেখানেই বিভিন্ন কারকগুলির মধ্যে উৎকৃষ্টতম সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া ধরা হয়। এই বিন্দুতে পরিবর্তনীয় কারকটির প্রান্তিক উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক হইয়া থাকে। এই বিন্দুর পরও যদি পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগ বাড়ানো হয়, তাহা হইলে জমির তুলনায় শ্রমের পরিমাণ বেশি হইয়া পড়িবে; ফলে, কারকসমূহের উৎকৃষ্টতম সংমিশ্রণ নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নও হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং

(১) স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার অধিকতর দক্ষতার সহিত ব্যবহার

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি আর কার্যকর হইবে না।

এই বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিটি পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions) কিংবা অসমানুপাতিক উৎপন্ন বিধির (Law of Non-proportional Returns) একটি বিশেষ পর্যায়।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যতক্ষণ অবধি ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর থাকে, ততক্ষণ পরিবর্তনীয় উপাদানটির অধিক নিয়োগের ফলে স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলি অধিকতর দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হইতে থাকে। উৎপাদনের এই পর্যায়ে যে হারে পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বাড়ে তাহা অপেক্ষা অধিকহারে মোট উৎপন্ন বাড়িতে থাকে। তাহাতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় কমিতে থাকে। এইভাবে অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর ব্যবহারের ফলে গড ও প্রান্তিক ব্যয় কমিতে থাকে বলিয়া ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিকে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধিও (Law of Decreasing Cost) বলা হইয়া থাকে।

(২) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ-সুবিধা

দ্বিতীয়ত, উৎপাদক ফার্ম অপবিবর্তনীয় উৎপাদনের সহিত যতই অতিরিক্ত পরিবর্তনীয় কারকসমূহ নিয়োগ করিতে থাকে ততই ফার্মের উৎপাদনের আয়তন বাড়িতে থাকে। উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ-সুবিধাগুলি কাজে লাগাইতে পারে। এই সুযোগ-সুবিধাগুলি যতই কাজে লাগানো যায়, ততই একদিকে যেমন গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে আবার প্রতিষ্ঠানের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় কমিতে থাকে। ফলে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি অথবা ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের বিধিটি কার্যকর হইয়া থাকে।

ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি
(Law of Diminishing Returns)

অপর একটি বা একাধিক উপাদান, উপাদান পদ্ধতি ইত্যাদি অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন একটি উপাদান যদি ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম দিকে প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন বাড়িলেও,

শেষের দিকে প্রথমে প্রান্তিক ও পরে গড় উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে।[১] যখন প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে তখন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির অনুপাত পরিবর্তনীয় উপাদানটির বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা কমিতে থাকে। উৎপাদনের এই বিন্দু হইতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হয়।

২৭১ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রান্তিক উৎপন্ন R বিন্দুর পর হইতে দক্ষিণে নামিতে শুরু করিয়াছে। ইহা দ্বারা এই বুঝা যাইতেছে যে, R বিন্দুর পর হইতে মোট উৎপন্নের বৃদ্ধির হার পরিবর্তনীয় উৎপাদন শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং Rকে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্নের বিন্দু বলা চলে। R বিন্দু সমরেখার উপরে মোট উৎপন্ন রেখা ঊর্ধ্বগামী হইলেও রেখাটির ঢাল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। গড় উৎপন্ন রেখা P_1 বিন্দু হইতে নামিতে আরম্ভ করিযাছে এবং শেষে মোট উৎপন্ন রেখাও Q বিন্দু হইতে নামিতে আরম্ভ করিযাছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিটি যেমন পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অথবা অসমানুপাতিক উৎপন্ন বিধির একটি বিশেষ পর্যায়, সেইরূপ ক্ষীযমাণ উৎপন্ন বিধিটিও পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি অথবা অসমানুপাতিক উৎপন্ন বিধিরই একটি অন্যতম পর্যায়। অন্যান্য কারক বা উপাদানগুলির নিয়োগ অপরিবর্তিত ধরিয়া, যদি একটি উপাদানের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়ানো হয়, তাহা হইলে মোট উৎপন্ন সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। কখনও মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির অনুপাত পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাত অপেক্ষা বেশি হয়, আবার কখনও বা মোট উৎপন্নের বৃদ্ধির অনুপাত কম হয়। যখন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার বেশি হয়, তখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধি কার্যকর হয়, আর যখন মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির হার কম হয় তখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হয়।

উৎপাদনের একটি পর্যায়ে কেন প্রান্তিক উৎপন্ন কমিতে থাকে, কেনই বা গড় উৎপন্ন কমিতে আরম্ভ করে এবং শেষে মোট উৎপন্নও হ্রাস পাইয়া থাকে? অর্থাৎ ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি উৎপাদন ক্ষেত্রে কেন এবং কখন দেখা দেয়?

---

১. Benham : "As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point, first the marginal and then the average product of that factor will diminish."

যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অপরিবর্তিত উপাদানসমূহের সহিত পরিবর্তনীয় কারক নিয়োগ করে তখন উহার এই লক্ষ্যই থাকে যাহাতে কারক-সমূহের সংমিশ্রণটি সর্বোত্তম হয়। এই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে অপরিবর্তিত কারকগুলির সহিত পরিবর্তনীয় কারকটির নিয়োগ বৃদ্ধি এমনভাবে করিতে হয় যাহাতে অপরিবর্তিত কারকগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগে। কারকগুলির সংমিশ্রণটি সর্বোত্তম হইলেই পরিবর্তনীয় উপাদানটি নিয়োগের প্রান্তিক উৎপন্ন সর্বাধিক হইয়া থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটির মোট উৎপন্ন বৃদ্ধির অনুপাতও সর্বাধিক হইয়া থাকে। কিন্তু কারকসমূহের সংমিশ্রণটি সর্বোত্তম বা সর্বোৎকৃষ্ট হওয়ার পরও যদি প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনীয় উৎপাদনটির নিয়োগ বাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে কারক সংমিশ্রণটি আর সর্বোৎকৃষ্ট থাকিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, তখন অপরিবর্তিত কারকগুলির তুলনায় পরিবর্তনীয় কারকটি অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হইয়াছে। এইভাবে পরিবর্তনীয় কারকটি অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে কারক-মিশ্রণ নিকৃষ্টতর হইতে থাকে। একটি বা একাধিক কারক অপরিবর্তিত রাখিয়া যখন কোন একটি বা একাধিক কারক অধিক পরিমাণে নিয়োগ করা হয়, তখন তাহার পিছনে উদ্দেশ্যই থাকে অপরিবর্তনীয় কারকটি বা কারকগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। যে সকল কারক স্থির উহাদের নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। যেমন, জমি একটি স্থির কারক। শুধু জমি কেন, স্বল্পকালীন সময়ে অনেক উপাদান বা কারকের যোগানই স্থির বা সীমাবদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ যখন কোন একটি বা একাধিক কারকের যোগান স্থির ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে, তখন উহাদের পরিবর্তে পরিবর্তনীয় কারক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উৎপাদনের সকল কারকই পরস্পর পরিবর্তক। একটি কারকের কাজ অপর একটি কারক ব্যবহার দ্বারা কিছুটা চলিতে পারে। কিন্তু কোন কারকই অপর একটি কারকের সম্পূর্ণ পরিবর্তক (Perfect substitutes) নহে। সেইজন্য কারকগুলির পরস্পরের মধ্যে পরিবর্তকতার স্থিতিস্থাপকতাও অসীম নহে।[১] ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের মূল

ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের কারণ

১. Joan Robinson: "There is limit to the extent to which one factor of production can be substituted for another, or in other words, the elasticity of substitution between different factors is not infinite."

কারণই এই যে, একটি স্থির ও স্বল্প উপাদান কারকের পরিবর্তক হিসাবে অপর কোন কারক ইচ্ছামত বেশি ব্যবহার করা সম্ভব নহে।[১] একটি কারকের পরিবর্তে যদি অপর একটি কারক বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমরা যে কোন দ্রব্য যে কোন পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিতাম। তাহা হইলে আমরা একখণ্ড নির্দিষ্ট পরিমাণের জমিতে পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রম ও মূলধন যত ইচ্ছা পরিমাণে নিয়োগ করিয়া সমস্ত দেশের খাদ্যাভাব দূর করিতে পারিতাম।

একটি কারক অপর একটি কারকের সম্পূর্ণ পরিবর্তক নয় বলিয়াই উহাদের পরস্পরের পরিবর্তকতার স্থিতিস্থাপকতা একের চেয়ে কম (less than unity)। সেইজন্যই নিয়োগ বৃদ্ধি সত্ত্বেও পরিবর্তনীয় কারকের প্রান্তিক ও গড় উৎপন্ন উৎপাদনের একটি পর্যায়ে হ্রাস পাইতে বাধ্য। এইজন্যই ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধির ক্রিয়া ও প্রভাব দেখা যায়।

আমাদের মনে রাখা দরকার, উৎপন্নের নিয়মগুলি (Laws of Returns) প্রান্তিক উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধিরই নির্দেশ করে, মোট উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নয়। ইহার কারণ, মোট উৎপাদনে হ্রাস ঘটিলেও তাহা ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন নীতি কার্যকরী হইবার অনেক পরে আরম্ভ হয় এবং প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক (negative) না হইলে এই অবস্থার উদ্ভব হয় না।

ক্ল্যাসিক্যাল ও মার্শাল প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণের ধারণা ছিল যে, ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, আর শিল্পোৎপাদনে ক্রমবর্ধমান উৎপন্নের বিধিটি প্রধানত প্রযোজ্য। ইহার কারণ এই যে, কৃষি উৎপাদনে সর্বপ্রধান উপাদানটি হইল জমি। কিন্তু জমির যোগান অন্যান্য উপাদানের যোগানের তুলনায় সর্বাপেক্ষা স্থির ও সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে শিল্প উৎপাদনে প্রধান উপকরণ হইল মানুষ। উৎপাদনের এই উপকরণটির যোগান পরিবর্তনীয়। কিন্তু সমকালীন অর্থবিজ্ঞানিগণ উৎপন্ন বিধির এই বিশ্লেষণ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কি কৃষি, কি শিল্প সকল উৎপাদনের ক্ষেত্রেই নিয়মটি সমান

---

১. Stigler: "Diminishing Return arises out of the fact that resource A is not a perfect substitute to resource B as the ratio of A to B increases."

গুরুত্বের সহিত কার্যকর হইতে পারে। উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে যখন একটি বা একাধিক উপাদানের যোগান স্থির ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে, এবং পরিবর্তক উপাদানগুলিও বেশি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, সেখানেই ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি দেখা দেয়। যদি একটি বা একাধিক কারকের যোগান স্থির ও স্বল্পতার জন্যই ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি দেখা দেয়, তাহা হইলে বিধিটি কেবলমাত্র স্বল্পকালেই প্রযোজ্য। স্বল্পকালে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজন মত উৎপাদনের সকল উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে না ; কিছু কিছু উপাদানের যোগান স্থির ও অপরিবর্তনীয় থাকে।

বিধিটির ক্রিয়া কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে সমান গুরুত্বপূর্ণ দেখা যায়

ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধিও (Law of Increasing Cost) বলা যায়। তাহার কারণ এই যে, উৎপাদনের যে পর্যায়ে এই বিধিটির প্রয়োগ দেখা যায়, সে পর্যায়ে পরিবর্তনীয় কারকগুলির ক্রমাগত নিয়োগ বৃদ্ধির দরুন উৎপাদন ব্যয় বাড়িতে থাকে। অথচ যে অনুপাতে কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি পায় সে অনুপাতে মোট উৎপন্ন বাড়িতে পারে না। ফলে, প্রান্তিক ও গড় ব্যয় দুইই বাড়িতে থাকে এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটিও কার্যকর হয়।

ক্রমবর্ধমান এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের তুলনা
(Increasing and Diminishing Returns Compared)

মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণের ধারণা ছিল যে, কোন উৎপাদক ফার্মে যখন ক্রমবর্ধমান ও ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি দুইটি কার্যকর হয় তখন উহাদের ক্রিয়া পাশাপাশি সমান্তরালে দেখা যায়।[১] যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন কারকসমূহের দক্ষতার দরুন দেখা দেয় এবং ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন কারকসমূহের দক্ষতার অভাবে কার্যকর হয়, তাহা হইলে এই বিধি দুইটি বিপরীত দিকে সম্পূর্ণ একই ধরনের বলা চলে। আবার, একটি শিল্পতেও বিধি দুইটির ক্রিয়া পাশাপাশি চলিতে থাকে। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয়ের ফলে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হয়, অপর দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের দরুন যখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি

১. Perfectly symmetrical for a firm.

দেখা যায় তখনও উহাদের পাশাপাশি সমান্তরাল অবস্থিতি কল্পনা করা যায়।

কিন্তু অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন্ প্রমুখ অর্থবিজ্ঞানিগণ উপরি-উক্ত ধারণাটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, মূলত এই দুইটি বিধির ক্রিয়া পাশাপাশি চলে না। দুইটি বিধি সম্পূর্ণ পৃথক কারণে দেখা দেয়। ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সাধারণত দেখা যায় যখন একটি কারক নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে ফার্মের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় অথবা ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটে। আর ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন সাধারণত দেখা দেয় তখনই, যখন কারকের যোগানে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায় এবং যখন পরিবর্তক কারক উহাদের কাজ ভালভাবে করিতে পারে না এবং তাহার দরুন প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি
(Constant Returns)

উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপাদান বা কারকসমূহের নিয়োগ যে অনুপাতে বাড়ানো যায়, ঠিক একই অনুপাতে যদি মোট উৎপন্নও বাড়ে তাহা হইলে সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইবে। কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন বৃদ্ধি সমান অনুপাতে ঘটিলে গড় ও প্রান্তিক উৎপন্নও সমান অনুপাতে বাড়িতে থাকিবে। মোট উৎপন্ন রেখাটি O বিন্দু (দুইটি অক্ষরেখার মিলনস্থল) হইতে সোজা সরলরেখার আকারে ডান-দিকে ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে। গড় ও প্রান্তিক উৎপন্ন রেখাও একই সরলরেখারূপে ভূমিতলের অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল হইবে। উৎপাদন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধিকে সমানুপাতিক ব্যয় বিধিও (Law of Constant Cost) বলা চলে। কেন না, এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও গড় ও প্রান্তিক ব্যয় একই সমান থাকে।

সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধিটি বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর হইতে দেখা যায় না বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই যে, যে সকল শর্ত ধরিয়া লইয়া ধারণাটি প্রণয়ন করা হইয়াছে উহারা মোটেই বাস্তবসম্মত নহে। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ যখন বাড়ানো যাইবে তখন বিভিন্ন

কারকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইবে ও উহাদের দামের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে না ; কারকগুলিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা চলিবে এবং প্রত্যেকটি কারকের বিভিন্ন এককের সমান দক্ষতা থাকিবে এবং কারকগুলি পরস্পর একটি আর একটির সম্পূর্ণ পরিবর্তক হইবে। এই অনুমিত শর্তগুলি বাস্তবে দেখা যায় কি না সন্দেহ। সুতরাং সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধিটির কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের কাজ ছাড়া ব্যবহারিক উপযোগিতা সামান্যই আছে।

মাত্রার দরুন উৎপন্ন বিধি
(Laws of Return to Scale)

আমরা এযাবৎ যে তিনটি উৎপন্ন বিধি আলোচনা করিলাম তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এক বা একাধিক কারক অপরিবর্তিত রাখিয়া অপর একটি কারকের নিয়োগ বাড়াইয়া গেলে কখনও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন, কখনও ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন, আবার কখনও বা সমানুপাতিক উৎপন্ন হইবে। এখন আলোচনা করা যাক, উৎপাদনের সকল উপাদান বা কারকগুলিকে যদি সমান ভাবে বাড়ানো যায়, তাহা হইলে উৎপন্নের উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে কি না। উৎপাদনের সকল কারকগুলিকে সমানভাবে বাড়ানো সম্ভব কেবলমাত্র দীর্ঘকালে, যখন সকল উপাদানগুলির যোগান পরিবর্তনীয়। দীর্ঘকালে সকল কারকগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন আনা যায় উহাকেই মাত্রার উৎপন্ন (Returns to Scale) বলে। মাত্রা বৃদ্ধির দরুন উৎপন্ন ক্রমবর্ধমান, ক্ষীয়মাণ এবং সমানুপাতিক হইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে যে হারে বাড়ানো হয় উহা অপেক্ষা বেশি হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহাকে মাত্রার ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন (Increasing Returns to Scale) বলে। উপাদানগুলি যে হারে বাড়ানো হয় উহা অপেক্ষা কম হারে যদি উৎপাদন বাড়ে, তাহা হইলে উহাকে মাত্রার ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন (Diminishing Returns to Scale) বলে। আবার, উপাদানগুলি যে হারে বাড়ানো হয় ঠিক সেই একই হারে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহাকে মাত্রার সমানুপাতিক উৎপন্ন (Constant Returns to Scale) বলা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদক ফার্ম আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে। বৃহদায়তন উৎপাদনের এই সুযোগ-সুবিধাগুলিকে মাত্রাজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ (Economies of Scale) বলে। আবার, উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির দরুন স্থির ও অবিভাজ্য উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা যথার্থভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। প্রধানত এই দুইটি কারণেই মাত্রার ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি (Increasing Returns to Scale) কার্যকর হয়। কিন্তু উৎপাদনের মাত্রা অত্যধিক বাড়াইলে সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানকে কতকগুলি অসুবিধাই ভোগ করিতে হয়। যেমন, উৎপাদনের আয়তন যদি খুব বেশি বৃহৎ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উদ্যোক্তার পক্ষে দক্ষতার সহিত পরিচালনা কার্য চালানো কঠিন হইয়া পড়িবে। উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধিতে যে সকল অসুবিধা ও জটিলতার সৃষ্টি হয় তাহাতে ব্যয়-সঙ্কোচ না ঘটিয়া ব্যয়-বাহুল্যই হইয়া থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের এই অসুবিধা-গুলিকে মাত্রাজনিত ব্যয়-বাহুল্য (Diseconomies of Scale) বলা হয়। এই ব্যয়-বাহুল্যের দরুন মাত্রার ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি (Law of Diminishing Returns to Scale) দেখা যায়। আবার, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধাজনিত ব্যয়-সংক্ষেপ এবং অসুবিধাজনিত ব্যয়-বাহুল্য যদি পরস্পর সমান হয়, তাহা হইলে মাত্রার সমানুপাতিক উৎপন্ন বিধি (Law of Constant Returns to Scale) কার্যকব হয়।

উৎপাদকের ভারসাম্য
(Producer's Equilibrium)

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, ভোগকারী কিভাবে তাহার আয় বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় করিয়া ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে। ভোগকারীর ভারসাম্যের শর্ত কিভাবে সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাও দেখানো হইয়াছে।

কোন ফার্ম যখন বিভিন্ন উপাদান বা কারক ক্রয় ও নিয়োগ দ্বারা উৎপাদন করে তখন উহার লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে হইলে ফার্মকে বিভিন্ন কারকের পরিমাণ এমনভাবে নিয়োগ করিতে হয় যাহাতে উহাদের দরুন ব্যয় হয় সর্বনিম্ন।

সর্বনিম্ন ব্যয়ের স্তরে পৌঁছাইতে হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন মিলাইয়া দেখিতে হয়। প্রতিষ্ঠানটি যদি দেখে এক একক অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া একটি কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন অপেক্ষা অপর একটি কারকের প্রান্তিক উৎপন্ন বেশি পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে উহা কম প্রান্তিক উৎপন্নের কারকটি অধিক মাত্রায় ক্রয় ও নিয়োগ করিতে থাকিবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠান কারকগুলি ক্রয় ও নিয়োগ ব্যাপারে পরিবর্তনের নীতি অথবা সম-প্রান্তিক উৎপন্নের বিধি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই নীতি উহা ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া চলিবে, যতক্ষণ না বিভিন্ন কারকের উপর অতিরিক্ত এক একক ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উৎপন্ন পরস্পর সমান হয়। যে অবস্থায় আসিয়া একটি কারকের উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উৎপন্ন অপর একটি কারকের উপর ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উৎপন্নের সহিত পরস্পর সমান হয় সেই অবস্থাই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অবস্থা। সেই অবস্থায় পৌঁছাইলেই নির্দিষ্ট ব্যয়ে ফার্মের মোট উৎপন্ন সর্বাধিক হয় এবং ফার্ম আর পরিবর্তনের নীতি প্রয়োগ করে না। কোন উৎপাদক ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত একটি সমীকরণের সাহায্যে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :

পরিবর্তনের নীতির প্রয়োগ

$$\text{উৎপাদকের ভারসাম্য} = \frac{\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন}}{\text{শ্রমের দাম}} = \frac{\text{মূলধনের প্রান্তিক উৎপন্ন}}{\text{মূলধনের দাম}} = 1$$

সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা
(Iso-Product or Iso-quant Approach)

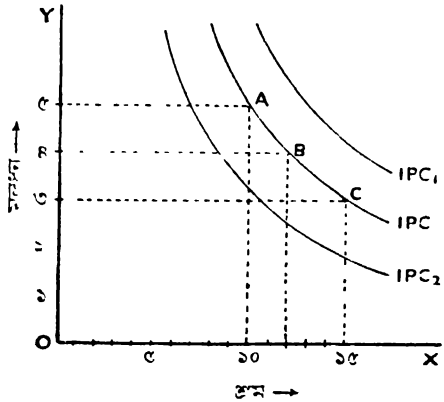
আমরা দেখিয়াছি, ভোগকারীর আচরণ ও ভারসাম্য নির্ধারণের আধুনিক পদ্ধতি হইতেছে, পছন্দ-তত্ত্ব। নিরপেক্ষতা-রেখা ও ক্রেতার বাজেট-রেখা হইল, পছন্দ-তত্ত্ব বিশ্লেষণের দুইটি মূল ধারণা। কোন উৎপাদক ফার্মের আচরণ ও ভারসাম্য বিশ্লেষণের যে আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে উহা সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা নামে পরিচিত। এই নূতন ধারাকে উৎপাদন-নিরপেক্ষতা রেখা-তত্ত্ব (Production Indifference Curve Theory) বলা যায়। সম-উৎপন্ন বিশ্লেষণ ধারা ব্যাখ্যানে দুইটি হাতিয়ার বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে : উহা হইল সম-উৎপন্ন রেখা ও সম-ব্যয়

রেখা। এই দুইটি বিশ্লেষণের পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আচরণ ও ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হয় আমরা এখন তাহা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

সম-উৎপন্ন রেখা

(Iso-Product or Equal Product Curve)

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যখন কোন পণ্য উৎপাদন করে তখন উহা একাধিক উপাদান বা কারক ক্রয় ও ব্যবহার করিতেছে ধরিয়া লওয়া হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানটি কারকসমূহের একাধিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করিতে পারে। যেমন ৫০ একক পণ্য উৎপাদন করিবার জন্য উহা ৫ একক মূলধন ও ১০ একক শ্রম, অথবা ৪ একক মূলধন ও ১২ একক শ্রম, অথবা ৩ একক মূলধন ও ১৫ একক শ্রম ব্যবহার করিতে পারে। মূলধন ও শ্রমের এই তিনটি বিভিন্ন সংমিশ্রণ রেখাচিত্রের দ্বারা নির্দেশ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো যায়:



উপরের রেখাচিত্রে OX অক্ষরেখা শ্রমের এবং OY অক্ষরেখা মূলধনের পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। A, B ও C বিন্দুতে যথাক্রমে মূলধন ও শ্রমের তিনটি সংমিশ্রণ দেখানো হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে কোনটি সংমিশ্রণই ফার্ম ব্যবহার করুক না কেন, মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক সমান হইবে। সংমিশ্রণের বিন্দুগুলি (A,B,C) সংযুক্ত করিয়া যে IPC রেখা পাওয়া যায়, উহাকেই সম-উৎপন্ন রেখা বলে। উহাকে উৎপাদন নিরপেক্ষতা

রেখাও (Production Indifference Curve) বলা চলে। এই রেখায় অবস্থিত বিভিন্ন বিন্দুতে মূলধন ও শ্রমের যে বিভিন্ন সংমিশ্রণ গঠিত হইতে পারে উহাদের ব্যবহার দ্বারা উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ একই সমান হইবে।[১] এই রেখায় অবস্থিত বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি একই সমান পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে সক্ষম বলিয়া উৎপাদক ফার্মের কোন একটি সংমিশ্রণের প্রতি বিশেষ পছন্দ বা পক্ষপাত থাকে না। নিরপেক্ষতা-রেখায় যেমন দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ হইতে ভোগকারী সমান উপযোগ বা তৃপ্তি পায়, ঠিক সেইরূপ সম-উৎপন্ন রেখার বিন্দুগুলিতে দুইটি কারকের বিভিন্ন সংমিশ্রণ হইতে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই পরিমাণ উৎপন্ন পণ্য লাভ করে।

সম-উৎপন্ন রেখা কাহাকে বলে ?

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী পাশাপাশি একাধিক সম-উৎপন্ন রেখা আঁকা যায়। মূল রেখার বামদিকের রেখাগুলি নিম্নতর সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ ঐ রেখাগুলির উপর অবস্থিত সংমিশ্রণ দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। আর দক্ষিণদিকের রেখাগুলি উচ্চতর সংমিশ্রণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ ঐ রেখাগুলির উপর বিভিন্ন সংমিশ্রণ অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে সক্ষম। এইভাবে একই রেখাচিত্রে যখন একাধিক সম-উৎপন্ন রেখা পাশাপাশি সাজাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ কম-বেশি দেখানো হয়, তখন উহাকে সম-উৎপন্ন মানচিত্র (Iso-product Map) বলা চলে। একই সম-উৎপন্ন মানচিত্রের দক্ষিণে অবস্থিত রেখা বামদিকের রেখা অপেক্ষা বেশি উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করে। কিন্তু প্রত্যেকটি রেখার উপর গঠিত বিভিন্ন সংমিশ্রণ একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন নির্দেশ করে।

সম-উৎপন্ন মানচিত্র কি ?

সম-উৎপন্ন রেখার কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভোগকারীর নিরপেক্ষতা-রেখার সহিত বেশ তুলনা করা চলে। প্রথমত, সম-উৎপন্ন রেখা বাম হইতে ডানদিকে ও দক্ষিণে নিম্নমুখী। অর্থাৎ এই রেখার ঢাল ঋণাত্মক। দ্বিতীয়ত, বামদিকে অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখার

১. Liebhafsky: "An iso-quant, or iso-product curve is a contour line and represents the different combinations of two inputs with which a given amount of product can be produced."

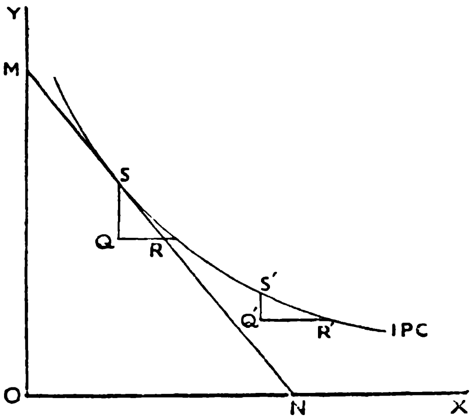
তুলনায় ডানদিকে অবস্থিত সম-উৎপন্ন রেখা অধিক পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করিয়া থাকে। তৃতীয়ত, সম-উৎপন্ন রেখা O বিন্দুর দিকে উত্তল (Convex to the point of origin O)। চতুর্থত, দুইটি সম-উৎপন্ন রেখা পরস্পরকে ছেদ কবিতে পারে না। সম-উৎপন্ন রেখার এই চারিটি বৈশিষ্ট্যই নিরপেক্ষতা বেখারও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নিবপেক্ষতা-বেখা ও সম-উৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এই সকল মিল থাকা সত্ত্বেও, রেখা দুইটির মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যটি এই যে, একটি নিরপেক্ষতা-রেখার উপর অবস্থিত বিন্দুগুলি হইতে যে সম-তৃপ্তি লাভ করা যায কিংবা বিভিন্ন নিরপেক্ষতা-রেখা যে স্বল্পতব বা অধিকতর তৃপ্তি নির্দেশ করে—তাহা পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু সম-উৎপন্ন রেখার উপর অবস্থিত প্রত্যেক বিন্দু যে উৎপাদন নির্দেশ করে তাহার পরিমাণ সঠিকভাবে জানা যায়।

সম-উৎপন্ন রেখার বৈশিষ্ট্য

কারকসমূহের পরিবর্তনের প্রান্তিক হার *
(Marginal Rate of Substitution of Inputs)

সম-উৎপন্ন রেখার দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, উহার ঢাল ঋণাত্মক এবং উহা দুইটি অক্ষরেখার উৎপত্তিস্থলের দিকে উত্তল। এই বৈশিষ্ট্য দুইটি বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের কারকসমূহের পরস্পর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার কাহাকে বলে, জানা প্রয়োজন। যদি কোন একটি কারক অপর একটি কারকের সম্পূর্ণ পরিবর্তক (perfect substitute) না হয়, তাহা হইলে একটি কারকের নিয়োগ কিছুটা হ্রাস এবং অপর কারকটির নিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি দ্বারা সমান পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। কোন একটি সম-উৎপন্ন রেখার উপর মোট উৎপন্ন অপরিবর্তিত রাখিয়া একটি কারকের নিয়োগ যেটুকু বাড়াইতে গেলে অপর কারকটির নিয়োগ যেটুকু কমাইতে হয়, তাহাকে ঐ কারক দুইটির পরস্পর পরিবর্তনের প্রান্তিক হার বলে। পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে কারকসমূহের পরিবর্তনের প্রান্তিক হারের প্রকৃতি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল :

* অনেকে ইহাকে পরিবর্তকতার কারিগরি প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Technical Substitution) বলেন।



উপরের চিত্রে সম-উৎপন্ন রেখা IPC-এর উপর কোন বিন্দু S দুইটি কারক X এবং Y-এর একটি সংমিশ্রণ নির্দেশ করিতেছে। এই সংমিশ্রণ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা যায়। S বিন্দু হইতে Y-কারকের পরিমাণ যদি SQ পরিমাণ কমানো যায় তাহা হইলে উৎপাদনের নির্দিষ্ট পরিমাণ একই রাখিবার জন্য X-এর নিয়োগ QR পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। এখন Y একক এবং X এককের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হইল $-\frac{\Delta Y}{\Delta X}$। অতএব S বিন্দুতে Y এবং X-এর মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হইবে $\frac{SQ}{QR}$। $\frac{SQ}{QR}$ আবার SR রেখার ঢাল অথবা MN রেখার (স্পর্শকের) ঢাল নির্দেশ করে। তাহা হইলে বলা চলে যে, সম-উৎপন্ন রেখার যে কোন বিন্দুতে দুইটি কারকের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ঐ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের সমান হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি, নিরপেক্ষতা-রেখায় দুইটি ভোগ্য পণ্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারও ঠিক একই ভাবে নির্ণয় করা হয়।

আবার ভোগীর নিকট দুইটি দ্রব্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার যেমন হ্রাস পায়, সম-উৎপন্ন রেখারও এই বৈশিষ্ট্য হইল, একটি কারকের (যেমন X-এর) নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে কারক দুইটির মধ্যে (X ও Y-এর মধ্যে) প্রান্তিক পরিবর্তনের হার হ্রাস পাইবে। কারক

দুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের হ্রাসের কারণ হইল উহাদেব অনিখুঁত বিনিময় যোগ্যতা (imperfect substitutability)। কারক দুইটির পরস্পর বিনিময়যোগ্যতা যত অনিখুঁত হইবে উহাদের মধ্যে প্রান্তিক পবিবর্তনের হারও তত বেশি কমিবে। সেইজন্য সম-উৎপন্ন রেখা যতই নিচে নামে উহার ঢাল কমিতে থাকে। পূর্বের চিত্রে S বিন্দুতে কারক দুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হারের তুলনায় S_1 বিন্দুতে প্রান্তিক পবিবর্তনের হার কম।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, S বিন্দুতে যদি Y-কারকটির নিয়োগ QS পরিমাণ কমাইতে হয়, তাহা হইলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক রাখিতে X-কারকটির নিয়োগ QR পরিমাণ বাড়ানো দরকার। এখন ধর, S বিন্দুতে X এবং Y কারক দুইটির প্রান্তিক উৎপন্ন যথাক্রমে MPx এবং MPy। তাহা হইলে Y কারকটির QS পরিমাণ নিয়োগ হ্রাস করিলে মোট উৎপাদন $QS \times MPy$ পরিমাণ হ্রাস পাইবে। আবার X এককটির নিয়োগ QR পরিমাণ রাডানোর ফলে মোট উৎপাদন $QR \times MPx$ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আমরা জানি, Y কারকটির নিয়োগ হ্রাস ও X-কারকটির নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনেব পরিমাণ একই থাকে। তাহা হইলে বলা চলে যে, Y-এককের নিয়োগ হ্রাসের দরুন মোট উৎপন্ন যতটুকু কমিবে, X-এককটির নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপন্ন ঠিক ততটুকুই বাড়িবে। সুতরাং

$$QS \times MPy = RQ \times MPx$$

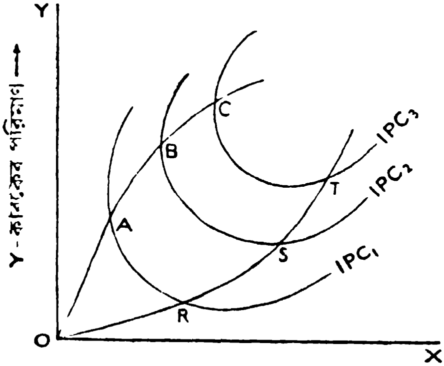
অথবা, $$\frac{QS}{RQ} = \frac{MPx}{MPy}$$

কিন্তু $\frac{QS}{RQ}$ হইল Y ও X কারক দুইটির মধ্যে পরিবর্তনের প্রান্তিক হার [পূর্বে দ্রষ্টব্য]। অতএব দুইটি কারক বা উপাদানের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের অনুপাতের সমান।

শৈলশিরা রেখা
(The Ridge Lines)

আমরা জানি যে, প্রত্যেক সম-উৎপন্ন রেখার উপর দুইটি কারকের বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বারা একই পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়। একটি সংমিশ্রণের পরিবর্তে আর একটি সংমিশ্রণ দ্বারা পণ্য উৎপাদন করিতে

হইলেই উৎপাদক ফার্মকে কারক দুইটির নিয়োগ ব্যাপারে পরিবর্তনের নীতি অনুসরণ করিতে হয়। অর্থাৎ একটি কারকের নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া উহার পরিবর্তে অপর একটি কারকের নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। তাহা বলিয়া প্রতিষ্ঠান সম-উৎপন্ন রেখার উপর অবস্থিত যে কোন সংমিশ্রণ দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করিলেই লাভ করিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, কোন্ সংমিশ্রণগুলি দ্বারা উৎপাদন লাভজনক। প্রত্যেক সম-উৎপন্ন রেখার উপর একটি করিয়া নির্দিষ্ট অঞ্চল আছে, কেবলমাত্র সেই অঞ্চলে অবস্থিত সংমিশ্রণ দ্বারা উৎপাদন করিলেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ হইয়া থাকে। এই অঞ্চলকে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-সম্ভাবনা অঞ্চল (Production-possibility area) বলে। সম-উৎপন্ন রেখার উপর উৎপাদন সম্ভাবনা অঞ্চল দুইটি সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এই দুইটি সীমারেখাকে শৈল-শিরা রেখা বলে। এই সীমারেখার বাহিরে অন্য কোন সংমিশ্রণ দ্বারা উৎপাদন করা লাভজনক নহে। সম-উৎপন্ন রেখার লাভজনক সংমিশ্রণগুলির সীমা নির্দেশ করিতে হইলে প্রথমে জানিতে হইবে রেখাটি কোন বিন্দুতে ভূমিতলের অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল আবার রেখাটি কোন বিন্দুতেই বা লম্ব অক্ষরেখাটির সহিত সমান্তরাল। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল, সম-উৎপন্ন রেখার কোন্ অংশে লাভজনক সংমিশ্রণগুলি অবস্থিত এবং দুইটি শৈলশিরা রেখা কি ভাবে ঐ অংশের সীমা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।



উপরের চিত্রে IPC_1, IPC_2 এবং IPC_3 তিনটি সম-উৎপন্ন রেখা। এই রেখা তিনটির উপর যথাক্রমে A, B ও C তিনটি বিন্দু। এই তিনটি বিন্দুতেই যথাক্রমে তিনটি সম-উৎপন্ন রেখার প্রত্যেকটিই OY অক্ষরেখার সমান্তরাল। সেইরূপ রেখা তিনটির উপর যথাক্রমে R, S ও T আর তিনটি বিন্দু। এই তিনটি বিন্দুতে যথাক্রমে তিনটি রেখার প্রত্যেকটি OX অক্ষরেখার সমান্তরাল। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, A বিন্দুর পর IPC_1 সম-উৎপন্নের রেখার বাম দিকে উপরের অংশে Y-কারকটির প্রান্তিক উৎপন্ন ঋণাত্মক। ঠিক সেইরূপ R বিন্দুর পর ডানদিকে উপরের অংশে কারকটির প্রান্তিক উৎপন্ন ধনাত্মক। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের পক্ষে A ও R বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের উপর অবস্থিত কারক দুইটির যে কোন সংমিশ্রণ নির্ধারণ করাই লাভজনক। সেইরূপ IPC_2 সম উৎপন্ন রেখার B ও S বিন্দুর মধ্যের অংশ এবং IPC_3 সম-উৎপন্ন রেখার C ও T বিন্দুর মধ্যের অংশ হইতে যে কোন সংমিশ্রণ বাছিয়া লইয়া উৎপাদন করা উচিত। এখন O বিন্দু হইতে যথাক্রমে দুইটি রেখাদ্বারা A, B ও C বিন্দু তিনটি এবং R, S ও T বিন্দু তিনটিকে যুক্ত করিলে যে দুইটি সীমারেখা পাওয়া যাইবে উহাকেই শৈলশিরা রেখা বলে। এখানে শৈলশিরা রেখা দুইটি হইল OABC এবং ORST।

সমব্যয়-রেখা
(Iso-cost Line)

ভোগকারী ও ক্রেতার বাজেট রেখার অনুকরণেই উৎপাদক ফার্মের সমব্যয়-রেখা অঙ্কিত হয়। প্রত্যেক ফার্মই কারকসমূহ ক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে বলিয়া স্থির করে। কারকগুলির বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা আছে ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে একটি ফার্ম নির্দিষ্ট দামে যত খুশি কারক কিনিতে পারে। মনে কর, X এবং Y এই দুইটি কারক কিনিবার মত ফার্মটির নিকট নির্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ আছে C। ফার্ম এই অর্থব্যয় করিয়া নির্দিষ্ট দামে X এবং Y কারক দুইটির বিভিন্ন সংমিশ্রণ কিনিতে পারে। X এবং Y-এর ইউনিট প্রতি দাম যদি যথাক্রমে Px বা Py দ্বারা সূচিত হয়, তাহা হইলে C

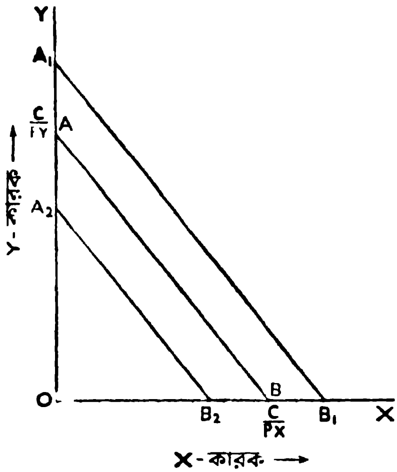
পরিমাণ অর্থব্যয়ে X ও Y-এর সম্ভাব্য ক্রয় ও নিয়োগের পরিমাণ এইরূপ সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :

মোট ব্যয় (C) = X-কারক ক্রয়ের ব্যয় + Y কারক ক্রয়ের ব্যয়

অথবা C = X-কারকসমূহ × ইউনিট প্রতি X-এর দাম + Y-কারকসমূহ × ইউনিট প্রতি Y-এর দাম

অথবা C = $X.Px + Y.Py$

ফার্মের এই ব্যয়-সমীকরণের যদি চিত্ররূপ দেওয়া হয় তাহা হইলেই সমব্যয়-রেখা পাওয়া যায়। সমব্যয়-রেখাকে উপাদান ব্যয়-রেখা (Factor-Cost line) কিংবা সোজাসুজি ব্যয়-রেখা (Outlay line)ও বলা চলে। নির্দিষ্ট বরাদ্দ অর্থব্যয়ে কোন ফার্মের পক্ষে নির্দিষ্ট দামে X এবং Y কারকের যত বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় ও নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে তাহার নির্দেশ সমব্যয়-রেখা হইতে পাওয়া যায়। নিচের চিত্রে সমব্যয়-রেখার আকৃতি দেখানো হইল :



উপরের চিত্রে X এবং Y এই দুইটি কারক ক্রয় ও নিয়োগ করা হইতেছে, দেখানো হইয়াছে। এই দুইটি কারকের উপর ফার্মের বরাদ্দ মোট ব্যয় হইতেছে C। কারক দুইটির ইউনিট প্রতি দাম যথাক্রমে Px এবং Py। ফার্মের বরাদ্দ মোট ব্যয় ও কারক দুইটির দাম একই আছে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন ফার্ম যদি কেবল X-কারকটি ক্রয় ও নিয়োগ করে,

তাহা হইলে X ক্রয়ের মোট পরিমাণ হইবে$\frac{C}{Px}$। আবার যদি কেবলমাত্র Y কারকটি ক্রয় করে, তাহা হইলে Y ক্রয়ের মোট পরিমাণ হইবে $\frac{C}{Py}$। এখন এই দুইটি বিন্দুকে একটি সরল রেখা দ্বারা যোগ করিলে AB সম-ব্যয় রেখা পাওয়া যায়। এই রেখার উপর যে কোন বিন্দু X ও Y কারক দুইটির কতটা ফার্ম কিনিতে সক্ষম তাহার ইঙ্গিত দিয়া থাকে। X ও Y উপাদান দুইটির দাম যদি অপরিবর্তিত থাকে, আর ফার্মের মোট বরাদ্দ ব্যয় যদি বাড়ে, তাহা হইলে নূতন আর একটি সমব্যয়-রেখা $A_1 B_1$ দ্বারা তাহা নির্দেশ করা যায়। এই রেখাটি মূল সমব্যয়-রেখার সমান্তরাল থাকিয়া ডানদিকে অবস্থান করিবে। এই উচ্চতর সমব্যয়-রেখাটি ফার্মের অধিকতর ব্যয় নির্দেশ করিয়া থাকে। আবার, কারক দুইটির দাম অপরিবর্তিত থাকিয়া, ফার্মের মোট বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ যদি কমে তাহা $A_2 B_2$ রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। এই রেখাটি মূল সমব্যয়-রেখা AB-র সমান্তরালে বামে থাকিবে এবং নিম্নতর ব্যয় নির্দেশ করিবে।

এখন X এবং Y কারক দুইটি পরস্পরের পরিবর্তক। একটি কারকের উপর ব্যয় আর একটি কারকের উপর ব্যয়ের পরিবর্তক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ফার্ম যখন এই দুইটি কারকের উপর ব্যয় করে তখন উহাদের মধ্যে ব্যয়ের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার (Marginal rate of outlay substitution between inputs) জানা যায় সমব্যয়-রেখার ঢাল দেখিয়া। উপরের চিত্রে AB সমব্যয়-রেখার ঢাল $=\frac{OA}{OB}$। ফার্ম যদি মোট অর্থ (C) X-কারক ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে X ক্রয়ের পরিমাণ হইবে $\frac{C}{Px}$, আর মোট অর্থ যদি Y-কারক ক্রয়ে ব্যয় করে তাহা হইলে Y ক্রয়ের পরিমাণ হইবে $\frac{C}{Py}$। অতএব AB সমব্যয়-রেখার ঢাল $=\frac{OA}{OB}$

$$=\frac{C}{Py} \div \frac{C}{Px} = \frac{Px}{Py}$$

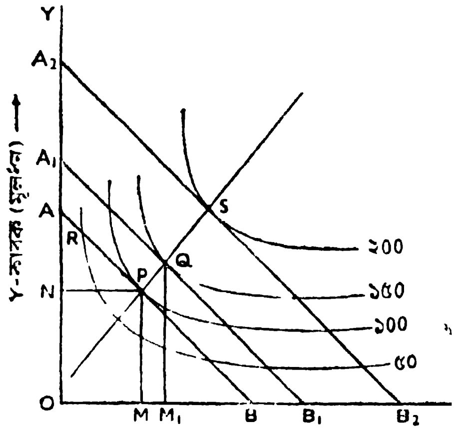
সুতরাং, Y ও X-এর মধ্যে ব্যয়ের প্রান্তিক পরিবর্তনের হার $=\frac{Px}{Py}$ । অর্থাৎ কারক দুইটির মধ্যে ব্যয়ের প্রান্তিক পরিবর্তনের অনুপাত এবং উহাদের দামের অনুপাত পরস্পর সমান হইবে।

উৎপাদনের ভারসাম্য : ফার্মের ন্যূনতম ব্যয়ের ভারসাম্য

(Producer's Equilibrium : Least-cost Combination)

ভোগকারীর ভারসাম্য যেমন সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ করিলে স্থাপিত হয়, ঠিক সেইরূপে সর্বনিম্ন ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করিলে উৎপাদক ফার্মের ভারসাম্য স্থাপিত হয়। তাহা হইলেই ফার্মের লাভ সর্বাধিক হইতে পারে।

ফার্ম কারক বা উপাদানের বিভিন্ন সংমিশ্রণ ক্রয় ও নিয়োগ দ্বারা একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। পণ্য উৎপাদনে যদি দুইটি কারক প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কারক দুইটিও উৎপাদন পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক সম-উৎপন্ন রেখা হইতে জানা যায়। সম-উৎপন্ন রেখা হইতে বুঝা যায়, কি বিভিন্ন সংমিশ্রণ দ্বারা ফার্ম একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু এই সংমিশ্রণগুলির যে কোনটি সর্বনিম্ন ব্যয়ের সংমিশ্রণ নয়। কোন্ সংমিশ্রণটি ন্যূনতম ব্যয়ের সংমিশ্রণ যাহা নিয়োগ করিলে ফার্মের উৎপাদন সর্বাধিক লাভের স্তরে পৌঁছিবে? আমরা নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি, উৎপাদক ফার্মের পক্ষে কোন্ সংমিশ্রণটি ন্যূনতম ব্যয়ের সংমিশ্রণ যাহা নিয়োগ করিলে ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছাইবে।



উপরে সম-উৎপন্ন মানচিত্রে চারিটি সম-উৎপন্ন রেখা আছে। রেখাগুলি যথাক্রমে ৫০, ১০০, ১৫০ ও ২০০ একক দ্রব্য নির্দেশ করিতেছে। AB হইল একটি সমব্যয়-রেখা। ইহা কারক বা উপাদান দুইটির (শ্রম ও মূলধনের) দাম নির্দেশ করিতেছে। কারক দুইটির দাম ও ফার্মটির বরাদ্দ

ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে ফার্মটি হয় OA পরিমাণ মূলধন কিনিতে পারে কিংবা OB পরিমাণ শ্রম কিনিতে পারে। P বিন্দুতে দুইটি কারকের সংমিশ্রণ কিনিয়া ফার্মটি ভারসাম্যে পৌঁছিয়াছে। P বিন্দুতে ফার্মটি উহার মোট বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করিয়া OM পরিমাণ শ্রম ও ON পরিমাণ মূলধন কিনিলে ন্যূনতম ব্যয় হইবে এবং সর্বাধিক উৎপাদন হইবে। P বিন্দুতে কারক দুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার এবং কারক দুইটির দামের মুনাফাও পরস্পর সমান হইবে। আবার, P বিন্দুতে AB সমব্যয়-রেখাটি সম-উৎপন্ন রেখাকে (১০০ এককের) স্পর্শ করিয়াছে। এই সম-উৎপন্ন রেখার যে কোন বিন্দু দিয়া গত সমব্যয়-রেখা AB সমব্যয় রেখাটির চেয়ে উচ্চতর। P বিন্দুতে সম-উৎপন্ন রেখার এবং সমব্যয়-রেখার ঢাল পরস্পর সমান। সম-উৎপন্ন রেখার যে কোন বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দুইটি কারকের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তন হারের সমান। আবার, আমরা জানি যে, দুইটি কারকের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার উহাদের প্রান্তিক উৎপন্নের অনুপাতের সহিত পরস্পর সমান। সুতরাং বলা চলে যে, ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় কারক দুইটির মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনের হার ও উহাদের দামের অনুপাত সমান। আবার, ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় কারক দুইটির প্রান্তিক উৎপন্নের অনুপাত এবং উহাদের দামের অনুপাত পরস্পর সমান।

নিম্নতর সম-উৎপন্ন রেখাতে (৫০ এককে) অবস্থিত R বিন্দুর ঢাল ঐ বিন্দুতে সম-ব্যয় রেখার ঢালের চেয়ে বেশি। সেইজন্য R উৎপাদক ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা নির্দেশ করে না।

ফার্ম যদি ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ায় তাহা হইলে সমব্যয়-রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে এবং ফার্ম নূতন ভারসাম্যে পৌঁছাইবে। A_1B_1 নূতন সমব্যয়-রেখা এবং Q নূতন ভারসাম্যের বিন্দু। এই নূতন ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্ম OM_1 পরিমাণ শ্রম ও QM_1 পরিমাণ মূলধনের সংমিশ্রণটি কিনিবে। ফার্মের ব্যয়বরাদ্দ আরও বাড়িয়া গেলে আবার নূতন সমব্যয়-রেখা হইবে A_2B_2 এবং নূতন ভারসাম্যের বিন্দু হইবে S। এখন P, Q ও S বিন্দু তিনটিকে সংযুক্ত করিলে যে OPQS রেখা পাওয়া যাইবে উহাকে উৎপাদন সম্প্রসারণ পথ (Expansion Path) বলা হয়। উৎপাদনের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ানো হইলে প্রতিবারে কোন্ বিন্দুতে কারকগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণ ঘটে সম্প্রসারণ পথ তাহার নির্দেশ দিয়া থাকে।

১৬ | উৎপাদন ব্যয়
(Cost of Production)

প্রত্যেক উৎপাদক ফার্মের লক্ষ্যই সর্বাধিক পরিমাণে মুনাফা অর্জন করা। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে হইলে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা প্রয়োজন তাহা ফার্ম নির্ধারণ করে দুইটি বিষয় মিলাইয়া দেখিয়া—এক, পণ্যের বাজার-দাম আর এক, উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট ব্যয়। বাজার-দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতেই বাজারে পণ্য যোগান নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে কিরূপে নানাভাবে ইহা ফার্মের পণ্য যোগানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটি তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে : (১) আর্থিক ব্যয়, (২) প্রকৃত ব্যয় এবং (৩) সুযোগ-ব্যয়।

উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়
(Money Cost of Production)

কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে গেলে বিভিন্ন উপাদান বা কারক নিয়োগ করিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে যে পরিমাণে বিভিন্ন কারক কিনিতে হয় তাহার দরুন ফার্মকে যে মোট অর্থ ব্যয় করিতে হয় উহাই ঐ দ্রব্য উৎপাদনের মোট আর্থিক ব্যয়। উৎপাদনের জন্য যে সকল বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করিতে হয় সেই সকল খাতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় উহাই উৎপাদন ব্যয়।

উৎপাদনের ব্যয় বলিতে কতকগুলিকে স্পষ্ট (explicit) ব্যয়, আবার কতকগুলিকে গূঢ় (implicit) ব্যয় বলা চলে। যে সকল কারক সরাসরি কিনিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হয় উহাদের দরুন যে অর্থ ব্যয় হয় উহাকে স্পষ্ট ব্যয় বলে। যেমন, জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা, মূলধন নিয়োগের জন্য সুদ, শ্রমের পারিশ্রমিক হিসাবে মজুরি প্রভৃতি খাতে যে অর্থ ব্যয় করিতে হয় উহাই স্পষ্ট ব্যয়। ইহা ছাড়া কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ব্যয়, স্থায়ী মূলধনের

উৎপাদনের ব্যয় বলিতে কি বুঝায় ?

ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় (depreciation charges), বিজ্ঞপ্তির দরুন ব্যয়, উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা প্রভৃতি বাবদ ব্যয়গুলি স্পষ্ট উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু আবার কতকগুলি খাতে ব্যয় আছে যাহাকে স্পষ্ট ব্যয় বলা চলে না। যেমন, উদ্যোক্তা যদি তাহার নিজের মূলধন, নিজের জমি প্রভৃতি উৎপাদনে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে যথাক্রমে ঐ মূলধনের সুদ কিংবা ঐ জমির খাজনা বাবদ ব্যয় স্পষ্ট আর্থিক ব্যয় বলিয়া ধরা যায় না। এই ধরনের কারকগুলি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় সত্য, কিন্তু যেহেতু উহাদের বাজার হইতে কিনিয়া ব্যবহার করিতে হয় নাই, সেইজন্য উহাদের দরুন যে ব্যয় হয় সেগুলিকে অপ্রকাশিত বা গূঢ় ব্যয় বলা হয়।

লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে, অর্থনীতিবিদ্‌গণ উৎপাদনের আর্থিক ব্যয় বলিতে স্পষ্ট এবং গূঢ় সকল প্রকার ব্যয়কেই ধরিয়া থাকেন। কিন্তু হিসাব-রক্ষকগণ (Accountants) কেবলমাত্র স্পষ্ট ব্যয়কে আর্থিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়
(Real Cost of Production)

সাধারণ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের পণ্য যোগান উৎপাদনের আর্থিক ব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ উৎপাদন ব্যয়ের আর্থিক বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয় উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন কারককে পণ্য উৎপাদন করিবার সময় যে প্রচেষ্টা করিতে হয়, যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, যে অপযোগ ঘাড়ে লইতে হয় তাহা পরিমাপ করা অর্থ ব্যয় (money cost) দ্বারা সম্ভব নহে। স্বল্পকালে অনেক সময় দেখা যায়, হয়তো কোন কারক এত অল্প-দামে নিয়োগ লাভ করিতেছে যে, উহা ঐ কারকের কর্মপ্রচেষ্টার অনুরূপ দাম আদৌ নহে। সেইজন্য উৎপাদনের ব্যয় বলিতে প্রকৃত ব্যয় বুঝিতে হয়। উৎপাদন করিতে বিভিন্ন কারকগুলির যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় উহার সমষ্টিকে উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয় বলা হয়। শ্রমিক শ্রম করিতে যে পীড়া অনুভব করে, মূলধনের মালিকের পুঁজি সঞ্চয় করিতে যে বর্তমান

মিতাচারের প্রয়োজন হয়, উদ্যোক্তা ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া অনিশ্চয়তা ভোগ করে—এই সকল প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বিভিন্ন কারকগুলিকে যে অর্থমূল্য দেওয়া হয় উহাই উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়।

কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের তত্ত্বটি একাধিক কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। এ কথা সত্য যে, যখন কোন কারক উৎপাদনে নিয়োগ লাভ করে তখন উহাকে অনেক রকম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, পীড়াদায়ক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু এই ত্যাগ বা পীড়া কারকের সম্পূর্ণ মনোগত ব্যাপার। অর্থের মানদণ্ডে ইহা পরিমাপ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, অনেক কাজ আছে যাহা কেবল পীড়াদায়কই নহে, বিপজ্জনকও বটে। এই সকল কাজের প্রকৃত ব্যয় বেশি হওয়া উচিত অথচ কার্যত উহাদের পারিশ্রমিক খুবই সামান্য। আবার অনেক উচ্চ পারিশ্রমিকের কাজ আছে যাহা আরামদায়ক এবং বিপদ-মুক্ত। প্রকৃত ব্যয়ের তত্ত্বে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে যে কাজ যত কম পীড়াদায়ক ও কম বিপজ্জনক, সে কাজের পারিশ্রমিক তত কম হওয়া উচিত। আবার, যে কাজ যত বেশি পীড়াদায়ক ও বিপজ্জনক, সে কাজের পারিশ্রমিক তত বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তৃতীয়ত, প্রকৃত ব্যয়ের তত্ত্ব অনুসারে জমির কোন প্রকৃত ব্যয় নাই। জমি প্রকৃতির দান। ইহার যোগানে কাহাকেও কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, জমির যদি কোন প্রকৃত ব্যয় না-ই থাকিবে তাহা হইলে খাজনা কি কারণে দেওয়া হয়।

প্রকৃত ব্যয়-তত্ত্বের সমালোচনা

সুযোগ-ব্যয়
(Opportunity Cost)

প্রকৃত ব্যয়ের তত্ত্ব অসম্ভব বলিয়া আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ সুযোগ-ব্যয় বলিয়া উৎপাদন ব্যয়ের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্বকে ক্ষেত্রান্তর ব্যয় (Transfer Cost) কিংবা বিকল্প ব্যয়ও (Alternative Cost) বলা হইয়া থাকে।

উৎপাদনের উপাদান বা কারকগুলির যোগান উহাদের চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ। উহারা আবার একাধিক বিকল্প কাজে ব্যবহৃত হইতে

পারে। উৎপাদনের কোন একটি ক্ষেত্রে যদি কতকগুলি কারক ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ঐ সকল কারক নিয়োগ করার সুযোগ থাকে না। উৎপাদনের একটি ক্ষেত্রে কোন কারকসমষ্টি ব্যবহার করা হইলে ঐ ক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন করা চলে না। এক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারকগুলি ব্যবহারের অর্থই অন্য বিকল্প ক্ষেত্রগুলিকে উহাদের ব্যবহারের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা। মনে কর, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি, মূলধন, শ্রম প্রভৃতি দ্বারা একটি শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলা যায়, কিংবা ৪ খানা বাসোপযোগী বাড়িও নির্মাণ করা চলে। এখন নির্দিষ্ট কারকগুলি যদি প্রকৃতপক্ষে একটি কারখানা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ৪ খানা বাসোপযোগী বাড়ি নির্মাণে উহাদের আর নিয়োগের সুযোগ থাকিবে না ; বাড়ি নির্মাণের সুযোগ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলে কারখানা নির্মাণের প্রকৃত ব্যয় হইবে ৪খানা বাসোপযোগী বাড়ি নির্মাণের যাহা খরচ হইতে পারিত তাহাই। যাহা উৎপাদন করা হইল তাহার ব্যয় হইবে যাহা উৎপন্ন হইল না কিন্তু হইতে পারিত তাহার মূল্য।[১] টাকা পয়সার মাধ্যমে এই ব্যয় প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় : কারখানাটির দাম যদি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা হয় এবং ৪ খানি বাড়ির মূল্য যদি ২ লক্ষ টাকা হয়, তাহা হইলে কারাখানাটি নির্মাণের ব্যয়ও (উৎপাদন ব্যয়) ২ লক্ষ টাকাই ধরিতে হইবে। কারখানাটি যদি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা না হয় তাহা হইলে উপাদানগুলি ৪ খানা বাড়ি নির্মাণে নিযুক্ত হইত, কেননা, ঐ ৪ খানা বাড়ি নির্মাণ করিলে, উহারা ঐ ২ লক্ষ টাকা আয় উপার্জন করিতে পারিত। উপাদান বা কারকগুলি ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কারখানা নির্মাণে ব্যবহৃত না হইলে নিকটতম পরবর্তী বিকল্প ব্যবহারের (Next best alternative) ক্ষেত্রে ৪ খানা বাড়ি তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হইতে পারিত। সুতরাং, বিকল্প ব্যবহারে উপাদানগুলি নিয়োগ লাভ করিলে যে মোট দাম পাইতে পারিত তাহাই কারখানা নির্মাণের সুযোগ-ব্যয় দাঁড়াইল।

উৎপাদনের বিভিন্ন বিকল্প ক্ষেত্র হইতে কারকগুলিকে সরাইয়া আনিয়া একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ করিয়া কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে

১. "Cost of the born is the unborn."

উহাদের যে পরিমাণ অর্থমূল্য দিতে হয় তাহাই হইল ঐ দ্রব্য উৎপাদনের সুযোগ-ব্যয়।) যে কোন কারকের বেলায়ই বলা যায় যে, কোন একটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উহা কাজ করিতে রাজী হইবে না, যদি না উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে উহা যাহা উপার্জন করিতে পারিত কম পক্ষে সেই অর্থমূল্য দেওয়া হয়। একজন শ্রমিক পাটকলে কাজ করিতে পারে আবার চিনির কলেও কাজ করিতে পারে। তাহাকে যদি পাটকলে কাজে লাগাইতে হয় তাহা হইলে চিনির কলে সে যাহা পাইতে পারে কমপক্ষে সেই পরিমাণ মজুরি দিতে হইবে। একখণ্ড জমিতে ধান উৎপাদন করা যায়, আবার ইক্ষুও উৎপাদন করা যায়। ঐ জমি হইতে ধান তুলিতে হইলে ইক্ষু উৎপাদনের জন্য ঐ জমি ব্যবহার করিলে যে দাম দিতে হইত কমপক্ষে সেই মূল্য দিতে হইবে। কোন ব্যবসায়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে কম পক্ষে সেই পরিমাণ সুদ দিতে হইবে অন্যান্য ক্ষেত্রে মূলধন নিয়োগের জন্য যে সুদ দিতে হয়। একজন উদ্যোক্তাকে কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইলে কমপক্ষে সেই পবিমাণ পারিশ্রমিক দিতে হইবে যাহা সে বেতনভুক পরিচালক হিসাবে বিকল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে পাইতে পারে। এইভাবে দেখা যায় যে, উৎপাদনের উপাদানগুলি অন্যান্য বিকল্প নিয়োগে যে অর্থমূল্য পাইতে পারে উৎপাদনের কোন একটি ক্ষেত্রে উহাদের নিয়োগের জন্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে সেই মূল্যই দিতে হয়। উপাদানগুলির বিকল্প নিয়োগের জন্য যে মূল্য দিতে হইতে পারে তাহাই প্রতিষ্ঠানটির সুযোগ-ব্যয়। অর্থাৎ সুযোগ-ব্যয় হইতেছে উপাদানগুলিকে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখিবার দাম।[১]

উপাদানগুলিকে কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত রাখিবার দাম হইতেছে সুযোগ-ব্যয়

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্বটি কেবল উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটির প্রতিফলন দেখা যায়। ভোগকারী যখন তাহার সীমিত আয় একাধিক বিকল্প দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, বিনিয়োগকারিগণ যখন বিনিয়োগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে কোন একটি ক্ষেত্রকে বাছিয়া লয়, সঞ্চয়কারিগণ যখন বর্তমান

১. Benham : "Prices reflect opportunity costs."

ভোগ কিছুটা কমাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে সঞ্চয় করে—এই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখন সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্বটির কার্যকারিতা দেখা যায়।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইলেও সুযোগ-ব্যয়ের ধারণাটির কতকগুলি সীমাবদ্ধতা (limitation) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ধারণাটি কেবলমাত্র নিখুঁত প্রতিযোগিতার অবস্থাতেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকিলে দাম সুযোগ-ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। কেন না, নিখুঁত প্রতিযোগিতার অভাবে বাজার-দাম প্রান্তিক ব্যয়ের বেশি বা কম হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের যে সকল ক্ষেত্রে উপাদানগুলি বিশেষভাবে বিশেষীকৃত (specific) হইয়া থাকে, সে সকল ক্ষেত্রে সুযোগ-ব্যয়ের তত্ত্বটি প্রযোজ্য হইতে পারে না। একটি উপাদান তখনই বিশেষীকৃত হয়, যখন উহা কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে, অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। যে উপাদানটির বিকল্প ব্যবহারের কোন সুযোগ নাই, উহার কোন সুযোগ-ব্যয়ও নাই। তৃতীয়ত, সুযোগ-ব্যয় ধারণাটির আর একটি সীমাবদ্ধতা এই যে, ইহা পরোক্ষভাবে মানিয়া লইয়াছে যে, অর্থদ্বারা দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করা সম্ভব। যে সকল দ্রব্য একে অন্যের পরিবর্তক নয়, উহাদের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে দ্রব্যগুলির উপযোগ পরিমাপ করিতে হয়। দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করিতে হইলেই অর্থের মানদণ্ড ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সুযোগ-ব্যয়ের সীমাবদ্ধতা

সময়-কালের বিভাগ ও উহাদের গুরুত্ব

(Classification of Time Periods and their Importance)

কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় একাধিক বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ উহার উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্য ঘটাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে আবার সময়ের তারতম্যানুসারে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করা যতটা সম্ভব, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা তাহার চেয়ে বেশি সম্ভবপর। সময়ের তারতম্য অনুসারে যেমন ফার্মের উৎপাদনের

পরিমাণ কম-বেশি হইতে পারে, তেমনি উৎপাদন ব্যয় ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা সময়কালের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অধ্যাপক মার্শাল সময়-কালকে চারিটি ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহাদের প্রত্যেকটির পর্যায়ে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন ব্যয়, ভারসাম্যের অবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম হয়। মার্শাল প্রদত্ত চারিটি সময়-কাল হইল :

১। **অতিস্বল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল** (The Very Short-run or Market Period): অতিস্বল্পকালীন সময়ে কোন ফার্মের পক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা একেবারেই সম্ভব নহে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য উৎপাদন ও যোগানের পরিমাণ একেবারে অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতির কোনই পরিবর্তন করিতে পারে না। কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না।

২। **স্বল্পকালীন সময়** (The Short-run): এই সময়ে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু ফার্মের উৎপাদনের মাত্রা (scale of production) পরিবর্তন করা যায় না। কয়েকটি পরিবর্তনীয় (variable) উপাদান, যেমন, শ্রম, কাঁচামাল প্রভৃতির নিয়োগ ও হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা উৎপাদন পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কৌশল প্রভৃতি স্থায়ী কারকগুলির পরিবর্তন দ্বারা উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানো-কমানো সম্ভব হয় না। এই সময়ে শিল্পে নিযুক্ত উৎপাদক ফার্মগুলির সংখ্যাও পরিবর্তন করা যায় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন করা না গেলেও, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার সীমার মধ্যে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

৩। **দীর্ঘকালীন সময়** (The Long-run): দীর্ঘকালীন সময় বলিতে সেই সময়-কাল বুঝায় যখন প্রতিষ্ঠান সমস্ত উপাদানগুলির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে। এই সময়-কাল এতটা দীর্ঘ যে, তখন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি কারকসমষ্টির পরিবর্তন ঘটাইয়া উৎপাদন ক্ষমতা ও মোট উৎপন্নের সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন করিতে পারে। দীর্ঘকালে উৎপাদনের কোন উপাদান বা কারকগুলি স্থির

বা অপরিবর্তনীয় থাকে না। ফলে, উৎপাদনের সকল ব্যয়ই স্থির না হইয়া পরিবর্তনীয় হইয়া থাকে। একটি শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে, এই সময়ে শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির সংখ্যাও হ্রাস-বৃদ্ধি করা চলে।

৪। **অতি দীর্ঘকালীন সময়** (The Very Long-run): এই সময়ে সাধরণতঃ যুগব্যাপী (secular) হইয়া থাকে। এই সময় এত দীর্ঘ যে, তখন উৎপাদনের উপাদানগুলির সকল রকম পরিবর্তন দ্বারা দ্রব্যের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা হয়, তখন সাধারণত সময়ের ভিত্তিতে উৎপন্ন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

স্বল্পকালীন ব্যয়
(Short-run Costs)

স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনের পরিমাণ বাডাইতে বা কমাইতে হইলে শ্রম, কাঁচামাল, বিভিন্ন শক্তি প্রভৃতি কারকের ব্যবহার বাড়াইতে-কমাইতে হয়। এই সকল পরিবর্তনীয় কারকগুলির হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আবার, স্বল্পকালে যন্ত্রপাতি প্রভৃতি কতকগুলি কারকের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এই সকল স্থির কারক ব্যবহারের দরুন যে ব্যয় হয় তাহার কোন তারতম্য ঘটে না, অপরিবর্তনীয় বা স্থিরই থাকিয়া যায়। সুতরাং, স্বল্পকালে উৎপাদক ফার্মের মোট ব্যয়কে মোট স্থির বা অপরিবর্তনীয় ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় এই দুই-ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ Short-run Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost। স্থির ব্যয়কে গঠন কিংবা পরোক্ষ ব্যয় (Supplementary or Overhead Cost) এবং পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মুখ্য কিংবা প্রত্যক্ষ ব্যয়ও (Prime or Direct Cost) বলা হইয়া থাকে। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে ব্যয়গুলির স্বল্পকালে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না উহাই স্থির, অপরিবর্তিত, গৌণ বা পরোক্ষ ব্যয়।[১] স্থির ব্যয়ের

স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয়

১. Benham: "The fixed costs of a firm are those costs that do not vary with the size of its output."

দৃষ্টান্ত হিসাবে খাজনা, উচ্চতম স্থায়ী কার্যকারিগণের বেতন, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ খরচ, প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা ইত্যাদি ধরা যায়। কোন প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালে যদি কিছুকাল অলসও বসিয়া থাকে তাহা হইলেও উহাকে স্থির ব্যয় করিতে হইবে। সুতরাং স্থির ব্যয় কখনও শূন্য হইতে পারে না। অপর পক্ষে, স্বল্পকালে উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যয়গুলির হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন ঘটে উহাই পরিবর্তনীয়, মুখ্য বা প্রত্যক্ষ ব্যয়। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকিলে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলিয়া কিছু থাকে না। পরিববর্তনীয় ব্যয় শূন্য হয়।[১] পরিবর্তনীয় ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি, পরিবহন খরচ, কাঁচামালের দাম, বিদ্যুৎ বা অন্যান্য শক্তির খরচ ইত্যাদি।

স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের গুরুত্ব

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয়ের এই পার্থক্য সকল অবস্থাতে কার্যকর হয় না। কেবলমাত্র স্বল্পকালীন সময়ে এই পার্থক্যটি খাটে, দীর্ঘকালীন সময়ে ইহা খাটে না। স্বল্পকালে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি পরিবর্তন করিতে পারে না। সেইজন্য এইসকল কারকগুলি নিয়োগের দরুন প্রতিষ্ঠানকে যে ব্যয় করিতে হয় উহাকে স্থির ব্যয় বলা হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে প্রতিষ্ঠান সকল কারকের পরিবর্তন করিয়া উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। দীর্ঘকালে কারকসমূহ পরিবর্তন করা যায় বলিয়া উৎপাদনের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয়। সেইজন্য দীর্ঘকালে স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

অনেক সময় স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট নহে। কোন্ খরচ স্থির ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে অথবা পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা নীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। সাধারণত অস্থায়ী শ্রমিকের পারিশ্রমিক পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান

১. Samuelson : "By definition, variable costs are zero when no output is being produced. But they change with quantity."

যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি-আবদ্ধ হইয়া শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণে উৎপাদন স্থগিত রাখিলেও ঐ প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকের মজুরি চুক্তি অনুযায়ী দিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের পারিশ্রমিক স্থির ব্যয়ের মধ্যেই ধরিতে হয়।

স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে বলা চলে যে, স্থির ব্যয় কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন সময়েই প্রকৃত ব্যয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।[১] স্বল্পকালীন অবস্থায় স্থির ব্যয় উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। স্বল্পকালে উৎপাদন যদি কম-বেশি হয় কিংবা কিছুকালের জন্য বন্ধও থাকে, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয় থাকিবেই। স্বল্পকালে পণ্যের দাম হইতে মোট ব্যয় (স্থির + পরিবর্তনীয়) না-ও উঠিয়া আসিতে পারে। এ অবস্থায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে না; কেন না, উৎপাদন বন্ধ রাখিলেও প্রতিষ্ঠানকে স্থির ব্যয় বহন করিতেই হইবে। সুতরাং, স্বল্পকালে প্রতিষ্ঠান যদি দেখে যে, পণ্যের দাম হইতে উহার মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং সামান্য স্থির ব্যয় উঠিয়া আসিতেছে, তাহা হইলে উৎপাদন বন্ধ করার চেয়ে সামান্য লোকসান দিয়াও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন চালাইয়া যাইবে। স্বল্পকালে প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনীয় ব্যয় দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া থাকে। বাজার-দাম হইতে পরিবর্তনীয় ব্যয় উঠিয়া আসিলেই বর্তমানে ক্ষতি স্বীকার করিয়া ও ভবিষ্যৎ লাভের আশায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন চালু রাখিবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় পণ্যের দাম হইতে প্রতিষ্ঠানকে মোট ব্যয় উশুল করিতেই হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদনের স্থির ব্যয় যদি পণ্যের দাম হইতে না উঠিয়া আসে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান টিকিতে পারে না, উৎপাদন বন্ধ করিতে হয়। দীর্ঘকালেই স্থির ব্যয় দামকে প্রভাবিত করিয়া থাকে; সেইজন্য দীর্ঘকালীন অবস্থায় স্থির-ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হইয়া দাঁড়ায়। দীর্ঘ কালে সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় বলিয়া গণ্য হয়। দীর্ঘকালে মোট ব্যয় পণ্যের যোগান ও বাজার-দামকে প্রভাবান্বিত করে।

১. Cairncross: "In the long period overhead costs are true cost."

গড় মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়
(Average Total Costs, Average Fixed Costs and Average Variable Costs)

দ্রব্যের একক প্রতি উৎপাদনের ব্যয়কে গড় মোট ব্যয় বা সংক্ষেপে গড় ব্যয় বলে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয়কে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলেই গড় ব্যয় পাওয়া যায়। গড় মোট ব্যয় আবার গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় যোগ দিয়াও পাওয়া যায়। অর্থাৎ Average Total Costs (ATC) = Total Cost (TC) ÷ Output (Q) অথবা Average Fixed Cost + Average Variable Cost (AFC + AVC)।

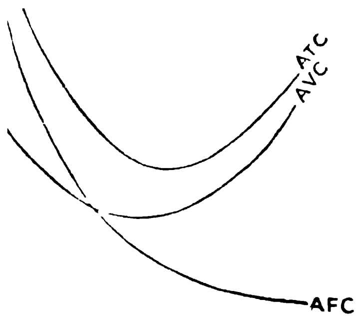
মোট স্থির ব্যয়কে যদি উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করা যায় তাহা হইলে গড় স্থির ব্যয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ Fixed Cost (FC) ÷ Output (Q) = Average Fixed Cost (AFC)।

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ Variable Cost (VC) ÷ Output (Q) = Average Variable Cost (AVC)। পরপৃষ্ঠায় সারণীতে গড় মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় কি ভাবে নির্ণয় করা যায়, উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হইল। পরপৃষ্ঠায় সারণীর তথ্যগুলি দেখিয়া বিভিন্ন প্রকারের গড় ব্যয়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যায়। ৩নং কলম লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গড় স্থির ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমিতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, উৎপাদনের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, উহার মোট স্থির ব্যয় একই পরিমাণ থাকে। একই পরিমাণ স্থির ব্যয় ক্রমশ অধিক পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ভাগ হইয়া যাওয়ার ফলে দ্রব্যের একক প্রতি স্থির ব্যয় ক্রমাগত হ্রাস পায়। ৫নং কলমে দেখা যায় যে, কিছু পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি পর্যন্ত গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় কমিয়াছে কিন্তু আবার উহা বাড়িয়াছে। গড় মোট ব্যয় ও (৭নং কলমে) গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের ন্যায় উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত প্রথমে হ্রাস পাইতে থাকে ; তাহার পর উৎপাদনের একটি স্তরে ন্যূনতম হয় ; পরে আবার উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় কমিয়াছে

১ উৎপন্নের মোট পরিমাণ (Q)	২ মোট স্থির ব্যয় (FC) (টাকা)	৩ গড় স্থিয় ব্যয় $\left(AFC=\frac{FC}{Q}\right)$ টাকা *	৪ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (VC) টাকা	৫ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় $\left(AVC=\frac{VC}{Q}\right)$ টাকা	৬ মোট ব্যয় (TC = FC + VC) টাকা	৭ গড় মোট ব্যয় $\left(ATC=\frac{TC}{Q}\right)$ টাকা
১০	১০	১'০০	২	'২০	১২	'২০
২২	১০	০'৪৫	৪	'১৮	১৪	০'৬৩
৩৬	১০	০'২৮	৬	'১৭	১৬	০'৪৫
৫২	১০	০'১৯	৮	'১৫	১৮	০'৩৪
৬৬	১০	০'১৫	১০	'১৫	২০	০'৩০
৭৬	১০	০'১৩	১২	'১৬	২২	০'২৯
৪২	১০	০'১২	১৪	'১৭	২৪	০'২৯
৪৫	১০	০'১২	১৬	'১৯	২৬	০'৩১
৪৫	১০	০'১২	১৮	'২১	২৮	০'৩৩
৪৩	১০	০'১২	২০	.২৩	৩০	০'৩৫

ততক্ষণ পর্যন্ত গড় মোট ব্যয়ও কমিয়াছে। যে স্তরে আসিয়া গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় একই সমান পরিমাণে কমে, সেই স্তরে গড় মোট ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। এই স্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় উহাকে সর্বাধিক কাম্য উৎপন্ন (optimum output) বলে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত গড় স্থির ব্যয় কমিতে থাকিলেও এক সময় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে থাকে।

যতক্ষণ পর্যন্ত গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাসের পরিমাণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধির পরিমাণের চেয়ে বেশি হয় ততক্ষণ গড় মোট ব্যয় কমিতেই থাকে। কিন্তু উৎপাদনের যে অবস্থায় গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাসের পরিমাণ অপেক্ষা গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ বেশি হয়, তখন গড় মোট ব্যয় বাড়িতে শুরু করে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় মোট ব্যয়ের আকৃতি দেখানো হইল :



উৎপন্নের পরিমাণ ⟶

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গড় স্থির ব্যয়ের রেখাটি সম-পরাবৃত্তের (rectangular hyperbola) আকৃতি গ্রহণ করে। গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড় মোট ব্যয়ের আকৃতি ইংরেজী U-এর আকৃতিবিশিষ্ট (U-shaped) হয়। এই রেখা দুইটিতে দেখা যায় যে, পরিবর্তনীয় ব্যয় ন্যূনতম স্তরে পৌঁছাইবার পর গড় মোট ব্যয় নিম্ন স্তরে পৌঁছাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, উৎপাদনের একটা স্তরে গড় স্থির ব্যয়ের হ্রাসের পরিমাণ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধির পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হইতে পারে।

প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়
(Marginal Cost and Average Cost)

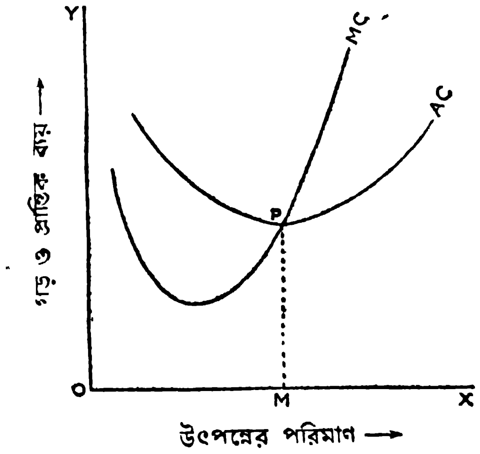
এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে তাহার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাহাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট ব্যয় যে পরিমাণে বাড়ে তাহাই প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়। মনে কর, কোন প্রতিষ্ঠান ২০৲ টাকা মোট ব্যয়ে ২ একক দ্রব্য উৎপাদন করে। যদি ৩ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ২২৲ টাকা পড়ে তাহা হইলে তৃতীয় এককের প্রান্তিক ব্যয় ২৲ টাকা হইবে। মোট ব্যয় কতটা বাড়ে তাহাই প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করিয়া থাকে। গড় মোট ব্যয় কিংবা গড় স্থির ব্যয়ের বৃদ্ধি কতটা হয় তাহা প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করে না। দ্রব্যের উৎপাদন এক একক বৃদ্ধি করিলে স্থির ব্যয় বাড়ে না, পরিবর্তনীয় ব্যয়ই বাড়িয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রান্তিক ব্যয় এবং ~~এবং~~ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এক নহে। এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় কতটা বৃদ্ধি পায়, প্রান্তিক ব্যয় উহাই পরিমাপ করে। কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়

মোট উৎপন্নের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC) (টাকায়)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$ (টাকায়)	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta C}{\Delta Q}$ (টাকায়)
১	১০৫০৲	১০৫০৲	
২	১০৯০৲	৫৪৫৲	৪০৲
৩	১১৩২৲	৩৭৭৩৲	৪২৲
৪	১১৭৬৲	২৯৪৲	৪৪৲
৫	১২২৫৲	২৪৫৲	৪৯৲
৬	১৩০০৲	২১৬·৭৲	৭৫৲
৭	১৪২০৲	২০২·৯৲	১২০৲
৮	১৫৮৪৲	১৯৮৲	১৬৪৲
৯	১৭৮২৲	১৯৮৲	১৯৮৲
১০	২০২০৲	২০২৲	২৩৮৲

নির্ধারণ করা হয় মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়কে মোট উৎপন্নের পরিমাণদ্বারা ভাগ করিয়া। উপরের সারণীতে মোট ব্যয়, গড় ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হইল।

প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সম্পর্ক

উপরের সারণীতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, গড় ব্যয় যেমন উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত কমে, সেইরূপ প্রান্তিক ব্যয়ও প্রথমে কিছুদূর অবধি, কমে। আবার, গড় ব্যয় যেমন কিছু-দূরের পর বাড়ে, প্রান্তিক ব্যয়ও নির্দিষ্ট সীমায় তেমনি বাড়িয়া থাকে। ফলে, প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের ন্যায় U-এর আকৃতিবিশিষ্ট হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় যতক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয়ের চেয়ে কম থাকে ততক্ষণ গড় ব্যয় কমিতে থাকে। অর্থাৎ গড় ব্যয় উৎপাদনের যে স্তর অবধি কমিতে থাকে, সে স্তর অবধি প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম থাকে। তৃতীয়ত, গড় ব্যয় বাড়িতে থাকিলে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। আবার উৎপাদনের যে স্তরে গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়, সেখানে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হইয়া দাঁড়ায়। সর্বনিম্নের বিন্দুতে গড় ব্যয় স্থিতি লাভ করে, বাড়েও না, কমেও না। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক আরও ভালভাবে প্রকাশ করা যায় :



১. Samuelson : "Marginal Cost represents the change in the total costs when we produce as extra unit of output."

উপরের চিত্রে OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন অবধি গড় ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। OM অবধি প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম। MP বিন্দুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। এই বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন। সেইজন্য প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের রেখার নিচে রহিয়াছে। এই বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের রেখাকে নিচ হইতে ছেদ করিয়া উপরে উঠিবে। OM পরিমাণের চেয়ে উৎপাদন যদি আরও বাড়ানো যায়, তাহা হইলে গড় ব্যয় বাড়িতে থাকিবে। এই পর্যায়ে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। সেইজন্য প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা গড় ব্যয়ের রেখার উপরে থাকিবে।

দীর্ঘকালীন ব্যয়
(Long-run Cost)

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক ফার্ম উহার উৎপাদন ক্ষমতার যেরূপ ইচ্ছা পরিবর্তন করিতে পারে। দীর্ঘকাল বলিতে এমন দীর্ঘ সময় বুঝায় যখন ফার্ম উৎপাদনের সকল কারকগুলির পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। স্বল্প-কালীন সময়ে ফার্মের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে; সময়ের অভাবে বাড়ানো-কমানো সম্ভব হয় না। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মের আয়তন, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি প্রভৃতি সকল উপকরণগুলি বাড়ানো-কমানো সম্ভব হয়। উৎপাদনের সকল কারকগুলির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব হয় বলিয়া দীর্ঘকালে ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়
(Long-run Average Cost)

স্বল্পকালে উৎপাদক ফার্মের কতকগুলি ব্যয় স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকে। এই সময়ে কতকগুলি উৎপাদনের কারক, যথা, যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ প্রভৃতির পরিবর্তন করা চলে না। ফলে, স্বল্পকালে, যদি, ফার্মের পণ্যের চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে উহাকে কাঁচামাল, অস্থায়ী শ্রম প্রভৃতি পরিবর্তনীয় কারকগুলি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়। এই অবস্থায় ফার্ম উহার আয়তন, যন্ত্রপাতি, কারখানা-গৃহ, উৎপাদন ক্ষমতা

প্রভৃতি পরিবর্তন করিয়া উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। সেইজন্য দীর্ঘকালে ফার্মের পণ্যের চাহিদা বাড়িলে উহা সকল কারকগুলির ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া পণ্য উৎপাদন বাড়াইতে পারে।

স্বল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে প্রথমে কমে, পরে তাড়াতাড়ি বাড়িতে থাকে। স্বল্পকালে উৎপাদনে ব্যবহৃত স্থির কারকগুলি, যথা, কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সময় পাওয়া যায় না। এই সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে কাঁচামাল, শ্রমিক প্রভৃতি পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ বাড়াইতে হয়। স্বল্পকালে প্রতিষ্ঠানের স্থির ব্যয়ে কোন পরিবর্তন হয় না; কেন না, স্থির উপাদানগুলির অদল-বদল করিবার সময় থাকে না। এই সময়ে প্রথমদিকে যদি অল্প পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনীয উপাদানগুলির ব্যবহার কিছু পরিমাণ বাড়াইতে হইবে; অর্থাৎ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অল্প পরিমাণ বাড়াইলেই চলিবে। কিন্তু উৎপাদনের যে স্তরে স্থির উপাদানগুলি অর্থাৎ কারখানাগৃহ, কলকব্জা প্রভৃতি পূর্ণ ব্যবহৃত হয় তাহার চেয়ে যদি অধিক উৎপাদন করিতে হয়, তাহা হইলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইবে। উৎপাদনের প্রথম দিকে গড় স্থির ব্যয় খুব তাড়াতাড়ি কমে, পরের দিকে আবার ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কিন্তু গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় স্থির ব্যযের ন্যায় প্রথম দিকে কমিলেও, পরে তাড়াতাড়ি বাড়িয়া থাকে। গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মিলিত যোগফলই গড় ব্যয়। সুতরাং, স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মিলিত ফল হইতে বুঝা যায়। স্বল্পকালীন গড় ব্যয় প্রথমে কমিতে থাকে, পরে আবার বাড়ে। সেইজন্য স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি অনেকটা ইংরেজী 'U' অক্ষরটির মত হয়।

স্বল্পকালীন গড় ব্যয়েব প্রকৃতি

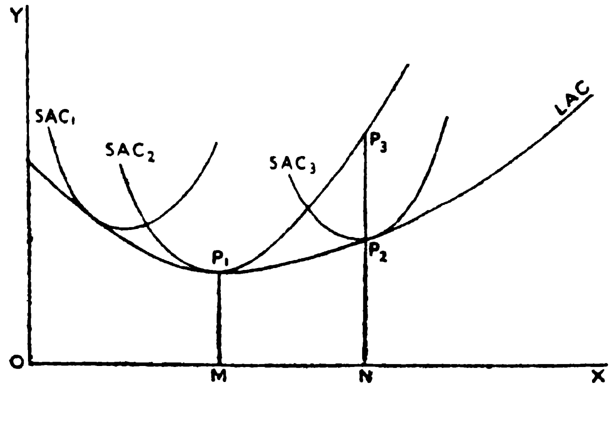
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের প্রকৃতিও অনেকটা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের প্রকৃতির মত। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন দীর্ঘকালে উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে, তখন প্রথম দিকে গড় ব্যয় কমিতে থাকে। কমিতে কমিতে ইহা সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছায়। আরও উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড় ব্যয় আবার বাড়িতে আরম্ভ করে। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখাও U-আকৃতির হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার U-আকৃতি যতটা সোজা ধরনের হয়, দীর্ঘ

কালীন গড় ব্যয়-রেখার U-আকৃতি ততটা সোজা না হইয়া চ্যাপ্টা (flatter) ধরনের হয়। দীর্ঘকাল বলিতে এমন দীর্ঘ সময় বুঝায় যখন প্রতিষ্ঠান উহার উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইতে বা কমাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান কারখানা-গৃহ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কিত স্থির ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। কিন্তু স্বল্পকালে যদি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কমায় তাহা হইলে গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের প্রকৃতি

কেন না, ঐ সময়ে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ইউনিট প্রতি স্থির ব্যয় বেশ একটি মোটা ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু দীর্ঘকালে উৎপাদন কমাইলে স্থির ব্যয় কিছুটা হ্রাস করা যায়। সুতরাং, তুলনা করিলে দেখা যায় যে, দীর্ঘকালে স্বল্পকালের চেয়ে গড় স্থির ব্যয় কম হয়। দীর্ঘকালে মাত্রা ভালভাবে নির্ধারণ করিয়া প্রতিষ্ঠান বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ফলে, এই সময়ে পরিবর্তনীয় ব্যয় ততটা দ্রুত বৃদ্ধি পায় না, যতটা পায় স্বল্পকালে। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদনের স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় দ্রুত বাড়িতে থাকে।

দীর্ঘকালে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অবিভাজ্য উপাদানগুলির (indivisible factors) উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারে। দীর্ঘকালে এই উপাদানগুলি অনেক পরিমাণে বিভাজ্য বলিয়া উহাদের বিভিন্ন অনুপাত সংমিশ্রণ দ্বারা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। মনে কর, নিচের রেখা-চিত্রে SAC_1, SAC_2, SAC_3 তিনটি উৎপাদন মাত্রায় তিনটি বিভিন্ন স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখা।



উপরি-উক্ত তিনটি উৎপাদন মাত্রার সর্বোত্তম উৎপাদন পরিমাণ ধার্য হয় যথাক্রমে স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখা তিনটির নিম্নতম বিন্দু দ্বারা। মনে কর, কোন এক সময়ে প্রতিষ্ঠান MP_1 গড় ব্যয়ে OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে। এখন যদি দ্রব্যটির চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানকে ON পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিতে প্রয়োজন হইতে পারে। প্রতিষ্ঠান যদি পুরাতন উৎপাদন মাত্রায় থাকিয়া উৎপাদন বাড়ায় তাহা হইলে গড় ব্যয় হইবে NP_3। কিন্তু প্রতিষ্ঠান যদি নূতন উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন বাড়ায় তাহা হইলে গড় ব্যয় হইবে NP_2। NP_3-এর তুলনায় NP_2 কম বলিয়া প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন ব্যয় রেখা SAC_2তে উৎপাদন করিতে পছন্দ করিবে। তাহা হইলে দীর্ঘকালে গড় ব্যয় NP_3 হইতে পরিবর্তিত হইয়া NP_2 হইবে। উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তনের ফলে ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাই দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা নির্দেশ করে। সম্ভাব্য স্বল্পকালীন ব্যয়ের রেখাগুলিকে স্পর্শ করিয়া একটি লাইন টানিলে যে LAC রেখা পাওয়া যায় উহাই দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা। এই রেখার আকৃতিও স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখার ন্যায় U-এর মতই হয়। এই রেখা স্বল্পকালীন রেখাগুলিকে ঘিরিয়া থাকে বলিয়া ইহাকে এনভেলাপ (Envelope) রেখা বলা হয়।

দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়
(Long-run Marginal Cost)

স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের ন্যায় দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ও উৎপাদনের প্রথম দিকে কমিতে থাকে, পরে বাড়িয়া গড় ব্যয়ের সর্বনিম্নতম বিন্দুতে উহার সহিত সমান হয়। ঐ বিন্দুর পর দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের অপেক্ষা বেশি হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আরও বাড়িতে থাকে। দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে নিম্নগামী হয়। পরে ঐ রেখা উর্ধ্বগামী হইয়া দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাকে উহার সর্বনিম্ন বিন্দুতে নিচ হইতে ছেদ করিয়া উহার উপরে উঠিয়া যায়। স্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক দেখা যায়, দীর্ঘকালীন সময়েও এই দুই প্রকার ব্যয়ের মধ্যে ঠিক একই সম্পর্ক দেখা যায়। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার তুলনায় চ্যাপ্টা আকৃতির হয়। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে বাড়ে বা কমে।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সম্পর্ক
(Relation between the Short-run Average Cost Curve and Long-run Average Cost Curve)

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখা হইতে স্বতন্ত্র নহে। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা গঠিতই হয় যে সকল বিন্দুতে ঐ রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখাগুলিকে স্পর্শ করিয়াছে সেই সকল বিন্দু দ্বারা। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখাগুলির স্পর্শক।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যযের রেখা প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন ব্যয়-রেখাকে মাত্র একটি করিয়া বিন্দুতে স্পর্শ করে। কিন্তু সকল স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখাগুলিকে দীর্ঘকালীন ব্যয়-রেখা উহাদের সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা মাত্র একটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখাকে সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে (৩১২ পৃষ্ঠার রেখাচিত্র দ্রষ্টব্য)। এই সর্বনিম্ন বিন্দুতে দীর্ঘকালীন ব্যয়ের রেখাও সর্বনিম্ন। অর্থাৎ যে বিন্দুতে স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখা সর্বনিম্ন সেই বিন্দুতে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও দীর্ঘকালীন ব্যয় পরস্পর সমান। এই বিন্দুর বামে অবস্থিত কোন স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুকে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা স্পর্শ করে না। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর বামে ও উপরের দিকে কোন বিন্দুতে স্পর্শক হয। সেইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত প্রত্যেকটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখাকে উহাদের সর্বনিম্ন বিন্দুর ডানদিকে ও উপরের দিকে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের রেখাকে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা নিচ হইতে উপরে উঠিয়া ছেদ করে। এই ছেদবিন্দুতে স্বল্পকালীন গড় ব্যযের রেখা সর্বনিম্ন। এই বিন্দুতে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও স্বল্পকালীন গড় ব্যয় পরস্পর সমান। সেইরূপ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখাকেও উহার নিম্নতম বিন্দুতে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা নিচ হইতে উপরে উঠিয়া ছেদ করে। এই ছেদবিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। যে বিন্দুতে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় পরস্পর সমান সেই বিন্দুতে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক

ব্যয়ও পরস্পর সমান (উপরের চিত্রে P_1 বিন্দুতে SAC = SMC = LAC = LMC)।

যোগান
(Supply)

কোন প্রতিষ্ঠান বাজারে যে দ্রব্য যোগান দেয় উহা উৎপাদন ব্যয় দ্বারা নিযন্ত্রিত হইয়া থাকে। উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান স্থির করে কতটা পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়া উহার পক্ষে লাভজনক। উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া গেলে বেশি পরিমাণে দ্রব্য যোগান দেওয়া লাভজনক নাও হইতে পারে, আবার উৎপাদনের ব্যয় কমিয়া গেলে কম পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেওয়াই লাভজনক। উৎপাদন ব্যয় কেবল যে কোন উৎপাদক ফার্মের দ্রব্য যোগানের পরিমাণই নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা নহে। কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন ব্যয় কমিয়া গেলে মুনাফা লাভ বেশি হইবে এই আশায় নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে। ফলে, যোগানের মোট পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। আবার, উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া গেলে লোকসানের আশঙ্কায় অনেক প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিবে। ফলে, যোগানের মোট পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

যোগান বলিতে কোন উৎপাদক ফার্ম বা শিল্প কোন নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে রাজী থাকে তাহা বুঝায়।

যোগান কাহাকে বলে?

চাহিদা বলিতে যেমন কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদা বুঝায়, ঠিক যোগান বলিতেও কোন নির্দিষ্ট দামে যোগান বুঝায়। চাহিদা যেমন দামের একটি ক্রিয়া (function), সেইরূপ যোগানও দামের একটি ক্রিয়া। দামের সহিত সম্পর্কশূন্য কোন চাহিদা অথবা যোগানকে কখনও কল্পনা করা যায় না।

যোগানের বিধি
(Law of Supply)

চাহিদার যেমন একটি সাধারণ বিধি আছে, যোগানেরও তেমনি একটি বিধি আছে। ফার্মই বল, কি শিল্পই বল, দ্রব্য-বিক্রেতাগণের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা এই যে, কম দামে তাহারা অল্প পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়

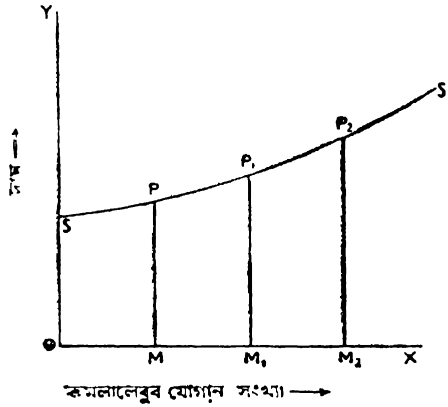
করিতে এবং বেশি দামে অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ দ্রব্যের বাজার-দাম কমিলে ইহার যোগান কমিবে, বাজার-দাম বাড়িলে উহার যোগান বাড়িবে। ইহাই যোগানের সাধারণ বিধি। যোগান ও দামের সহিত যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক (functional relationship) দেখা যায়, ইহা চাহিদা ও দামের সহিত ক্রিয়াগত সম্পর্ক হইতে বিভিন্ন। দাম ও চাহিদার মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্কটি বিপরীতমুখী কিন্তু দাম ও যোগানের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্কটি একইমুখী। অর্থাৎ দামের যে দিকে পরিবর্তন ঘটে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে তার বিপরীত দিকে, কিন্তু দামের যে দিকে পরিবর্তন ঘটে যোগানের পরিবর্তনও ঠিক সেই দিকে ঘটে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান সরবরাহ হইতে পারে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। এই তালিকাকে যোগান তালিকা (Supply Schedule) বলে। যেমন,

প্রতিটি কমলালেবুর দাম	কমলালেবুর যোগান সংখ্যা
৮ পয়সা	১
১২ পয়সা	২
২০ পয়সা	৩

ইহা ব্যক্তিগত যোগান তালিকা (Individual Supply Schedule)। বিভিন্ন দামে বিক্রেতা কতগুলি লেবু যোগান দিতে ইচ্ছুক এই তালিকা তাহারই ইঙ্গিত দেয়। বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত তাহা যোগ করিলে যে তালিকা প্রস্তুত হয়, উহাকে বাজারের যোগান তালিকা (Market Supply Schedule) বলে। পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্র দ্বারা যোগানের বিধি বা যোগানের তালিকা নির্দেশ করা হইল।

পরপৃষ্ঠার চিত্রে OX অক্ষরেখা কমলালেবুর যোগান পরিমাণ এবং OY অক্ষরেখা দাম নির্দেশ করিতেছে। বাজার-দাম যখন PM তখন OM সংখ্যা লেবু যোগান হয়, বাজার-দাম যখন P_1M_1 তখন OM_1 সংখ্যা লেবু যোগান হয় এবং বাজার-দাম যখন P_2M_2 তখন OM_2 সংখ্যা লেবু যোগান হয়। P, P_1, P_2 বিন্দু তিনটিকে যুক্ত করিলে SS যোগান-রেখা অঙ্কন করা যায়। এই যোগান-রেখা যোগান তালিকার চিত্ররূপ। এই



রেখাদ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, দাম বাড়িলে যোগান বেশি হয়। যোগান-রেখা সাধারণত ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। সুতরাং যোগান-রেখার ঢাল ধনাত্মক (positive)।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে দাম বাড়িলে যোগান বাড়িবে, কিংবা দাম কমিলে যোগান কমিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। অর্থাৎ যোগানের বিধির কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এমন অনেক জিনিস আছে যাহার যোগান স্থির ও সীমাবদ্ধ। যেমন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একখানি চিত্র। বাজার-দামের কম-বেশির উপর উহার যোগান নির্ভর করে না। শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে কখন কখনও দেখা যায় মজুরির হার হ্রাস পাইলে শ্রমের যোগান বাড়িয়া থাকে। মজুরির হার কমিলে শ্রমিক পরিবারের সকলেই কাজ করিতে চাহে, তাহার ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে। যে সকল ক্ষেত্রে যোগানের বিধির এইরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় সেখানে যোগান-রেখা দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী না হইয়া বামদিকে পশ্চাৎগামী (backward sloping) হইয়া থাকে।

ফার্মের যোগান-রেখা
(The Supply Curve of the Firm)

কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফার্ম বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক, উহাকেই ঐ ফার্মের যোগান বলে। ফার্মের যোগান

নির্ভর করে উহার উৎপাদন ব্যয়ের উপর। সুতরাং, সাধারণভাবে উৎপাদন ব্যয়ের রেখাকেই ফার্মের যোগান-রেখা বলা চলে। উৎপাদন ব্যয়-রেখা বলিতে বুঝায় প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা। উৎপাদনের পরিমাণ সামান্য মাত্রায় বাড়াইলে মোট উৎপন্ন ব্যয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়। ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাই সাধারণত উহার যোগান-রেখা। নিখুঁত বা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইতে হইলে ফার্মকে দ্রব্য যোগানের ব্যবস্থা এমনভাবে করিতে হয় যাহাতে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়।

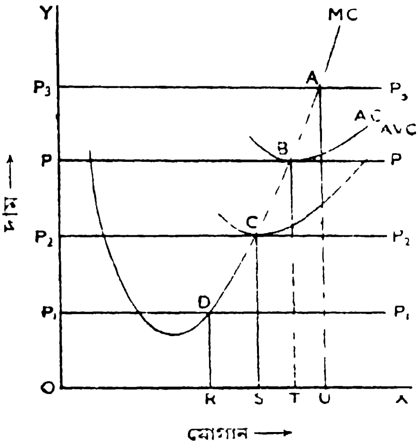
কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, যদিও দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা উৎপাদক ফার্মের দ্রব্য উৎপাদন করিবার ও যোগান দেওয়ার একটি শর্ত, তবুও ইহাই একমাত্র শর্ত নহে। অনেক সময় এই শর্তটির সহিত আরও শর্ত ফার্মকে মানিয়া লইয়া তবে দ্রব্য যোগান দিতে হয়।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা গড় ব্যয়-রেখার মত নিম্নগামী হয়। কোন উৎপাদক ফার্মই প্রান্তিক ব্যয়-রেখার নিম্নগামী অংশ ধরিয়া দ্রব্য যোগান দিবে না। কেন না, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার নিম্নগামী অংশের যে কোন বিন্দু ধরিয়া দ্রব্য উৎপাদন বাড়াইলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার নিম্নগামী কোন অংশই ফার্মের যোগান-রেখা হইতে পারে না।

স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের গড় মোট ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও গড স্থির ব্যয়ের সম্মিলিত যোগফল। এই সময়ে দাম যদি গড় মোট ব্যয়ের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ হইবে। দাম যদি গড় মোট ব্যয়ের সমান হয়, তাহা হইলে গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় দুই-ই উশুল হইবে এবং প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। কিন্তু দাম যদি গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়েও কম হয়, তাহা হইলে গড় স্থির ব্যয়ের কিছুই উশুল হইবে না এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সবটুকু উশুল হইবে না। প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় আদৌ করিবে না। যদি দাম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে নিচে নামে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করিবে। এক্ষেত্রে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলেও প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা ধরিয়া দ্রব্য যোগান

প্রান্তিক ব্যয়ের সমস্ত অংশই ফার্মের যোগান-রেখা নহে

চালাইবে না। এ অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বলা যায় না। অর্থাৎ সাধারণভাবে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বলা হইলেও প্রান্তিক ব্যযের সমস্ত অংশই ফার্মের যোগান-রেখা নহে। নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায় :



উপরের চিত্রে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা MC-এর আকৃতি U-এর মত। ইহা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে নিম্নগামী, পরের দিকে উর্ধ্বগামী। যতক্ষণ অবধি প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাটি নিচের দিকে নামিতেছে, ততক্ষণ ঐ রেখাকে ফার্মের যোগান-রেখা বলা যায় না। কেন না, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার এই অংশের যে কোন বিন্দুতে উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ বাড়িতে থাকিবে। আবার, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার যে অংশটা নিচ হইতে উপরে উঠিয়াছে, তাহারও সমস্তটুকু প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বলা চলে না। বাজার দাম যদি OP_1 হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান OR পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। কিন্তু এই দামে প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে না, কেন না, এই দাম হইতে প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অতি অল্পই উশুল হয়। এই দামে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লোকসান দেওয়ার চেয়ে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করাই ভাল। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমস্তটা দাম হইতে উঠিয়া না আসে, ততক্ষণ প্রতিষ্ঠান লোকসান দেওয়ার চেয়ে

উৎপাদন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিবে। দাম বাড়িলে যখন গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমস্তটা উঠিয়া আসিবে, তখন স্থির ব্যয়ের কিছু না উঠিলেও প্রতিষ্ঠান সাময়িক ভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে। এই দাম প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম লোকসানজনক হইবে। দীর্ঘকালীন সময়ে বাজারের উন্নতি হইবে ভাবিয়া স্বল্পকালে সাময়িক লোকসান দিয়াও এই দামেই প্রতিষ্ঠান দ্রব্য বিক্রয় করিবে। OP_1 হইতে দাম বাড়িয়া যখন OP_2 হইবে তখন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় উঠিয়া আসিবে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান যখন OP_2 দামে OS পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিবে তখন দাম নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হইবে। আবার দাম প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়েরও সমান হইবে। অর্থাৎ C বিন্দুতে দাম = নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় = প্রান্তিক ব্যয়। কিন্তু দাম যদি নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের চেয়ে কম হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে উৎপাদন বন্ধ রাখিবে।

উৎপাদন বন্ধের বিন্দু

অর্থাৎ নিম্নতম পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বিন্দু C-কে প্রতিষ্ঠানের **উৎপাদন বন্ধের বিন্দু** (shut down point) বলা যায়। C বিন্দুর নিচে দাম নামিলে প্রতিষ্ঠান সাময়িক ভাবে উৎপাদন করিবে না। সুতরাং, C বিন্দুর নিচের দাম যদি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমানও হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাকে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বলা যায় না। অর্থাৎ উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর উপরে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার যে অংশ অবস্থিত উহাকেই কেবলমাত্র ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান-রেখা বলা যায়। উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর নিচে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখার কোন অংশই যোগান-রেখা নহে।

স্বল্পকালীন সময়ে দাম বাড়িয়া যদি OP হয় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় অর্থাৎ গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং গড় স্থির ব্যয় দুই-ই উঠিয়া আসিবে। OP দামে দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। অর্থাৎ ঐ দামে দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয় সমান হইবে। চিত্রে B বিন্দুতে নির্ধারিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের সমতা স্থাপিত হইবে। ঐ বিন্দুকে **আয়-ব্যয়ের সমতা-বিন্দু** (Break-even point) বলা হয়। আয়-ব্যয়ের সমতা-বিন্দুতে দাম = সর্বনিম্ন গড় ব্যয় = প্রান্তিক ব্যয়।

আয়-ব্যয়ের সমতা-বিন্দু

দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম হইতে যদি স্বাভাবিক মুনাফা সমেত গড় মোট ব্যয় সমস্তটা উঠিয়া আসে, তবেই প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে। কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন সময়ে লোকসান দিয়া বাজারে টিকিতে পারে না। সুতরাং আয়-ব্যয়ের সমতা-বিন্দুর উপরে অবস্থিত দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার সমস্ত অংশই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা। আয-ব্যয়ের সমতা-বিন্দুর নিচে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার কোন অংশই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা হইতে পারে না।

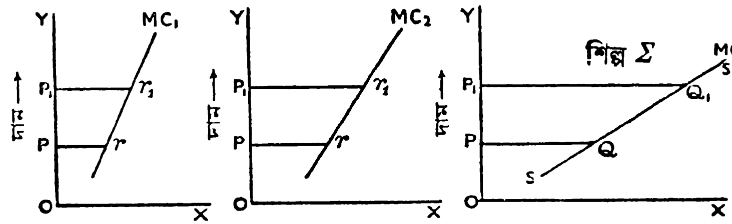
শিল্পের যোগান-রেখা
(The Supply Curve of the Industry)

একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী অথবা নিকট পরিবর্তক দ্রব্য (close substitutes) উৎপাদনকারী কয়েকটি ফার্মের সমষ্টিকেই শিল্প বলে। শিল্পের যোগান বলিতে উহার অধীন যাবতীয় ফার্মগুলির নিজ নিজ যোগানের মোট সমষ্টি বুঝায়। আমরা যদি জানিতে পারি, বিভিন্ন দামে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কি কি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগান একসঙ্গে যোগ করিলেই ঐ শিল্পের মোট যোগান পাওয়া যাইবে। আবার, শিল্পের যোগান-রেখা নির্ধারণ করিতে হইলে উহার অন্তর্গত সকল ফার্মের যোগান-রেখার সমষ্টি ধরিতে হইবে। ফার্মের যোগান-রেখা বলিতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখার একটি বিশেষ অংশকে বুঝায়। সুতরাং, শিল্পের যোগান-রেখা হইল উহার অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাগুলির সমষ্টি।

শিল্পের যোগান-রেখা সময়ের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। আমরা জানি, স্বল্পকালীন সময়ে গড় পরিবর্তনীয় ব্যযের নিম্নতম বিন্দুর উপরে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয়-রেখার অংশটিই প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা। প্রান্তিক ব্যয়ের এই অংশটি বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন হয়। শিল্পের যোগান বলিতে শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির প্রান্তিক ব্যয়ের রেখাগুলির সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। যেহেতু

স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা

ফার্মগুলির প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ঊর্ধ্বগামী, সেইহেতু স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখাও ঊর্ধ্বগামী হইয়া থাকে। কিন্তু এই যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে অনেকটা সোজাসুজি (steeply) উপরে উঠিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে কোন শিল্প উহার অন্তর্গত ফার্মগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া নিজের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না ; কেবলমাত্র দাম বাড়িলেই শিল্প উহার মোট যোগান বাড়াইতে পারে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি দেখানো হইল :



উপরের চিত্রে কোন একটি শিল্পের অন্তর্গত দুইটি ফার্ম ধরা হইয়াছে। শিল্পের যোগান-রেখা হইল ΣMC (Σ অর্থ সমষ্টি)। ইহা ফার্ম দুইটির প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে পাশাপাশি রাখিয়া যোগ করিয়া পাওয়া গিয়াছে। OP দামে শিল্পের যোগান হইতেছে PQ। PQ আবার ১নং ফার্মের P*r* এবং ২নং ফার্মের P*r*-এর সমষ্টির সমান। দাম বাড়িয়া OP_1 হইলে, শিল্পের যোগান বাড়িয়া P_1Q_1 হইবে। P_1Q_1 আবার P_1r_1 ও P_1r_1-এর সমষ্টির সমান। সুতরাং শিল্পের যোগান-রেখা বলিতে উহার অন্তর্গত সকল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাগুলির পাশাপাশি যোগফলকে বুঝায়।

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি (স্বল্পকালীন সময়ের ন্যায়) সাধারণত বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগতিসম্পন্ন (upward sloping) হয়। আবার অনেকের ধারণা, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল (horizontal) কিম্বা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামীও (downward sloping) হইতে পারে। দীর্ঘকালীন সময়ে সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহাদের আয়তন, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে পারে। শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলিরও সংখ্যা বাড়ানো-

কমানো সম্ভবপর হয়। যদি শিল্পে অধিকতর মুনাফালাভের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে নূতন নূতন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করিবে, আবার লোকসানের সম্ভাবনা দেখা দিলে পুরাতন অনেক ফার্ম শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। ইহার ফলে পণ্য যোগানের যে পরিবর্তন ঘটিবে তাহা শিল্পের উৎপাদন ব্যয়কে প্রভাবিত করে। দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি উৎপাদন ব্যয়ের এই হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। দীর্ঘকালীন সময়ে, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে যদি বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়-সঙ্কোচ না ঘটিয়া ব্যয়-বৃদ্ধি (diseconomies) ঘটে, অর্থাৎ উৎপাদনের ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইলে যদি শিল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উপরে উঠিবে। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন যদি শিল্পের ব্যয়-সঙ্কোচ ও ব্যয়-বৃদ্ধি দুইই সমান সমান ঘটে এবং ফলে উৎপাদন ব্যয় একই থাকে, তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইবে। তৃতীয়ত, শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নগামী হইবে।

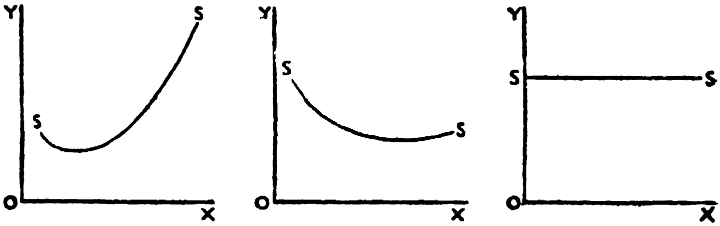
দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পেব যোগান-রেখা

শিল্পের যোগান-রেখার আকৃতি উপরে বর্ণিত তিন প্রকারের হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা গেলেও, কার্যত নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে যোগান-রেখা নিম্নগামী অথবা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে দেখা যায় না। প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মগুলির প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ঊর্ধ্বগামী হইয়া থাকে। ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাগুলির সমষ্টিই শিল্পের যোগান-রেখা বলিয়া, দীর্ঘকালে শিল্পের যোগান-রেখা নিম্নগামী না হইয়া ঊর্ধ্বগামী হইবে। তাহাছাড়া, প্রতিযোগিতার বাজারে যদি কোন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ ফার্মটি কিছুকালের মধ্যেই বাজারে দ্রব্যের যোগান ও দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিবে। সেক্ষেত্রে বাজারে প্রতিযোগিতা আর নিখুঁত থাকিতে পারে না—বাজার একচেটিয়া বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ভাবাপন্ন হইবে।

শিল্পের যোগান-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইবে—ইহা তখনই কল্পনা করা যায় যখন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হয়। কিন্তু ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইলে

ফার্মটি ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারিবে না। সুতরাং, ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা যদি সমান্তরাল হইতে না পারে, তাহা হইলে শিল্পের যোগান-রেখাও সমান্তরাল হইতে পারে না। তবে শিল্পটি যদি ক্ষুদ্র হয়, এবং উহার সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচনের ফলে উৎপাদন মূল্যের কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে ঐ শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা সমান্তরাল হইবে অনুমান করা যায়, কিন্তু ইহা কষ্টসাধ্য অনুমান।

তাহা হইলে বলা চলে যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা নিম্নগামী বা ভূমিতল রেখার সমান্তরাল হইতে পারে না। বাম দিক হইতে দক্ষিণে উর্ধ্বগামী হইয়া থাকে। তবে স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা যেমন সোজাসুজি উপরে উঠিয়া যায়, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা ধীরে ধীরে (gently) উপরে উঠিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলির কারকসমূহ ও উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন করিবার সুযোগ-সুবিধাগুলি অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখা দেখানো হইল :



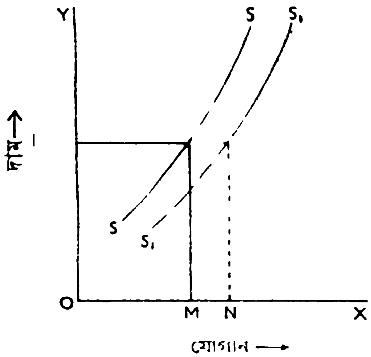
১নং চিত্র ২নং চিত্র ৩নং চিত্র

উপরের তিনটি চিত্রের মধ্যে ১নং চিত্রে শিল্পের চাহিদা-রেখা বামদিক হইতে দক্ষিণে উপরে উঠিয়াছে। ইহাই দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার সাধারণ আকৃতি। ২নং ও ৩নং চিত্রে দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের যোগান-রেখার আরও দুইরকম আকৃতি দেখানো হইয়াছে বটে, কিন্তু বাস্তবত ঐ ধরনের আকৃতিবিশিষ্ট যোগান-রেখা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যোগানের পরিবর্তন
(Changes in Supply)

যোগানের পরিবর্তন বলিতে একই দামে পূর্বের তুলনায় দ্রব্যের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝায় কিংবা বিভিন্ন দামে একই পরিমাণ দ্রব্যের বিক্রয়

বুঝায়। চাহিদার পরিবর্তন বলিতে যেমন চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন বুঝায় সেইরূপ যোগানের পরিবর্তন অর্থই যোগানের অবস্থার পরিবর্তন বুঝায়। যোগানের পরিবর্তন বুঝাইতে গেলে নূতন একটি যোগান-রেখা আঁকিয়া বুঝাইতে হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে যোগানের পরিবর্তন দেখানো হইল :



যখন দাম OP ছিল তখন যোগানের পরিমাণ ছিল OM এবং যোগান-রেখা ছিল SS। পরে যদি এই একই দামে বিক্রেতাগণ ON পরিমাণ দ্রব্য অর্থাৎ পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে ইচ্ছুক থাকে, তাহা হইলে যোগান বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা হয়। যোগানের এই অবস্থা নূতন যোগান-রেখা SS দিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যোগান বৃদ্ধির ফলে পূর্বেকার যোগান-রেখা ডানদিকে সরিয়া গিয়াছে। আবার, একই দামে বিক্রেতাগণ যদি পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্য যোগান দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে যোগান-রেখা মূল যোগান-রেখার বাম দিকে সরিয়া যাইবে।

যোগানের পরিবর্তন একাধিক কারণে ঘটিতে পারে। এই কারণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

যোগান পরিবর্তনের কারণ

(ক) উৎপাদন ব্যয় : উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বিক্রেতা একই দামে পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে রাজী হইবে। আবার, উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পাইলে একই দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে।

(খ) কারিগরি কৌশলের পরিবর্তন : কারিগরি কৌশলের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ব্যয় ও দামে বিশেষভাবে তারতম্য ঘটিতে পারে। তাহার জন্যও যোগানের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

(গ) কর ব্যবস্থা : সরকারী করনীতির উপরও দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে। করের হার বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। ফলে,

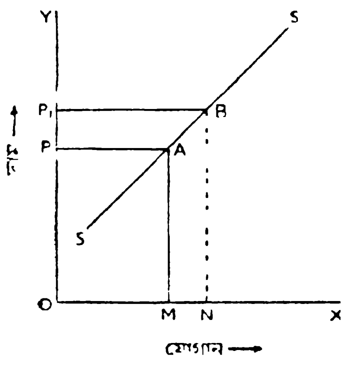
বিক্রেতাকে পূর্বের ন্যায় একই পরিমাণ দ্রব্য যোগান দিতে হইলে বেশি দামে যোগান দিতে হয়।

(ঘ) উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার: যদি উৎপন্ন দ্রব্যের বেশি পরিমাণই বিক্রেতাগণ নিজেরা ভোগ করে, তাহা হইলেও যোগানের পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন

(Changes in the quantity supplied)

যোগানের পরিবর্তন বলিতে যোগান-রেখার পূর্বেকার স্থান পরিবর্তন বুঝায়। কিন্তু যোগানের পরিমাণে পবিবর্তন বলিতে যোগান-রেখার স্থান পরিবর্তন বুঝায় না। যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন অর্থ একই যোগান-রেখাতে যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন দেখানো হইল:



আগে OP দামে OM পবিমাণ দ্রব্য যোগান ছিল। দাম যখন বাড়িয়া OP_1 হইল তখন যোগানের পরিমাণ OM হইতে বাড়িয়া ON হইল। অর্থাৎ দাম বাড়িবার ফলে বিক্রেতাগণ MN পরিমাণ যোগান বাড়াইযা দিল। এক্ষেত্রে একই যোগান-রেখা SS ধরিয়া যোগানের পরিমাণের বৃদ্ধি প্রকাশ করা হইয়াছে। সেইরূপ, দাম কমিলে একই যোগান-রেখা ধরিয়া যোগানের পরিমাণের হ্রাস প্রকাশ করা যায়। যোগানের পবিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখাইতে নূতন যোগান-রেখা আঁকিতে হয় না।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

(Elasticity of Supply)

চাহিদা যেমন দামের পরিবর্তনে সাড়া দেয়, যোগানও ঠিক সেইরূপ দামের পরিবর্তনে সাড়া দেয়। আবার, দামের পরিবর্তনে সকল দ্রব্যের

চাহিদা যেমন সমানভাবে সাড়া দেয় না, ঠিক সেইরূপ দামের পরিবর্তনে সকল দ্রব্যের যোগানও সমানভাবে সাড়া দেয় না। দামের পরিবর্তনে চাহিদা যে পরিমাণে বা মাত্রায় সাড়া দেয় উহা যেমন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, তেমনই দামের পরিবর্তনে দ্রব্যের যোগান যে পরিমাণে বা মাত্রায় সাড়া দেয় উহা যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। কতটা পরিমাণে দাম কমিলে কতটা পরিমাণে যোগান কমিবে, আবার কতটা পরিমাণে দাম বাড়িলে কতটা পরিমাণে যোগান বাড়িবে তাহারই ইঙ্গিত দেয় যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Supply)। দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তন এবং উহার দরুন যোগানের পরিবর্তন—এই দুই-এর তুলনামূলক পরিমাপ হইল যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা। ইহা সাধারণত যোগানের পরিবর্তনের হার এবং দাম পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ দামের শতকরা পরিবর্তন এবং উহার ফলে যোগানের পরিমাণের শতকরা পরিবর্তন—এই দুইএর অনুপাতই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণ করে। ইহা নিচের সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$\text{যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$= \frac{\text{যোগানের পরিমাণে পরিনর্তন}}{\text{পুরাতন যোগানের পরিমাণ}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{পুরাতন দাম}}$$

সাংকেতিকের দ্বারা প্রকাশ করিলে সমীকরণটি এই দাঁড়ায় :

$$Es = \frac{\Delta Q}{Q} \div \frac{\Delta P}{P}$$

[এখানে Qকে পুরাতন যোগানের পরিমাণ, Pকে পুরাতন দাম, ΔQকে যোগানের সামান্য পরিবর্তন এবং ΔPকে দামের সামান্য পরিবর্তন ধরা হইয়াছে।

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যেমন পাঁচ প্রকারের, যোগানের দাম স্থিতিস্থাপকতাও তেমনি পাঁচ প্রকারের হইতে পারে, যথা :

$Es = \alpha$ (যোগানের অসীম স্থিতিস্থাপকতা)

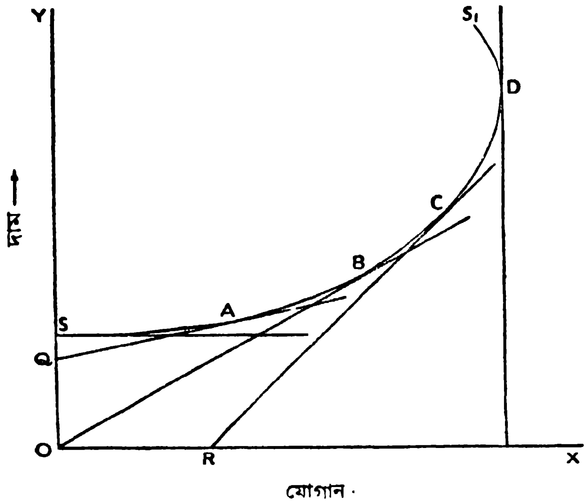
$Es > 1$ (যোগানের স্থিতিস্থাপকতা)

$Es = 1$ (যোগানের সমানুপাতিক স্থিতিস্থাপকতা)

$E_s < 1$ (যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা)

$E_s = 0$ (যোগানের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা)

নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে একটি যোগান-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পাঁচ প্রকার যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দেখানো হইল :



উপরের চিত্রে A, B, C, D ও S এই পাঁচটি বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কি ভাবে পরিমাপ করা যায় তাহা দেখানো হইয়াছে। চাহিদা-রেখার কোন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতে হইলে যেমন ঐ বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানিয়া স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয়, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করিতে হইলেও ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। B বিন্দুতে স্পর্শক টানিলে উহা O বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইবে। এই বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের হার ও যোগানের পরিবর্তনের হার সমান। সুতরাং, B বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সমানুপাতিক (Unit Elasticity of Supply) অর্থাৎ $E_s = 1$। C বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানিলে উহা যোগানের অক্ষরেখা OX-এর উপর P বিন্দুতে পৌঁছিবে। এই বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের হারের চেয়ে যোগানের পরিবর্তনের হার অধিক। সুতরাং C বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের অধিক ($E_s > 1$) অর্থাৎ যোগান স্থিতিস্থাপক (Elasticity of Supply)। A বিন্দুতে

একটি স্পর্শক টানিলে উহা দাম অক্ষরেখা OY-এর সহিত মিলিবে। এই বিন্দুতে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা যোগানের পরিবর্তনের হার কম। সুতরাং A বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের কম ($Es<1$) অর্থাৎ যোগান অস্থিতিস্থাপক (Inelasticity of Supply)। D বিন্দুতে স্পর্শক টানিলে উহা OY অক্ষরেখার সমান্তরাল হইবে। সুতরাং D বিন্দুতে যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (Perfect Inelasticity of Supply) অর্থাৎ, $Es=O$ হইবে। আবার, S বিন্দুতে· স্পর্শক টানিলে উহা OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হইবে। সুতরাং, S বিন্দুতে যোগান অসীম স্থিতিস্থাপক (Perfect Elasticity of Supply); অর্থাৎ $Es=\alpha$ হইবে।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল

(Factors on which Elasticity or Inelasticity of Supply depends)

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বা অস্থিতিস্থাপকতা নিম্নলিখিত বহু বিষয়ের উপব নির্ভর করে :

(১) দ্রব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যোগানের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।. যে সকল দ্রব্য সাধারণত পচনশীল, যেমন, দুগ্ধ, মৎস্য, ফলমূল, শাকসবজী ইত্যাদি—উহাদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। এইসকল দ্রব্য সরস অবস্থায় বেশি দিন গুদামজাত করিয়া রাখা যায় না, পচন ধরিবার আগেই অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু টেকসই (durable) দ্রব্যের দাম যদি কমে, তাহা হইলে উহা বিক্রয় না করিয়া ধরিয়া রাখা চলে। স্বল্পকালীন সময়ে টেকসই দ্রব্যের যোগান সেইজন্য স্থিতিস্থাপক।

(২) যে সকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে গুদামজাত করিয়া রাখিবার সুযোগ-সম্ভাবনা আছে, উহাদের যোগান স্থিতিস্থাপক।

(৩) যে সকল দ্রব্য দীর্ঘকালীন সময়ে যোগান দেওয়া হয়, উহাদের বেলায় যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে বলিয়া দ্রব্যের যোগান চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়।

(৪) যদি উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান অপ্রচুর থাকে তাহা হইলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে; আবার, উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বেশি হইবে।

(৫) কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা যদি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইয়া না থাকে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে।

(৬) উৎপাদনের কারিগরি কৌশল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি পাওয়া যায় ততই চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও বাড়িবে।

পরিশেষে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বিশেষভাবে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে বিক্রয়ের আরও বিকল্প পথ খোলা আছে কি না তাহার উপর। যদি প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে দ্রব্য বিক্রয়ের একাধিক বাজার খোলা থাকে এবং প্রতিষ্ঠানটি একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে বা একটি দ্রব্য ছাড়িয়া অন্য দ্রব্য সহজেই সরবরাহ করিতে পারে তাহা হইলে দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবে।

১৭

ফার্ম ও শিল্পের ভারসাম্য
(Equilibrium of the Firm and of the Industry)

পূর্ণ প্রতিযোতিার বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একই ধরনের দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। এইরূপ বাজারে দাম নির্ধারিত হয় এক দিকে ক্রেতার চাহিদা এবং অপর দিকে বিক্রেতার যোগানের দ্বারা। দাম নির্ধারণের আলোচনায় সাধারণত ভারসাম্য দাম নির্ধারণেরই বিশ্লেষণ করা হয়। ভারসাম্য দাম বলিতে সেই দাম বুঝায় যে দামে ক্রেতাগণের চাহিদার পরিমাণ এবং বিক্রেতাগণের যোগানের পবিমাণ পরস্পর সমান হয়। অবশ্য বাজারে প্রকৃত দাম এই ভারসাম্য দামের চেয়ে কম-বেশি হইতে পারে। কিন্তু বাজার-দাম ভারসাম্য দামের সমান না হইলেও ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের আচার-ব্যবহারের ফলে বাজার-দামের ভারসাম্য দামের দিকে পরিবর্তিত হইবার ঝোঁক দেখা যায়। ভারসাম্য দাম নির্ধারণে প্রতিটি ফার্ম এবং প্রতিটি শিল্পের ভারসাম্য পৃথকভাবে আলোচনা করা চলে।

ফার্মের ভারসাম্য
(Equilibrium of the Firm)

দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের একক হইল ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। ফার্ম যখন দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বাজারে বিক্রয় করে তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে, কি করিয়া সর্বাধিক নীট আয় (Net Income) লাভ করা যায়। ইহাকেই বলে ফার্মের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবহার (rational behaviour)। ফার্মের নীট আয় বলিতে উহার বিক্রয়লব্ধ মোট আয় এবং মোট উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যকে বুঝায়। মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পরিমাণ আবার নির্ভর করে ফার্মের মোট উৎপাদন পরিমাণের উপর। উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে মোট আয় ও মোট ব্যয় দুই-ই পরিবর্তিত হয়। ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা তখনই আসে যখন উহার উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার দিকে কোন ঝোঁক দেখা যায় না। অর্থাৎ ফার্ম যখন দ্রব্য

উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারণ করে যাহাতে উহার সর্বাধিক নীট আয় লাভ হয় তখনই উহার ভারসাম্য আসে। ফার্মের ভারসাম্য অবস্থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভের উৎপাদন (Best Profit Output) বলে।

ফার্মের ভারসাম্য স্বল্পকালীন সময়ে হইতে পারে, আবার দীর্ঘকালীন সময়েও হইতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় উহার মুনাফা লাভ না-ও ঘটিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে দাম যদি ফার্মের ন্যূনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান হয় তাহা হইলে লোকসান দিয়াও উহা দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। এই সময়ে লোকসান সর্বাধিক কম হইলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হইয়াছে ধরিতে হইবে। ভবিষ্যৎ মুনাফা লাভের আশায় এই সময়ে ফার্ম ন্যূনতম লোকসানে যে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে উহাকেই ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য বলা হয়। আবার দীর্ঘকালীন সময়ে ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম লোকসান দিয়া দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে পারে না। এই সময়ে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা ধনাত্মক (positive) হওয়া চাই। ধনাত্মক সর্বাধিক মুনাফা লাভ না করিতে পারিলে দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্মের উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা থাকে না। ফলে, ফার্মের ভারসাম্য স্থাপিত হইবে না।

ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

শিল্পের ভারসাম্য
(Equilibrium of the Industry)

শিল্পের ভারসাম্য বলিতে উহার অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিয়াছে কি না বুঝাইয়া থাকে। যদি কোন শিল্পের অধীনে সকল ফার্মই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে এবং কোন ফার্মের ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কিংবা নূতন কোন ফার্মের ঐ শিল্পে প্রবেশ করিবার ঝোঁক না থাকে, তাহা হইলে ঐ শিল্পের ভারসাম্য অবস্থা স্থাপিত হইয়াছে বলা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি যখন স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে তখনই উহারা সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিয়াছে ধরিতে হয়।

শিল্পের ভারসাম্য

শিল্পের ভারসাম্য বলিতে সাধারণত দীর্ঘকালীন সময়ের ভারসাম্যই

বুঝাইয়া থাকে। কেন না, কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন সময়েই শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সক্ষম হয়। স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের অন্তর্গত কোন কোন ফার্ম হয়তো স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, নতুবা লোকসান দিয়া দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে।

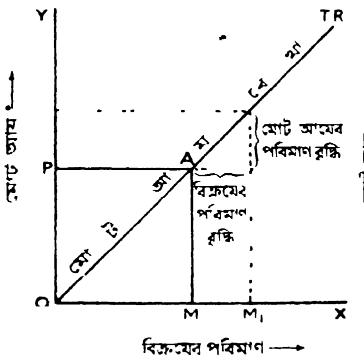
বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, ফার্মের স্বল্পকালীন সময়ের ভারসাম্য এবং দীর্ঘকালীন সময়ের ভারসাম্য এক নহে। যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে স্বল্পকালীন সময়ে একটি ফার্ম ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে, দীর্ঘকালীন সময়ে সেই একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে ফার্মটি ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে না। স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন সময়ের মধ্যে ফার্মের বিভিন্ন প্রকার ব্যয় ও আয়ের প্রকৃতি ভিন্ন হয় বলিয়া স্বল্পকালীন ভারসাম্যের বিন্দু এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিন্দু এক হইতে পারে না। ফার্মের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের বিশ্লেষণ আমরা পূর্বেই করিযাছি। এখন ফার্মের বিভিন্ন প্রকার আয়ের বিশ্লেষণ করিতেছি।

মোট আয়
(Total Revenue)

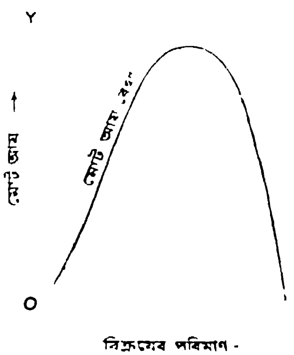
ফার্মের মোট আয় বলিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া উহা যে অর্থ লাভ করে তাহাকে বুঝায়। দ্রব্যের দামকে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা গুণ করিলে ফার্মের মোট আয় নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ মোট আয় = দাম × দ্রব্যের পরিমাণ ($TR = p \times q$)। অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের মোট আয় হইল ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের উপর ক্রেতাগণের মোট ব্যয়ের পরিমাণ। মোট আয়ের প্রকৃতি মোট আয়-রেখা (Total Revenue Curve) আঁকিয়া দেখানো যায়। মোট আয়-রেখার আকৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে এবং অন্যান্য বাজারে ভিন্নরূপ হয়। ইহার কারণ এই যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন বিক্রেতা বা কোন একটি ফার্ম বাজারে প্রচলিত দামেই দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সে অসংখ্য বিক্রেতার মধ্যে নগন্য একজন বলিয়া বাজার-দাম পরিবর্তিত করিতে পারে না। অল্প দ্রব্য বিক্রয় করিলে যে বাজার-দামে

বিভিন্ন বাজারে মোট আয়-রেখার আকৃতি

বিক্রয় করে, বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিলেও ঐ একই বাজার দামে বিক্রয় করিতে হয়। ফলে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার মোট আয়-রেখা উৎপত্তিস্থল হইতে উঠিয়া সরলরেখার আকৃতিতে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকার অপূর্ণ বা অনিখুঁত প্রতি-যোগিতার বাজারে বিক্রেতা বা ফার্মের সংখ্যা এক বা কতিপয় থাকায়, বিক্রেতা বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিলে বাজার-দাম কমাইতে হয়। বাজার-দাম কমাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মের মোট বিক্রয় ও আয় বাড়িতে থাকে এবং মোট আয়-রেখা উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। বিক্রেতার মোট আয় এইভাবে বাড়িতে বাড়িতে উৎপাদনের এক পর্যায়ে সর্বাধিক হয়, তাহার পর আবার কমিতে কমিতে এক সময় শূন্য দামে মোট আয়ও শূন্যে পরিণত হয়। মোট আয় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে মোট আয়-রেখাও দক্ষিণে নিম্নগামী হইতে থাকে এবং এক সময়ে ভূমিতল অক্ষরেখাতে পৌঁছাইয়া থাকে। নিচে দুইটি রেখাচিত্রের সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম বা বিক্রেতার মোট আয়-রেখা কিরূপ আকৃতি গ্রহণ করে, দেখানো হইল।



১নং চিত্র



২নং চিত্র

১নং চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার মোট আয়-রেখা TR দেখানো হইয়াছে। এইরূপ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ OM হইতে বাড়াইয়া OM_1 করিলে বাজার-দামের কোন পরিবর্তন হইবে না। ফলে, যে অনুপাতে দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে মোট আয়ের

পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়িতে থাকে। বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে মোট আয়ের রেখার কিরূপ আকৃতি হয়, ২নং চিত্রে তাহা দেখানো হইয়াছে।

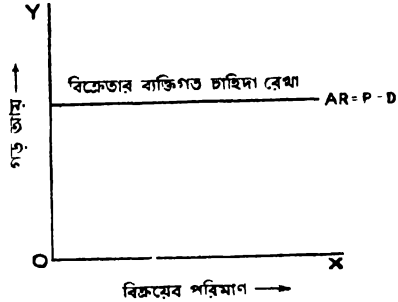
গড় আয়
(Average Revenue)

দ্রব্যের একক পিছু বিক্রয় দ্বারা উহা হইতে যে আয় পাওয়া যায় উহাকে গড় আয় বলে। কোন ফার্ম বা বিক্রেতার মোট আয়কে দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলেই গড় আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ গড় আয় = মোট আয় ÷ দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ ($AR = TR \div Q$)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকিলেও গড় আয় ও দাম পরস্পর সমান হইয়া থাকে। সেইজন্য একই রেখা দ্বারা গড় আয় ও দাম নির্দেশ করা যায়। আবার, দামের রেখা আর চাহিদার রেখাও অভিন্ন। কেন না, বিভিন্ন দামে ভোগকারিগণ দ্রব্যের কি কি বিভিন্ন পরিমাণ কিনিতে ইচ্ছুক দামের রেখা তাহাই নির্দেশ করিয়া থাকে। অতএব বলা চলে যে, দাম-রেখা, চাহিদা-রেখা ও গড় আয়ের রেখা একই। নিচের সারণীতে ইহা দেখানো হইয়াছে :

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	একক প্রতি দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $\left(AR = \frac{TR}{Q}\right)$
১০	২ টাকা	২০ টাকা	২ টাকা
১১	২ "	২২ "	২ "
১২	২ "	২৪ "	২ "
১৩	২ "	২৬ "	২ "
১৪	২ "	২৮ "	২ "
১৫	২ "	৩০ "	২ "

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার গড় আয়-রেখা কি আকৃতির হয়, পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা দেখানো হইল :

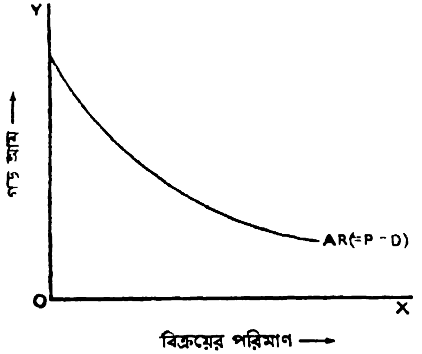


পার্শ্বের চিত্রে AR একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার গড় আয়-রেখা। ইহাই আবার দাম ও চাহিদা-রেখাও নির্দেশ করিতেছে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের গড় আয়-রেখা ভূমিতল অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়। ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্যই বিক্রয় করুক না কেন বাজার-দাম একই থাকে, ফলে, গড় আয়ও একই থাকে। সুতরাং একই রেখা AR দ্বারা দাম ও গড় আয় নির্দেশ করা যায়। আবার, চাহিদা-রেখা ও দাম-রেখা এক বলিয়া AR রেখা দ্বারা চাহিদাও নির্দেশ করা যায়।

AR রেখা একটি ফার্মের বা একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদার রেখা। কিন্তু বাজারের মোট চাহিদার রেখা কিন্তু ভূমিতল অক্ষরেখার সহিত সমান্তরাল নহে। বাজারে সকল বিক্রেতার মোট চাহিদা-রেখা দক্ষিণ দিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু যে বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, যে বাজার একচেটিয়া ভাবাপন্ন কিংবা অপূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ, সেখানে অধিক পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয়। কিন্তু দ্রব্য বিক্রয় যে পরিমাণেই বৃদ্ধি করা হউক না কেন, বিক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে ফার্মের দাম ও গড আয় পরস্পর সমান হয়। নিচের সারণীতে ইহা দেখানো হইয়াছে:

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	একক প্রতি দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $\left(AR = \frac{TR}{Q}\right)$
১০	২ টাকা	২০ টাকা	২ টাকা
১১	১'৯৪ প:	২১'৩৪ প:	১'৯৪ প:
১২	১'৮৮ প:	২২'৫৬ প:	১'৮৮ প:
১৩	১'৮১ প:	২৩'৫৩ প:	১'৮১ প:

যে কোন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার গড় আয়-রেখা কি আকৃতির হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা দেখানো যায়:



পার্শ্বের চিত্রে AR পূর্ণ প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতার গড় আয়-রেখা। এই গড আয়-রেখার ঢাল ঋণাত্মক (অর্থাৎ ইহা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখে নামিয়াছে)। এই রেখা ঋণাত্মক হয় এই কারণে যে, একটি ফার্ম বা একজন বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলেই উহার দাম কমাইতে হয় এবং তাহার জন্য গড়-আয় হ্রাস পাইয়া থাকে।

প্রান্তিক আয়
(Marginal Revenue)

কোন ফার্মের বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি পাইলে মোট আয় যতটুকু বাড়ে কিংবা এক একক হ্রাস পাইলে মোট আয় যতটুকু কমে উহাকেই প্রান্তিক আয় বলা হয়।[১] বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে মোট আয়ের যে যথার্থ বা গড় হারে পরিবর্তন ঘটে উহাই প্রান্তিক আয়। প্রান্তিক আয় হইল মোট আয় ও মোট বিক্রয় পরিবর্তনের অনুপাত।[২] অর্থাৎ

$$\text{প্রান্তিক আয় (MR)} = \frac{\Delta R}{\Delta Q}$$

প্রান্তিক আয়ের প্রকৃতি পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একরূপ হয়, আবার, প্রতিযোগিতাবিহীন অন্যান্য প্রকারের বাজারে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া কোন ফার্ম বা বিক্রেতার মোট আয় তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত সমান অনুপাতে বাড়ে। কিন্তু গড় আয় যে কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রেই এক থাকে এবং বাজার দামের সমান হয়। যে কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ের বেলায় মোট আয় সমান পরিমাণে বাড়ে বলিয়া প্রান্তিক আয়ও

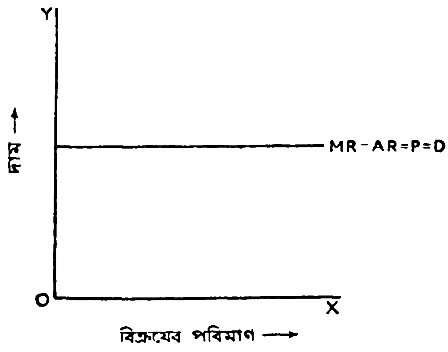
১. 'Marginal Revenue is the extra revenue resulting from selling an extra unit of goods.'

২. 'Marginal revenue is defined as the exact or average rate of change of total revenue as sales change'—H. H. Liebhafsky.

সর্বদা এক সমান হয় এবং গড় আয়ও দামের সমান হয়। দ্রব্য বিক্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও গড় আয় যদি পরিবর্তিত না হইয়া একই থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক আয়েরও কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। অতএব গড আয়, দাম ও প্রান্তিক আয় একে অন্যের সমান হইবে। নিচের সারণীতে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয়ের সহিত দাম ও গড় আয়ের সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে :

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	একক প্রতি দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১০	২ টাকা	২০ টাকা	২ টাকা	২ টাকা
১১	২ "	২২ "	২ "	২ "
১২	২ "	২৪ "	২ "	২ "
১৩	২ "	২৬ "	২ "	২ "
১৪	২ "	২৮ "	২ "	২ "
১৫	২ "	৩০ "	২ "	২ "

নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রান্তিক আয়ের সহিত গড় আয় ও দামের সম্পর্ক দেখানো যায়। চিত্রে MR প্রান্তিক আয়-রেখা অক্ষরেখা OX-এর সমান্তরাল। ইহার কারণ এই যে, বিক্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও গড



আয়ে কোন পরিবর্তন না ঘটায় প্রান্তিক আয়ের পরিমাণ একই রহিয়াছে। গড আয় ও দাম প্রান্তিক আয়ের সমান বলিয়া MR রেখা দ্বারাই গড় আয় ও দাম-রেখা নির্দেশ করা হইয়াছে। MR রেখাটি আবার একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদাও বুঝাইতেছে।

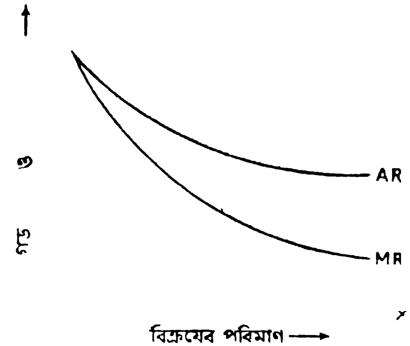
কিন্তু একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকারের পূর্ণ প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে গড আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। এই ধরনের বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একজন কিংবা কতিপয় বলিয়া একজন বিক্রেতার বাজারের মোট দ্রব্য যোগানের উপর বেশ প্রভাব থাকে। অর্থাৎ একজন বিক্রেতা বাজারের মোট যোগানের বিশেষ একটি অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে, একজন বিক্রেতা যদি তাহার বিক্রয় কিছুটা বাড়াইতে চায় তাহা হইলে দাম কিছুটা কমাইতে হইবে, তাহা না হইলে পূর্বের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। দাম কমাইবার ফলে তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত একক কম দামে বিক্রয়ের ফলে মোট আয়ের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু দাম কমিবার ফলে, এখন তাহাকে আয়ের এককগুলিকেও ঐ নূতন ও কম দামে বিক্রয় করিতে হইবে। ফলে, আগের এককগুলি পুরাতন দামে বিক্রয় করিয়া সে যে আয় লাভ করিত, এখন নূতন ও কম দামে ঐগুলি বিক্রয় করিয়া কম মোট আয় লাভ করিবে। ইহাতে বিক্রেতার গড আয় কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক আয়ও কমিয়া গড আয় ও দাম অপেক্ষা কম হইবে। অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে দ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধির সহিত বিক্রেতা যখন দাম কমাইতে থাকে তখন তাহার গড আয় ক্রমাগত কমিতে

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১০	২ টাকা	২০ টাকা	২ টাকা	২ টাকা
১১	১'৯৪ পঃ	২১'৩৪ পঃ	১'৯৪ পঃ	১'৩৪ পঃ
১২	১'৮৮ পঃ	২২'৫৬ পঃ	১'৮৮ পঃ	১'১২ পঃ
১৩	১'৮১ পঃ	২২'৫৩ পঃ	১'৮১ পঃ	৯৭ পঃ
১৪	১'৭৫ পঃ	২৪'৫০ পঃ	১ ৭৫ পঃ	'৯৭ পঃ
১৫	১'৬৮ পঃ	২৫'৪০ পঃ	১'৬৮ পঃ	'৯৪ পঃ

থাকে। আবার, গড় আয় কমিবার দরুন প্রান্তিক আয়ও কমিতে থাকে। প্রান্তিক আয় কমিয়া গড় আয় ও দাম অপেক্ষা কম হইবে। উপরের সারণীতে

পূর্ণ প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক দেখানো হইয়াছে। একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকারের পূর্ণ প্রতিযোগিতা-বিহীন বাজারে গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও দামের সম্পর্ক নিচের রেখা-চিত্রের সাহায্যেও দেখানো যায় :

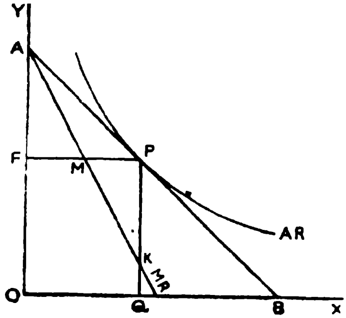
গড় আয়-রেখা AR ও প্রান্তিক আয়-রেখা MR দুই-ই ঋণাত্মক অর্থাৎ দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়। গড় আয়-রেখাই দামের রেখা এবং চাহিদা-রেখা। এই রেখা ঋণাত্মক হইবার কারণ এই যে, বিক্রেতার অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হইবে। দাম বা গড আয় কমিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক আয়ও কমিতে থাকে এবং বিক্রয়ের যে কোন অবস্থায় গড় আয়ের চেয়ে কম হয়। সেইজন্য প্রান্তিক আয়ের রেখাও ঋণাত্মক হয় এবং গড় আয়-রেখার বামদিকে ও নিচে থাকে।



প্রান্তিক আয়, গড় আয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা
(Marginal Revenue, Average Revenue and Elasticity of Demand)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও গড় আয়ের কোন পরিবর্তন হয় না, প্রান্তিক আয়েরও কোন পরিবর্তন ঘটে না। গড় আয়-রেখা ও প্রান্তিক আয়-রেখা পরস্পরে মিলিয়া যায় (coincide)। আবার, একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য প্রকারের প্রতিযোগিতাবিহীন বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় দুইই বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ক্রমাগত কমে এবং প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয়। প্রান্তিক আয় ও গড় আয়ের সম্পর্ক চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যেও নির্দেশ করা যায়। নিচে রেখাচিত্রের সহায়তায় প্রান্তিক

আয় ও গড় আয় (= দাম) এবং স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক দেখানো হইল :



পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রে AR হইল গড় আয়-রেখা এবং P উহার উপরে অবস্থিত একটি বিন্দু। P বিন্দুকে স্পর্শ করিয়া AB সরলরেখা টানা হইয়াছে। AB স্পর্শকের P বিন্দুর নিচের অংশ PBকে P বিন্দুর উপরের অংশ PA দিয়া ভাগ করিলে P বিন্দুতে AR রেখার স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়। P বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা $= \frac{PB}{PA}$ ।

এখন, P বিন্দু হইতে PQ ও PF দুইটি লম্ব যথাক্রমে OX অক্ষরেখা ও OY অক্ষরেখার উপর টানা হইল। PF রেখার ঠিক মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত M বিন্দুকে ছেদ করিয়া AK রেখা এমনভাবে টানা হইল যাহাতে PF সমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই AK রেখাই (AB গড় আয়-রেখার) প্রান্তিক আয়-রেখা।

এখন FAP এবং PQB ত্রিভুজ দুইটির কোণগুলি পরস্পর সমান বলিয়া

$$\frac{PB}{PA} = \frac{PQ}{FA}$$

আবার, FAM ও MPK ত্রিভুজ দুইটিতে আমরা দেখিতে পাই

$$FM = MP$$

$$\angle FMA = \angle PMK \text{ (বিপ্রতীপ কোণ)}$$

এবং $\angle AFM = \angle MPK$ (সমকোণ বলিয়া)

সুতরাং FAM ও MPK ত্রিভুজ দুইটি সর্বাংশে সমান। ফলে, FA = PK।

অতএব $\frac{PB}{PA} = \frac{PQ}{FA} = \frac{PQ}{PK}$

কিন্তু $PK = PQ - KQ$

সুতরাং $\frac{PB}{PA} = \frac{PQ}{PK} = \frac{PQ}{PQ-KQ}$

প্রতিষ্ঠান যখন OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তখন উহার গড় আয় PQ এবং প্রান্তিক আয় KQ, অতএব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইবে : $\frac{PQ}{PQ-KQ}$

অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Ed) =

$$= \frac{\text{গড় আয় (AR)}}{\text{গড় আয় (AR)} - \text{প্রান্তিক আয় (MR)}}$$

অথবা $Ed = \frac{AR}{AR-MR} = \frac{A}{A-M}$

দ্রব্য বিক্রয়ের যে কোন পরিমাণে চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা (Point elasticity of demand) যদি e ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে

$$e = \frac{A}{A-M}$$

$$\therefore \quad eA - eM = A$$

অথবা, $-eM = A - eA$

$$\therefore \quad M = \frac{eA-A}{e} = \frac{A(e-1)}{e}$$

অর্থাৎ প্রান্তিক আয় = গড় আয় × $\frac{\text{চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা} - ১}{\text{চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা}}$

উপরের সঙ্কেত অনুযায়ী $\left(MR = AR \times \frac{e-1}{e}\right)$

এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে প্রান্তিক আয় নির্ণয় করা যায়। আবার, একই সঙ্কেত অনুসারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা হইতে গড় আয়ও নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা চলে :

$$e = \frac{A}{A-M}$$

$$\therefore \quad eA - eM = A$$

অথবা, $eA - A = eM$

অথবা $A(e-1)=eM$

$$\therefore \quad A=\frac{eM}{e-1}$$

$$=M\frac{e}{e-1}$$

অর্থাৎ গড় আয় = প্রান্তিক আয় × $\frac{\text{চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা}}{\text{চাহিদার বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা} - ১}$

$$\left(AR=MR\times\frac{e}{e-1}\right)$$

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ের নিম্নলিখিত চারিপ্রকারের সম্পর্ক নির্দেশ কবা যায় :

১। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন একের সমান হয় ($E=1$), তখন প্রান্তিক আয় শূন্য হয় ($MR=O$)। এই প্রান্তিক আয়-রেখা ভূমি-তলের অক্ষকে স্পর্শ করে।

২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন ১-এর বেশি হয় ($E>1$), তখন প্রান্তিক আয় শূন্যের চেয়ে অধিক হইবে ($MR>O$)। প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হইবে এবং প্রান্তিক আয়ের রেখা গড আয়ের রেখার নিচে থাকিবে।

৩। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন ১-এর কম হয় ($E<1$) তখন প্রান্তিক আয় শূন্যের কম হইবে ($MR<O$)। প্রান্তিক আয়-রেখা ভূমিতল অক্ষরেখার নিচে নামিবে।

৪। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যখন অসীম হয় ($E=\alpha$) তখন প্রান্তিক আয় ও গড় আয় পরস্পর সমান হয় ($MR=AR$)। তখন প্রান্তিক আয়-রেখা ও গড় আয়-রেখা পরস্পর মিশিয়া যায়।

পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য
(Equilibrium of the Firm under Perfect Competition)

আমরা জানি উৎপাদনের যে অবস্থায় আসিয়া ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণ আর হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে চাহে না তাহাকেই উহার ভারসাম্য বলে। এই অবস্থায় আসিলে ফার্মের সর্বাধিক সম্ভব নীট আয় লাভ ঘটে, উৎপাদন আর বাড়াইলে বা কমাইলে নীট আয় বাড়িবার কোনই সম্ভাবনা থাকে

না। যতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিলে ফার্মের সর্বাধিক নীট আয় বা মুনাফা লাভ হয়, ততটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইলেই উহার ভারসাম্য ঘটে। ফার্মের ভারসাম্য দুইটি দিক হইতে আলোচনা করা যায়: (১) বাজারের প্রকারভেদ অনুসারে এবং (২) সময়ের তারতম্য অনুসারে।

ফার্মের ভারসাম্যের প্রকারভেদ

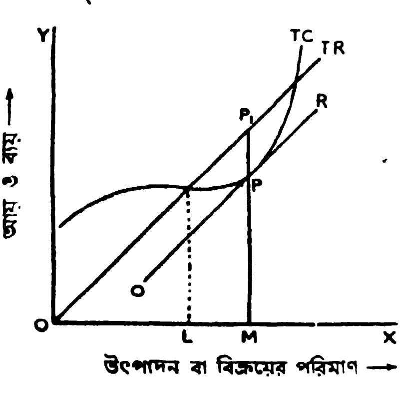
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া কারবার অথবা নানা প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে। বাজারের এই বিভিন্ন অবস্থা বিশেষে ফার্মের ভারসাম্যেরও প্রকারভেদ হইয়া থাকে। আবার, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সমান সুযোগ-সুবিধা পায় না, চাহিদার পরিবর্তন অনুযায়ী উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধিও করিতে পারে না। ফলে, বিভিন্ন সময়েও প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের প্রকারভেদ দেখা যায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা দুই প্রকারে বিশ্লেষণ করা যায়: (১) মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে এবং (২) গড় এবং প্রান্তিক আয় ও ব্যয় রেখার দ্বারা।

মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ

(Firm's Equilibrium Analysis : TR & TC Curves)

উৎপাদনের যে স্তরে ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করে উহাকে ফার্মের ভারসাম্য বলে। মুনাফা হইল ফার্মের মোট আয় ও মোট উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য। উৎপাদনের যে স্তরে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি সেই স্তরে ফার্মের মুনাফাও সর্বাধিক এবং সেই স্তরে ফার্ম ভারসাম্য প্রাপ্ত হয়। পার্শ্বস্থ চিত্রে মোট আয় ও মোট ব্যয়ের



সাহায্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য কিভাবে ঘটে তাহা দেখানো হইল :

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট আয়-রেখা (TR) O বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উর্ধ্বমুখে সরল রেখার আকৃতিতে উঠিয়া যায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের চিত্ররূপ

ইহার কারণ এই যে, এই বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান একই দামে পণ্যের কম-বেশি বিক্রয় করিতে পারে। যদি প্রতিষ্ঠান এক একক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহা হইলে মোট আয়ও ঐ এক একক দ্রব্যের দামের সমান বাড়িবে অতিরিক্ত প্রতিটি এককের বিক্রয়ের ফলে মোট আয় সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। মোট ব্যয়-রেখা (TC) O বিন্দু হইতে আরম্ভ না হইয়া ঐ বিন্দুর কিছুটা উপর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ফার্ম যদি সাময়িকভাবে অলস থাকে কিংবা কিছু উৎপাদন না-ও করে তবু স্থির ব্যয় উহাকে চালাইয়া যাইতেই হয়। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যোগফল হইল মোট ব্যয়। TC রেখা O বিন্দুর যতটা উপর হইতে আরম্ভ হইয়াছে ততটা ফার্মের স্থির ব্যয়। মোট ব্যয়-রেখার P বিন্দুতে TR রেখার সমান্তরাল করিয়া OR একটি স্পর্শক টানা হইল। এখন P বিন্দুতে মোট ব্যয়-রেখা TC এবং মোট আয়-রেখা TR-এর দূরত্ব সর্বাধিক। আবার P বিন্দু হইতে উপরে সোজাসুজি একটি লম্ব এবং নিচে সোজাসুজি আর একটি লম্ব টানা হইল। এই লম্ব দুইটি মোট আয়-রেখা TRকে P_1 বিন্দুতে এবং OX রেখাকে M বিন্দুতে স্পর্শ করিল। P ও P_1 বিন্দুতে মোট ব্যয়-রেখা (TC) এবং মোট আয়-রেখার (TC) ঢাল পরস্পর সমান। অতএব বলা যায় যে, যেখানে TR ও TC রেখা দুইটির মধ্যে খাড়াখাড়ি দূরত্ব সর্বাধিক হইবে সেখানে উহাদের ঢাল সমান। অর্থাৎ রেখা দুইটির উপর দুইটি স্পর্শক যেখানে সমান্তরাল সেখানেই ফার্মটির মুনাফা সর্বাধিক হইবে এবং উহাই ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করিলে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইবে।

গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ

(Firm's Equilibrium Analysis : AR and MR and MC Curves)

গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের (রেখাগুলির) সাহায্যেও প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ব্যখ্যা করা যায়। ফার্মের এই ভারসাম্যের অবস্থা স্বল্পকালীন বাজারে এবং দীর্ঘকালীন বাজারে পৃথক ভাবে দেখা যায়। সুতরাং, স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা পৃথকভাবেই আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

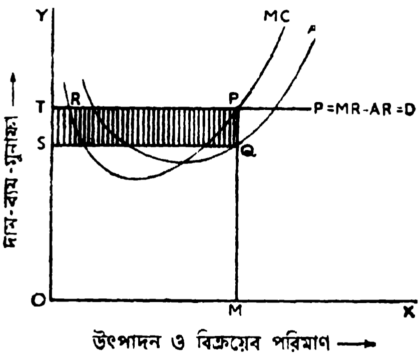
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

(Short-run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition)

যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করে তখন উহা দুইটি বিষয় ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখে : প্রথমত, পণ্যের যোগান বৃদ্ধির ফলে উহার মোট আয় কতটা বাড়িতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, পণ্য যোগান বৃদ্ধির ফলে উহার মোট ব্যয়ই বা কতটা বাড়িতে পারে। অর্থাৎ এক একক পণ্য যোগান বৃদ্ধির ফলে উহার প্রান্তিক আয় কতটা হইবে এবং প্রান্তিক ব্যয়ই বা কতটা পড়িবে। যতক্ষণ ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় উহার প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের যোগান বাড়াইয়া যাওয়া ফার্মের পক্ষে লাভজনক। কিন্তু ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় যখন প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হইবে, সে অবস্থায় পণ্য যোগান বাড়াইলে ফার্মের পক্ষে লোকসান হইবে। শুধু সেই পরিমাণ পণ্য যোগান দিলে বা বিক্রয় করিলে ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিবে যেখানে ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। স্বল্পকালীন সময়ে এইরূপ ভারসাম্যপ্রাপ্তি দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। প্রথমত, ফার্ম স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা বেশি আয়ে অর্থাৎ সর্বোচ্চ সম্ভাব্য নীট আয়ে (Maximum possible net revenue) ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ফার্ম ন্যূনতম সম্ভাব্য নীট লোকসানে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা কম ঋণাত্মক নীট আয়েও (Minimum possible negative net revenue) ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে। নিচে এই দুই প্রকার ভারসাম্যের অবস্থা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হইল।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যে দাম বাজারে বর্তমান থাকে তাহাতেই ফার্ম পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ফার্ম যত পরিমাণ পণ্যই বিক্রয় করুক না কেন, বাজার-দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। সুতরাং, এই বাজারে দাম-রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমান্তরাল হয়। এই দাম রেখাই আবার পণ্যের ক্রেতাগণের চাহিদা-রেখা। এই বাজারে পণ্য বিক্রয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও দাম-রেখা সমান্তরাল থাকে বলিয়া প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ও পরস্পর সমান হয়। ফলে সমান্তরাল দাম-রেখা দ্বারা প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ও প্রকাশ করা যায় (অর্থাৎ P = MR = AR)। পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রে দাম, প্রান্তিক আয় এবং গড় আয়ের এই সম্পর্ক দেখাইয়া ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থা নির্দেশ করা হইল :

(১)
সর্বোচ্চ সম্ভাব্য নীট আয়ে ফার্মের ভারসাম্য



চিত্রে ফার্মটি OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা ভারসাম্যে পৌঁছাইয়াছে। কেন না, শুধুমাত্র OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনেই ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। আবার, প্রান্তিক আয়, গড় আয় ও দাম পরস্পর সমান বলিয়া ফার্মটির ভারসাম্যের উৎপন্নের ক্ষেত্রে MC = MR = AR = P OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা ফার্মটি সর্বোচ্চ সম্ভাব্য নীট আয় অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে একটি ফার্মের পক্ষে এই স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত লাভ করিয়া ভারসাম্যে থাকা সম্ভব। কেন না, স্বল্পকালীন সময় বলিয়া নূতন কোন ফার্ম বাজারে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারসাম্যের সাধারণ ও প্রথম শর্ত : প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা

উপরের চিত্রে P বিন্দুতে ফার্মটির ভারসাম্য হইয়াছে। P বিন্দুতে দাম, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান (P = MR = MC)। কিন্তু যে কোন বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলেই সেখানে

ফার্মটি ভারসাম্য লাভ করিবে না। যেমন চিত্রে R বিন্দুতেও MR = MC কিন্তু R বিন্দুতে উৎপাদন ধার্য করিলে ফার্ম সর্বাধিক মুনাফা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। কেন না, যতদূর পর্যন্ত প্রান্তিক ব্যয়-রেখা প্রান্তিক আয়-রেখার নিচে থাকিবে ততদূর পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইয়া গেলে ফার্মের নীট আয়ও বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু P বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা নিচ হইতে উপরে উঠিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিয়াছে। P বিন্দুর আগে ফার্ম যতই উৎপাদন বা বিক্রয় বাড়াক না কেন, ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হইবে না। আবার P বিন্দুর পর প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা প্রান্তিক আয়-রেখার উপরে চলিয়া যায় বলিয়া P বিন্দুর পরে যে কোন পরিমাণে অতিরিক্ত উৎপাদন বা বিক্রয় ফার্মের পক্ষে লোকসানের হইবে। একমাত্র P বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ OM ধার্য করিলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হইবে। সুতরাং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা (MR = MC) যদিও ফার্মের ভার ফার্মের শর্ত, তথাপি উহাই একমাত্র শর্ত নহে। ফার্মের ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত হইল : ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দুতে প্রান্তিক ব্য[illegible]ঊর্ধ্বমুখে উঠিয়া নিচ হইতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে ছেদ করিয়া [illegible]হার উপরে চলিয়া যাইবে।

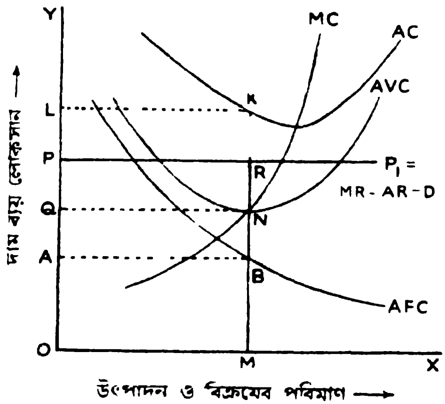
ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত : ভাবসাম্যের বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ঊর্ধ্বমুখে উঠিয়া নিচ হইতে প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিয়া উপরে চলিয়া যাইবে

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও P বিন্দুতে MR = MC = P = AR, তথাপি এই বিন্দুতে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় গড ব্যয় অপেক্ষা বেশি। দাম গড ব্যয় অপেক্ষা বেশি হওয়ার দরুন ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে। এই অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ OM পরিমাণ উৎপন্নে ফার্মটির মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিলেই পাওয়া যায়। ফার্মের মোট ব্যয় হইতেছে : OM পরিমাণ উৎপন্ন × QM গড় ব্যয় = OMQS ক্ষেত্র। আবার ফার্মের মোট আয় হইতেছে : OM পরিমাণ বিক্রয় × PM দাম = OMPT ক্ষেত্র। সুতরাং ফার্মের স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হইতেছে : OMPT ক্ষেত্র − OMQS ক্ষেত্র = STPQ ক্ষেত্র। OM পরিমাণ ভারসাম্যের উৎপন্নে STPQ ক্ষেত্রই ফার্মের সর্বাধিক সম্ভব মুনাফার পরিমাণ।

বাজারে দাম যদি গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ফার্মের

লোকসান হইবে। স্বল্পকালীন সময়ে লোকসান দিয়াও ফার্ম পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু কতটা পরিমাণ লোকসান দিয়া ফার্ম পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে? যদি দাম এত কম হয় যে, ফার্মের পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমস্তটাও না উঠিয়া আসে, স্থির ব্যয় তো দূরের কথা, তাহা হইলে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় দ্বারা যে পরিমাণ লোকসান দ্বারা যে পরিমাণ লোকসান হইতে পারে, তাহার চেয়ে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন কাজ বন্ধ রাখাই কম লোকসানের। অর্থাৎ দাম যদি পরিবর্তনীয় ব্যয়েরও কম হয় তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। ফার্ম বন্ধ করিয়া দিলে যে লোকসান হইবে, চালু রাখিলে তাহা অপেক্ষা লোকসান আরও বেশি হইবে। ইহার কারণ এই যে, ফার্ম বন্ধ রাখিলে ফার্মের স্থির ব্যয় মাত্র লোকসান হইবে কিন্তু চালু রাখিলে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়েরও কিছুটা লোকসান দিতে হইবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝানো হইল :

ন্যূনতম সম্ভাব্য নীট লোকসানে ফার্মের ভারসাম্য



উপরের চিত্রে ফার্ম যখন OP দামে OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন বা বিক্রয় করে তখন R বিন্দুতে উহার প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে। সুতরাং R বিন্দু হইতে ভূমিতলের অক্ষরেখার উপর লম্ব টানিলে OM পরিমাণ ভারসাম্যের উৎপাদন পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই ভারসাম্য উৎপাদনে ফার্মের লোকসান হইতেছে ; কেননা, এই অবস্থায় দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা কম আছে। কিন্তু কতটা পরিমাণ লোকসান দিয়া এইভাবে ফার্ম

পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া যাইবে? যতটা পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় বাড়াইয়া গেলে ফার্মের লোকসান সর্বাপেক্ষা কম হইবে, ততটা পরিমাণই হইবে ফার্মের ন্যূনতম সম্ভাব্য লোকসানের ভারসাম্য। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে OM পরিমাণ পণ্যে ফার্মের স্বল্পতম লোকসানের ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে। কেননা, OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ে $MR = MC = P = AR$। কিন্তু এই ভারসাম্যে ফার্মের নীট লোকসান হইতেছে। এই লোকসানের পরিমাণ ফার্মের মোট ব্যয় হইতে মোট আয় বাদ দিলেই পাওয়া যাইবে। OM পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ে ফার্মের মোট ব্যয় $= OM \times MK = OMKL$ ক্ষেত্র। মোট আয় $= OM \times OP = OMRP$ ক্ষেত্র। সুতরাং ফার্মের নীট লোকসান বা ঋণাত্মক আয় (negative revenue) $= OMKL - OMRP = PRKL$ ক্ষেত্র। কিন্তু OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে ফার্মের মোট স্থির ব্যয় $= OMBA$ $(= OM \times BM)$ ক্ষেত্র। আবার OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় $= OMNQ$ $(= OM \times MN)$ ক্ষেত্র। এখন ফার্মের মোট ব্যয় OMKL ক্ষেত্র হইতে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় OMNQ ক্ষেত্র বাদ দিলে যে QNKL ক্ষেত্রটি পাওয়া যাইবে উহা ফার্মের প্রকৃত মোট স্থির ব্যয়। এই QNKL ক্ষেত্রটি মোট স্থির ব্যয়ের OMBA ক্ষেত্রের সমান। ফার্মটি OP দামে OM পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিয়া মোট আয় লাভ করিতেছে OMRP ক্ষেত্রের সমান। কিন্তু এই আয়ে ফার্মের মোট স্থির ব্যয় QNKL উঠিয়া আসে না। মোট স্থির ব্যয় QNKL-এর মাত্র QNRP অংশ উঠিয়া আসে, কিন্তু PRKL অংশটি OP দামে বিক্রয় করিয়া উঠানো যায় না। OP দামে বিক্রয় করিলে PRKL ক্ষেত্রই ফার্মের নীট লোকসানের বা নীট ঋণাত্মক আয়ের পরিমাণ। ফার্ম OP দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া এই লোকসান দিয়াও উৎপাদন বন্ধ করিবে না। কেননা, এই অবস্থায় উৎপাদন একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে ফার্মকে স্থির ব্যয়ের সমস্তই ($OMBA = QNKL$ ক্ষেত্র) লোকসান দিতে হইবে।

তাহা হইলে বলা যায় যে, ফার্মের ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্যের প্রধান ও প্রথম শর্ত হইল: $MR = MC$ (ঊর্ধ্বমুখী হইয়া নিচ হইতে দাম রেখাকে ছেদ করিয়া উপরে যাইবে) $= P$। দ্বিতীয় শর্ত হইল: প্রান্তিক ব্যয় ও দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইবে ($MC = P < AC$)। তৃতীয়

শর্ত হইল প্রান্তিক ব্যয় ও দাম পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইবে ($MC = P > AVC$)।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

(Long-run Equilibrium of the Firm under Perfect Competition)

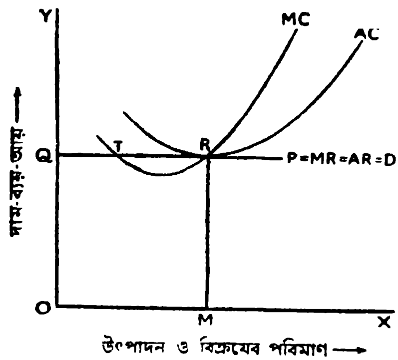
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিটি ফার্ম উহার আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার মত যথেষ্ট সময় পাইয়া থাকে। প্রতিটি ফার্ম যন্ত্রপাতির পরিবর্তন, উৎপাদন পদ্ধতির অদল-বদল, সংগঠন পরিবর্তন প্রভৃতি দ্বারা উৎপাদন মাত্রারও পরিবর্তন করিতে সমর্থ হয়। দীর্ঘকালীন সময়ে কোন শিল্পের অধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যারও হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব এবং যে কোন প্রতিষ্ঠান কোন একটি শিল্প পরিত্যাগ এবং অন্য কোন শিল্পে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।

স্বল্পকালীন সময়ে যেমন সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মুনাফায় ভারসাম্য এবং ন্যূনতম লোকসানে ভারসাম্য—এই দুই প্রকার ভারসাম্য ঘটিতে পারে, দীর্ঘকালীন সময়ে কিন্তু এইরূপ দুইপ্রকার ভারসাম্য ঘটে না। দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্মের মোট আয় মোট উৎপাদন ব্যয়ের অবশ্যই সমান হইবে। যদি মোট আয় মোট ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহার অর্থ হইল, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফার অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে। কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিলে, ঐ প্রতিষ্ঠানটি অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিতে চাহিবে অথবা নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্পে আকৃষ্ট হইবে। ইহার ফলে বাজারে পণ্যের মোট যোগান বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে, তাহা হইলে পণ্যের মোট যোগান বৃদ্ধির ফলে দাম কমিবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ ধরিয়া চলিতে থাকিবে যতক্ষণ না স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা একেবারে অন্তর্হিত হয়। আবার, মোট আয় যদি মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ঠিক বিপরীত ফল দেখা দিবে। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণ কমাইবে এবং শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে। ইহার ফলে বাজারে পণ্যের মোট যোগান হ্রাস পাইবে এবং দাম বাড়িবে।

শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের অবস্থায় মোট আয় এবং মোট ব্যয় পরস্পর সমান হইবে।

দীর্ঘকালীন সময়ে যখন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের মোট আয় মোট ব্যয়ের সমান হয়, তখন গড় আয় অথবা দাম গড় ব্যয়ের সমান (AR=P=AC) হইবে। ইহা ছাড়া, ফার্মের ভারসাম্যের প্রধান এবং সাধারণ শর্তটি অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (অথবা দাম) এবং প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা দীর্ঘকালীন বাজারেও সমানভাবে খাটিবে। কতটা পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে ফার্মের নীট আয় সর্বাধিক হইবে, তাহা এই শর্তটির ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দুইটি শর্ত আছে—প্রথম এবং সাধারণ শর্ত হইল: প্রান্তিক আয় (=দাম)=প্রান্তিক ব্যয় (MR=P=MM)। দ্বিতীয় শর্তটি হইল: দাম=গড় ব্যয় (P=AC)। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়, দাম, প্রান্তিক আয়, গড় আয় এবং গড় ব্যয় পরস্পরের সমান (MC=P=MR=AR=AC)।



উপরের রেখাচিত্রের সাহায্যে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা দেখানো হইল। ফার্মটি যখন OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়াছে তখন উহার প্রান্তিক আয় (দাম) প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত সমান হইয়াছে। অতএব OM হইল পণ্যটির ভারসাম্য উৎপন্ন ও বিক্রয়ের পরিমাণ। OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করাতে ফার্মের গড় ব্যয়ও দামের সহিত সমান হইয়াছে। আবার ভারসাম্যের বিন্দু R-এতে গড় আয়-রেখাটি গড় ব্যয়-রেখার স্পর্শক লইয়াছে। R বিন্দুতে গড় আয়-রেখা গড় ব্যয়-রেখার স্পর্শক না হইলে দাম, গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইতে পারে না। লক্ষণীয় যে, যেহেতু QP রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমান্তরাল এবং AC হইল ইংরেজী অক্ষর U-এর আকৃতিবিশিষ্ট, সেইহেতু, QP রেখা

AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শক। ইহা হইতে মন্তব্য করা যায় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্ম নিম্নতম সম্ভাব্য গড় ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্ম কেবল যে সর্বাধিক সম্ভাব্য মুনাফাই লাভ করে তাহা নহে, উহা স্বাভাবিক মুনাফাও লাভ করে। স্বাভাবিক মুনাফাকে গড় ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

অপূর্ণ বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য
[Equilibrium of the Firm Under Imperfect Competition]

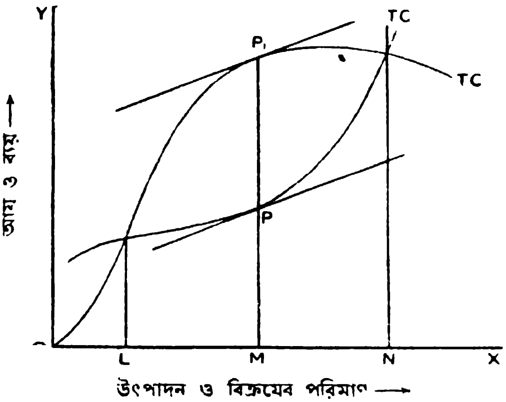
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে যেমন (১) মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে এবং (২) গড় আয় এবং গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য ব্যাখ্যা করা যায় সেইরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেও ঠিক এই পদ্ধতি দ্বারাই ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করা চলে।

মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ
(Firm's Equilibrium Analysis : TR & TC Curves)

যে সকল বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই সেই সকল ক্ষেত্রে মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্যের চিত্ররূপ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্যের চিত্ররূপ হইতে কিছুটা পৃথক হইয়া থাকে। অপূর্ণ বা অনিখুঁত বাজারে ফার্মের মোট আয়-রেখা O বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখে সরলরেখার আকৃতিতে উপরে উঠিয়া যায় না। এইরূপ বাজারে মোট আয়-রেখা উৎপত্তিস্থল হইতে দক্ষিণদিকে ঊর্ধ্বগামী হইয়া উৎপাদনের এক পর্যায়ে সর্বাধিক হয় বটে, কিন্তু তাহার পর ঐ রেখা দক্ষিণে নিম্নগামী হইতে থাকে। পরপৃষ্ঠার চিত্রে মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার ভিত্তিতে কিভাবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ঘটে তাহা দেখানো হইল।

চিত্রে OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। OM পরিমাণ পণ্যে মোট আয় ও মোট ব্যয় রেখার মধ্যে খাড়াখাড়ি দূরত্ব সর্বাধিক। রেখা দুইটির ঢালও যথাক্রমে

P_1 ও P বিন্দুতে সমান এবং রেখা দুইটির উপর উক্ত বিন্দু দুইটিতে স্পর্শক টানিলে স্পর্শক দুইটিও সমান্তরাল হইবে। ফার্ম যদি OL পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তাহা হইলে উহার লাভ বা লোকসান কিছুই হইবে না। কেন না, L বিন্দুতে মোট আয় ও মোট ব্যয় পরস্পর সমান, সেইরূপ



আবার ON পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলেও ফার্মের লাভ বা লোকসান হইবে না। কেন না, N বিন্দুতেও মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান ; অর্থাৎ ফার্মের সর্বাধিক মুনাফার বিন্দু OL এবং ON-এর মধ্যে কোন একটি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে পাওয়া যাইবে। ভারসাম্যের উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OM। L এবং N বিন্দুকে আয়-ব্যয় সমানের বিন্দু (Break-even point) বলা হয়।

গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ
(Firm's Equilibrium Analysis : AR and MR and MC Curves)

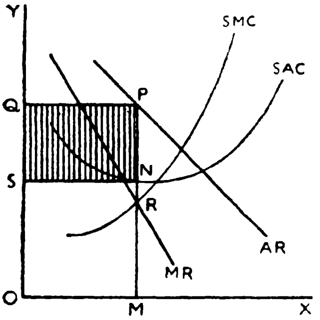
ফার্মের ভারসাম্যের সাধারণ ও প্রধান শর্ত হইল প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা (MR = MC)। এই শর্তটির সাহায্যে ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিশ্লেষণ পৃথকভাবে করা প্রয়োজন।

বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলে ফার্মের গড় আয় রেখা

বাম হইতে দক্ষিণে ঢালু হইয়া থাকে। প্রান্তিক আয়-রেখা গড় আয়-রেখার নিচে থাকে এবং বাম হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে ঢালসম্পন্ন হয় (অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার দ্রষ্টব্য)। স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্য কি ভাবে ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করা হইল :

(১)
স্বল্পকালীন ভারসাম্য

চিত্রে AR ও MR রেখা দুইটি যথাক্রমে ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করিতেছে। SAC ও SMC যথাক্রমে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখা। SMC রেখা MR রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এই R বিন্দু হইতে উপরে AR রেখা স্পর্শ করিয়া P বিন্দুতে এবং নিচে OX অক্ষরেখাকে স্পর্শ করিয়া M বিন্দুতে লম্ব টানা হইল। এই লম্ব PMই ভারসাম্যের দাম। এই দামে OM পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করাতে ফার্মটি সর্বাধিক সম্ভাব্য মুনাফা লাভ করিয়াছে। OM পরিমাণ পণ্যের বিক্রয়ে ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। যদি OM পরিমাণের চেয়ে কম কিংবা OM পরিমাণের চেয়ে বেশি পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতে পারে না। সুতরাং OM ফার্মের ভারসাম্যের উৎপাদন ও বিক্রয় পরিমাণ। তাহা হইলে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের **ভারসাম্যের প্রথম ও প্রধান শর্ত হইল :** প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় (MR = MC)।



কিন্তু ফার্মটির ভারসাম্যের অবস্থায় দাম PM গড় ব্যয় MN অপেক্ষা বেশি (P > AC)। অর্থাৎ ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্মটি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে। এই অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ ভারসাম্যের মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্মের মোট আয় হইল : OMPQ (OM × PM) ক্ষেত্র এবং মোট ব্যয় হইল : OMNS (OM × MN)

ক্ষেত্র। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ হইতেছে: মোট আয় OMPQ ক্ষেত্র − মোট ব্যয় OMNS ক্ষেত্র = SNPQ ক্ষেত্র।

বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, অনিখুঁত বাজারে ফার্মের ভারসাম্য যখন প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান (M = MC) হয়, তখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়েই দাম অপেক্ষা কম (MR = MC < P) হইয়া থাকে। ইহাই স্বল্পকালীন সাম্যের **দ্বিতীয় শর্ত**।

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে **ভারসাম্যের তৃতীয় একটি শর্ত** নির্দেশ করা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের বিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারিত হয় তখন প্রান্তিক ব্যয়-রেখার ঊর্ধ্বমুখী হইবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখা ঊর্ধ্বমুখী হইতে পারে আবার নিম্নমুখী হইলেও চলে। প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নিম্নমুখী হইলে উহা নিম্নমুখী প্রান্তিক আয়-রেখাকে নিচ হইতে ছেদ করে। ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের এই বিশ্লেষণ যে কোন প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে খাটে। একচেটিয়া বাজার, অলিগোপলি, একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতা প্রভৃতি যে কোন প্রকার অনিখুঁত বাজারেই স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা (Supernormal profit) লাভ করিতে পারে আবার লোকসানও দিতে পারে।

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখার সাহায্যে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিশ্লেষণ স্বল্পকালীন ভারসাম্যের বিশ্লেষণ হইতে কিছুটা পৃথক হয়। অবশ্য দীর্ঘ-কালীন বাজারেও স্বল্পকালীন বাজারের ন্যায় ফার্মের **ভারসাম্যের সাধারণ ও প্রধান শর্ত হইল প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা** (MR = MC)।

(২) দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্মের ভারসাম্যের অবস্থার দাম গড় ব্যয়ের সমান হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে। দাম গড় ব্যয়ের সমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যখন বাজারে নূতন ফার্মের প্রবেশের ও বাজার পরিত্যাগের কোন বাধা না থাকে, প্রতিটি বাজারে স্থিতিস্থাপকতা একই রকমের হয় এবং সকল ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয়

ইত্যাদি সমান হয়। এই শর্তগুলি বর্তমান থাকিলে স্বল্পকালীন বাজারের স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা দীর্ঘকালীন বাজারে কোন ফার্মই লাভ করিতে পারে না। কেন না, দীর্ঘকালীন সময়ে নূতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করায় পণ্যের যোগান বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে দাম কমিয়া গড় ব্যয়ের সহিত সমান হয়। আবার, স্বল্পকালীন সময়ে দাম কমিয়া যদি গড় ব্যয় অপেক্ষা অল্প হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দীর্ঘকালীন সময়ে কিছুসংখ্যক ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে কিংবা বাজার পরিত্যাগ করিবে। উহার ফলে পণ্যের যোগান হ্রাস পাওয়ায় দাম বাড়িয়া গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। তবে, বাস্তবক্ষেত্রে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় দাম ও গড় ব্যয়ের সমতা ঘটিতে বড় একটা দেখা যায় না। কেন না, যে শর্তগুলির উপর ইহা নির্ভরশীল তাহা বাস্তবে দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে গড় ব্যয়ের দাম অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনাই থাকে বেশি এবং সেইজন্য ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং ফার্মের **দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত হইল : দাম গড় ব্যয়ের সমান হইতেও পারে, আবার না হইতেও পারে। গড় ব্যয়ের দাম অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।**

পূর্ণ বা নিখুঁত প্রতিযোগিতায় শিল্পের ভারসাম্য
(Equilibrium of Industry under Perfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য তখনই ঘটিবে যখন :

(১) শিল্পটির অন্তর্গত সকল ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে পৌঁছাইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিটি ফার্ম এমনভাবে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে যাহাতে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়।

(২) কোন ফার্ম ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিতে কিংবা নূতন কোন ফার্ম ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ শিল্পটির অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের নিম্নতম গড় ব্যয় ও দাম সমান হয় এবং তাহার ফলে প্রতিটি ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে, তাহা হইলেই শিল্পের ভারসাম্য স্থাপিত হইবে।

অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্যের শর্ত হইল :

(১) প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় (MR = MC)

(২) দাম = গড় ব্যয় (নিম্নতম) [P = AC (minimum)]

অর্থাৎ শিল্পের ভারসাম্যে

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় = দাম = গড় ব্যয়।

স্বল্পকালীন সময়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য কদাচিৎ ঘটিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে তিনপ্রকার অবস্থা ঘটিতে পারে :

স্বল্পকালীন সময়ে শিল্পের ভারসাম্য

(ক) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতে পারে; এবং প্রত্যেকটি ফার্মের নিম্নতম গড় ব্যয়ও দামের সমান হইতে পারে। এ অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম যেমন ভারসাম্যে পৌঁছাইবে, সেইরূপ সমগ্র শিল্পটিও ভারসাম্যে পৌঁছাইবে। কিন্তু এই প্রকার শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য কল্পনা করা গেলেও বাস্তবে ইহা ঘটে না।

(খ) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতে পারে কিন্তু দাম প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হইতে পারে। দাম প্রতিটি ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা কিছুটা বেশি হইতে পারে। এ অবস্থায় যদিও প্রতিটি ফার্মের ভারসাম্য ঘটিয়া থাকে (কেন না, উহাদের প্রত্যেকের MR = MC), কিন্তু তথাপি সমগ্র শিল্পের ভারসাম্য ঘটিতে পারে না (কেন না, প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় দামের সমান নহে)।

(গ) শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইতে পারে ; কিন্তু প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় প্রতিটি ফার্মের ভারসাম্য ঘটে বটে, কিন্তু যেহেতু ফার্মগুলি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, সেইহেতু শিল্পটি ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে না।

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের ভারসাম্যের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিন প্রকারের অবস্থা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মগুলি সমজাতীয় উপাদান দ্বারা উৎপাদন করিতে পারে। এইপ্রকার অবস্থায় ফার্মগুলির প্রত্যেকের গড় ব্যয় পরস্পর সমান হইবে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি পূর্ণ হইবে।

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পের ভারসাম্য

শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মের প্রান্তিক আয়=প্রান্তিক ব্যয়=দাম=গড় ব্যয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ফার্ম তখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমতার বিন্দুতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিবে এবং কোন ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারিবে না। ফলে প্রতিটি ফার্ম ও সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য ঘটিবে।

দ্বিতীয়ত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি যে সকল উপাদান দ্বারা উৎপাদন করে উহাদের মধ্যে উদ্যোক্তা ছাড়া অপর সকল উপাদানগুলি সমজাতীয় হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মগুলির গড় ব্যয় পরস্পর সমান হইতে পারে না। যে ফার্মগুলি অপেক্ষাকৃত দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদ্বারা উৎপাদন করিবে উহাদের গড ব্যয়, যাহারা অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাদ্বারা উৎপাদন করিবে উহাদের গড় ব্যয় অপেক্ষা স্বভাবতই কম হইবে। ফলে, কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে, আবার কেহ কেহ কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। এইরূপ অবস্থায় যদিও শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইবে, তথাপি পণ্যের দাম ও সকল ফার্মগুলির গড় বায় সমান না হওয়ায় (অর্থাৎ সকল ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে না বলিয়া) সমগ্র শিল্পটির ভারসাম্য ঘটিতে পারে না।

তৃতীয়ত, শিল্পের অন্তর্গত ফার্মগুলি যে সকল উপাদান দ্বারা উৎপাদন করে উহারা বি-জাতীয় (heterogeneous) হইতে পারে। এই অবস্থায় ফার্মগুলির গড় ব্যয়ের পার্থক্য আরও বেশি হইবে। ফলে, কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে, আবার কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। এক্ষেত্রেও সমগ্র শিল্পটির দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটিতে পারে না।

অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের প্রবণতা মাত্র তখনই দেখা যায় যখন সকল ফার্ম সমজাতীয় উপাদান দ্বারা উৎপাদন করিতে পারে এবং উৎপাদক ফার্মগুলির আয়তন ও সংখ্যা পরিবর্তনের কোন বাধা থাকে না এবং নূতন ফার্মের শিল্পে প্রবেশে কোন বাধা থাকে না।

অপূর্ণ বা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের ভারসাম্য
(Equilibrium of Industry under Imperfect Competition)

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বহু রকমের লক্ষণবিশিষ্ট বাজার দেখা যায়। উহাদের মধ্যে একচেটিয়া বাজার হইল চরম অনিখুঁত বাজার। তাহাছাড়া রহিয়াছে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার, ডুয়োপলি, অলিগোপলি প্রভৃতি বাজার।

একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে, ঐ একটিমাত্র ফার্মদ্বারাই শিল্প গঠিত হয়। উৎপাদক ফার্ম ও শিল্প এক হইয়া পড়ে বলিয়া ফার্মের ভারসাম্য ও শিল্পের ভারসাম্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। একচেটিয়ার বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের শর্তগুলিই শিল্পেরও ভারসাম্যের শর্ত বলিয়া গণ্য হয়। **ভারসাম্যের প্রথম শর্ত হইল : প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়** (প্রান্তিক ব্যয়-রেখা দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিতে পারে কিংবা দক্ষিণে নিম্নমুখী হইয়া প্রান্তিক আয়-রেখাকে ছেদ করিতে পারে)। **দ্বিতীয় শর্ত হইল : প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় দাম অপেক্ষা কম**। অর্থাৎ ভারসাম্যের অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত লাভ সম্ভব হয়।

অনিখুঁত বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, পণ্যের পৃথকীকরণ (Product differentiation)। এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায় সমশ্রেণীর পণ্য বিক্রয় করিলেও উহারা সম্পূর্ণ সমজাতীয় নহে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগী ফার্মের পণ্যের মধ্যে কিছুটা মিল থাকিলেও উহারা সম্পূর্ণভাবে একপ্রকার নহে। বিভিন্ন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে না বলিয়া এই বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সমগ্র শিল্প গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং অনিখুঁত বাজারে সমগ্র শিল্পের ভারসাম্যের ধারণাটি ব্যবহার করা চলে না। এই প্রকার বাজারে যে সকল প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্যের মধ্যে খুব মিল থাকে উহারা এক একটি গোষ্ঠী গঠন করিয়া থাকে। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা খুব সামান্যই দেখা যায়; কিন্তু প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উৎপাদক ফার্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। কিন্তু গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মগুলি একে অন্যের প্রতিযোগী হইলেও উহারা কিছুটা পরিমাণে একচেটিয়া ক্ষমতারও

অধিকারী। সুতরাং অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্য বলিতে গোষ্ঠীগত ভারসাম্য (Group Equilibrium) বুঝাইয়া থাকে, শিল্পের ভারসাম্য বুঝায় না।

স্বল্পকালীন সময়ে গোষ্ঠীর ভারসাম্য দুইটি শর্তের উপর নির্ভর করে: প্রথম শর্ত হইল—গোষ্ঠীর অন্তর্গত ফার্মগুলির প্রত্যেকটির প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। দ্বিতীয় শর্ত হইল—প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় পণ্যের দামের সমান হওয়া চাই। স্বল্পকালীন সময়ে প্রথম শর্তটি পূর্ণ হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি পূর্ণ হয় না বলিয়া, গোষ্ঠীর ভারসাম্য সম্পূর্ণভাবে ঘটে না। স্বল্পকালীন সময়ে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে গড় ব্যয় ও দাম পরস্পর সমান হয় না। গড় ব্যয় দাম অপেক্ষা কম হয় এবং উভয়ে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়। ফলে গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন কোন ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিয়া থাকে।

দীর্ঘকালীন সময়ে যদি ফার্মগুলির কোন গোষ্ঠীতে প্রবেশের বাধা না থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে দামও গড় ব্যয়ের সমান হইবার প্রবণতা থাকে। এই অবস্থায় গোষ্ঠীর অন্তর্গত ফার্মগুলি স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করিতে পারে এবং গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটিতে পারে। কিন্তু গোষ্ঠীর এই ভারসাম্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অনুরূপ্ নহে। কেন না, গোষ্ঠীর অন্তর্গত ফার্মগুলির গড় ব্যয় যখন দামের সমান হয় এবং উহারা স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে সক্ষম হয় তখন উহাদের গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় না। ফলে, ফার্মগুলির দীর্ঘকালীন সময়েও স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফাই উপার্জন করিয়া থাকে। অতএব অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটিবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

১৮ | নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ

(Pricing under Perfect Competition)

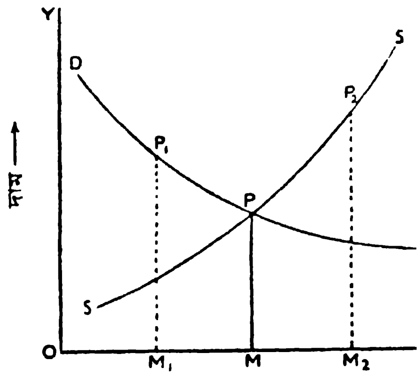
নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অগণিত। বিক্রেতা ও ক্রেতার সংখ্যা অগণিত বলিয়া পণ্যের মোট যোগান ও মোট চাহিদার তুলনায় কোন একজন বিক্রেতা বা ক্রেতার যোগান বা চাহিদার পরিমাণ অতি নগণ্য। এই বাজারে সকল বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে। ফলে, কোন ক্রেতার কোন একজন বিক্রেতার পণ্যের উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকে না। বাজারে সর্বত্র একই দামে ক্রেতা-বিক্রেতাগণ পণ্যটি কেনা-বেচা করে। কোন ক্রেতা কোন বিক্রেতার নিকট হইতে কম দামে পণ্যটি ক্রয় করিতে পারে না, আবার কোন বিক্রেতাও কোনও ক্রেতার উপর বাজারে চলতি দাম অপেক্ষা বেশি দাম চাপাইতে পারে না। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধে শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে আবার শিল্প পরিত্যাগও করিতে পারে।

ভারসাম্য দাম নির্ধারণ

(Determination of the Equilibrium Price)

যে কোন প্রকার বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয়। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারেও চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দাম নির্ধারণ করিয়া থাকে। অবশ্য কোন একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান দামের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। বাজারে সকল ক্রেতার মোট চাহিদা এবং সকল বিক্রেতার মোট যোগান দাম নির্ধারণ করে। যে দামে বাজারের মোট চাহিদা ও মোট যোগান পরস্পরের সমান হয়, উহাকেই বাজারের ভারসাম্য দাম বলা হয়। ভারসাম্য দামে ক্রেতাগণ যে পরিমাণ পণ্য কিনিতে ইচ্ছুক, বিক্রেতাগণও ঠিক একই পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে চায়। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ পণ্যের কেনা-বেচা হয় উহাকে ভারসাম্য পরিমাণ বা ভারসাম্য পণ্য বলে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, যদিও চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দাম নির্ধারিত হয়, তথাপি আবার চাহিদা ও যোগান উভয়েই দাম দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। কোন দামে চাহিদা যোগান অপেক্ষা বেশি হইলে দাম বাড়িয়া যাইবে। তাহার ফলে চাহিদা সঙ্কুচিত হইবে এবং যোগান বাড়িয়া যাইবে। আবার কোন দামে চাহিদা অপেক্ষা যোগান বেশি হইলে দাম কমিয়া যাইবে। উহার ফলে চাহিদা বাড়িবে এবং যোগান সঙ্কুচিত হইবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সহিত সমান না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত দাম, চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন চলিতে থাকিবে। দাম যে বিন্দুতে পৌঁছাইলে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হইবে উহাই দামের ভারসাম্য বিন্দু। দামের ভারসাম্য বিন্দুতে দাম, চাহিদা ও যোগান স্থিতিশীলতা লাভ করে। দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় দাম, চাহিদা ও যোগান একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়া পারস্পরিক ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়। চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা ভারসাম্য দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা বুঝানো হইল :



ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ-

DD ক্রেতাগণের মোট চাহিদা বা বাজার চাহিদা-রেখা নির্দেশ করিতেছে এবং SS বিক্রেতাগণের মোট যোগান বা বাজার যোগান-রেখা নির্দেশ করিতেছে। রেখা দুইটি P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। P বিন্দুই ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু হইতে OX অক্ষরেখার উপর লম্ব টানিয়া যে

PM রেখা আঁকা হইয়াছে উহাই ভারসাম্য দাম নির্দেশ করিতেছে। এই দামে যোগান ও চাহিদার পরিমাণ পরস্পর সমান। OM হইল পণ্যের ভারসাম্য পরিমাণ। পণ্যের দাম স্বভাবত PM হইবে। যদি দাম PM হইতে কম-বেশি হয় তাহা হইলে চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দামকে PM-এর সমান করিতে বাধ্য করিবে। মনে কর, দাম PM না হইয়া P_1M_1 হইল। P_1M_1 দামে চাহিদার পরিমাণ হইবে মাত্র OM_1, কিন্তু বিক্রেতাগণ OM_1 অপেক্ষা অনেক বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যোগানের পরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়া দাম স্বভাবতই হ্রাস পাইবে। আবার মনে কর, দাম P_2M_2 হইল। এই দামে ক্রেতাগণ OM_2 পরিমাণ পণ্য কিনিতে ইচ্ছুক, কিন্তু বিক্রেতাগণ OM_2 অপেক্ষা অনেক কম পণ্য যোগান দিতে ইচ্ছুক। চাহিদার পরিমাণ যোগানের তুলনায় অতিরিক্ত বলিয়া দাম বাধ্য হইয়া বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দাম যখন PM-এতে ধার্য হইবে তখন চাহিদাও অতিরিক্ত হইবে না কিংবা যোগানও অতিরিক্ত হইবে না। PM-এতে দাম স্বভাবতই স্থিতিশীল হইবে এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হইবে।

ভারসাম্য দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব
(Importance of Time in the determination of Price Equilibrium)

যদিও চাহিদা ও যোগানের প্রতিক্রিয়া দ্বারাই দাম নির্ধারিত হয়, তথাপি চাহিদা ও যোগানই দাম নির্ধারণের চূড়ান্ত শক্তি নহে। বহু শক্তি চাহিদা ও যোগানের মধ্য দিয়া দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আবার, দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের ভূমিকাও সকল সময়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ নহে। সময়ের তারতম্য অনুসারে দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের প্রভাব কম-বেশি হইয়া থাকে। অধ্যাপক মার্শালের মতানুযায়ী সাধারণভাবে বলা যায় যে, যত কম সময়ে দাম নির্ধারিত হইবে, দামের উপর চাহিদার প্রভাব তত বেশি হইবে; আবার, যত বেশি সময়ে দাম নির্ধারিত হইবে, দামের উপর যোগান অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব তত অধিক হইবে।

মার্শাল তিন প্রকার সময়-কালের ভিত্তিতে ভারসাম্য দাম বিশ্লেষণ

করিয়াছেন। প্রথমত, **অতি অল্পকালীন সময় বা বাজার-কাল** (Very Short Period or Market Period)। এই সময়ে পণ্যের যোগান একটুও হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না। ফলে, এই সময়ে চাহিদার পরিবর্তন ঘটিলে যোগান ঐ পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয়ত, **স্বল্পকালীন সময়** (Short Period or Short-run)। এই সময়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সীমাবদ্ধ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে। ফলে, প্রতিষ্ঠান-গুলি এই সময়ে চাহিদা পরিবর্তনের সহিত পণ্যের যোগানে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য ঘটাইতে পারে না, অংশত সামঞ্জস্য ঘটাইতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, **দীর্ঘকালীন সময়** (Long Period or Long-run)। এই সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি ও শিল্প উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে। ফলে, যে কোন প্রকার চাহিদা পরিবর্তনের সহিত উহারা যোগানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম হয়। মার্শাল-নির্দিষ্ট এই তিনটি সময়-কালেই দামের ভারসাম্য ঘটিতে পারে। কিন্তু এই তিনটি সময়-কালের ভারসাম্য দামের প্রকৃতি এক নহে। সময়ের পার্থক্য হেতু এই তিনটি দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান এবং উহাদের পশ্চাতের শক্তিগুলি একই প্রকার প্রভাব বিস্তার করে না। দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব ইহা হইতেই সঠিক বুঝিতে পারা যায়।

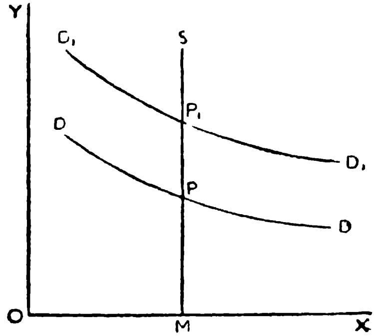
অতি অল্পকালীন ভারসাম্য : বাজার দাম নির্ধারণ
(Very Short Period Equilibrium : Determination of the Market Price)

অতি অল্পকালীন সময় বলিতে এমন সময় বুঝায় যে সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পণ্যের যোগান একটুও হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই অতি অল্পকালীন সময়কে বাজার-কালও বলা হয়। এই সময়ে পণ্যের যোগান বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে যে পরিমাণ পণ্য মজুত আছে তাহা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এই সময়ে যোগানের পরিমাণ সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া যোগান-রেখা সাধারণত ভূমিতলের অক্ষরেখা হইতে উপরের দিকে একটি লম্ব টানিয়া নির্দেশ করা হয়। অবশ্য পণ্যটি যদি পচনশীল না হয়, যদি উহা অল্প কয়েকদিনের জন্য ধরিয়া রাখা সম্ভব হয়,

তাহা হইলে সেক্ষেত্রে পণ্যটির যোগান-রেখা নিচের দিকে বাম হইতে দক্ষিণে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী, আবার, উপরের দিকে কিছুটা লম্ব রেখার আকৃতি গ্রহণ করিতে পারে।

পচনশীল পণ্যের বেলায় অতি অল্পকালীন ভারসাম্য বা বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা এখন বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের অনুপযুক্ত। উহার চাহিদা কম হইলে উহা কিছুটা সময় ধরিয়া রাখা যায় না, কম দামেই সবটা বিক্রয় করিতে হয়। কম দামে বিক্রয় করাতে কিছুটা লোকসান হয় বটে। কিন্তু যদি উহা একেবারেই বিক্রয় করা না হয় তাহা হইলে সমস্তটাই লোকসান হইবে। আবার, পণ্যটির চাহিদা বেশি হইলে ঐ বেশি দামেই দ্রব্যটির সবটা বিক্রয় করিতে হয়। অতএব, দেখা যায় যে, পচনশীল দ্রব্যের ভারসাম্য দাম প্রধানত চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্যের চাহিদা বাড়িলে দামও বাড়িবে, আবার চাহিদা কমিলে দামও কমিবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে অতি অল্পকালীন ভারসাম্য বা বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় দেখানো হইল:

পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রে SM হইল পচনশীল পণ্যটির যোগান-রেখা। এই রেখাটি চাহিদা-রেখা DDকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ভারসাম্য বিন্দু P অনুসারে বাজার দাম হইতেছে PM এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হইতেছে OM। যদি চাহিদা বাড়িবার ফলে চাহিদা-রেখা ডান দিকে সরিয়া D_1D_1তে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে নূতন ভারসাম্য বিন্দু P_1 অনুসারে বাজার-দাম হইবে P_1M।



অতি অল্পকালীন সময়ের বাজারে কেবল যে পচনশীল পণ্যেরই বেচা-কেনা হয় তাহা নহে। অনেক দ্রব্য আছে যাহা কিছুটা সময় সংরক্ষণ করা চলে। এই সকল দ্রব্যের পছন্দসই দাম না পাইলে বিক্রেতাগণ উহাদিগকে কিছুকালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে। এইরূপ যে সকল পণ্য ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখা চলে উহাদের যোগান অতি অল্পকালীন সময়েও

পরিবর্তনীয়। এই সকল পণ্যের বেলায় যদি বাজারের চাহিদা নরম হয়, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ ভবিষ্যৎ বাজারে অধিক দামে বিক্রয় করিবার আশায় কিছু পরিমাণ পণ্য বাজার হইতে সরাইয়া রাখিবে। এইভাবে পণ্য কিছুটা সরানোর ফলে বর্তমান বাজারে পণ্যের যোগান কমিয়া বাজার দাম বাড়িতে পারে। অপর দিকে, বাজার চাহিদা যদি চড়া হয়, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ সবটা পণ্য বাজারে ছাড়িয়া দিয়া পণ্যের যোগান বৃদ্ধি করে এবং তাহার ফলে বাজার দামও হ্রাস পাইবে।

সংরক্ষণোপযোগী পণ্যের বেলায় বিক্রেতাগণ পছন্দমত দাম না পাইলে পণ্যের কিছুটা বিক্রয় না করিয়া সরাইয়া রাখিতে পারে। বিক্রেতাগণের বর্তমান বাজার হইতে এইরূপ পণ্য সরানো কিংবা বাজারে মাল ছাড়া বিশেষভাবে নির্ভর করে পণ্যের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দামের উপর। কিন্তু বর্তমান বাজারে তাহারা আদৌ বিক্রয় করিবে কি না কিংবা কিছুটা পণ্য ভবিষ্যৎ বাজারের জন্য সরাইয়া রাখিবে কি না তাহা নির্ভর করে পণ্যের সংরক্ষণ দামের (reservation price) উপর। এই সংরক্ষণ দাম বলিতে বিক্রেতাগণের সর্বনিম্ন দাম বুঝায়—যে দামের কমে তাহারা পণ্য মোটেই বিক্রয় করিবে না। ভবিষ্যৎ বাজারে সম্ভাব্য দাম হইতে পণ্য ধরিয়া রাখিবার খরচ বাদ দিলেই কোন বিক্রেতার সংরক্ষণ দাম নির্ণয় করা যায়। যদি কোন বিক্রেতা তাহার পণ্যের ভবিষ্যৎ দাম ২০৲ টাকা হইবে ধারণা করে এবং ঐ সময় অবধি পণ্য ধরিয়া রাখিবার খরচ ৫৲ টাকা হয় তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ দাম ১৫৲ টাকা হইবে। বর্তমান বাজার দাম এই সংরক্ষণ দামের চেয়ে কম হইলে সে মাল মজুত রাখিয়া ভবিষ্যৎ বাজারের জন্য অপেক্ষা করিবে, যতদিন না বাজার দাম সংরক্ষণ দামের সমান হয়। বিক্রেতার সংরক্ষণ দাম কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

সংরক্ষণ দাম ও উহার নির্ধারকসমূহ

(১) বিক্রেতার ভবিষ্যৎ বাজার ও দাম সম্বন্ধে ধারণা বা আন্দাজের উপর। সে যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে বাজারে পণ্যের যোগান বাড়িবে এবং তাহার ফলে দাম হ্রাস পাইবে তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ দামও কম হইবে।

(২) পণ্যের যোগান যদি একচেটিয়া বিক্রেতার হাতে থাকে তাহা হইলেও বিক্রেতার সংক্ষরণ দাম বেশি হইবে। কেন না, এ ক্ষেত্রে বাজারে

পণ্যের যোগান টান ও দাম বাড়িবার আশঙ্কা আছে।

(৩) পণ্য কতদিন ধরিয়া রাখিতে হইবে, গুদাম ভাড়া, ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ কত ব্যয় হইবে—তাহার উপরও বিক্রেতার সংরক্ষণ দাম নির্ভর করে। যদি বিক্রেতার আন্দাজ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাজার-দাম বেশি না বাড়ে, অথচ সেই অনুপাতে পণ্য ধরিয়া রাখিবার আনুসঙ্গিক ব্যয় বেশি দিতে হয় তাহা হইলে সংরক্ষণ দামও বেশি হইবে।

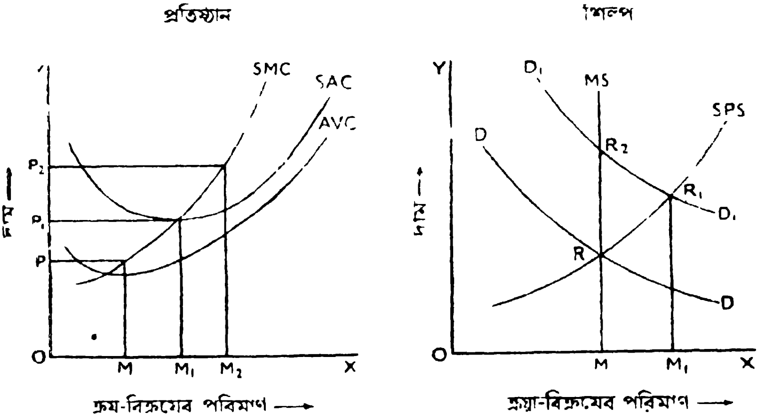
(৪) বিক্রেতার নগদ টাকার পছন্দনীয়তা বা প্রয়োজন। বিক্রেতার যদি তাড়াতাড়ি পণ্য বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহার পণ্যের সংরক্ষণ দাম কম হইবে।

স্বল্পকালীন ভারসাম্যঃ স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারণ
(Short-run Equilibrium : Determination of Short-run Normal Price)

স্বল্পকালীন সময় বলিতে এমন সময়-কাল বুঝায় যাহার মধ্যে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের আয়তন ও স্থায়ী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। এই সময়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান উহার সীমাবদ্ধ উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। কোন শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে, স্বল্পকালীন সময়ে ঐ শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বাড়িতে বা কমিতে পারে না। স্বল্পকালীন সময়-কাল এত সামান্য যে, উহার মধ্যে কোন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে না কিংবা কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের সীমাবদ্ধ সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে উৎপাদন বাড়াইতে বা কমাইতে পারে বলিয়া এই সময়ে চাহিদা পরিবর্তনের সহিত যোগানের পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারে না।

স্বল্পকালীন সময়ে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই উহার যোগান-রেখা। আবার শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানগুলির প্রান্তিক ব্যয়-রেখার সমষ্টিই শিল্পের যোগান-রেখা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অতি অল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যোগান রেখা যেমন উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি সত্ত্বেও লম্ব হয়, স্বল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা বাম হইতে

দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। ইহার কারণ এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে কোন প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উহার পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইতে হয়। পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতই বাড়িয়া থাকে এবং যোগান-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। আবার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যোগান-রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় বলিয়া শিল্পের যোগান-রেখা কিংবা পণ্যটির বাজারের মোট যোগান-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। নিচে পাশাপাশি দুইটি চিত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য বা স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা হইল:



স্বল্পকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা ($P = MC$)। উৎপাদনের যে মাত্রায় দাম ও প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় সমান হইবে উহাই প্রতিষ্ঠানের সেই পরিমাণ উৎপাদন যাহা হইতে সর্বাধিক মুনাফা লাভ হইতে পারে। প্রথম চিত্রটিতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম হইতেছে OP কিংবা OP_1 কিংবা OP_2 এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে হইতেছে OM, OM_1, ও OM_2। OP, OP_1 এবং OP_2—এই প্রতিটি দাম এবং প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান। কিন্তু এই প্রতিটি স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেও

প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম

গড় ব্যয়ের সমান নহে। OP গড় ব্যয়ের কম, OP_1 গড় ব্যয়ের সমান আবার OP_2 গড় ব্যয়ের বেশি। যেহেতু কোন প্রতিষ্ঠান লোকসানে ভারসাম্য লাভ করে, আবার কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, সেইজন্য স্বল্পকালীন ভারসাম্য স্থায়ী হইতে পারে না। স্বল্পকালীন ভারসাম্যকে অস্থায়ী ভারসাম্য বলা হয়।

দ্বিতীয় চিত্রে শিল্পের মোট চাহিদা ও মোট যোগান যথাক্রমে DD ও SPS রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখার ছেদবিন্দু R অনুযায়ী ভারসাম্য দাম হইতেছে RM এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে OM। এখন স্বল্পকালীন সময়ে যদি চাহিদা বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে মূল চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া D_1D_1 রেখাতে রূপান্তরিত হইবে। ফলে, এই নূতন চাহিদা-রেখা যোগান-রেখা SPSকে R_1 বিন্দুতে ছেদ করিবে, নূতন ভারসাম্য দাম বাড়িয়া R_1M_1 হইবে এবং নূতন ভারসাম্য উৎপাদনও বাড়িয়া OM_1 হইবে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদি অতি অল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড়িয়া এইভাবে উচ্চতর D_1D_1 রেখার রূপান্তরিত হইত তাহা হইলে উহা অতি অল্পকালীন যোগান-রেখা MSকে (অতি অল্পকালীন সময়ে যোগান-রেখা MS লম্বের আকার ধারণ করে।) R_2 বিন্দুতে ছেদ করিত। ফলে, অতি অল্পকালীন বাজারে ভারসাম্য দাম বাড়িয়া RM_2 হইত এবং ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিত অবস্থায় OMই থাকিয়া যাইত। এই অতি অল্পকালীন বাজারের দাম R_2M স্বল্পকালীন বাজারের দাম R_1M_1 অপেক্ষা বেশি বাড়িত। অতএব বলা চলে যে, চাহিদা বাড়িলে অতি অল্পকালীন সময়ে ভারসাম্য দাম স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম অপেক্ষা বেশি হয়, কিন্তু ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ অতি অল্পকালীন বাজারে একটুও বাড়ে না, অথচ স্বল্পকালীন ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়া থাকে।

শিল্পের দিক হইতে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম

স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম বিশ্লেষণের সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বল্পকালীন বাজারে দাম শিল্পের অধীন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইলেও, শিল্পের ভারসাম্য ঘটে না। ইহার কারণ এই যে, শিল্পের অধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে না, কোনটি স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে, কোনটি বা লোকসানে ভারসাম্য লাভ করে।

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য : দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম নির্ধারণ
(Long-run Equilibrium : Determination of Long-run Normal Price)

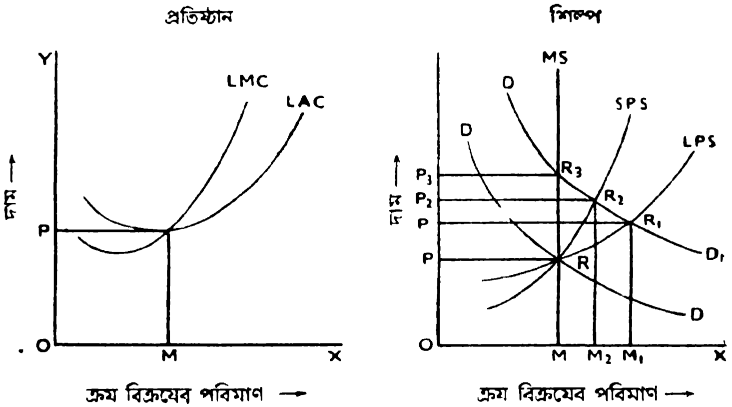
দীর্ঘকালীন সময় বলিতে এমন যথেষ্ট সময়-কাল বুঝায় যাহার মধ্যে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের আয়তন, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন ক্ষমতার যেমন খুশি পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। এই সময়ে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার পরিবর্তন সম্ভব হয়, নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে যোগ দিতে পারে আবার পুরাতন প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্যের চাহিদা পরিবর্তনের সহিত যোগান সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারে।

দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন মাত্রা ও উৎপাদন ক্ষমতা পরিবর্তন করিতে সক্ষম হয় বলিয়া উহারা সকলেই সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ে পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা করে। যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালে লোকসান দিয়া পণ্য উৎপাদন করে উহারা দীর্ঘকালীন বাজারে যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তন ঘটাইয়া, গড ব্যয় কমাইয়া দামের সমান করিতে চেষ্টা করে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যদি স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফাতে পণ্য বিক্রয় করে তাহা হইলে উহা দেখিয়া নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে। ফলে, পণ্যের যোগান বাড়িয়া যাইবে, দাম নামিয়া সর্বনিম্ন গড ব্যয়ের সমান হইবে। এই কারণে একই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিতে স্বল্পকালীন গড ব্যয় যাহা পডে উহার তুলনায় দীর্ঘকালীন গড ব্যয় কম পড়ে। সেইজন্য আবার দীর্ঘকালীন যোগান-রেখার ঊর্ধ্বগামী ঢাল স্বল্পকালীন যোগান-রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হয়।[১] নিচে পাশাপাশি দুইটি চিত্রের সাহায্যে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বা দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ করা হইল :

স্বল্পকালীন সময়ের ন্যায় দীর্ঘকালীন সময়েও প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দাম ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা। উৎপাদনের যে মাত্রায়

১. দীর্ঘক লে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইয়াছে ধরিয়া লইলে যে গান-বেখা বাম হইতে দাক্ষণে ঊর্ধ্বগ মী হইবে।

দাম ও প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় সমান উহাই পণ্যের ভারসাম্যের বা সর্বাধিক মুনাফার পরিমাণ। প্রথম চিত্রটিতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম



হইতেছে OP এবং ভারসাম্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইতেছে OM।

প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম

দীর্ঘকালীন বাজারে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের আর একটি শর্ত এই যে, দাম সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। দাম সর্বনিম্ন গড ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে। কিন্তু নিখুঁত দীর্ঘকালীন বাজারে ইহা সম্ভব নহে। কেন না, বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে দেখিলে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে। তাহার ফলে পণ্য যোগান বৃদ্ধি পাইয়া দাম কমিয়া সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ের সমান হইবে। আবার, দীর্ঘকালীন বাজারে দাম সর্বনিম্ন গড ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘকালীন সময়ে লোকসান দিয়া পণ্য বিক্রয় করিতে পারে না। এই অবস্থায় পুরাতন কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে। তাহার ফলে পণ্যের যোগান কমিয়া দাম বৃদ্ধি পাইয়া গড় ব্যয়ের সমান হইবে।

দ্বিতীয় চিত্রে শিল্পের দীর্ঘকালীন মোট চাহিদা ও মোট যোগান যথাক্রমে DD ও LPS রেখা দুইটি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। R বিন্দুতে দীর্ঘকালীন

ভারসাম্য দাম OP এবং পণ্যের ভারসাম্য পরিমাণ হইয়াছে OM। চাহিদা বাড়িলে চাহিদা-রেখা D_1D_1 রেখায় রূপান্তরিত হইবে এবং নূতন চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে নূতন ভারসাম্য বিন্দু R_1-এতে ছেদ করিবে। R_1 বিন্দু অনুসারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম OP_1 এবং পণ্যের ভারসাম্য পরিমাণ OM_1 হইবে। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড়িলে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দাম OP হইতে বাড়িয়া OP_2 হইত এবং স্বল্পকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ OM হইতে বাড়িয়া OM_2 হইত। আবার, অতি অল্প-কালীন সময়ে চাহিদা বাড়িলে অতি অল্পকালীন ভারসাম্য দাম OP হইতে বাড়িয়া OP_3 হইত কিন্তু পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ OM-ই থাকিত। এই বিশ্লেষণ হইতে মন্তব্য করা চলে যে, অতি অল্পকালীন ভারসাম্য দাম অপেক্ষা স্বল্পকালীন ভারসাম্য কম হয় এবং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম সর্বাপেক্ষা কম হয়। আবার, অতি অল্পকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, স্বল্পকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং দীর্ঘকালীন পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি পরিবর্তিত হয়।

শিল্পের দিক হইতে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, স্বল্পকালীন সময়ে মোট গড় ব্যয় পণ্যের দাম হইতে উঠিয়া না আসিলেও প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করে না। স্বল্প-কালীন সময়ে মোট গড় ব্যয়ের মধ্যে কিছুটা গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং কিছুটা গড় স্থির ব্যয় থাকে। এই সময়ে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় যদি পণ্যের দাম হইতে উঠিয়া আসে, আর গড় স্থির ব্যয় যদি আদৌ উঠিয়া না আসে, তাহা হইলে লোকসান দিয়াও প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করিবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে মোট গড় ব্যয় (গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় + গড় স্থির ব্যয়) দাম হইতে না উঠিলে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি পরিবর্তনীয় বলিয়া সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয় হয়, স্থির ব্যয় বলিয়া কোন ব্যয় থাকে না। স্বল্পকালীন সময়ে দাম হইতে স্থির ব্যয় না উঠিলেও যেমন প্রতিষ্ঠান লোকসান দিয়া পণ্য বিক্রয় করে, দীর্ঘকালীন সময়ে কিন্তু স্থির ব্যয় দাম হইতে অবশ্য উঠিয়া আসা চাই। স্থির ব্যয় না উঠিলে লোকসান

দীর্ঘকালীন ভারসাম্য এবং স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয়

দিয়া দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্য বিক্রয় করা চলে না। দীর্ঘকালীন সময়ে স্থির ব্যয়কে অবহেলা করা চলে না বলিয়া দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়কে সত্যকার ব্যয় বলিয়া গণ্য করা হয়।[১] দীর্ঘকালীন সময়ে দাম মোট গড় ব্যয়ের সমান হয় এবং প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। আবার, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানগুলি সমান নিম্নতম গড ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বলিয়া প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করিবার প্রবণতা দেখা যায় না। কোন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করে না এবং কোন পুরাতন প্রতিষ্ঠানও শিল্প পরিত্যাগ করে না। ফলে, শিল্পের স্থায়ী ভারসাম্য প্রাপ্তি ঘটে।

উৎপন্নবিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম
(Laws of Returns and Long-run Equilibrium Price)

দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্প যখন পণ্য উৎপাদন করে তখন উহাতে বিভিন্ন উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইতে পারে। দীর্ঘকালীন সময়ে শিল্পে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি, সমহার উৎপন্ন বিধি এবং ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির যে কোনটা কার্যকর হইতে পারে। উৎপন্ন বিধির প্রত্যেকটির কার্যকারিতার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের প্রান্তিক ও গড় ব্যয় এবং পণ্যের যোগান-রেখা বিভিন্ন হইতে বাধ্য। শিল্পে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি অথবা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় কার্যকর হইলে, প্রান্তিক ও গড় ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া থাকে। যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধ্বগামী বা ধনাত্মক হয়। শিল্পে সমহার উৎপন্ন বিধি অথবা সমহার ব্যয় বিধি কার্যকর হইলে, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় একই থাকিয়া যায়, বাড়েও না কমেও না। চাহিদা-রেখা সমান্তরাল থাকে। আবার, শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি অথবা ক্ষীয়মাণ উৎপাদন ব্যয় কার্যকর হইলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় কমিতে থাকে। চাহিদা-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী বা ঋণাত্মক হয়। উৎপন্ন বিধির এই তিনটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিরূপে ও কোথায় নির্ধারিত হইবে তাহা নিচে পৃথকভাবে আলোচনা করা হইল :

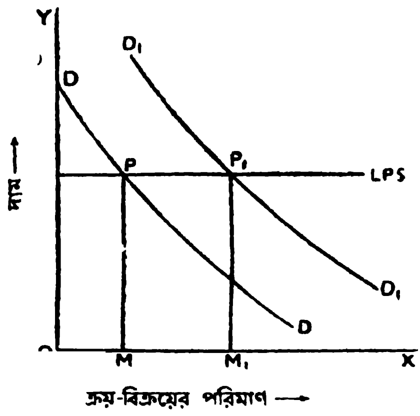
---

১. "Fixed costs are true costs only in the long run."

(ক) ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Law of Diminishing Returns and Long-run Equilibrium): দীর্ঘকালীন সময়ে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে পণ্যের যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। এই অবস্থায় চাহিদা বাড়িলে ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ দুইই বাড়িবে। আবার, চাহিদা কমিলে ভারসাম্য দাম এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ দুই-ই কমিবে। আমরা পূর্বে যে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ও স্বাভাবিক দাম নির্ধারণের আলোচনা করিয়াছি সেখানে শিল্পে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি বা ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি কার্যকর রহিয়াছে ধরিয়া লইয়াছি। ঐ আলোচনা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুনর্বার ঐ আলোচনা এখানে অবান্তর।

(খ) সমহার উৎপন্ন বিধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Law of Constant Returns and Long-run Equilibrium): শিল্পে সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে যোগান-রেখা OX অক্ষরেখার সমান্তরাল হইবে। পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রান্তিক ও গড় ব্যয় একই থাকিবে। অর্থাৎ সমহার উৎপাদন ব্যয় বিধি বলবৎ রহিবে। এক্ষেত্রে চাহিদা বাড়িলে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম একই থাকিয়া যাইবে কিন্তু ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ভারসাম্যের পরিবর্তন দেখানো হইল :

চিত্রে LPS পণ্যের যোগান-রেখা। সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায় এই রেখাটি অক্ষরেখার সমান্তরাল হইয়াছে। চাহিদা-রেখা DD যোগান-রেখাকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P বিন্দুতে ভারসাম্য দাম PM এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM হইয়াছে। এখন চাহিদা বাড়িলে চাহিদা-রেখা DD ডানদিকে স্থানান্তরিত হইয়া D_1D_1 আকার গ্রহণ

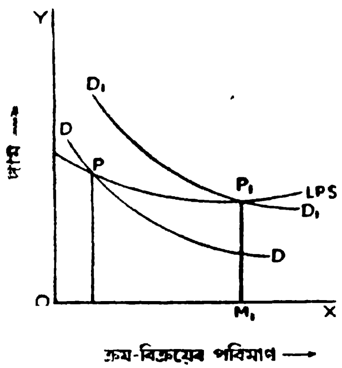


করিবে। নূতন চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ

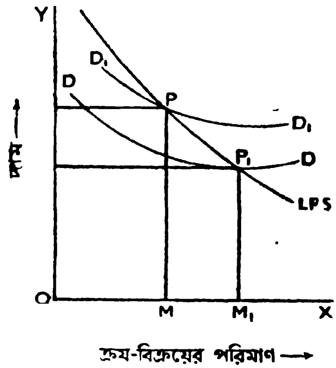
করিবে। P_1 বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য দাম P_1M এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM_1 হইবে। সুতরাং বলা যায় যে, শিল্পে সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে, পণ্যের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত ভারসাম্য দামের কোনই পরিবর্তন ঘটিবে না। তবে চাহিদা বাড়িলে ভারসাম্যের পরিমাণ বাড়িবে আবার চাহিদা কমিলে ভারসাম্যের পরিমাণ কমিবে।

(গ) **ক্রম-বর্ধমান উৎপন্ন বৃদ্ধি ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য** (Law of Increasing Returns and Long-run Equilibrium) শিল্পে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়েই কমিতে থাকে। শিল্পের যোগান-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী বা ঋণাত্মক হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে ভারসাম্যের পরিবর্তন নির্দেশ করা হইল :

১নং চিত্র



২নং চিত্র



১নং চিত্রে দীর্ঘকালীন যোগান-রেখা LPS চাহিদা-রেখা DDকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P বিন্দু অনুসারে PM দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম এবং PM ভারসাম্যের পরিমাণ। চাহিদা বাড়িলে চাহিদা-রেখা স্থানান্তরিত হইয়া D_1D_1 আকার গ্রহণ করিবে এবং যোগান-রেখাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিবে। P_1 বিন্দুতে নূতন ভারসাম্য দাম P_1M_1 মূল দাম অপেক্ষা কম হইবে এবং নূতন ভারসাম্য পরিমাণ OM_1 মূল ভারসাম্যের পরিমাণ OM অপেক্ষা বেশি হইবে। P এবং P_1 এই বিন্দু দুইটির বামে কিংবা দক্ষিণে চাহিদা দাম ও যোগান দাম সমান নহে বলিয়া এই দুইটি ছেদবিন্দু ছাড়া

অন্যত্র ভারসাম্য ঘটিতে পারে না। এই ধরনের ভারসাম্যের একটি শর্ত এই যে, নিম্নগামী যোগান-রেখাকে নিম্নগামী চাহিদা-রেখা উপর হইতে ছেদ করিয়া নিচে নামিয়া আসা চাই। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদা-রেখা যোগান-রেখাকে নিচ হইতে ছেদ করিয়া ভারসাম্য ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয় চিত্রে চাহিদা-রেখা নিচ হইতে উঠিয়া যোগান-রেখাকে ছেদ করিয়াছে। P এবং P_1 বিন্দুতে অবশ্য ভারসাম্য ঘটিয়াছে কিন্তু এই ভার-সাম্য স্থিতিশীল নহে। ইহার কারণ এই যে, চাহিদা-রেখা নিচ হইতে যোগান-রেখাকে ছেদ করিয়া উপরে চলিয়া গেলে দুইটি ছেদবিন্দুর দক্ষিণেই চাহিদার দাম বেশি ও যোগান দাম কম হইবে। এইরূপ অবস্থাতে যোগানের ভারসাম্য P অথবা P_1 বিন্দুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রবণতা দেখা দিবে। ফলে, স্থায়ী বা স্থিতিশীল ভারসাম্য ঘটিতে পারে না।

ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির অধীনে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য সম্পর্কে প্রধান প্রশ্নই হইল, নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি উভয়ে সহাবস্থান করিতে পারে কি না। শিল্পে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধিটি কার্যকর হয়, তখন ঐ শিল্পের অন্তর্গত কোন কোন প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের মাত্রা বাড়াইবার ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটাইতে পারে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বাজার হইতে সরাইয়া দিয়া একচেটিয়া ভাবাপন্ন কিংবা অলিগোপলির বাজার সৃষ্টিও করিতে পারে। সেইজন্য বলা চলে যে, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি এবং নিখুঁত প্রতিযোগিতা বা স্থিতিশীল ভারসাম্যের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভবপর নহে।[১]

বাজার দাম ও স্বাভাবিক দাম

(Market Value and Normal Value)

অতি অল্প সময়ে বাজারে যে দামে বেচা-কেনা হয় তাহাকে বাজার দাম বলা হয়। এই সময়ে পণ্যের যোগান অপরিবর্তনীয় এবং পচনশীল দ্রব্যের বেলায় যোগান কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে দাম অতি নিচু থাকিলে বিক্রেতাগণ পণ্য বিক্রয় না করিয়া উহা

১. "Increasing Returns are incompatible with perfect competition and stable equilibrium."

নিজেরাই ভোগে ব্যয় করিয়া ফেলে। বাজার দাম কেবলমাত্র পণ্যের বর্তমান মজুতের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না, পণ্যটির সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ যোগানও বাজার দামকে প্রভাবিত করিয়া থাকে।

স্বাভাবিক দাম দুই প্রকারের হইতে পারে—স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম এবং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম। স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম এবং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম উভয়েই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইয়া থাকে। কিন্তু স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দামের ক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয় প্রতিষ্ঠানের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার সীমা ও সংগঠন দ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু দীর্ঘ-কালীন স্বাভাবিক দামের বেলায় প্রান্তিক ব্যয় উৎপাদন মাত্রার সম্পূর্ণ পরিবর্তনের পর নির্ধারিত হয়। স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম গড় ব্যয়ের বেশিও হইতে পারে, আবার কমও হইতে পারে, কিন্তু কোনক্রমেই নিম্নতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের কম হইতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক দাম প্রতিষ্ঠানের নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হইয়া থাকে।

বাজার দাম বিশেষভাবে পণ্যের চাহিদার উপর নির্ভর করে। অতি অল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড়িলে বাজার দাম বাড়িবে, চাহিদা কমিলে বাজার দাম কমিবে। বাজার দামের ভারসাম্য অস্থায়ী, কেন না সামান্য অস্থায়ী কারণে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলেই বাজার দামের পরিবর্তন হয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম কোন একটা বিশেষ মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন ব্যয়ই এই মান নির্দেশ করে। অবশ্য অল্পকালীন বাজারে প্রতিষ্ঠান গড় ব্যয় অপেক্ষা কমে বা বেশিতে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান যখন স্থায়ীভাবে পণ্য বিক্রয় করিবে তখন দাম গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। এই দামই স্বাভাবিক দাম এবং ইহাই স্থায়ী ভারসাম্য দাম।

বাজার দাম বর্তমান অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অস্থায়ী ফল হিসাবে দেখা দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক দাম দেখা দেয় বর্তমান অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চরম ফল হিসাবে। যদিও বাজার দাম চাহিদার অস্থায়ী উঠা-নামার উপর নির্ভর করে তথাপি ইহা দীর্ঘকালীন দামের প্রভাবমুক্ত নহে। বিক্রেতা যদি ধারণা করে যে, ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম বাড়িবে তাহা হইলে সে বর্তমান বাজার হইতে পণ্যের কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া রাখিবে। ফলে, বর্তমান বাজার দাম কিছুটা বাড়িয়া যাইবে।

আবার, যদি সে মনে করে ভবিষ্যতে স্বাভাবিক দাম হ্রাস পাইবে তাহা হইলে সে মোট পণ্যই বর্তমান বাজারে বিক্রয় করিবে। ফলে, বর্তমান বাজার দাম হ্রাস পাইবে। অতএব দেখা যায় যে, বাজার দাম স্বাভাবিক দামের গতিকে অবজ্ঞা করিয়া স্থির থাকিতে পারে না। বাজার দাম স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা বেশি বা কম হইতে পারে, কিন্তু উহার গতিপ্রবণতা সাধারণত স্বাভাবিক দামের দিকেই দেখা যায়।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন এবং ভারসাম্য
(Change in Demand and Supply and Equilibrium)

চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ভারসাম্য দাম প্রতিষ্ঠিত হয়। চাহিদার পরিবর্তন ঘটিতে পারে একাধিক কারণে। ভোগকারিগণের আয়, রুচি, অভ্যাস ও পছন্দক্রমের পরিবর্তন, জনসংখ্যার পরিবর্তন, অন্যান্য পণ্যের দামের পরিবর্তন, করব্যবস্থার পরিবর্তন, অর্থের যোগানের পরিবর্তন, ভবিষ্যতে দামের গতি সম্পর্কে ধারণা প্রভৃতি চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। চাহিদা হ্রাস পাইলে চাহিদা-রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়, আর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া যায়। যোগানের অবস্থাও আবার নানা কারণে পরিবর্তিত হইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলির দক্ষতা ও দামের পরিবর্তন, কারিগরী কৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রভৃতির দরুন পণ্যের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। যোগান হ্রাস পাইলে যোগান-রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়, আর যোগান বৃদ্ধি পাইলে যোগান-রেখা ডানদিকে সরিয়া যায়।

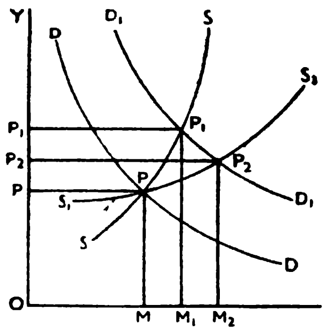
চাহিদা ও যোগানের যে-কোনটার পরিবর্তন ঘটিলেই পুরাতন ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থানে নূতন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, দাম ও ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। আবার চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন ঘটিলেও পুরাতন ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং নূতন ভারসাম্য দেখা দেয়। ফলে, দাম ও ক্রয়-বিক্রয় পরিমাণের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নিচে আমরা বিষয়টি আর একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

চাহিদার পরিবর্তন, যোগান অপরিবর্তন

(Demand Change but Supply Unchanged)

যদি যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে চাহিদা পরিবর্তনের ফলে কিভাবে নূতন ভারসাম্য দেখা দেয় এবং দাম ও পণ্যের পরিমাণের উপর কি প্রতিক্রিয়া ঘটে, নিচে চিত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা হইল।

অপরিবর্তিত যোগান-রেখা SS মূল চাহিদা-রেখা DDকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P ভারসাম্য বিন্দুতে পুরাতন ভারসাম্য দাম ছিল PM এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল OM। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পুরাতন চাহিদা-রেখা ডানদিকে সরিয়া D_1D_1 রেখারূপে দেখা দিল। অপরিবর্তিত যোগান-রেখা নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1কে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিল। নূতন ভারসাম্য বিন্দু P_1তে নূতন ভারসাম্য দাম হইল P_1M_1 এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OM_1। অর্থাৎ যোগান অপরিবর্তিত থাকিলে যদি চাহিদা বাড়িয়া যায় তাহা হইলে নূতন ভারসাম্য দাম ও নূতন ভারসাম্যের পরিমাণও বাড়িয়া যাইবে। অপরদিকে যোগান যদি অপরিবর্তিত থাকে আর চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন ভারসাম্যের দাম ও নূতন ভারসাম্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।



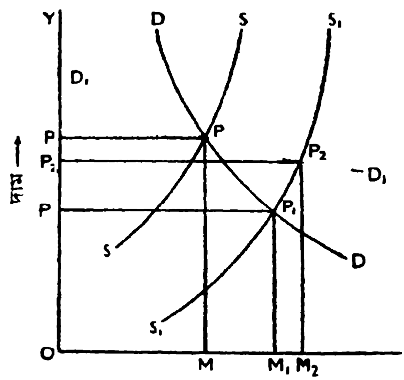
যোগানের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া চাহিদা বাড়িলে দামের বৃদ্ধি কতটা এবং ক্রয়ের পরিমাণের বৃদ্ধিই বা কতটা ঘটিবে তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে যোগান-রেখার ঢালের উপর। যোগান-রেখার ঢাল যদি কম হয় অর্থাৎ যোগান যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে, কিন্তু ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে। কিন্তু যোগান-রেখার ঢাল যদি বেশি হয়, অর্থাৎ যোগান যদি কম স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে এবং ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে। উপরের চিত্রে S_1S_1 যোগান-রেখাটির ঢাল SS রেখার ঢাল অপেক্ষা কম। S_1S_1 রেখা D_1D_1 রেখাকে

P_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে কিন্তু SS রেখা (এই রেখাটির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি) D_1D_1 রেখাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P_2 বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম OP হইতে PP_2 বেশি বাড়িয়াছে কিন্তু P_1 বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম OP অপেক্ষা PP_1 বেশি বাড়িয়াছে। আবার, P_2 বিন্দুতে ভারসাম্যেব পরিমাণ বাড়িয়াছে MM_2-এব সমান অথচ P_1 বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে MM_1-এর সমান। অপর পক্ষে, আবার দেখানো যায়, যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয় এবং চাহিদার হ্রাস ঘটে, তাহা হইলে দাম যত কমিবে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যতটা কমিবে, যোগান স্থিতিস্থাপক হইলে চহিদা হ্রাসের ফলে দাম ততটা কমিবে না কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি কমিবে।

যোগানের-পরিবর্তন, চাহিদা অপরিবর্তিত
(Supply Change but Demand Unchanged)

যদি চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে যোগান পরিবর্তনের ফলে কিভাবে নূতন ভারসাম্য দেখা দেয় এবং দাম ও পণ্যেব পরিমাণের উপব কি প্রতিক্রিয়া ঘটে নিচে চিত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা হইল।

অপরিবর্তিত চাহিদা-রেখা DD মূল যোগান-রেখা SSকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P ভারসাম্য বিন্দুতে পুরাতন ভারসাম্য দাম ছিল PM এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল OM। যোগান বৃদ্ধির ফলে পুরাতন যোগান-রেখা ডান দিকে সরিয়া S_1S_1 রেখারূপে দেখা দিল। নূতন যোগান-রেখা S_1S_1 চাহিদা-রেখা DDকে নিয়তর P_1-এ ছেদ করিল।



নূতন ভারসাম্য দাম হইল P_1M_1 এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইল OM_1। অর্থাৎ চাহিদা অপরিবর্তিত থাকিলে যদি যোগান বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে নূতন ভারসাম্য দাম কমিবে কিন্তু পণ্যের নূতন ভারসাম্যের

পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। অপর দিকে, চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, আর যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলে নূতন ভারসাম্য দাম বাড়িবে এবং পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ কমিবে।

চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকিয়া যোগান বাড়িলে দামের হ্রাস কতটা হইবে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণই বা কতটা বাড়িবে তাহা নির্ভর করে চাহিদা-রেখার ঢালের উপর। চাহিদা-রেখার ঢাল যদি কম হয় অর্থাৎ চাহিদা যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে যোগান বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত কম কমিবে এবং পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি বাড়িবে। কিন্তু যোগান-রেখার ঢাল যদি বেশি হয়, অর্থাৎ যোগান যদি কম স্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে যোগান বৃদ্ধির ফলে ভারসাম্য দাম অপেক্ষাকৃত বেশি কমিবে এবং ভারসাম্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম বাড়িবে। উপরের চিত্রে D_1D_1 চাহিদা-রেখার ঢাল DD রেখার ঢাল অপেক্ষা কম। D_1D_1 রেখা S_1S_1 রেখাকে P_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে; কিন্তু DD রেখা (এই রেখাটির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি) S_1S_1 রেখাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। P_2 বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম OP অপেক্ষা PP_2 কমিয়াছে; কিন্তু P_1 বিন্দুতে ভারসাম্য দাম পুরাতন দাম OP অপেক্ষা PP_1 (PP_2 অপেক্ষা PP_1 বেশি) কমিয়াছে। আবার P_2 বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে MM_2-এর সমান অথচ P_1 বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ বাড়িয়াছে MM_1-এর সমান (MM_1 অপেক্ষা MM_2 বেশি)। অপর পক্ষে, আবার দেখানো যায় যে, চাহিদা যদি বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, এবং যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলে ভারসাম্য দাম অল্প বাড়িবে, ভারসাম্যের পরিমাণ বেশি কমিবে। আবার, চাহিদা যদি কম স্থিতিস্থাপক হয় এবং যোগান কমিয়া যায়, তাহা হইলে দাম বেশি বাড়িবে এবং পণ্যের ভারসাম্যের পরিমাণ অল্পই কমিবে।

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন
(Changes in both Demand and Supply)

চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন বিভিন্ন প্রকারে ঘটিয়া ভারসাম্য দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে প্রভাবিত করিতে পারে:

(ক) চাহিদা ও যোগান উভয়ের বৃদ্ধি : চাহিদা ও যোগান উভয়েই

বৃদ্ধি পাইলে ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু ভারসাম্য দামের উপর কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধির মাত্রার উপর এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদা যদি বেশি মাত্রায় বাড়ে এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হয় তাহা হইলে ভারসাম্য দাম বাড়িবে। অপর পক্ষে, যোগান বৃদ্ধির মাত্রা যদি বেশি এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হয়, তাহা হইলে ভারসাম্য দাম কমিবার সম্ভাবনা।

(খ) চাহিদা ও যোগান উভয়ের হ্রাস: পণ্যের চাহিদা ও যোগান উভয়ই কমিলে ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। চাহিদা যদি বেশি মাত্রায় হ্রাস পায় এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হয়, তাহা হইলে ভারসাম্যের দাম কমিবার সম্ভাবনা বেশি। অপর পক্ষে, যোগান হ্রাসের মাত্রা যত কম হইবে, ভারসাম্য দাম বাড়িবার সম্ভাবনা ততই বেশি দেখা দিবে।

(গ) চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস: চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস পাইলে ভারসাম্য দাম বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু যোগানের হ্রাসের মাত্রা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হইবে ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ততই কমিবার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে, চাহিদা বৃদ্ধির মাত্রা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই বেশি হইবে, ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবার সম্ভাবনা ততই বেশি হইবে।

(ঘ) · চাহিদা হ্রাস ও যোগান বৃদ্ধি: চাহিদা হ্রাস ও যোগান বৃদ্ধি পাইলে পণ্যের ভারসাম্য দাম হ্রাস পাইবে। যোগান বৃদ্ধির মাত্রা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যতই বেশি হইবে, ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ততই বেশি বাড়িবার সম্ভাবনা। অপর পক্ষে, চাহিদা হ্রাসের মাত্রা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই অধিক হইবে, ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ততই বেশি কমিবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে।

১৯ | অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম

(Pricing under Imperfect Competition)

অনিখুঁত বাজার কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। অনিখুঁত বাজারের উৎপত্তি ঘটে সাধারণত দুইটি কারণে : প্রথমত, বাজারে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যদি মুষ্টিমেয় হয় তাহা হইলে বাজারটি অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, ঐ মুষ্টিমেয় বিক্রেতাগণ যদি সম্পূর্ণ সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় না করিয়া পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে তাহা হইলেও অনিখুঁত বাজারের উৎপত্তি ঘটিতে দেখা যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজার নানা প্রকারের হইতে পারে। যেমন, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার, অলিগোপলি, ডুয়োপলি, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার, ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যে প্রধান কয়েকটির ক্ষেত্রে দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচে তাহার আলোচনা করা হইল।

একচেটিয়া বাজার
(Monopoly)

একচেটিয়া বাজার অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের এক চরম অবস্থা। একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে। বাজারে তাহার আর কোন প্রতিযোগী বিক্রেতা থাকে না। তাহার পণ্যের কোন নিকটবর্তী পরিবর্তকেরও (close substitute) বাজারে অস্তিত্ব দেখা যায় না। পণ্যের যোগানের উপর তাহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। ফলে অন্যান্য প্রতিযোগিগণের শিল্পে প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থাগুলি বর্তমান থাকিলে উহাকে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার বা কারবার বলা হয়। এইরূপ বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার নিখুঁত প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। নিখুঁত প্রতিযোগিতা যেমন চরম এক কাল্পনিক অবস্থা, বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারও তেমনি চরম এক কাল্পনিক অবস্থা।

বাস্তবে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার দেখা যায় না। বাস্তবক্ষেত্রে যে

সকল একচেটিয়া বাজার দেখা যায় উহারা কম-বেশি একচেটিয়া কারবার। এইরূপ কম-বেশি একচেটিয়া বাজার বা কারবারের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। এইরূপ বাজারে একই শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-গুলির উৎপাদন ও যোগান একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মালিক গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। বিক্রেতা দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে বটে, কিন্তু বাজারে প্রতিযোগী বিক্রেতার আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের বাজারে একচেটিয়া পণ্যটির নিকটবর্তী কোন পরিবর্তক থাকিতে পারে কিংবা নূতন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের আশঙ্কা থাকে।

আর এক প্রকারের একচেটিয়া বাজার বাস্তবে দেখা যায়। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাজারে একই পণ্য সমান দামে বিক্রয় না করিয়া বিভিন্ন বাজারে একই পণ্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে বিভেদ মূলক একচেটিয়া কারবার (Discriminating Monopoly) বলা হয়।

একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য দাম ও পণ্যের পরিমাণ নির্ধারণ
(Equilibrium and Output Determination Under Monopoly)

একচেটিয়া বাজারে ভারসাম্য দাম নির্ধারণে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য ও শিল্পের ভারসাম্য পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ বাজারে একটিমাত্র বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠান পণ্য যোগান দেয় বলিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানই শিল্পের বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলির অধিকার লাভ করিয়া থাকে—প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্যের এবং শিল্পের ভারসাম্যের শর্তগুলি মূলত একই।

একচেটিয়া বাজারে পণ্যের চাহিদা

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করে বলিয়া কোন একটি প্রতিষ্ঠান দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই বাজারে প্রতিটি বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা-রেখা অসীম স্থিতিস্থাপকতা সমান্তরাল রেখা বিশিষ্ট হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করে বলিয়া উহা পণ্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে। একচেটিয়া কারবারীকে বেশি পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে

হইলে পণ্যের দাম কমাইতে হইবে। ফলে, একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের চাহিদা-রেখা ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়। আবার, একচেটিয়া কারবারীকে বেশি পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে দাম কমাইতে হয় বলিয়া গড় আয় (বা দাম) ও প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম হয়। প্রান্তিক আয়ের রেখা গড় আয়ের রেখার নিচে থাকে। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয় এবং একই সমান্তরাল রেখা দ্বারা গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করা হয়।

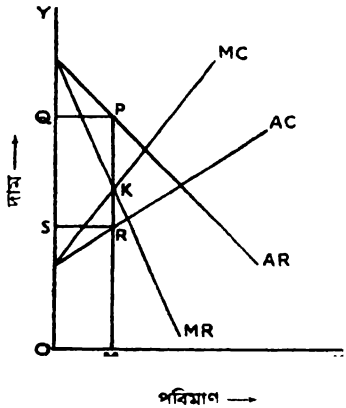
একচেটিয়া বাজারে পণ্যের যোগান

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের যোগান যেমন উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে, একচেটিয়া বাজারেও পণ্যের যোগান উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই উহার যোগান-রেখা। একচেটিয়া বাজারেও কারবারীর প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই একচেটিয়া পণ্যের যোগান-রেখা। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় যেমন প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের রেখা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হয় অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়, একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ও গড় ব্যয়ের রেখাও ধনাত্মক হইয়া থাকে। তবে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় রেখাগুলির ঢাল অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক ও গড় ব্যয় রেখাগুলির ঢাল অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, একচেটিয়া কারবারীকে যখন বেশি পণ্য বিক্রয় করিতে হয় তখন উৎপাদনের উপাদানগুলি বেশি দামে কিনিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হয়।

ভারসাম্য দাম ও পণ্যের পরিমাণ

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যখন কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রয় করে তখন উহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা, একচেটিয়া কারবারীরও লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করা। বাজারে কতটা পরিমাণ পণ্য যোগান দিয়া কারবারী সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে তাহা নির্ভর করে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্কের উপর। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যের যোগান বৃদ্ধি করিলে তাহার পক্ষে অধিকতর মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইবে। তাহার মুনাফা সর্বোচ্চ হইবে সেই পরিমাণ

পণ্য যোগান দিয়া যাহাতে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। যে বিন্দুতে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পরের সমান হয় সেই বিন্দুতে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে তাহার নীট মুনাফা সর্বাধিক হইবে। এই বিন্দুতে পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণকেই একচেটিয়া ভারসাম্যের উৎপাদন (Monopoly equilibrium output) বলে। আবার, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা-বিন্দু হইতে নিচে ও উপরে ভূমিতল রেখা ও গড় আয়-রেখার উপর একটি লম্বরেখা টানিলে ঐ রেখাটির দৈর্ঘ্যই একচেটিয়া ভারসাম্য দাম নির্দেশ করিবে। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়া ভারসাম্য দাম ও পণ্যের পরিমাণ আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হইল :



উপরের চিত্রে একচেটিয়া কারবারী যখন OM পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করে তখন উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। OM হইতেছে একচেটিয়া পণ্যের ভারসাম্য পরিমাণ। প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পরস্পর ছেদ-বিন্দু K হইতে নিচে OX অক্ষরেখার উপর ও উপরে AR রেখার উপর প্রসারিত PM লম্বটি একচেটিয়া ভারসাম্য দাম নির্দেশ করিতেছে। এই দাম প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ের অপেক্ষাই বেশি। অর্থাৎ একচেটিয়া ভারসাম্যের অবস্থায়, প্রথমত, প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়, দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই দাম অপেক্ষা কম। উপরে চিত্রে প্রদর্শিত একচেটিয়া ভারসাম্যের দাম আবার কারবারীর গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি। ফলে, একচেটিয়া কারবারীর স্বাভাবিক

মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ ঘটে। এই অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলেই জানা যায়। চিত্রে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় হইল :

PM × OM (দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ)
= OMPQ ক্ষেত্র

মোট ব্যয় হইল : MR × OM (গড় ব্যয় × বিক্রয়ের পরিমাণ)
= OMRS ক্ষেত্র

অতিরিক্ত মুনাফার পরিমাণ : OMPQ − OMRS
= SRPQ ক্ষেত্র

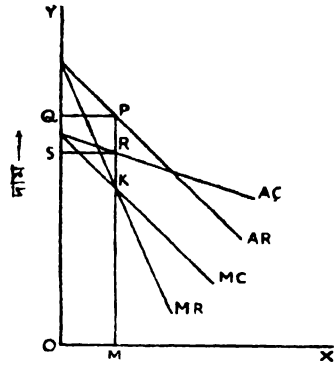
অবশ্য স্বল্পকালীন বাজারে একচেটিয়া কারবারীর এই অতিরিক্ত মুনাফা সকল অবস্থায় না-ও ঘটিতে পারে। স্বল্পকালীন বাজারে বাজার মন্দা থাকিলে সে গড় ব্যয়ের কমেও পণ্য বিক্রয় করিয়া কিছুটা লোকসান দিতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই একচেটিয়া কারবারী নিম্নতম পরিবর্তনীয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া লোকসান দিতে পারে না।

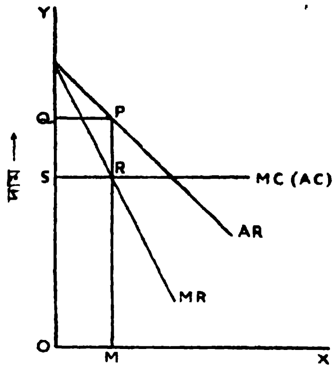
দীর্ঘকালীন সময়ে একচেটিয়া কারবারী তিনটি বিভিন্ন উৎপন্ন বিধির যে কোনটির অধীনে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। তিনটি উৎপন্ন বিধির অধীনে একচেটিয়া ভারসাম্যের দাম ও পরিমাণে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

উৎপাদনে যখন ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইবে তখন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের [পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দ্রষ্টব্য] রেখা উভয়েই ঊর্ধ্বমুখে উঠিবে। নিম্নমুখী প্রান্তিক আয়-রেখা উপর হইতে ঊর্ধ্বমুখী প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে K বিন্দুতে ছেদ করিবে। ঐ বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ হইবে OM এবং একচেটিয়া ভারসাম্যের দাম হইবে PM। অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা হইবে SRPQ ক্ষেত্রের সমান।

উৎপাদনে যখন ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি ও সমহার উৎপন্ন বিধি দুইটি কার্যকর হইবে, তখন একচেটিয়া ভারসাম্যের পরিমাণ ও দাম কিভাবে নির্ধারিত হইবে তাহা নিচে দুইটি চিত্র দ্বারা বিশ্লেষণ করা হইল :

পরপৃষ্ঠায় ১ নং চিত্রে ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায় প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় উভয়ের রেখাই নিম্নমুখী দেখানো হইয়াছে। এই অবস্থায় নিম্নমুখী প্রান্তিক আয় রেখা উপর হইতে নিম্নমুখী প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে K বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। K বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ হইয়াছে





OM এবং ভারসাম্যের দাম PM। দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হওয়ায় একচেটিয়া কারবারী SRPQ ক্ষেত্রের সমান অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিতেছে।

২নং চিত্রে সমহার উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায় প্রান্তিক ব্যয় ও গড ব্যয়ের রেখা সমান্তরাল হইয়াছে। নিম্নগামী প্রান্তিক আয়-রেখা উপর হইতে প্রান্তিক ব্যয়-রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। এই বিন্দু অনুসারে ভারসাম্যের পরিমাণ হইয়াছে OM এবং ভারসাম্যের দাম PM। দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হওয়ায় একচেটিয়া কারবারী SRPQ ক্ষেত্রের সমান অতিরিক্ত একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিতেছে।

বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার : বিভিন্ন রকম দাম পৃথকীকরণ
(Discriminating Monopoly : Different Types of Price Discrimination)

একচেটিয়া কারকারী যখন একই সমজাতীয় পণ্য বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করে, উহাকে বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজার বলে। এইরূপ বাজারে একচেটিয়া কারবারী মূল্য পৃথকীকরণ (Price Discrimination) নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন, কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহারের জন্য শিল্প কারখানাগুলির নিকট হইতে বেশি দাম এবং গৃহস্থের নিকট হইতে কম দাম গ্রহণ করিয়া থাকে।

একচেটিয়া কারবারী নিম্নলিখিত একাধিক প্রকারে দাম পৃথকীকরণ নীতি অবলম্বন করিতে পারে :

(ক) ক্রেতার আয় অনুসারে দাম পৃথকীকরণ : অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী ক্রেতাগণের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী একই ধরনের সেবা বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। যেমন, কোন গ্রামে একমাত্র ডাক্তার ধনী রোগীর নিকট হইতে সেবার দরুন বেশি দাম এবং গরিব রোগীর নিকট হইতে কম দাম আদায় করিয়া থাকেন।

(খ) পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ অনুসারে পৃথকীকরণ : একচেটিয়া কারবারী পণ্য ক্রয়ের পরিমাণ কম-বেশি অনুযায়ী বিভেদমূলক দাম আদায় করিতে পারে। একটি ৮ আউন্স ছোট শিশির ঔষধের জন্য যদি ২৲ টাকা দাম ধরা হয়, তাহা হইলে ১৬ আউন্সের বড় শিশির ঔষধের জন্য ৪৲ টাকা না ধরিয়া ৩·৫০ টাকা ধরা যাইতে পারে।

(গ) পণ্য বিক্রয়ের স্থান অনুসারে দাম পৃথকীকরণ : একচেটিয়া কারবারী একই সমান পণ্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিতে পারে। যেমন, বিক্রেতা বিদেশে পণ্যটি অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় করে, অথচ স্বদেশে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাকে স্থানিক দাম পৃথকীকরণ বা ইংরাজীতে Dumping বলা হয়।

(ঘ) বয়স ও সময় অনুযায়ী দাম পৃথকীকরণ : পণ্য বা সেবা ভোগকারীর বয়সের তারতম্য অনুসারে বিভেদমূলক দাম আদায় করা হয়। যেমন, ১২ বৎসরের কম রেল যাত্রিগণের নিকট অর্ধেক ভাড়া এবং ১২ বৎসরের বেশি এইরূপ যাত্রিগণের নিকট পুরা ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা আছে। আবার ভোগকারী সেবা কখন ভোগ করে তাহার ভিত্তিতেও বিভেদমূলক দাম নির্ধারণ করা হয়। যেমন, ম্যাটিনি শো-তে সিনেমা টিকেট কম দামে কিন্তু সন্ধ্যার শো-তে বেশি দামে বিক্রয় করা হয়।

কি কি অবস্থায় বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার সফল ও লাভজনক হইতে পারে ?

(Under what Conditions Discriminating Monopoly can be successful and profitable)

নিম্নলিখিত কতকগুলি বিশেষ অবস্থা ও শর্তাধীনে বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবার ও দাম পৃথকীকরণ নীতি সফল ও লাভজনক হইতে পারে :

প্রথমত, পণ্যের বিভিন্ন বাজারের চাহিদা এমনভাবে পৃথক হওয়া প্রয়োজন যে, এক বাজারে যে পণ্যটি বিক্রয় করা হয়, উহা অপর কোন বাজারে বিক্রয় করা সম্ভবপর নহে। একচেটিয়া কারবারীর বিভিন্ন বাজার এমন হইবে যে, এক বাজারে যে পণ্য বিক্রীত হইয়াছে উহা আর কোন বাজারে ক্রেতার নিকট পুনর্বার বিক্রীত (re-sale) হইবে না। যদি অল্প দামের বাজার হইতে অধিক দামের বাজারে পণ্যটি পুনর্বিক্রয়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সেই পণ্যের দাম পৃথকীকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী একই পণ্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন প্রতিপন্ন করিয়া মূল্য-বিভেদ ঘটাইতে পারে।

তৃতীয়ত, সাধারণত সেবামূলক কার্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সহজেই বিভেদমূলক দাম আদায় করা সম্ভব হয়। যেমন, গ্রামাঞ্চলের একমাত্র ডাক্তার ধনী রোগীদের নিকট হইতে বেশি 'ফি' এবং গরিব রোগীদের নিকট হইতে কম 'ফি' আদায় করিয়া থাকেন। গরিব রোগিগণ ডাক্তারের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প দামে যে সেবা সরাসরি-ভাবে ক্রয় করে তাহা ধনী রোগিগণের নিকট পুনর্বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া এইরূপ দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয়। ঠিক একই কারণে রেলের পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর নিকট হইতে বিভিন্ন মাশুল আদায় করা সম্ভব। রেলের বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীর মধ্যে যাতায়াতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পুনর্বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা থাকে না বলিয়াই বিভেদমূলক মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চতুর্থত, বিভিন্ন বাজারের মধ্যে যদি বেশ দূরত্ব থাকে কিংবা উহাদের মধ্যে যদি সহজ যোগাযোগের কোনরূপ প্রাকৃতিক বাধা থাকে, তাহা হইলেও একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বিভেদমূলক দাম ধার্য করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সহজ যোগাযোগ না থাকিলে সস্তা বাজার হইতে চড়া বাজারে পণ্য পুনর্বিক্রয়ের সম্ভাবনা থাকে না—একচেটিয়া কারবারীর বিভেদমূলক দাম আদায় করিবারও অসুবিধা হয় না।

পঞ্চমত, সরকারী কর বা শুল্কনীতিও অনেক সময় বিভেদমূলক দাম আদায় করিতে সহায়তা করে। যেমন, কোন দেশের সরকার যদি আমদানি দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করে, তাহা হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে একই পণ্যের বিভেদমূলক দাম ধার্য করা সম্ভব হয়।

কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ সম্ভবপর হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে উহা যে লাভজনক হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। একচেটিয়া বিভেদ-মূলক দাম ব্যবস্থাকে লাভজনক হইতে হইলে বিভিন্ন বাজারে পণ্যটির চাহিদার প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হইলেই মূল্য পৃথকীকরণ লাভজনক হইতে পারে।

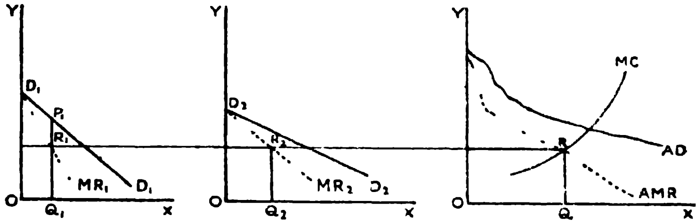
বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ ও ভারসাম্য
(Price Determination and Equilibrium under Discriminating Monopoly)

দাম পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যই সর্বাধিক নীট মুনাফা উপার্জন কবা। ইহা তখনই সম্ভব হয় যখন বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন থাকে। একচেটিয়া কারবারী প্রত্যেক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যদি দাম ও পণ্যের যোগান পরিমাণ ধার্য করে তাহা হইলে সর্বাধিক সম্ভব নীট মুনাফা উপার্জন করিতে পারে। সাধারণ একচেটিয়া বাজারে (Simple monopoly) ভারসাম্যের দাম ও পণ্যের পরিমাণ যে সকল শর্তদ্বারা নির্ধারিত হয়, বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারেও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যলাভের শর্ত একই। বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারে কারবারী সেই পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিলে ভারসাম্যে পৌঁছিবে যাহাতে তাহার প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়। বিভিন্ন বাজারে নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী বিভেদমূলক দাম অনুসরণকারী একচেটিয়া বিক্রেতা সেই পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিবে যাহাতে প্রতি বাজারের প্রান্তিক আয় পণ্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। যদি একটি বাজারের প্রান্তিক আয় আর একটি বাজারের প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে অধিকতর লাভজনক হইবে প্রথম বাজার হইতে পণ্য সরাইয়া দ্বিতীয় বাজারে বেশি পরিমাণ বিক্রয় করা। সুতরাং, বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে দুইটি :

(১) বিভিন্ন বাজারের প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হওয়া চাই।

(২) প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয় মোট পণ্যের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়া চাই। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভেদমূলক একচেটিয়া

বাজারে দাম ও ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হইল :



১ নং ও ২ নং চিত্রে দুইটি পৃথক বাজারের অবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রথম বাজারের চাহিদা-রেখা D_1D_1 দ্বিতীয় বাজারের চাহিদা-রেখা D_2D_2 অপেক্ষা কম স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করিতেছে। MR_1 এবং MR_2 যথাক্রমে দুইটি বাজারের প্রান্তিক আয়-রেখা। ৩নং চিত্রে AD রেখা দুইটি বাজারের মোট চাহিদা এবং AMR রেখা দুইটি বাজারের সম্মিলিত প্রান্তিক আয় নির্দেশ করিতেছে। MC দুই বাজারে মোট পণ্য যোগানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। R বিন্দুতে মোট পণ্যের প্রান্তিক ব্যয় ও দুইটি বাজারের মোট প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান। দুইটি বাজারে মোট পণ্য যোগানের পরিমাণ OQ। আবার R_1 বিন্দুতে $MR_1 = MC$ এবং R_2 বিন্দুতে $MR_2 = MC$। এখন R_1 বিন্দু হইতে OX অক্ষরেখা ও DD_1 চাহিদা-রেখার উপর লম্ব টানিলে যে P_1Q_1 রেখা পাওয়া যাইবে উহাই প্রথম বাজারের ভারসাম্য দাম। প্রথম বাজারের ভারসাম্য পণ্যের পরিমাণ হইতেছে OQ_1। সেইরূপ, দ্বিতীয় চিত্রে R_2 বিন্দু হইতে অক্ষরেখা ও D_2D_2 রেখার উপর লম্ব টানিলে যে P_2Q_2 রেখা পাওয়া যাইবে উহা দ্বিতীয় বাজারের ভারসাম্য দাম। এই বাজারে ভারসাম্য পণ্যের পরিমাণ হইতেছে OQ_2।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বাজারের ভারসাম্য পণ্য, যথা, OQ_1 এবং OQ_2কে যোগ করিলে ৩নং চিত্রে দুইটি বাজারের মোট পণ্য OQ পাওয়া যাইবে। ১নং বাজারের দাম P_1Q_1 ২নং বাজারের দাম P_2Q_2 অপেক্ষা বেশি। ইহার কারণ এই যে, প্রথম বাজারে দ্বিতীয় বাজারের তুলনায় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম।

একচেটিয়া দাম পৃথকীকরণ নীতি কি কল্যাণকর ?

(Is Monopoly Price Discrimination beneficial ?)

বিভেদমূলক একচেটিয়া কারবারের ফলাফল ভাল-মন্দ দুই-ই হইতে পারে। একচেটিয়া দাম পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলি হইল :

বিপক্ষে যুক্তি

(১) এক সমান দামে বিভিন্ন বাজারে পণ্য বিক্রয় করিলে যে পরিমাণ মুনাফা লাভ সম্ভব হয়, বিভেদমূলক দাম নীতির মাধ্যমে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি সম্ভব হয়। বিক্রেতা এক বাজারে অত্যন্ত কম দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া যে লোকসান করে, অন্য বাজারে বেশি দামে পণ্যটি বেচিয়া ঐ লোকসান উঠাইয়া লয়। ইহার ফলে প্রথম বাজারে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি বিনষ্ট হয়, আবার দ্বিতীয় বাজারে ক্রেতাগণ অত্যধিক দামে পণ্য ক্রয় করিয়া শোষিত হইয়া থাকে।

(২) বিভেদমূলক দাম-নীতির বিরুদ্ধে আর একটি বড অভিযোগ এই যে, সাধারণ একচেটিয়া বাজারের তুলনায় বিভেদমূলক একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনের উপকরণগুলি বিভিন্ন নিয়োগের মধ্যে অধিকতর অকাম্যভাবে বণ্টিত হইয়া থাকে। ফলে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উপকরণের বিশেষ অপচয় ঘটে।

কিন্তু বিভেদমূলক দাম-নীতির সপক্ষেও একাধিক যুক্তি আছে :

সমর্থনে যুক্তি

(১) সামাজিক ও অর্থনীতিকভাবে বিভেদমূলক দাম-নীতি সমর্থনের অপেক্ষা রাখে। অনেক ক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ নীতি অবলম্বন না করিলে একচেটিয়া কারবারী পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের ও আয়ের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। যেমন, রেলযাত্রীর উপর যদি একটিমাত্র ভাড়া ধার্য করা হয়, তাহা হইলে রেলের ব্যয় তুলিবার জন্য ঐ ভাড়া অত্যন্ত বেশি হারে আদায় করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু ভাড়া অত্যন্ত বেশি ধার্য করিলে একমাত্র ধনী ছাড়া অল্প লোকই রেলে চড়িতে পারিবে। ফলে, রেলের ব্যয় উঠিবে না, আবার ভোগকারিগণের অভাব-তৃপ্তির পরিমাণও হ্রাস পাইবে। সেইজন্য পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ, আয় বৃদ্ধি এবং ভোগকারিগণের তৃপ্তির পরিমাণ বাড়াইতে হইলে রেলকে বিভিন্ন হারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে মাশুল আদায় করিতে হয়।

(২) সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে আর একভাবে বিভেদমূলক দাম-

নীতিকে সমর্থন করা যায়। যদি ধনী শ্রেণীর নিকট হইতে কোন পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত বেশি আদায় করা হয়, এবং গরিবের নিকট হইতে ঐ পণ্যের অপেক্ষাকৃত কম দাম আদায় করা যায়, তাহা হইলে বিভেদমূলক দাম-নীতি নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। কেননা, এইভাবে বিভেদমূলক দাম-নীতি অনুসরণ করা না হইলে অধিকাংশ গরিব ব্যক্তি পণ্যটি ভোগ করিতে সক্ষমই হইবে না।

(৩) একচেটিয়া উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যদি ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধির অধীনে পণ্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে উহাকে বিভেদমূলক দামে পণ্য বিক্রয় করিতে হইবে। দাম পৃথকীকরণ না করিলে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাইবে এবং ব্যয় বেশি পড়িবে। তাহাতে আবার ভোগকারিগণের অভাব-তৃপ্তির পরিমাণও কমিয়া যাইবে। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন বিধি কার্যকর হইলে একচেটিয়া কারবারীকে বিভেদমূলক দামে পণ্য বেচিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বেশি ও ব্যয় হ্রাস করিতে হয়।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের তুলনা
(Comparison between Perfect Competition and Monopoly)

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজার উভয়ই বাজারের চরম অবস্থা এবং একে অন্যের বিপরীত অবস্থা। এই দুই বাজারের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকিলেও ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই বেশি।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মিল দেখা যায় উহারা প্রধানত এই :

(১) উভয় বাজারেই বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে।

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যেমন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জন করা, একচেটিয়া বাজারেও কারবারীর লক্ষ্য থাকে সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা লাভ করা।

(৩) উভয় বাজারেই ভারসাম্যের শর্ত হইল, প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতা।

(৪) উভয় বাজারেই বিক্রেতাকে বাজারে পণ্য চালু করিবার জন্য কোনরূপ বিক্রয় ব্যয় করিতে হয় না।

কিন্তু দুই বাজারের মধ্যে এই সকল বিষয়ে মিল দেখা গেলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যগুলিই বেশি শক্তিশালী। এই পার্থক্যগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে :

(১) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে অসংখ্য ক্রেতা থাকিতে পারে কিন্তু একমাত্র বিক্রেতা থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে নূতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে প্রবেশ করিতে কিংবা শিল্প পরিত্যাগ করিতে কোন বাধা থাকে না, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে অন্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের পথে বাধা থাকে। নিখুঁত প্রতিযোগিতাব বাজারে কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা একজন বিক্রেতা পণ্যের দাম প্রভাবিত করিতে পারে না। একই দামে ক্রেতা-বিক্রেতা ইচ্ছামত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর নিকট দাম ও পণ্য যোগান উভয়ই প্রভাবিত করিতে পারে। পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে তাহাকে দাম কমাইতে হয়, আবার বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইতে হয়। অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী একই সমান পণ্য বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিয়া সর্বাধিক মুনাফা লাভ কবিতে পারে।

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে যে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক। সেই জন্য পণ্য চাহিদা-রেখা বা দাম-রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখাব সমান্তরাল হয়। প্রতিষ্ঠান একই দামে যে কোন পরিমাণ পণ্য বিক্রয করিতে পারে বলিয়া গড আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয় এবং একই রেখা দ্বারা গড আয় ও প্রান্তিক আয় নির্দেশ করা যায়। অর্থাৎ নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে $AR = MR = P = D$। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেব পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতি-স্থাপকতা অপেক্ষা কম (less than perfect elastic) হয়। একচেটিয়া কারবারীকে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে দাম কমাইতে হয়। পণ্যের চাহিদা-রেখা ঋণাত্মক অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়। তাহার প্রান্তিক আয় গড় আয় অপেক্ষা কম হয় এবং প্রান্তিক আয়-রেখা গড আয়-রেখার নিচে অবস্থান করে। অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে $MR < AR = P = D$। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে যেমন পার্থক্য করা হয়,

একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠানই শিল্পের সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। সেইজন্য এই বাজারে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিজের পণ্যের চাহিদা বলিতে মোট বাজারের চাহিদা বুঝাইয়া থাকে।

(৩) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে শিল্পের অন্তর্গত সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা পাশাপাশি যোগ করিলে শিল্পের মোট যোগান-রেখা জানিতে পারা যায়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়-রেখাই শিল্পের মোট যোগান-রেখা নির্দেশ করে।

(৪) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা সাধারণত বাম হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বগামী হয়। সমান্তরাল গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা কল্পনা করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নিম্নমুখী হইলে প্রতিযোগিতা বিনষ্ট হইয়া অনিখুঁত প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী, সমান্তরাল ও নিম্নগামী, এই তিন প্রকারই হইতে পারে।

(৫) নিখুঁত প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে :

দাম = প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় = গড় আয় = গড় ব্যয়

(সর্বনিম্ন বিন্দুতে)

কিন্তু একচেটিয়া বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে :

দাম = গড় আয় > প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়

দাম > গড় ব্যয়

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠান যখন ভারসাম্যে পৌঁছায় তখন উহা স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করে।

(৬) নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম সাধারণত একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য দাম অপেক্ষা কম হয়। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হয়। একচেটিয়া বাজারে উৎপাদনের পরিমাণ কম হয় বলিয়া প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণও কম

হয়। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক হইতে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্য একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্য অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় অথবা সমর্থনযোগ্য।

২০। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার
(Monopolistic Competition)

নিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারের কোনটাই বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় না। বাস্তব বাজার বলিতে অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারই বুঝাইয়া থাকে। এই অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের একটি বিশেষ রূপ হইল একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজার। এই বাজারে যেমন একদিকে কিছুটা নিখুঁত প্রতিযোগিতার উপাদান দেখা যায়, আবার তেমনি পাশাপাশি একচেটিয়া বাজারের উপাদানও বর্তমান থাকে। এই বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্য

(১) বিক্রেতার সংখ্যা একজন কিংবা অগণিত নহে। কতিপয় মুষ্টিমেয় বিক্রেতা এই বাজারে পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকে এবং প্রত্যেক বিক্রেতা মোট পণ্যের একটি মোটা অংশ বাজারে যোগান দিয়া থাকে।

(২) নিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা একচেটিয়া বাজারে যেমন বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে না। বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্যের মধ্যে কিছুটা মিল থাকিতে পারে কিন্তু উহারা সম্পূর্ণ একজাতীয় নহে। পণ্যের পৃথকীকরণ (product differentiation) একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের একটি প্রধান লক্ষণ। বিভিন্ন বিক্রেতা যে পণ্য বাজারে বিক্রয় করে উহার মধ্যে গুণগত বা কাল্পনিক পার্থক্য থাকে। যদি গুণগত কোন পার্থক্য নাও থাকে তাহা হইলেও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক বিক্রেতার পণ্য অপর বিক্রেতার পণ্য হইতে যে পৃথক সে ধারণা ক্রেতাগণের মনে জন্মানো হয়। বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্য সম্পূর্ণ সমজাতীয় না হইলেও উহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক (close substitutes) হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। এইখানেই বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজার হইতে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারের তফাৎ। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে পণ্যের কোন ঘনিষ্ঠ (close) পরিবর্তক নাই, একচেটিয়া

কারবারীকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয় না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাকে কিছুটা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। এক বিক্রেতার পণ্য অন্য বিক্রেতার পণ্যের কম-বেশি পরিবর্তক।

(৩) বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে নূতন কোন প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে নূতন প্রতিষ্ঠানের বাজারে প্রবেশের কোন বাধা নাই।

(৪) একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা স্বাধীনভাবে দাম-নীতি অনুসরণ করিতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি উহার পণ্যের দরুন একটু চড়া দামও ধার্য করে, তাহা হইলে ক্রেতাগণের সকলে ঐ প্রতিষ্ঠানের নিকট পণ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া অপর কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করে না। এই বাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণ ব্যাপারে বিক্রেতা-গণের মধ্যে বড় একটা প্রতিযোগিতা দেখা যায় না।

(৫) এই বাজারে বিক্রেতাগণের মধ্যে দাম নির্ধারণ ব্যাপারে বিশেষ প্রতিযোগিতা না থাকিলেও সেবা যোগান বিষয়ে প্রতিযোগিতা (service competition) দেখা যায়। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠান হয়তো ধারে পণ্য বিক্রয় করে, কোন প্রতিষ্ঠান পণ্যটি বিনামূল্যে ক্রেতার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেয়, কোন প্রতিষ্ঠান উপহার বা উপহার কুপন বিলি করে ইত্যাদি।

(৬) নিখুঁত প্রতিযোগিতা কিংবা একচেটিয়া বাজারে কোন পণ্যভেদ নাই বলিয়া বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয়-বাবদ কোন ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন ব্যয় ছাড়া বিক্রয় বাবদ ব্যয়ও করিতে হয়। এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাই প্রচার, বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির মাধ্যমে চেষ্টা করে যাহাতে ক্রেতাগণ বিশেষভাবে তাঁহার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রতিযোগীর পণ্যের উপর আকর্ষণ কমিয়া যায়। বাজারে পণ্য বিভেদই বিক্রয় ব্যয়ের মূল কারণ।

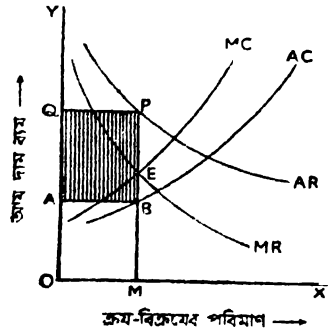
একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ
(Pricing under Monopolistic Competition)

একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ দুইটি দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়: (১) ফার্মের ভারসাম্য ঘটিয়া কিভাবে

ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয় এবং (২) শিল্পের বা গোষ্ঠীগত ভারসাম্য ঘটিযা কিভাবে দাম নির্ধারিত হয়।

প্রতিষ্ঠানেব দাম ও উৎপাদনের ভাবসাম্য

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক হয। প্রতিষ্ঠানের গড আয়, দাম ও প্রান্তিক আয পরস্পর সমান হয। কিন্তু একচেটিযা লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপকতা হইতে কম হয। সেইজন্য চাহিদা-রেখা বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী হয়। কিন্তু এই বাজারে চাহিদা-রেখার ঢাল বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারের চাহিদা-রেখার ঢাল অপেক্ষা কম। অর্থাৎ একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের চাহিদা একচেটিযা বাজারের চাহিদার তুলনায় অধিক স্থিতিস্থাপক। তাহার কারণ এই যে, একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে কোন বিক্রেতার পণ্যই অপর বিক্রেতার পণ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। এক বিক্রেতার পণ্য অপর বিক্রেতার পণোব কিছুটা পরিবর্তক। এই বাজারে কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে পণ্য বিক্রয় করিতে চাহিলে দাম কমাইতে হয। ফলে, প্রান্তিক আয় গড় আয় বা দাম অপেক্ষা কম হয়। পণ্য বিক্রযের পবিমাণ যতই বাড়ানো হয়, ততই গড আয ও প্রান্তিক আয়-রেখার মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পায। কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম কমাইয়া পণ্য বিক্রযের পরিমাণ বাড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত লাভজনক, যতক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় উহার প্রান্তিক ব্যয়-অপেক্ষা বেশি থাকে। প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক মুনাফা লাভ হয় সেই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিয়া যেখানে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান।



অর্থাৎ ভারসাম্যের শর্ত হইল প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা। কিন্তু ভারসাম্যের অবস্থায় প্রান্তিক আয় দাম অপেক্ষা কম হইবে। পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রের সাহায্যে একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দাম ও উৎপাদনের ভারসাম্য আরও ভালভাবে বিশ্লেষণ করা হইল।

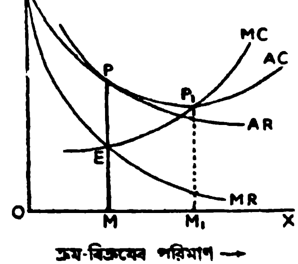
চিত্রে E বিন্দুতে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। এই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে OM এবং ভারসাম্য দাম হইতেছে PM। এই দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি। আবার, এই দাম অপেক্ষা গড় ব্যয় কম। অর্থাৎ সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটি ABPQ ক্ষেত্রের সমান অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতেছে। একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা খুবই সম্ভব। আবার, স্বল্পকালীন বাজারে ন্যূনতম লোকসান দিয়া একটি প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে। এইরূপ ভারসাম্যের অবস্থায় দাম প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়।

কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে অতিরিক্ত মুনাফা ঘটিলে অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রবেশ করিবে; আবার, স্বল্পকালীন সময়ে কোন লোকসান ঘটিলে অনেক পুরাতন প্রতিষ্ঠান বাজার পরিত্যাগ করিবে। ফলে দীর্ঘকালীন সময়ে কোন প্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে না কিংবা লোকসান দেয় না। ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয়ের সমতার বিন্দুতে ধার্য হয়। দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত হইতেছে :

প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়

দাম = গড় ব্যয়

অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় = দাম = গড় ব্যয়। নিচের চিত্রে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থা দেখানো হইয়াছে :



চিত্রে E বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান দেখানো হইয়াছে। E বিন্দু অনুসারে প্রতিষ্ঠানটির ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OM হইয়াছে এবং দাম হইয়াছে PM। কিন্তু গড় ব্যয়-রেখা গড় আয়-রেখাকে স্পর্শক হিসাবে P বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। ফলে, ভারসাম্যের

দাম PM ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ OM-এর গড় ব্যয়ের সমান হইয়াছে। কিন্তু দাম গড় ব্যয়ের সমান হইলেও এই অবস্থায় নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্যের অবস্থা হইতে পৃথক। প্রতিযোগিতার বাজারে দাম গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দুতে সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত বাজারে দাম গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দুতে সমান হইতে পারে না। বাজারে দাম গড় ব্যয়-রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর বামদিকে উপরে কোন বিন্দুতে গড় ব্যয়-রেখাকে স্পর্শ করে। একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে যদিও ভারসাম্যের অবস্থায় কোন প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিতে পারে না, কিন্তু এই বাজারে ভারসাম্যের দাম নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্যের দাম অপেক্ষা বেশি হয়; আবার ভারসাম্যের উৎপাদনের পরিমাণ প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসাম্যের উৎপাদনের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে দেখানো যায় যে, বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকিত তাহা হইলে P বিন্দুতে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইতে OM_1 এবং ভারসাম্য দাম হইত P_1M_1। অথচ একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে OM এবং ভারসাম্য দাম হইয়াছে PM।

শিল্পের বা গোষ্ঠীর ভারসাম্য

একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে শিল্পের ভারসাম্য বা গোষ্ঠীগত ভারসাম্য আসিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, স্বল্পকালীন বাজারে শিল্পের বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিতে পারে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান লোকসানও দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্প বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জণ করিবে। দীর্ঘকালীন সময়ে প্রায় সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিতে পারে। আবার, স্বল্পকালীন সময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান লোকসান দেয় উহাদের মধ্যে কিছু কিছু শিল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ফলে, শিল্পের অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানই অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিবে না কিংবা লোকসান দিবে না। সকল প্রতিষ্ঠানের গড় ব্যয়ই দামের সমান হইবে।

অলিগোপলি
(Oligopoly)

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের একটি বিশেষ রূপ হইল অলিগোপলি। অলিগোপলি বলিতে এমন একটি বাজারকে বুঝায় যেখানে ক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য, কিন্তু অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান শিল্পের সমস্ত বা বেশির ভাগ পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া থাকে। এই অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দুইএর অধিক হওয়া চাই। উৎপাদক ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এতটা মুষ্টিমেয় হওয়া প্রয়োজন যাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বাজারের মোট পণ্যের যোগান প্রভাবিত করিতে পারে। এই বাজারে কোন বিক্রেতা অপর কোন বিক্রেতার ক্রিয়াকলাপের প্রভাব অগ্রাহ্য করিতে পারে না। নিখুঁত প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া বাজার কিংবা একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজার—ইহাদের প্রত্যেকের সহিত অলিগোপলির পার্থক্য নির্দেশ করা যায। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত। কোন বিক্রেতা একক ভাবে পণ্য যোগান দ্বারা দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না। কিন্তু অলিগোপলিতে বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয। প্রত্যেক বিক্রেতা বাজার-দামকে প্রভাবিত করিতে পারে, কেন না, প্রত্যেকে বাজারের মোট যোগানের একটি মোটা অংশ সরবরাহ করিযা থাকে। একচেটিয়া বাজারের সহিত অলিগোপলির পার্থক্য এই যে, একচেটিয়া বাজারে মাত্র একজন বিক্রেতা পণ্য যোগান দিযা থাকে, কিন্তু অলিগোপলির বাজারে কতিপয় বিক্রেতা পণ্য যোগান দিয়া থাকে। আবার একচেটিয়া লক্ষণবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বাজারের সহিত অলিগোপলির পার্থক্য লক্ষণীয। একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে। ক্রেতাগণের কোন বিশেষ জাতীয় পণ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে। ফলে, কোন একজন বিক্রেতা পণ্যের দাম কম-বেশি চাহিলে তাহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিক্রেতার দাম-নীতিকে বা পণ্যের যোগানকে প্রভাবিত করে না। কোন একজন বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের দাম কিছু বেশি ধার্য করে তাহা হইলে তাহার বাঁধাধরা ক্রেতাগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না; কিংবা পণ্যের দাম কিছুটা কমাইলে অপরাপর বিক্রেতার খরিদ্দারগণ তাহার নিকট পণ্যটি কিনিতে ছুটিয়া আসিবে না। এই ধরনের বাজারে দাম প্রতিযোগিতা (price

অলিগোপলির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

competition) তেমন কার্যকর হয় না। কিন্তু অলিগোপলির ক্ষেত্রে কোন একজন বিক্রেতা তাহার দাম-নীতি যদি কিছু অদল-বদল করে, তাহা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য বিক্রেতার দাম-নীতি ও পণ্য যোগানের উপর বিশেষভাবে দেখা দিবে। কোন একজন বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের দাম কমাইয়া দেয় তাহা হইলে অপরাপর বিক্রেতাগণও তাহাদের পণ্যের দাম কমাইয়া পণ্য যোগানের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। আবার, কোন বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের দাম বাড়ায়, তাহা হইলে কিন্তু বাজারের অন্যান্য বিক্রেতাগণ তাহাদের পণ্যের দাম বাড়াইয়া প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে না। [অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি পূর্বে আরও বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে]।

অলিগোপলির প্রকারভেদ
(Forms of Oligopoly)

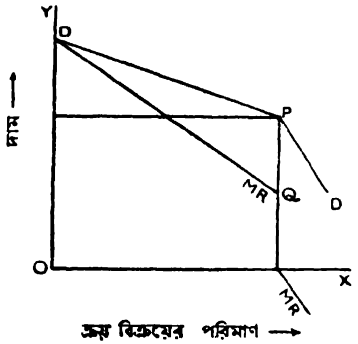
সাধারণত বাজারে দুইপ্রকারের অলিগোপলি দেখা যায় : এক, বিশুদ্ধ অলিগোপলি (Pure or Perfect Oligopoly); দ্বিতীয়ত, পৃথকীকৃত অলিগোপলি (Differentiated Oligopoly)। বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে বিক্রেতাগণ সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে। ফলে, কোন একজন বিক্রেতা যদি যোগানের পরিমাণ বা দামের কিছুটা অদল-বদল করে তাহা হইলে উহার প্রভাব অন্যান্য বিক্রেতাগণের পণ্য যোগান ও দামের উপর বিশেষভাবে দেখা দিবে। পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিক্রেতাগণ কম-বেশি কিছু বিভেদযুক্ত কিংবা প্রায় অনুরূপ পণ্য বিক্রয় করে। এক বিক্রেতার পণ্য অন্য বিক্রেতার পণ্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্তক হিসাবে গণ্য করা হয় না। বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্য অসমজাতীয় বলিয়া প্রত্যেকে কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে।

অলিগোপলিতে দাম নির্ধারণ
(Pricing under Oligopoly)

অলিগোপলিতে দাম নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। ইহার কারণ এই যে, এই ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা দামের অদল-বদল করিলে অন্যান্য বিক্রেতাগণের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। ফলে, কোন বিক্রেতার পণ্যের নির্দিষ্ট চাহিদা-রেখা কি হইবে তাহাও সঠিক করিয়া নির্দেশ করা যায় না। অলিগোপলিতে কোন

একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদার প্রকৃতি বিশেষভাবে নির্ভর করে অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলি দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করে তাহার উপর। যদি কোন একটি প্রতিষ্ঠান পণ্যের দাম কমায়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাদের পণ্যের দাম কমাইবে। ফলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটির পণ্যের বিক্রয় ততটা বাড়িতে পারে না। অর্থাৎ যদি কোন প্রতিষ্ঠান বর্তমান দাম অপেক্ষা কম দাম ধার্য করে তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইবে। আবার, প্রতিষ্ঠানটি যদি বর্তমান দাম অপেক্ষা দাম বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দাম নাও বাড়াইতে পারে। ফলে, প্রতিষ্ঠানটির বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষভাবে কমিবে। অর্থাৎ যদি কোন প্রতিষ্ঠান বর্তমান দাম অপেক্ষা দাম বেশি ধার্য করে, তাহা হইলে উহার চাহিদা অত্যন্ত. স্থিতিস্থাপক হইবে। অতএব অলিগোপলিতে কোন নির্দিষ্ট চাহিদা-রেখা আঁকা যায় না। এই চাহিদা-রেখা অনেকটা মোড়ানো (kinked) হয়। নিচের চিত্রে চাহিদা-রেখা DD অবিচ্ছিন্ন নহে; P বিন্দুতে DD চাহিদা-রেখা মোড়ানো। আবার, চাহিদা-রেখার ন্যায় প্রান্তিক আয়-রেখারও Q বিন্দুতে ছেদ নির্দেশ করা যায়।

অলিগোপলিতে চাহিদার প্রকৃতি



অলিগোপলিতে একজন বিক্রেতার ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য বিক্রেতাগণের ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেহেতু একটি প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপকে নানাভাবে প্রভাবিত করে, সেইহেতু প্রথম প্রতিষ্ঠানটি উহার দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ কিভাবে স্থির করিবে তাহা সঠিকভাবে

জানা যায় না। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অনুমান করিয়া প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া থাকে।

অলিগোপলিতে যদি মুষ্টিমেয় বিক্রেতা সমজাতীয় পণ্য বিক্রয় করে তাহা হইলে উহারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক দাম-নীতি দীর্ঘদিন ধরিয়া কায়েমী রাখিতে পারে না। দাম সম্পর্কীয় তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে বিক্রেতাগণ পরস্পব মিলিয়া জোট কারবারের সৃষ্টি করিতে পারে। উহাদের দাম-নীতি তখন মোটামুটি একচেটিয়া কারবারীর মূল্যতত্ত্বের মত হয। অবশ্য এ অবস্থায় প্রত্যেক বিক্রেতার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকায একটি সাধারণ ভারসাম্য মূল্য স্থাপিত হইতে পারে না। অনেক সময় বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক সহযোগিতায একটি মূল্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকে। অনেক সময আবার ইহাও দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি দাম-নীতি সম্পর্কে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটিব 'দাম নেতৃত্ব' (price leadership) মানিয়া লয। বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটি যে দামে পণ্য বিক্রয় করে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও সেই দামেই পণ্য বিক্রয কবিয়া থাকে। অলিগোপলিতে যখন এইরূপ দাম নেতৃত্ব স্থাপিত হয, তখন দাম সাধাবণত একচেটিয়া বাজারের দামের ন্যায ধার্য হয।

কিন্তু পৃথকীকৃত অলিগোপলিতে বিভিন্ন বিক্রেতা পণ্যের দাম-নীতি সম্পর্কে পারস্পরিক প্রতিক্রিযাশীল নহে। যেহেতু বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন ধরনেব পণ্য বিক্রয করে সেইহেতু প্রত্যেকে একটি পৃথক বিক্রয় বাজাব সৃষ্টি করিতে পাবে। এই অবস্থাতে যতটি বিক্রেতা ততটি বিক্রযবাজাব, এবং ততটি দাম কল্পনা করা যায। প্রত্যেকটি বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের ভাবসাম্য প্রান্তিক ব্যয ও প্রান্তিক আয সমতার বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। তবে নিখুঁত অলিগোপলির ন্যায় এ অবস্থাতেও ভারসাম্য দাম অত্যন্ত অস্থাযী হয। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পণ্যের দাম ও উৎপাদন পরিমাণ অনবরত পরিবর্তন কবিতে হয় যাহাতে প্রত্যেকে সর্বাধিক মুনাফা উপার্জন কবিতে সক্ষম হয়।

বিক্রয়-ব্যয়
(Selling Cost)

উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উহার পণ্যের প্রতি ক্রেতাগণকে আকৃষ্ট কবাব জন্য যে খরচ করে উহাকে বিক্রয়-ব্যয় বলে। বাজারে পণ্যের প্রচাব

ও বিক্রয় কার্য চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানকে যে সকল ব্যয় করিতে হয় উহাই বিক্রয়-ব্যয়। এক কথায় পণ্যের বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার কার্যের দরুন খরচকেই বিক্রয়-ব্যয় বলা চলে। ইহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিক্রয়-ব্যয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান পণ্যের প্রতি ক্রেতাগণের চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারকার্যেব দ্বারা প্রতিষ্ঠান ক্রেতাগণকে পণ্যটি সম্পর্কে পবিচয ঘটায এবং উহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওযাকিবহাল করিযা তোলে। প্রতিযোগিতামূলক প্রচার-কার্যের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান আর একটি প্রতিষ্ঠানের তুলনায নিজস্ব পণ্য বেশি পরিমাণে বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়।

নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয়-ব্যয় করিতে হয় না। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকায় ধরিয়া লওয়া হয়, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান বর্তমান দামে ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ফলে, এই বাজারে কোন বিক্রয়-ব্যয়ের প্রয়োজন হয না। বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারেও কোন প্রতিযোগী বিক্রেতা না থাকায় প্রচারকার্য বাবদ কোন খবচ করিতে হয না। কিন্তু একচেটিয়া লক্ষণযুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে কিংবা অলিগোপলির বাজারে বিক্রয়-ব্যয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। এই প্রকারের বাজারে বিক্রেতাগণ পৃথকীকৃত পণ্য বিক্রয় করে বলিযা প্রত্যেকে তাহার পণ্য বাজারে চালু করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করে। এই ধরনের বাজারে অনেক সময বিক্রয়-ব্যয উৎপাদন-ব্যয অপেক্ষাও বেশি করা হয়।

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজাবে বিক্রয-ব্যয় অপবিহার্য হইলেও ইহার ফলাফল সকল অবস্থাতে সুনিশ্চিত নহে। বিক্রয-ব্যয় পণ্যের চাহিদা প্রভাবিত করে। বিক্রয়-ব্যয় দ্বারা প্রতিষ্ঠান যদি ভাল প্রচারকার্য চালাইতে সক্ষম হয তাহা হইলে পণ্যটির চাহিদা বাড়িবে এবং এবং চাহিদা-রেখা দক্ষিণে সরিয়া যাইবে। কিন্তু পণ্যেব এই চাহিদা বৃদ্ধি অনেকটা অনিশ্চিত। কেন না, একটি প্রতিষ্ঠান উহার নিজস্ব পণ্যের চাহিদা বাড়াইতে জোর প্রচারকার্য চালাইলে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিও পরস্পরবিরোধী প্রচারকার্য বাবদ ব্যয করিবে। ফলে, প্রথম প্রতিষ্ঠানটির উপর বিক্রয়-ব্যয়ের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া

বিক্রয-ব্যয়েব ফলাফল

যাইবে। অনেক সময় আবার বিক্রয়-ব্যয়ের প্রভাব শুধুমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা বাড়াইয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না। একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচারকার্যের জন্য যে ব্যয় করা হয় উহা পণ্যের সাধারণ চাহিদা বাড়াইতে পারে। যেমন, একটি কোম্পানি যদি কফি চালাইবার জন্য প্রচার বাবদ ব্যয় করে তাহা হইলে ঐ বিক্রয়-ব্যয় দরুন বাজারে কফির সাধারণ চাহিদা বাড়িতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে যে, বিক্রয়-ব্যয় একদিকে যেমন পণ্যের চাহিদাকে প্রভাবিত করে, ইহা আবার মোট ব্যয় বাড়াইয়া, যদি প্রচুর উৎপাদন জনিত পণ্যের গড় ব্যয় কম না থাকে, তাহা হইলে পণ্যের দামকেও বাড়াইয়া থাকে। বিক্রয়-ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যদি প্রতিষ্ঠানের মোট গড় ব্যয় বাড়িয়া যায় তাহা হইলে আবার পণ্যের চাহিদার উপর কি ফলাফল হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না।

বিক্রয় পরিমাণের উপর বিক্রয়-ব্যয়ের ফলাফল কি হইতে পারে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রচারকার্য বাবদ কিছুটা পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিলে তাহার ফলে বিক্রয়ের পরিমাণ কতটা বাড়িবে তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। অনেক সময় প্রচার-ব্যয়ের কোন ফলাফলই দেখা না দিতে পারে। যেমন, পেট্রল বিক্রয়কেন্দ্রগুলি যখন বিনা পয়সায় গাড়ির চাকায় হাওয়া ভরিয়া দেয় কিংবা গাড়ি পরিষ্কার করিয়া দেয়, তখন উহাদের এই প্রচারকার্য বাবদ ব্যয় পেট্রল বিক্রয়ের পরিমাণকে বড় একটা বাড়াইতে পারে না। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্রচারের ফলে কোন প্রতিষ্ঠানেরই বিক্রয় বাড়ে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যেককে এইরূপ প্রচারকার্য চালাইতে হয়। কেন না, যে প্রতিষ্ঠানটি এইরূপ প্রচারকার্য বাবদ ব্যয় না করিবে উহাকে নিশ্চয়ই কিছু খরিদ্দার হারাইবে উহার পক্ষে বর্তমান বিক্রয়ের পরিমাণ বজায় রাখা অসম্ভব হইবে।

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণের সাধারণ নীতি

(General Principles of Price Determination under Imperfect Competition)

অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে একই ধরনের সমজাতীয় পণ্য কেনা-বেচা হয় না। বিক্রেতাগণ বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাজারে বিক্রয় করে এবং

ক্রেতাগণেরও কোন বিশেষ বিক্রেতার বিশেষ ধরনের পণ্যের উপর বিশেষ রকম আকর্ষণ থাকে। প্রত্যেক বিক্রেতা বিজ্ঞপ্তি, ট্রেড মার্ক, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা নিজের পণ্য অপরাপর বিক্রেতার পণ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, এই বিশ্বাস ক্রেতাগণের মনে জন্মাইতে চেষ্টা করে। কোন বিক্রেতা যদি তাহার পণ্যের প্রতি কিছুসংখ্যক ক্রেতার আসক্তি জন্মাইতে সফল হয়, তাহা হইলে বাজারে সে কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে। এই একচেটিয়া ক্ষমতার জোরে প্রত্যেক বিক্রেতা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কিছুটা স্বাধীনভাবে পণ্যের দাম ধার্য করিতে পারে। কিন্তু নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে কোন বিক্রেতাই পণ্যের দাম স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করিতে পারে না। প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা কেবলমাত্র পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ ধার্য করিতে পারে, দাম বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা যদি পণ্যের দাম কিছুটা বাড়াযও তাহা হইলে তাহার পণ্যের প্রতি কিছু ক্রেতার আসক্তি আছে বলিয়া তাহারা ঐ বিক্রেতাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্য কিনিবে না। আবার, সে যদি তাহার পণ্যের দাম কিছুটা কমাযও, তাহা হইলেও অন্যান্য বিক্রেতার নিকট যাহারা পণ্য কিনিত তাহারা সকলে তাহার নিকট চলিযা আসিবে না। অনিখুঁত প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা তাহার পণ্যের দাম বাড়াইলে কিছু পুরাতন ক্রেতা হাতছাড়া হইতে পারে, কিন্তু সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। সেইরূপ সে যদি তাহার পণ্যের দাম কমায়ও, তাহা হইলেও তাহার বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি কিছু বাড়িবে না। বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি বাড়াইতে হইলে পণ্যের দামও বেশি করিয়া কমাইতে হইবে। সেইজন্য অনিখুঁত প্রতি-যোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক হয় না, চাহিদা-রেখা ডানদিকে নিম্নমুখী হয। তবে বিশুদ্ধ একচেটিয়া বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যতটা হয, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা তাহা অপেক্ষা বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, এই বাজারে কিছু কিছু পরিবর্তক পণ্য বর্তমান থাকে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায এই বাজারেও বিক্রেতার সর্বাধিক মুনাফা উপার্জনের লক্ষ্য থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় উহার প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকে, ততক্ষণ উহার পক্ষে পণ্যের যোগান বাড়াইয়া যাওয়া লাভজনক। আবার, প্রান্তিক আয় যদি প্রান্তিক

ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে পণ্যের যোগান কমানোই বিক্রেতার পক্ষে লাভজনক। বিক্রেতাব মুনাফা সর্বাধিক হইবে সেই পরিমাণ পণ্য যোগান দিলে যাহাতে প্রান্তিক আয ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। ইহাই ভারসাম্যের অবস্থা। কিন্তু এই ভাবসাম্যেব অবস্থায প্রান্তিক আয দাম অপেক্ষা কম হয। ইহার কাবণ এই যে, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজাবে বিক্রেতাকে অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয করিতে হইলে বাজার দাম কমাইতে হয। আবার ভারসাম্যের অবস্থায় প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান বলিযা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক ব্যয়ও দাম অপেক্ষা কম হয়।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজাবে যখন কোন শিল্প ভারসাম্যে পৌঁছায তখন ঐ শিল্পে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানই সর্বনিম্ন গড ব্যযে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয করিয়া থাকে। তখন ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সর্বাধিক কাম্য প্রতিষ্ঠান বলা চলে। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতাব বাজারে শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন গড ব্যযে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয কবে না। প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে যে প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন গড ব্যযে পণ্য যোগান দিতে পারে না, উহাকে শিল্প ছাডিয়া অন্যত্র চলিযা যাইতে হয। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতাব বাজাবে সর্বাধিক কাম্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সাধারণ প্রতিষ্ঠানও বাজাবে পণ্য বিক্রয করিযা থাকে। ইহার কারণ এই যে, সাধাবণ প্রতিষ্ঠানগুলির পণ্যের জন্য কিছু কিছু ক্রেতার বিশেষ আকর্ষণ থাকে এবং সর্বাধিক কাম্য প্রতিষ্ঠান আপন পণ্যের দাম কমাইয়া ঐ আকর্ষণ নষ্ট কবে না।

২১ | সংশ্লিষ্ট চাহিদা ও যোগান
(Inter-related Demands and Supplies)

আমরা এযাবৎ দাম নির্ধারণের যে সকল বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ক্রেতাগণের একটি মাত্র পণ্যের চাহিদা আছে এবং বিক্রেতাগণের নিকটও একটি মাত্র পণ্যের যোগান আছে। ঐ পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের উপর অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের প্রভাব নাই। ঐ পণ্যটির দামের সহিত অন্য কোন দ্রব্যের দামেরও সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম অন্যান্য পণ্যের চাহিদা, যোগান ও দাম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারিত হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্ভব নহে। বাস্তবে একটি পণ্যের দাম কেবলমাত্র ঐ পণ্যটির চাহিদা ও যোগানের প্রতিক্রিয়া দ্বারাই নির্ধারিত হয় এমন নহে। অন্যান্য পণ্যের চাহিদা এবং যোগানও পণ্যটির দাম নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বাস্তবক্ষেত্রে অধিকাংশ পণ্যের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। পণ্যের চাহিদা ও যোগান কিভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইতে পারে, নিচে তাহা আলোচনা করা হইল।

সংশ্লিষ্ট চাহিদার প্রকারভেদ
(Different Forms of Inter-related Demand)

পণ্যের সংশ্লিষ্ট চাহিদা নিম্নলিখিত চারিপ্রকারের দেখা যায় :

(১) **সংযুক্ত চাহিদা** (Joint Demand)—কোন একটি অভাব পূরণের জন্য যখন একাধিক দ্রব্যের ব্যবহার প্রয়োজন হয় তখন ঐ সকল দ্রব্যের চাহিদাকে সংযুক্ত চাহিদা বলা হয়। যেমন, পাঁউরুটি ও মাখন, চা, চিনি ও দুধ, মোটরগাড়ি ও পেট্রল ইত্যাদি সংযুক্ত চাহিদার কয়েকটি উদাহরণ। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শুধু ভোগকারিগণের নিকট একাধিক দ্রব্যের চাহিদাই যে সংযুক্ত হয় তাহা নহে, উৎপাদনকারিগণের নিকট উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদাও সংযুক্ত চাহিদার দৃষ্টান্ত। যে সকল দ্রব্যের চাহিদা সংযুক্ত উহার একটি আর একটির অনুপূরক হইয়া থাকে। যেমন, মাখন পাঁউরুটির অনুপূরক, পেট্রল মোটরগাড়ির অনুপূরক। সংযুক্ত চাহিদাকে সেইজন্য অনুপূরক চাহিদাও (Complementary demand) বলা চলে।

সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির চাহিদা এবং দামের পরিবর্তন একই মুখে ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ একটি দ্রব্যের চাহিদা বা দাম বাড়িলে সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা ও দাম বাড়িবে, আবার একটি দ্রব্যের চাহিদা ও দাম কমিলে সংযুক্ত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা ও দাম কমিবে। যেমন, পাঁউরুটির চাহিদা বাড়িলে মাখনের চাহিদা বাড়িবে, আবার পাঁউরুটির চাহিদা কমিলে মাখনের চাহিদা কমিবে।

সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের পরস্পর সম্পর্ক

কিন্তু সাধারণভাবে সংযুক্ত চাহিদার দ্রব্যগুলির দামের পরিবর্তন একমুখে ঘটিলেও, অনেক সময় এই পরিবর্তন বিপরীত মুখেও ঘটিতে পারে। যেমন, মনে কর, পাঁউরুটির যোগান যদি বাড়ে কিন্তু মাখনের যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে বাজারে পাঁউরুটির দাম কমিবে। ফলে, পাঁউরুটির চাহিদা বাড়িবে। পাঁউরুটির চাহিদা বৃদ্ধির সহিত সংযুক্ত দ্রব্য মাখনের চাহিদাও বাড়িবে। কিন্তু যেহেতু মাখনের যোগান অপরিবর্তিত ধরিয়া লওয়া হইযাছে, সেইজন্য মাখনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উহার দাম বাড়িবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সংযুক্ত চাহিদার একটি দ্রব্য পাঁউরুটির দাম যখন কমিয়াছে তখন আর একটি দ্রব্য মাখনের দাম বাড়িযাছে।

(২) **উদ্ভূত চাহিদা** (Derived Demand)—যখন একটি দ্রব্যের চাহিদা হইতে আর একটি দ্রব্যের চাহিদার উৎপত্তি হয়, তখন দ্বিতীয় দ্রব্যটির চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলে। উৎপাদনের উপাদান বা কারকগুলির চাহিদা উদ্ভূত চাহিদার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উপাদানগুলির চাহিদা সৃষ্টি হয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা হইতে। ভোগকারিগণের বাড়ির চাহিদা হইতে বাড়ি তৈয়ারীর জন্য জমি, মালমশলা, রাজমিস্ত্রীর শ্রম, ইত্যাদি চাহিদার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই উপাদানগুলির চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা। উদ্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যগুলির চাহিদা ও দাম একমুখী হইযা থাকে। যেমন, বাড়ি তৈয়ারীর জন্য ইটের চাহিদা বাড়িলে, চুন, বালি, সুরকি ইত্যাদির চাহিদাও বাড়িবে।

(৩) **যৌগিক চাহিদা** (Composite Demand)—যখন একই দ্রব্য বিভিন্নভাবে ব্যবহারের জন্য চাওয়া হয় তখন সেইরূপ চাহিদাকে যৌগিক চাহিদা বলে। যেমন, ইস্পাত বিভিন্নভাবে ব্যবহার দ্বারা বিভিন্ন অভাব পূরণ করা যায়। বাড়িঘর নির্মাণে, অস্ত্রপাতি নির্মাণে, রেলগাড়ি ও জাহাজ

নির্মাণে, যন্ত্রপাতি কলকব্জা নির্মাণে ইস্পাত ব্যবহার করা যায়। দ্রব্যের যৌগিক চাহিদার ক্ষেত্রেও চাহিদা ও দামের একই সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। বাড়িঘর নির্মাণকারিগণ যদি বেশি দামে ইস্পাত কেনে, তাহা হইলে ইস্পাতের অন্যান্য চাহিদাকারিগণের নিকটও ইস্পাতের দাম অবশ্য বাড়িবে।

(৪) **প্রতিযোগী চাহিদা** (Rival or Competitive Demand)—যখন কোন একটি চাহিদা বিভিন্ন দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা পূরণ করা যায় তখন ঐ সকল বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাকে প্রতিযোগী চাহিদা বলা হয়। যেমন, চা ও কফি, বাস ও রেল, চিনি ও স্যাকারিন ইত্যাদির চাহিদা প্রতিযোগী চাহিদা। উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদাও যেমন, পুঁজি ও শ্রমের চাহিদাও কতকটা প্রতিযোগী চাহিদা। যে সকল দ্রব্যের চাহিদাকে প্রতিযোগী চাহিদা বলা হয়, উহারা পরস্পরের বিকল্প বা পরিবর্তক দ্রব্য। প্রতিযোগী চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন বিপরীতমুখী হইয়া থাকে। কিন্তু দামের পরিবর্তন একই মুখে ঘটে।

সংযুক্ত চাহিদা ও দাম নির্ধারণ

(Joint Demand and Price Determination)

সংযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন দ্রব্যের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, আমরা এখন তাহাই আলোচনা করিব।

সাধারণ ক্ষেত্রে পণ্যের দাম প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দাম-তত্ত্বের ঐ মূল নীতিটি কিছু অদল-বদল করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক দুই বা ততোধিক দ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় পৃথকভাবে নির্ণয় করার কোনই অসুবিধা নাই। কেননা, উহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া পৃথক। যেমন, পাঁউরুটি ও মাখনের পৃথক উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করার কোনই সমস্যা নাই; কেন না, উহারা সংযুক্তভাবে উৎপন্ন হয় না। সমস্যা হইল চাহিদার দিক হইতে বিভিন্ন অনুপূরক দ্রব্যের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ করা। যেহেতু পাঁউরুটি ও মাখন একযোগে সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, সেইহেতু কোন্ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে দুইটি দ্রব্যের পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয়

করিতে হইলে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া আর একটি দ্রব্যের চাহিদার পবিমাণ বাড়াইতে হয়। দ্বিতীয় দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ বাড়াইবার ফলে ভোগকারী যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে উহাই ঐ দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ। মাখনের চাহিদাব পরিমাণ অপরিবর্তিত বাখিয়া, পাঁউরুটির চাহিদা এক একক বাড়াইলে যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা যায় উহাই পাঁউরুটিব প্রান্তিক উপযোগ। এইরূপভাবে আবার পাঁউরুটির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মাখনের চাহিদা এক একক বৃদ্ধি করিলে, মাখনের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ করা যায়। পাঁউরুটির দাম নির্ধারিত হইবে পাঁউরুটির প্রান্তিক উপযোগ ও উহার প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা। সেইরূপ মাখনের দাম নির্ধাবিত হইবে মাখনের প্রান্তিক উপযোগ ও উহার প্রান্তিক ব্যয় দ্বারা। উৎপাদনের যে সকল উপাদানগুলির চাহিদা সংযুক্ত উহাদের ক্ষেত্রেও দাম নির্ধারণে ঐ একই নীতি প্রযোজ্য।

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম নির্ধারণে উপযোগ-তত্ত্বেব বিশ্লেষণ সন্তোষজনক মনে কবেন না। তাহারা পছন্দ-তত্ত্বেব ভিত্তিতে সংযুক্ত চাহিদার পণ্যের দাম নির্ধারণের পক্ষপাতী। তাঁহাদেব মতে সংযুক্ত পণ্যক্রযেব ক্ষেত্রে ভোগকারীর ভারসাম্য অবস্থা তখনই আসিবে যখন দুই বা ততোধিক পণ্যের প্রান্তিক উপযোগেব অনুপাত উহাদের দামেব অনুপাতের সমান হয় $\left(\text{অর্থাৎ } \frac{MUx}{MUy} = \frac{Px}{Py} = 1.\right)$। ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে পণ্যগুলির সেই পরিমাণ কিনিবে যাহাতে প্রত্যেকটি পণ্যের উপর ব্যযিত অর্থ হইতে সে সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারে। উৎপাদনের উপাদান ক্রয়ের ক্ষেত্রেও উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি উপাদান সেই পবিমাণ কিনিবে যাহাতে উহাদের প্রত্যেকটি হইতে সমপরিমাণ প্রান্তিক উৎপন্ন লাভ করিতে পাবে।

সংশ্লিষ্ট যোগান

(Inter-related Supplies)

পণ্যের পরস্পর সংশ্লিষ্ট যোগান দেখা যায় প্রধানত দুই প্রকারের :

(১) সংযুক্ত যোগান, এবং (২) প্রতিযোগী যোগান।

(১) **সংযুক্ত যোগান** (Joint Supply)—যখন একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা একই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দ্রব

ও সেবা উৎপন্ন হয়, তখন এই দ্রব্যগুলির বা সেবাগুলির যোগানকে সংযুক্ত যোগান বলে। একই ব্যয় দ্বারা সংযুক্তভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া এই দ্রব্য-গুলিকে সংযুক্ত যোগানের দ্রব্য বা সহ-উৎপন্ন ব্যয় বিশিষ্ট দ্রব্য (Joint goods বা joint cost goods) বলা হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ দ্রব্য উৎপাদন করে উহাদিগকে একাধিক দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (Multi-product firm) বলা চলে। যে সকল দ্রব্য বা সেবার যোগান সংযুক্ত উহারা পরস্পর অনুপূরক (Complementary) হইয়া থাকে। সংযুক্ত যোগানের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইল : তুলা ও তুলাবীজ, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কয়লা, ধান ও খড় ইত্যাদি। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে মূলত যে দ্রব্যটি বা সেবা উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, উহাকে মুখ্য পণ্য বলে ; আর যে দ্রব্য বা সেবাটি অপরিহার্যভাবে মূল দ্রব্য বা সেবার সহিত উৎপন্ন হয় উহাকে উপজাত-দ্রব্য বা সেবা (bye-product) বলে।

সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের দামের পরস্পর সম্পর্ক

যে সকল দ্রব্যের যোগান সংযুক্ত উহাদের দামের পরিবর্তনের পরস্পর সম্পর্ক কি? তুলা ও তুলাবীজ সংযুক্ত যোগান। যদি তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তুলার দাম বাড়ে তাহা হইলে তুলা বীজের দামে কোন্‌দিকে পরিবর্তন ঘটিবে? তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে যখন তুলার দাম বাড়ে তখন স্বভাবতই তুলার উৎপাদনও বাড়িয়া যায়। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজের উৎপাদনও বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু বীজের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকায়, বীজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে উহার দাম কমিবে। সুতরাং, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে যখন মুখ্য পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পায়, তখন উপজাত পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে, মুখ্য পণ্যের দাম কমিলে উপজাত পণ্যটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে পণ্যের দামের পরিবর্তন বিপরীত দিকে ঘটে।

(২) **প্রতিযোগী যোগান** (Rival or Competitive Supply)—একই উপাদান দ্বারা যখন দুই বা ততোধিক দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে, তখন উহাদের যোগান পরস্পর প্রতিযোগী হয়। যেমন একই স্থানের জমি যদি পাট ও ধান চাষের উপযোগী হয়, তাহা হইলে ঐ জমি বেশি পরিমাণে পাট চাষে নিয়োগ করিলে ধান উৎপাদনে জমির যোগান কমিয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে পাট ও ধানের যোগান পরস্পর প্রতিযোগী। পাটের চাহিদা ও দাম বাড়িলে কৃষক বেশি খাজনা দিয়া বেশি পরিমাণ জমি পাট উৎপাদনে

নিযুক্ত করিবে। কিন্তু পাট চাষে বেশি জমি নিযুক্ত হইলে ধান চাষের জন্য জমির যোগান টান পড়িবে। ইহাতে ধানের উৎপাদন কমিবে এবং দাম বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং প্রতিযোগী যোগানের পণ্যের ক্ষেত্রে যোগানের পবিবর্তন বিপরীত মুখে ঘটে এবং দামের পরিবর্তন একই মুখে ঘটে।

সংযুক্ত যোগান ও দাম নির্ধারণ

(Joint Supply and Price Determination)

সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে পণ্যের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের সাধারণ তত্ত্ব প্রয়োগ করিতে হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় একটি পণ্যের দাম বিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারণের সময় সূত্রটি যে ভাবে প্রযোজ্য, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগের একটু তারতম্য আছে। সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্যের মোট সম্মিলিত ব্যয় নির্ণয় করা সহজ, কিন্তু প্রত্যেকটি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সহজ নহে।

দাম নির্ধারণেব বিশ্লেষণ যাহাতে সহজ হয়, তাহার জন্য সংযুক্ত যোগানের পণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে : (১) কতকগুলি সংযুক্ত যোগানের পণ্য আছে যাহাদের আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্তন করা চলে। যেমন, পশম ও মাংস। ইচ্ছা করিলে বৈজ্ঞানিক প্রজনন দ্বারা এমন জাতের মেষ উৎপাদন করা যায়, যাহাতে মাংসের আপেক্ষিক অনুপাত পশমের আপেক্ষিক অনুপাত অপেক্ষা বেশি হইতে পারে। আবার, এমন জাতেরও মেষ উৎপাদন করা যায় যাহাতে পশমের আপেক্ষিক অনুপাত মাংসের আপেক্ষিক অনুপাত অপেক্ষা বেশি হইতে পারে। (২) আর এক প্রকারের সংযুক্ত যোগানের পণ্য আছে যাহাদের আপেক্ষিক অনুপাত স্থির; মানুষ অদল-বদল করিতে পারে না। যেমন, তুলা ও তুলাবীজ, ধান ও খড় ইত্যাদি।

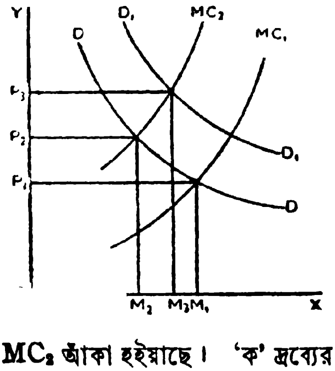
সংযুক্ত যোগানে পণ্যের শ্রেণী বিভাগ

প্রথম শ্রেণীর সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায়। মনে কর, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা 'ক' ও 'খ' এই দুই জাতের মেষ উৎপন্ন করা হইয়াছে। 'ক' জাতের মেষ হইতে অপেক্ষাকৃত বেশি অনুপাতে মাংস পাওয়া যায়; আর 'খ' জাতের মেষ হইতে পশমের আপেক্ষিক অনুপাত পাওয়া যায় বেশি। এই উভয় জাতের এক একটি মেষ প্রতিপালনের ব্যয় ধরা যাক ১০০৲ টাকা। মনে কর; 'ক' জাতের একটি মেষ

সংযুক্ত যোগান দ্রব্যেব দাম নির্ধারণ

হইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম পাওয়া যায়, উহার প্রতিপালন ব্যয় ১০০ টাকা। সেইরূপ ‘খ’ জাতের একটি মেষ হইতে ৭ একক মাংস এবং ১০ একক পশম পাওয়া যায়। উহার প্রতিপালন ব্যয় ১০০ টাকা।

যদি ‘ক’ জাতের ৭টি মেষ প্রতিপালন করা যায়, তাহা হইলে উহাদের মাংসের পরিমাণ হইবে ৭০ একক, এবং পশমের পরিমাণ ৫৬ একক—৭টা মেষের প্রতিপালন ব্যয় হইবে ৭০০ টাকা। আবার ‘খ’ জাতের ১০টি মেষের প্রতিপালন ব্যয় হইবে ১০০০ টাকা; উহাদের মাংসের পরিমাণ হইবে ৭০ একক এবং পশমের পরিমাণ ১০০ একক। এই দুই জাতের মেষ প্রতিপালন করিয়া অতিরিক্ত ৪৪ একক পশম পাওয়া যায় অতিরিক্ত ৩০০ টাকা ব্যয়ে। সুতরাং পশমের প্রান্তিক ব্যয় হইবে $\frac{৩০০}{৪৪}$ টাকা অর্থাৎ ৬$\frac{২}{১১}$ টাকা। ঠিক একইরূপে মাংসেরও প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায়। এইভাবে যখন প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে বাহির করা যায়, তখন নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পশমের দাম উহার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান এবং মাংসের দামও মাংসের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান। অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদনের যে অবস্থায় প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইবে সেই পরিমাণে প্রত্যেকটি দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হইবে।



পার্শ্বের চিত্রে ‘খ’ দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় অনুমান করিয়া ‘ক’ দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা MC_1 রেখা আঁকা হইয়াছে। আবার ‘ক’ দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় ধরিয়া লইয়া ‘খ’ দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয়-রেখা MC_2 আঁকা হইয়াছে। ‘ক’ দ্রব্যের ভারসাম্যের দাম OP_1 এবং ভারসাম্য পণ্যের পরিমাণ OM_1। ‘খ’ দ্রব্যের ভারসাম্যের দাম OP_2 এবং ভারসাম্য পণ্যের পরিমাণ OM_2। যদি ‘খ’ দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে তাহা হইলে ‘ক’ দ্রব্যের যোগান বাড়িবে যতক্ষণ না উহার প্রান্তিক ব্যয়-রেখা নূতন চাহিদা রেখা D_1D_1কে স্পর্শ করে। ‘খ’ দ্রব্যের-দাম বাড়িয়া OP_3 হইবে, যখন ‘ক’ দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় থাকিবে।

কিন্তু সংযুক্ত যোগানের পণ্য যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়, অর্থাৎ উহাদের আপেক্ষিক অনুপাত যদি পরিবর্তন করা না যায়, তাহা হইলে পণ্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। যেমন, তুলা ও তুলাবীজের আপেক্ষিক অনুপাত প্রকৃত নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। উহাদের আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব নয় বলিয়া উহাদের প্রান্তিক ব্যয় পৃথকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। শুধুমাত্র ইহাদের মোট সংযুক্ত ব্যয় নির্ণয় করা যায়। এইরূপ সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণে দুইটি নীতি সাধারণত কার্যকর হয়। প্রথমত, তুলা ও তুলাবীজ—এই দুইটি সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের মোট উৎপাদন ব্যয় উহাদের মোট বিক্রয় দাম দ্বারা উশুল হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় ভোগকারীর নিকট সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাহা দ্বারা। তুলার বাজার চাহিদা কি, তাহা দ্বারা তুলার দাম পৃথকভাবে স্থির হইবে ; তুলাবীজের বাজার চাহিদা কি, তাহা দ্বারা তুলাবীজের দাম ধার্য হইবে। দাম নির্ধারণের এই নীতিকে 'principle of what the traffic will bear' বলা হয়।

অপরিবর্তনীয় অনুপাতে সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

মনে রাখিতে হইবে যে, সংযুক্ত যোগানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পণ্য উপাদনের একটি প্রাথমিক ব্যয (Prime cost) আছে। প্রত্যেকটি পণ্যের বাজার দাম এমনভাবে ধার্য হওয়া চাই যে, উহা দ্বারা ন্যূনপক্ষে দ্রব্যটি উৎপাদনের প্রাথমিক ব্যয় উঠিয়া আসে।

দাম নিয়ন্ত্রণ ও উহার ফলাফল
(Price Control and its Effects)

যখন কোন দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি পড়ে, তখন উহার দাম বাড়িয়া যায়। এই দামবৃদ্ধির সুবিধা লইয়া দ্রব্যটির উৎপাদক, বিক্রেতা ও আড়তদার প্রভৃতি মোটা মুনাফা উপার্জন করিয়া থাকে। ফলে ভোগকারিগণের কষ্টের চূড়ান্ত হয। ঐ দ্রব্যটি যদি খাদ্যবস্তু হয়, কিংবা অন্য কোন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হয়, তাহা হইলে উহার চড়া দাম ভোগকারিগণের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে ভোগকারিগণ, বিশেষ করিয়া শ্রমিকশ্রেণী, উচ্চতর মজুরির জন্য দাবী পেশ করে। উহার ফলে শ্রমিক-মালিক বিবাদ ও

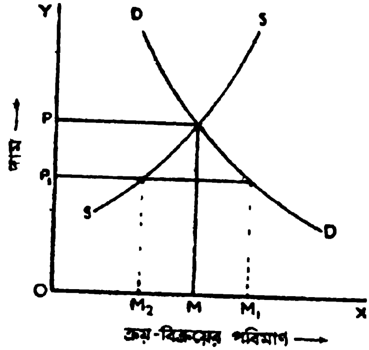
দাম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

অন্যান্য অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে। আবার, দ্রব্যটি যদি উৎপাদক সামগ্রী হয় তাহা হইলে উহার দাম বাড়িলে অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। পণ্য মূল্য বৃদ্ধির এই সকল অশুভ পরিণাম যাহাতে না ঘটে তাহার জন্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া থাকে।

দাম নিয়ন্ত্রণের ফলাফল

দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে পণ্যের দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কতকগুলি ফলাফল দেখা দেয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ফলাফলগুলি দেখানো হইল :

চিত্রে কোন পণ্যের ভারসাম্য দাম OP এবং ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM দেখানো হইয়াছে। এই দাম খুব বেশি মনে করিয়া সরকার পণ্যটির দাম OP_1 ধার্য করিয়া দিল। এই নিয়ন্ত্রিত দামে চাহিদার পরিমাণ বাড়িয়া OM_1 হইল কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়া OM_2 হইল। অর্থাৎ দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে যোগান অপেক্ষা চাহিদা M_1M_2 পরিমাণ বাড়িল। যোগানের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ক্রেতাগণ ইচ্ছামত পরিমাণে পণ্য কিনিতে পারিবে না। বিক্রেতাগণ ইচ্ছামত যতটুকু পণ্য বাজারে ছাড়িবে, ক্রেতাগণ তাহার বেশি কিনিতে পারিবে না। দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নিম্নলিখিত আরও কতকগুলি অসুবিধা আছে :



(১) অন্যতম অসুবিধা হইল সর্বোচ্চ দাম (ceiling price) নির্ধারণ সম্পর্কে। যে পণ্য দেশে উৎপন্ন হয় উহার দাম ধার্য করা হয় উৎপাদন ব্যয় ও সম্ভাব্য স্বাভাবিক মুনাফার যোগফলের ভিত্তিতে। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তনীয়। উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রিত দামেরও অদল-বদল করিতে হয়। আবার পণ্যটি যদি বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়, তাহা হইলে উহার নিয়ন্ত্রণ দাম ধার্য করা হয় পণ্যটি দেশে পৌছান পর্যন্ত যে মোট ব্যয় হয় তাহার ভিত্তিতে। এই মোট ব্যয়েরও পরিবর্তন হইতে পারে।

(২) দাম নিয়ন্ত্রণের আর একটি অসুবিধা হইতেছে নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ দাম

চালু করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনেক সময় কালো বাজারের সৃষ্টি হয়। ফলে পণ্যটি বাজার হইতে একেবারে উধাও হইতে পারে কিংবা উহার যোগান অস্বাভাবিকরূপে কমিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি সৎ, সুদক্ষ ও কর্মকুশল না হয়, তাহা হইলে দাম নিয়ন্ত্রণের সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে পারে।

(৩) অনেক সময় ভোগকারিগণের মধ্যে পণ্যের বণ্টন সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। যাহাদের প্রয়োজন বেশি তাহাদের ভাগ্যে উপযুক্ত পরিমাণে দ্রব্য না-ও জুটিতে পারে।

সরকারী দাম নিয়ন্ত্রণের উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলি দেখা দিতে পারে বলিয়া দাম নিয়ন্ত্রণের সহিত রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের আবশ্যকতা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

রেশনিং ব্যবস্থা
(Rationing System)

সরকার যখন পণ্যের দাম বাঁধিয়া দেয় অনেক সময়ই ঐ পণ্যটি ভোগকারিগণের মধ্যে অন্যায় ও অকাম্যভাবে বণ্টিত হইতে পারে। সেইজন্য যুদ্ধ বা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় সরকার অতি আবশ্যকীয় বা যে পণ্যের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ উহার ন্যায্য বণ্টনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ ধরনের ঘাটতি পণ্যের মাথাপিছু ন্যায্য বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করা হয় উহাকে রেশনিং ব্যবস্থা বা বরাদ্দ প্রথা বলে। রেশনিং ব্যবস্থা হইল ভোগকারিগণের ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার সর্বাপেক্ষা কাম্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি দ্বারা মাথাপিছু পণ্যের ক্রয় বরাদ্দ করা হয়; ফলে, সকলেই নিয়ন্ত্রিত দামে পণ্যের কিছুটা ভোগ করিতে পারে। কোন ভোগকারী নিয়ন্ত্রিত পণ্যের যতটা পরিমাণ ইচ্ছা ক্রয় করিয়া ভোগে লাগাইতে পারে না।

রেশনিং ব্যবস্থার ফলাফল ও সুবিধা

রেশনিং ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বড় গুণ এই যে, ইহা প্রবর্তিত হইলে ধনী ক্রেতাগণ চড়া দাম দিয়া ঘাটতি পণ্যের সবটাই অথবা অধিকাংশ কিনিয়া লইতে পারে না। সকল ক্রেতাই মাথাপিছু বরাদ্দ পরিমাণ পণ্য ক্রয় করিতে পারে এবং সরকারও নিয়ন্ত্রিত সর্বোচ্চ দাম-স্তর বজায় রাখিতে সক্ষম হয়।

কিন্তু রেশনিং ব্যবস্থার অনেক অসুবিধাও আছে। ন্যায়ের ভিত্তিতে পণ্য

বণ্টন ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে সকল ভোগকারির জন্য সমান পরিমাণ পণ্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন। কিন্তু একই পণ্য সকল লোকের সমান পরিমাণে প্রয়োজনে না-ও লাগিতে পারে। সকল ভোগকারির প্রয়োজন এক নহে। সকলের আয়, রুচি, পছন্দনীয়তাও এক নহে। রেশনিং ব্যবস্থায় মাথাপ্রতি সমান পরিমাণ পণ্যের বরাদ্দ করা হয় বলিয়া বিভিন্ন ভোগকারীর বিভিন্ন পরিমাণ প্রয়োজনের দিকে ইহা দৃষ্টি দিতে পারে না। ভোগকারিগণের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতাকে এই ব্যবস্থা বিশেষ-ভাবে ক্ষুণ্ণ করে।

অসুবিধা

রেশনিং ব্যবস্থার আর একটি গলদ এই যে, ইহা অধিকদিন চালু থাকিলে ভোগকারিগণের চাহিদার প্রকৃতি সাধারণ পথে না চলিয়া বিকৃত হইতে বাধ্য হয়। আবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্রয় পরিমাণ যদি সরকার ধার্য করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রয়োজন ও সামর্থ্য থাকিলেও ঐ দ্রব্যগুলি ভোগকারিগণ অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে না। তখন তাহারা অন্যান্য সহজলভ্য বিলাস-সামগ্রী কিনিতে অধিক ব্যয় করিতে থাকে। ফলে, শ্রম, পুঁজি প্রভৃতি উপাদানগুলি এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে অধিক পরিমাণে নিয়োগ লাভ করিতে থাকে ; ইহাতে যোগান-টান নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের ঘাটতি আরও বাড়িতে পারে।

রেশনিং-ব্যবস্থার আর একটি অসুবিধা হইতেছে ইহার পরিচালনাগত সমস্যা। এই ব্যবস্থা ভালভাবে কার্যকর করিতে হইলে শ্রেণীগত ভাবে বিভিন্ন ভোগকারীর প্রয়োজন ও পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারণ করিয়া মাথাপিছু পণ্যের পরিমাণ ধার্য করিতে হয়। যে সকল কেন্দ্র হইতে দ্রব্য বণ্টন করা হইবে সেখানে কোন প্রকার চোরা কারবার যাহাতে না চলে তাহার উপর সরকারী কর্মচারীদের কড়া দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

উপরি-উক্ত অসুবিধাগুলির জন্য রেশনিং ব্যবস্থা বেশি দিন চালু রাখা উচিত নহে। জরুরী অবস্থা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া উচিত।

২২ ফাট্‌কা
(Speculation)

ভবিষ্যৎ ঘটনার পরিবর্তন অনুমান করিয়া বর্তমানের ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণকেই সাধারণ অর্থে ফাট্‌কা বলে। ফাট্‌কা কারবারের ভিত্তি হইল ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন। ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন অনুমান করিয়া মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে দ্রব্য বা লগ্নীপত্রের (goods and securities) যে কেনা-বেচা চলে উহাকে ফাট্‌কা কারবার বা এক কথায় ফাট্‌কা বলা হয়।

ফাট্‌কার অর্থ কি

বর্তমানে দ্রব্য বা লগ্নীপত্রের চাহিদা বা যোগানের যাহা গতি, ভবিষ্যতে সেই গতি না-ও থাকিতে পারে। চাহিদা-যোগানের গতি যদি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এক না থাকে তাহা হইলে দ্রব্য বা লগ্নীপত্রের দামও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তফাৎ হইতে বাধ্য। ফাট্‌কা কারবারীর কাজ ভবিষ্যতে দামের গতি কোনদিকে যাইবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা। সেই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া সে বর্তমানে বেচা-কেনা করে এবং ঐ লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফালাভের চেষ্টা করে। ফাট্‌কা কারবার বা লেনদেন (speculative dealing) পাট, চা, তুলা প্রভৃতি নানারকম কাঁচামাল এবং খনিজ ও তৈয়ারী দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত হইতে পারে। আবার, শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারী ঋণপত্র প্রভৃতি বিবিধ লগ্নী-পত্রের কেনা-বেচার বাজারেও ফাট্‌কা লেন-দেন সংগঠিত হইতে পারে। প্রথম প্রকার ফাট্‌কা লেন-দেনকে উৎপন্ন বা পণ্যের বাজার (Produce or Commodity Market) বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার বাজারকে লগ্নীপত্রের বাজার বা শেয়ার বাজার (Stock Exchange or Share Market) বলা হয়।

ফাট্‌কা কারবার বা লেন-দেনের প্রকৃতি
(Nature of Speculative Dealings)

ফাট্‌কা কারবারের উৎপত্তির মূল কারণ হইল ভবিষ্যতে দামের সম্ভাব্য পরিবর্তন। ভবিষ্যতে দামের পরিবর্তন ঘটিবে অনুমান করিয়া ফাট্‌কা কারবারী

মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে পণ্য বা লগ্নী-পত্র ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে। ফাট্‌কা কারবারীরা যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে তাহা হইলে তাহারা বর্তমান বাজারে পণ্য বা লগ্নী-পত্র ক্রয় করিবে। এই পণ্য বা লগ্নী-পত্র তাহারা ভবিষ্যতের চড়া বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ করিবে। অপরপক্ষে, তাহারা যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে পণ্যের বা লগ্নী-পত্রের দাম কমিবে, তাহা হইলে বর্তমান বাজারেই পণ্য বা লগ্নী-পত্র বিক্রয় করিযা দিয়া তাহারা ভবিষ্যতে লোকসানের হাত হইতে রেহাই পাইতে চেষ্টা কবিবে।

ফাট্‌কা কারবারী যদি মনে করে যে, ভবিষ্যতে পণ্য বা লগ্নী-পত্রের দাম বাড়িবে তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে বেশি দামে বেচিয়া মুনাফা লাভের আশায় পণ্য বা লগ্নী-পত্র বর্তমানেই ক্রয় করে অথবা ক্রয় করিবার চুক্তি করে। এই পণ্য বা লগ্নী-পত্র সে বর্তমানেই যোগান দিতে পারে কিংবা চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দামে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যোগানের ব্যবস্থা করিতে পারে। ফাট্‌কা বাজারের এইরূপ পণ্য বা লগ্নী-পত্রের ক্রেতাকে "তেজী কারবারী" (Bull) বলা হয়। বাজারের ভবিষ্যৎ দাম সম্পর্কে তাহার অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার লাভ হইবে। অপরপক্ষে, ফাট্‌কা কারবারী যদি অনুমান করে যে, পণ্য বা লগ্নী-পত্রের দাম ভবিষ্যতে কমিবে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে কম দামে কিনিবার আশায় বর্তমানে বেশি দামে বিক্রয় করিবে এবং ভবিষ্যতে পণ্য বা লগ্নী-পত্র যোগান দিতে চুক্তি-আবদ্ধ হইবে। ফাট্‌কা বাজারে পণ্য বা লগ্নী-পত্রের এইরূপ বিক্রেতাকে "মন্দা কাববারী (Bear) বলে। যখন এই চুক্তির মেযাদ পূর্তি হইবে তখন যদি বাজারের দাম চুক্তির দাম (contract price) অপেক্ষা কম হয, তাহা হইলে এই দুই দামের যে পার্থক্য হইবে সেই পরিমাণ অর্থই ফাট্‌কা কারবারীর মুনাফা। অনেক সময এই চুক্তির ঝুঁকি (hedging or covering contract) দ্বারা বীমা করিয়া অন্য ব্যবসায়ীর কাঁধে চাপানো হয়। এই চুক্তিদ্বারা সময়মত অপেক্ষাকৃত অল্প দামের দ্রব্য ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ চুক্তিব সাহায্যে ফাট্‌কা কারবার উৎপাদক শ্রেণীকে কাঁচামাল যোগান দিতে বিশেষ সহাযতা করে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের দিন ও চুক্তির মেয়াদ পূর্তির দিনের মধ্যে যদি খুব অধিক সময় অতিবাহিত হয, তাহা হইলে উহাকে **ভাবী** বা **আউতি সওদা** (forward contract) অথবা এককথায 'future' বলা

হয়। আর যদি চুক্তিতে তাড়াতাড়ি মাল সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি থাকে, তাহা হইলে উহাকে **সাম্প্রতিক** অথবা **স্থানিক সওদা** (Spot contract) বলা হয়।

ফাট্‌কা ও জুয়াখেলা
(Speculation and Gambling)

অনেকে মনে করেন, ফাট্‌কা কারবার জুয়াখেলারই অনুরূপ। তাহাদেব ধারণা এই যে, জুয়ারী ফাট্‌কা কারবারীর মতই ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্বে অনুমান করিয়া তাহাব ভিত্তিতে বর্তমান ক্রিযাকলাপ সংগঠন ও মুনাফা লাভ কবে। কিন্তু কার্যত ইহা সত্য নহে। কেন না, জুয়ারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বা ফলাফল পূর্বে অনুমান করিয়া তাহাব ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বহন কবে, তাহা সামাজিক দিক হইতে অনাবশ্যক ঝুঁকি। জুয়ারী যে ঝুঁকি কাঁধে নেয় তাহাতে সমাজে উৎপাদনের অনিশ্চযতা দূর হয না। যেমন, জুয়ারী যদি কোন খেলার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বে অনুমান করিয়া বাজী রাখে, তাহা হইলে তাহাব এই ঝুঁকি গ্রহণ সামাজিক উৎপাদন বা কল্যাণের দিক হইতে একেবারেই অনাবশ্যক হইবে। সে এইরূপ বাজী বাখিয়া ঝুঁকি বহন না কবিলেও সমাজের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ফাট্‌কা কারবারী যে ঝুঁকি গ্রহণ কবে তাহা অত্যাবশ্যক। ফাট্‌কা কাববারী যেমন একদিকে ঝুঁকি গ্রহণ দ্বারা নিজে মুনাফা লাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি লেন-দেনেব মাধ্যমে দামের উঠা-নামার গতি সীমিত করিয়া সে দামেব স্থিতিশীলতা স্থাপন করিতে সাহায্য কবে। ফাট্‌কা কারবারী ঝুঁকি বহন দ্বারা দামেব স্থিবতা আনয়ন করে বলিয়া ফাট্‌কা উৎপাদনের সহাযতা করে এবং উহার মাধ্যমে সমাজের উপকারে আসে।

ফাট্‌কার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও সুফল
(Economic Importance and Benefits of Speculation)

(১) ফাটকা কারবাবেব প্রধান সুফল এই যে, ইহা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে দামের অত্যধিক উঠা-নামা প্রতিরোধ করিয়া পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করে। ফাট্‌কা কারবারী যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে, তাহা হইলে সে বর্তমান বাজারে পণ্যটি ক্রয় শুরু করিবে। তাহার দৃষ্টান্তে আরও অনেকে বর্তমান বাজারে পণ্য ক্রয় আরম্ভ করিবে। ফলে, বর্তমান বাজারে পণ্যটিব

চাহিদা বাড়িয়া যাইবে। ফাট্‌কা কারবারীরা পণ্যটি না কিনিলে উহার দাম যতটা কম হইত, উহাদের কিনিবার ফলে দাম উহা অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। আবার, ভবিষ্যতের বাজারে যখন তাহারা পণ্যটি বিক্রয় করে তখন তাহাদের বিক্রয়ের ফলে ভবিষ্যতের বাজারে পণ্যটির যোগান বাড়িয়া যাইবে। ফাট্‌কা কারবারীরা ভবিষ্যতের বাজারে পণ্য বিক্রয় না করিলে উহার দাম যতটা বাড়িতে পারিত উহাদের বিক্রয়ের ফলে দাম ততটা বাড়িতে পারে না। অপরপক্ষে, ফাট্‌কা কারবারীরা যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দাম হ্রাস পাইবে, তাহা হইলে তাহারা বর্তমান বাজারে পণ্য বিক্রয় করিবে। ফলে, বর্তমানে চাহিদার তুলনায় পণ্যের যোগান বেশি হইবে এবং ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমান বাজারে পণ্যের দাম হ্রাস পাইবে। ফাট্‌কা কারবারীরা বর্তমানে পণ্যটি বিক্রয় না করিলে উহার দাম যতটা বেশি হইত উহাদের বিক্রয়ের ফলে দাম উহা অপেক্ষা কম হইবে। আবার ভবিষ্যতের বাজারে তাহারা পণ্যটি না কিনিলে বাজারে পণ্যটির যোগান বৃদ্ধি পাইয়া উহার দাম যতটা কমিতে পারিত উহাদের বিক্রয়ের ফলে দাম ততটা কমিতে পারে না। এইভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতে বিভিন্ন সময়ে বাজারের পণ্য-চাহিদা ও পণ্য যোগানের মধ্যে অধিকতর সমতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া দামের স্থিরতা দেখা দেয়। আবার, ফাট্‌কা কারবারের ফলে একই সময়ে বিভিন্ন স্থান কিংবা অঞ্চলের মধ্যেও দামের অধিকতর স্থিরতা দেখা দেয়। দুইটি বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে যদি দামের পার্থক্য দেখা দেয়, তাহা হইলে ফাট্‌কা কারবারীরা উহার সুযোগ লইয়া মুনাফা উপার্জনের চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সস্তার বাজারে পণ্যটি ক্রয় করিয়া চড়া বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে, যে স্থানে পণ্যটি সস্তা ছিল (তাহাদের ক্রয়ের দরুন) সেখানে দাম বাড়িয়া যাইবে। আবার যে স্থানে দাম বেশি ছিল সে স্থানে তাহাদের বিক্রয় বৃদ্ধির দরুন দাম কমিয়া যাইবে। এইভাবে ফাট্‌কা কারবারিগণের কেনা-বেচার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দামের পার্থক্য অনেকটা কমিয়া আসে।

(২) কৃষি ও শিল্প উৎপাদনক্ষেত্রে ফাট্‌কা কারবারের উপকারিতা যথেষ্ট। ফাট্‌কা কারবারের ফলে উৎপাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেক সময়েই পণ্যের চাহিদা ও পণ্যের যোগানের মধ্যে কোন সংগতি থাকে না। কাঁচামালের বাজার দর ঘন ঘন ওঠা-নামার দরুন

উৎপাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আরও বেশি তীব্র হইতে দেখা যায়। ফাট্‌কা কারবারী উৎপাদককে ঠিক সময়মত নির্দিষ্ট দামে কাঁচামাল যোগান দিবার ভার গ্রহণ করিয়া এবং উৎপন্ন পণ্য খরিদ করিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহার অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহনের ভার বহুল পরিমাণে লাঘব করে।

(৩) ফাট্‌কা কারবার বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণ-গুলির, বিশেষ করিয়া কাঁচামালের, সুবণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দেশের উৎপাদক সম্পদের কাম্য বিলি-বণ্টনের (optimum allocation of productive resources) ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহার ফলে একদিকে যেমন উপকরণগুলির দামের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে, অপরদিকে উহাদের ব্যবহারের অপচয় কমে ও উৎপাদনের ধারাও অব্যাহত হয়।

(৪) ফাট্‌কা কারবার দামের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা দ্বারা পণ্য বিনিময়ের সুবিধা সৃষ্টি করে এবং সাধারণ ভোগকারিগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করে। যখন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়, সেই অবস্থাতে পণ্য ক্রয় করিলে ভোগকারিগণ সর্বাধিক সম্ভাব্য তৃপ্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়। ফাট্‌কা কারবারী তাহার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অনেক সময় ভবিষ্যতে পণ্য যোগানের টানের প্রতি ভোগকারিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহারাও ভবিষ্যৎ বাজারে দাম বৃদ্ধির আভাস পাইয়া বর্তমান ভোগ সঙ্কোচন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে।

(৫) ফাট্‌কা কারবার ষ্টক্, শেয়ার, সিকিউরিটি প্রভৃতি লগ্নী-পত্রের বাজারে মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে। শেয়ার-বাজারে বা ষ্টক এক্সচেঞ্জে কেনা-বেচা ও লেন-দেন করিয়া ফাট্‌কা কারবারিগণ বিভিন্ন লগ্নী-পত্রের দামের স্থিতিশীলতা আনয়ন করে। লগ্নী-পত্রের দামে স্থিতিশীলতা স্থাপিত হইলে সাধারণ পুঁজিপতি বিনিয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও কোন্ লগ্নী-পত্রে অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা অধিক লাভবান হওয়া যায় তাহার নির্দেশ পায়।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ফাট্‌কা কারবার দামের স্থিতিশীলতা স্থাপনে, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন ও ধারা অব্যাহত রাখিতে, ভোগকারিগণের স্থিতিশীল দামে পণ্য কিনিতে, মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করিতে এবং বিভিন্ন সময় ও অঞ্চলের মধ্যে উৎপাদনের উপকরণগুলির কাম্য বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

ফাট্‌কার কুফল
(Evils of Speculation)

ফাট্‌কা কারবার যদি বৈধ হয় তাহা হইলে উপরি-উক্ত সুফলগুলি পাওয়া যায়। কিন্তু অবৈধ (Illegitimate) ফাট্‌কা সমাজের অসামান্য ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। যদি বাজার সম্বন্ধে ফাট্‌কা কারবারিগণের প্রকৃত খবর ও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, যদি তাহাদের অনুমানগুলি বাস্তবত সত্য না হয়, এবং যদি তাহারা কেবলমাত্র নিজেদের মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ফাটকা লেন-দেনে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে ফাট্‌কা কারবার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অকল্যাণকর হইবে। এইরূপ ফাট্‌কাকে অবৈধ ফাট্‌কা বা জুয়াখেলা বলা হয়। এইরূপ কারবার পণ্য বা লগ্নী-পত্রের দামের উঠা-নামা বাড়াইতে সহায়তা করে। উৎপাদন, ভোগকারী কিংবা মূলধন বিনিয়োগ-কারিগণ সকলেই এইরূপ ফাট্‌কা কারবারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় মুষ্টিমেয় ফাট্‌কা কারবারীর ক্রিয়া-কৌশলে বাজারের সমস্ত পণ্যের যোগান উহাদের হাতে একায়ত্তি (cornered) হইতে পারে। মুষ্টিমেয় কারবারী যখন এইভাবে পণ্যের অধিকাংশ যোগান করায়ত্ত করে তখন বাজারে পণ্যের উপর তাহাদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। ইহাকে আগ্রাসী ফাট্‌কা কারবার (Aggressive Speculation) বলে। এইরূপ অবৈধ ফাট্‌কা বাজার দামের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। ফলে, উৎপাদনকারী, ভোগকারী, বিনিয়োগকারী প্রভৃতি সকলেই বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ফাট্‌কা কারবার যখন এইভাবে অবৈধ ও সমাজকল্যাণ বিরোধী হইয়া পড়ে তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।

ফাট্‌কা কারবারের নিয়ন্ত্রণ
(Control of Speculative Dealings)

ফাট্‌কা কারবার নিয়ন্ত্রণের প্রথম এবং প্রধান উপায়ই হইল ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শের মান উন্নয়ন। জুয়া কারবার বন্ধ করিবার সপক্ষে জোর সুপারিশ করিয়া এই ধরনের কারবারের বিরুদ্ধে দেশের জনমত সুসংবদ্ধভাবে

গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপক টসিগ (Taussig) ষ্টক্ বিনিময় বাজারের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন এবং ফাট্‌কা লেন-দেন সম্পর্কে জনসাধারণে অধিকতর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। অধ্যাপক লারনার (Lerner) মনে করেন যে, ফাট্‌কা কারবার যদি খুব আগ্রাসী ও ক্ষতিকর হয় তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে পাল্‌টা ফাট্‌কা কারবার (Counter Speculation) চালানো একান্ত প্রয়োজন। সরকারের উচিত এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাহার কাজ হইবে পণ্যের দামের উপযুক্ত খসড়া প্রস্তুত করা। আসল বাজার দাম যাহাতে খসড়াকৃত দামের সহিত হারবদ্ধ (pegged) হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্যকরণীয়।

ভারতে ফাট্‌কা কারবারের কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সরকার আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন (Forward Contracts Regulation Act) পাশ করিয়াছেন। শেয়ার বাজার ছাড়া অন্যান্য ফট্‌কা বাজারের লেন-দেনগুলি এই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। যদিও বিভিন্ন ফাট্‌কা বাজারে সভ্যগণ নিজ নিজ বাজারের বিধিদ্বারা পরিচালিত হন, তথাপি প্রত্যেক ফাট্‌কা বাজারের বিধিগুলি আগাম চুক্তি নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুমোদন সাপেক্ষ। সরকার এই সকল বাজারের কার্যকলাপ তদারক করিবার জন্য একটি আগাম বাজার কমিশন (Forward Maıket Commission) নিয়োগ করিয়াছেন। এই কমিশন বিভিন্ন পণ্যের ফাট্‌কা বাজারের কার্যাবলী সম্পর্কে সরকারকে নিয়মিত বিবরণ দাখিল করিবে ও পরামর্শ দিবে।

২৩ জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন

(The National Income and its Distribution)

কোন দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা করিতে হইলে ঐ দেশের জাতীয় আয়েব বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যেমন ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভর করে সেইরূপ জাতীয় সমষ্টিগত কল্যাণও জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। কোন দেশের জীবনযাত্রার মান উঁচু কি নিচু তাহা সাধারণভাবে জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিমাণ করা হয়। জাতীয় আয়-স্তর যখন নিম্নগামী হয়, তখন স্বভাবতই দেশে আর্থিক দুর্গতি দেখা দেয়। আবার, আয়-স্তর যখন বৃদ্ধিলাভ করে তখন দেশবাসীর আর্থিক সুখ-সমৃদ্ধিও বাড়ে। অবশ্য এক মাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই যে সকল অবস্থায় দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বাড়িবে তাহা ঠিক নহে। দেশের সামাগ্রিক কল্যাণ জাতীয় আয়ের সুবণ্টনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। অন্যান্য বহু অর্থ নৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানও জাতীয় আযের পরিপ্রেক্ষিতেই করা সম্ভব হয় : জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেই দেশের সামগ্রিক ভোগ ও বিনিয়োগ নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় আয়ের আয়তন, বণ্টন ও স্থিতিশীলতা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

জাতীষ আযের গুরুত্ব

জাতীয় আয়ের অর্থ কি ?

(Meaning of National Income)

প্রত্যেক দেশেই প্রতিবৎসর যেমন কতকগুলি দ্রব্য উৎপাদিত হয়, তেমনি আবার সেবাকার্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। চাল, ডাল, পোশাক-পরিচ্ছদ. আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দ্রব্য যেমন উৎপন্ন হইতে পারে, তেমনি আবার শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রভৃতি সেবাকার্যও উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয় উহার সমষ্টিকেই জাতীয় আয় বলা হয়। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের সমষ্টিকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ ও পরিমাপ করা যায়। ফলে, জাতীয় আয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বা অর্থ প্রচলিত দেখা যায়।

জাতীয় আয়ের ধারণা মোটামুটিভাবে তিন দিক হইতে বিশ্লেষণ করা যায় :

(১) দেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্নদ্রব্য ও সেবাকার্যের সমষ্টিগত অর্থমূল্যকে জাতীয় আয় বলা যায়।

(২) দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে কতকগুলি উপাদান প্রয়োজন হয়। উৎপাদনের এই উপাদানগুলি হইল জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগ। এই উপাদানগুলি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিয়া যে আয় উপার্জন করে উহার সমষ্টিকেও জাতীয় আয় বলা চলে। অর্থাৎ দেশের মোট খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা যোগ দিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(৩) নির্দিষ্ট সময়ে দেশের মোট ভোগ-ব্যয় ও মোট সঞ্চয় যোগ করিলেও জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

তাহা হইলে বলা চলে যে, জাতীয় আয় একাধারে দেশের মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্য, ইহা উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানগুলির অর্জিত মোট আয় এবং ইহা আবার মোট ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয়ের যোগফল। এই তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে জাতীয় আয় বিচার করা যায় বলিয়া জাতীয় আয় পরিমাণের পদ্ধতিও এই তিনদিক হইতে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ
(Measurement of the National Income)

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার জন্য তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে :

(১) মোট উৎপাদন পদ্ধতি, (২) আয় পদ্ধতি এবং (৩) ভোগ-সঞ্চয় পদ্ধতি।

(১) **মোট উৎপাদন পদ্ধতি** (Total Output Method): এই পদ্ধতিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে প্রথমত মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) কি, উহা স্থির করিতে হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় করিতে হইলে দেশে এক বৎসরে উৎপন্ন মোট দ্রব্য ও সেবাকার্যের বাজার দাম ধরিতে হয়। সারা বৎসর ধরিয়া দেশের লোক নানা রকম দ্রব্য উৎপাদন করে। এইরূপ উৎপন্ন প্রত্যেকটি দ্রব্যের পরিমাণকে উহার বাজার-দাম দিয়া গুণ করিলে মোট

দ্রব্য উৎপাদনের অর্থমূল্য নির্ণয় করা যায়। দ্রব্য উৎপাদন ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ে দেশে নানা রকমের সেবাকার্যও সৃষ্টি হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি সেবাকার্য উৎপাদন করিয়া থাকে উহারা যে আয় লাভ করে উহার সমষ্টিও ধরিতে হইবে। অর্থাৎ মোট উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম এবং সেবাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মোট আয় যোগ করিলে যে যোগফল পাওয়া যাইবে উহাই মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় (GNP বা GNI)।

নির্দিষ্ট বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অর্থমূল্যের সমষ্টি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপের একটি বড সমস্যা আছে। অনেক দ্রব্য ও সেবাকার্য দেখিতে পাওয়া যায় যাহা ক্রয়-বিক্রয় হয় না, যাহাদের অর্থমূল্য নির্ণয় করা যায় না। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় বহির্ভূত দ্রব্য ও সেবাকার্যগুলিকে জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত কিনা অর্থনীতি-বিদ্‌গণের মধ্যে এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তবে এই ধরনের কিছু কিছু দ্রব্যকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা খুবই যুক্তিযুক্ত। যেমন, যেসকল দ্রব্য উৎপাদক নিজে ভোগ করে, যে বাড়িতে মালিক নিজে বসবাস করিয়া সেবাস্রোত ভোগ করে উহাদিগকে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরা উচিত। কিন্তু গৃহিণীরা কোন অর্থমূল্য না লইয়া বাড়ির যে সকল সেবামূলক কার্য করেন কিংবা যে সকল ব্যক্তিগত কাজ মানুষ নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকে—এই সকল কাজকে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া বিনামূল্যে সম্পাদিত সকল প্রকার কাজকেই জাতীয় উৎপাদনের বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা উচিত নহে। যেমন, সরকার বিনামূল্যে যে সকল সেবামূলক কার্য করিয়া থাকে উহাদের জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে অবশ্য ধরিতে হইবে। কেননা, এই সকল কাজের দরুন যে ব্যয় হয় উহাকেই উহাদের অর্থমূল্য হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

জাতীয় আয় নির্ধারণে আর একটি সমস্যা আছে। প্রকৃত জাতীয় আয় বা নীট জাতীয় আয় (Net National Product or NNP) নির্ণয় করিতে হইলে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় হইতে জিনিসের অপচয় বা যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাবদ একটা খরচ (depreciation charges) বাদ দিতে হয়। যে সকল যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি মূলধন দ্বারা দ্রব্য উৎপন্ন হয় উহারা চিরদিন টেকসই নহে। চিরদিন সমানভাবে উৎপাদনকার্য

চালাইয়া যাইতে পারে না। প্রতি বৎসর ব্যবহারের ফলে উহাদের কিছু কিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আবার কিছু কিছু পুরাতন ও অপ্রচলিত (out-of-date) হইয়া পড়ে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেও কিছু কিছুর ধ্বংস-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। সময়মত মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অপচয় যদি পূরণ না করা হয় তাহা হইলে উৎপাদন কার্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে না, জাতীয় আয় সৃষ্টিতেও বাধা পড়ে। যাহাতে জাতীয় আয় উৎপাদনের গতি অব্যাহত থাকে সেইজন্য মোট জাতীয় আয় হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ও অপচয় বাবদ যে খরচ হয় তাহা বাদ দিয়া নীট জাতীয় আয় নির্ণয় করিতে হয়।

মোট উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে :

মোট উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ সম্পর্কে কয়েকটি স্মরণযোগ্য বিষয়

(১) আমরা যখন জাতীয় আয় হিসাব করি তখন মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের বাজার দাম ধরিয়া থাকি। কিন্তু যে সকল দ্রব্য অর্ধ-উৎপন্ন অর্থাৎ উৎপাদনের মাধ্যমিক স্তরে (intermediate stage) আছে, উহাদের দাম ধরিলে চলিবে না। কেবলমাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের (final products) বাজার-দাম লইয়া হিসাব করিতে হইবে। যেমন, পাঁউরুটির দাম ধরা হইবে ; কিন্তু পাঁউরুটি তৈয়ারির জন্য যে ময়দা লাগে, সে ময়দার দাম ধরা হইবে না। পাঁউরুটির দাম ধরার পর যদি ময়দার দামও ধরা হয় তাহা হইলে দুইবার গণনা (double counting) করার দোষ হইবে। জাতীয় আয় হিসাব করিতে কেবল পাঁউরুটির দামই ধরিতে হইবে, পাঁউরুটি তৈয়ারি করিতে যে ময়দা প্রয়োজন হয় উহার দাম ধরিতে হইবে না। ময়দার দাম পাঁউরুটির দামের মধ্যে ধরা হইয়া থাকে।

(২) মোট জাতীয় আয় হিসাব করিতে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের বাজার-দাম ধরিলেই যথেষ্ট নহে। সেইসঙ্গে সরকার যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করে উহাদের বাজার-দামও ধরিতে হইবে। এক্ষেত্রেও মাত্র সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকার্যের সমষ্টিই ধরিতে হইবে, অর্ধ-উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার দাম বাদ দিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক দেশই কিছু কিছু দ্রব্য রপ্তানি করিয়া থাকে, আবার কিছু কিছু আমদানি করে। দেশের রপ্তানির মাধ্যমে যে অর্থমূল্য লাভ হয় উহা

জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। আবার আমদানির ফলে যে অর্থ দেশ হইতে বাহির হইয়া যায় উহার ফলে জাতীয় আয় হ্রাস পায়। জাতীয় আয় হিসাবের সময় দেখিতে হইবে দেশের রপ্তানি ও আমদানির মূল্যের মধ্যে কতটা পার্থক্য হইতেছে। যদি আমদানির তুলনায় রপ্তানির মূল্য বেশি হয়, তাহা হইলে ঐ পার্থক্য জাতীয় আয়ের সঙ্গে যোগ করিতে হয়। আবার রপ্তানির তুলনায় যদি আমদানির মূল্য বেশি হয় তাহা হইলে ঐ পার্থক্য জাতীয় আয় হইতে বিয়োগ করিতে হয়।

(৪) যে বৎসরের জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইবে, সেই বৎসরের মধ্যে যে সকল নূতন নূতন মূলধনী দ্রব্য ও সম্পত্তি উৎপন্ন হয় উহাদের বাজার দামও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। চলতি মূলধনের কোন লেন-দেন জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা চলিবে না। মূলধনী দ্রব্য বা সম্পত্তিও দ্রব্যের মতই সংশ্লিষ্ট বৎসরে কেনা বেচা হয়।

(৫) সরকার দ্রব্যের উপর কোন পরোক্ষ কর বসাইলে সেই কর জাতীয় আয় হিসাবের সময় বাদ দিতে হইবে। কোন দ্রব্যের উপর কর বসিলে ঐ দ্রব্যের বাজার-দাম বাড়িয়া যায়। কিন্তু দ্রব্যের বাজার-দাম বাড়িয়া গেলেও দ্রব্যটি যাহারা উৎপাদন করে তাহারা ঐ বর্ধিত মূল্য দ্রব্যটির দাম হিসাবে পায় না। ঐ বর্ধিত মূল্য হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে যাহা বাকী থাকে তাহাই দ্রব্যের দাম বাবদ উহারা পাইয়া থাকে। মোট উৎপাদন পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে দ্রব্যের বাজার-দাম হইতে সরকারকে দেয় করের পরিমাণ বাদ দিতে হয়।

(২) **আয় পদ্ধতি** (Income Method)—এই পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে উৎপাদনের উপাদানগুলির উপার্জিত অর্থআয়ের মোট যোগফল ধরিতে হয়। উপাদানসমূহের মোট অর্থআয় বলিতে জমির খাজনা, ঋণকৃত মূলধনের সুদ, শ্রমের মজুরি ও ভাড়া এবং ব্যবসায় সংগঠনের মুনাফাকে বুঝায়। এইভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন :

(ক) জাতীয় আয় নির্ধারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহের সকল রকম পাওনা আয়কেই ধরা হয় না। যে-সমস্ত আয় কোনরূপ দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদন না করিয়াই অর্জন করা যায়, উহা উৎপাদনের উপাদানের আয় হিসাবে ধরা হয় না এবং জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবেও গ্রহণ করা হয় না।

যেমন, সরকার যখন বাস্তুহারাদের অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন, তখন সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করিয়া সরকারকে সাহায্য করে না। এইরূপ পাওনা আয়কে হস্তান্তর পাওনা (transfer payments) বলে। উৎপাদনের উপাদানসমূহের উপার্জিত আয় দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় এইরূপ হস্তান্তর পাওনা বাদ দিতে হইবে।

(খ) যৌথ কারবারে মোট উপার্জিত আয়ের একটি অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়, লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না। এই অবণ্টিত মুনাফাকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হয়।

(গ) অনেক সময় নিয়োগকর্তা নিজের সংগঠন কার্য ছাড়া উৎপাদনে নিজের জমি বা মূলধন বিনিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ জমির প্রাপ্য খাজনা বা মূলধনের সুদ সংশ্লিষ্ট উপাদানের উপার্জিত আয় হিসাবে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়।

(ঘ) সরকার সংগৃহীত সকল রকম করকে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। সাধারণত যে সকল কর প্রত্যক্ষ তাহাই জাতীয় আয়ভুক্ত করা হয়। কেন না, এই কর মানুষের উপার্জিত আয় হইতে সরকারকে প্রদান করিতে হয়। যেমন, আয়কর উৎপাদনের উপাদানের উপার্জিত আয়ের অংশ বিশেষ।

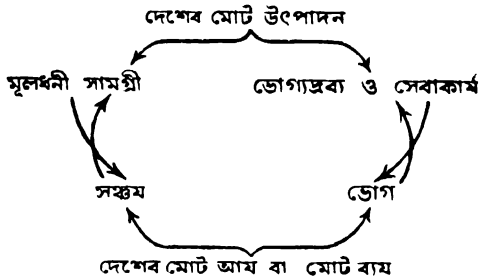
(৩) **ভোগ ও সঞ্চয় পদ্ধতি** (Consumption and Savings Method)—প্রতি বৎসর দেশে দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন দ্বারা জাতীয় আয়ের সৃষ্টি হয়। এই আয়ের একাংশ ভোগ্য-দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়, আর বাকী অংশ সঞ্চয়কার্যে নিয়োগ করা হয়। কোন এক বৎসরে দেশের মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যোগ করিলেই জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার যে তিনটি পদ্ধতি উপরে আলোচনা করা হইল, উহার যে কোনটা আমরা কাজে লাগাইতে পারি। এই তিনটি পদ্ধতি জাতীয় আয়কে তিনটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করে।

তিনটি পদ্ধতির মূল্যায়ন

আসলে আমরা ইহার যে কোন পদ্ধতি দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করি না কেন, একই ফল পাওয়া যাইবে। দেশে কোন এক বৎসরে যে পরিমাণ মোট দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপন্ন হয়, তাহার যাহা বাজার-দাম উহাই আবার উৎপাদনের

উপাদানগুলি উহাদের আয় হিসাবে পাইয়া থাকে। অর্থাৎ, দেশের মোট উৎপাদন = দেশের মোট আয়। আবার দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলি মোট যে আয় উপার্জন করে, অর্থাৎ জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন যথাক্রমে যে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা পায় তাহার একাংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে, আর একাংশ সঞ্চয় করে। অর্থাৎ দেশের মোট আয় = দেশের মোট ভোগব্যয় + সঞ্চয়। দেশের ভোগব্যয় ও সঞ্চয় আবার দেশের মোট ব্যয়ের সমান। অতএব দেশের মোট আয় = দেশের মোট ব্যয়। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় যে পরস্পর সমান তাহা নিচের ছকটি দ্বারা ভালভাবে বুঝানো যায়।



আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়
(Money and Real National Income)

জাতীয় আয় সাধারণত অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু অর্থের মাপকাঠিতে জাতীয় আয় পরিমাপের বড় অসুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা কোন বৎসরে জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে বাড়িল কি কমিল তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে পারা যায় না। অর্থের মূল্য প্রতিবৎসর সমান থাকে না, কোন বৎসর বাড়ে, কোন বৎসর কমে। অর্থের মূল্য বাড়িলে জিনিসপত্রের দামও হ্রাস পায়। আবার, অর্থের মূল্য কমিলে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। মনে কর, কোন দেশে এক বৎসরে জিনিসপত্রের যাহা দাম পরবর্তী বৎসরে তাহার দ্বিগুণ হইল। যদি ঐ দেশে পর পর দুইটি বৎসরে উৎপাদনের পরিমাণ এক সমান থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির ফলে অর্থের অঙ্কে জাতীয় আয়

দ্বিগুণ হইবে। কিন্তু অর্থের অঙ্কে জাতীয় আয় দ্বিগুণ হইলেও প্রকৃত জাতীয় আয় কিন্তু বাড়ে নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও ঘটে নাই। দেশের উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কিনা তাহা জানিতে হইলে দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়াছে কিনা তাহা হিসাব করিতে হইবে। কোন বৎসরের তুলনায় পরবর্তী বৎসরে যদি জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বৎসরে মোট উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য অর্ধেক ধরিয়া লইয়া প্রকৃত জাতীয় আয় হিসাব করিতে হয়। এইভাবে প্রকৃত জাতীয় আয় হিসাব করিয়া তবে উহার ভিত্তিতে দেশের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা করা যায়।

মাথাপিছু আয়
(Per Capita Income)

জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় উহাকে দেশের মাথাপিছু আয় বলা হয়। যেমন, ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতের মোট জাতীয আয় ছিল ১১৭৬০ কোটি টাকা। ঐ বৎসরে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪২ কোটির উপর। সুতরাং, ঐ বৎসর মাথাপিছু আয় ছিল ২৯২ টাকার মত। সাধারণত মাথাপিছু আয় দেখিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। যে দেশের মাথাপিছু আয় বেশি সেই দেশ উন্নত, আর যে দেশের মাথাপিছু আয় কম, সে দেশ অনুন্নত। কিন্তু কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় দেখিয়াই কোন দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। কেন না, মাথাপিছু আয় গড়পড়তা আয় নির্দেশ করে মাত্র। আসলে যদি জাতীয় আয় জনসাধারণের মধ্যে সুবন্টিত না হয়, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিতে পারে না। তাহা ছাড়া, কেবল অর্থ-আয়ই উন্নত জীবনের পরিমাপ নহে। জনসাধারণের মাথাপিছু অর্থ-আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি ভোগ্যদ্রব্যের বাজার মূল্যও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বলা যায় না। জনসাধারণের প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি কতটা হয়, তাহা দ্বারা দেশের লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা করা সম্ভব।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের সার্থকতা

(Utility of National Income Analysis)

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের একাধিক সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) জাতীয় আয় দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণের মাপকাঠি। যদি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে জাতীয় আয় যতই বাড়িবে, দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণও ততই বৃদ্ধিলাভ করিবে। অবশ্য সকল সময় কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। যেমন, কোন দেশকে যদি জাতীয় আয়ের একটি মোটা অংশ দেশেব শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় বাখিতেই ব্যয় করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ আয়ের অতি সামান্য অংশই জনসাধাবণের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারিবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় দেশেব অর্থনৈতিক কল্যাণের সঠিক মাপকাঠি হইতে পাবে না।

(২) জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে দেশেব জনগণেব জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা যায়। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়িলে জনসাধাবণের জীবনযাত্রাব মানও উন্নতিলাভ কবিয়াছে, সাধারণভাবে ইহা ধাবণা করা যায়। কিন্তু মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গড আয় বৃদ্ধি নির্দেশ করে, প্রকৃত আয় বৃদ্ধি নির্দেশ করে না। জনসাধাবণেব জীবনযাত্রাব মান বৃদ্ধি প্রকৃত আয় বৃদ্ধির উপব নির্ভর কবে।

(৩) জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বাবা বিভিন্ন দেশেব জীবনযাত্রাব মানের মধ্যে তুলনা করা যায়। অবশ্য এইরূপ তুলনা করিবার অনেক অসুবিধাও আছে।

(৪) দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকর করিতে হইলে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। দেশেব অর্থ ব্যবস্থাব বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ধারণা কবিতে হইলে জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ, মূলধন গঠনের হার, উৎপাদনের হার প্রভৃতি জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ধার্য করিয়া পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ করা হয়।

(৫) সমষ্টিগত অর্থবিদ্যার মূল বিষয়বস্তু হইল জাতীয় আয় বিশ্লেষণ। দেশের সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার গঠন, উহার ত্রুটি-বিচ্যুতি জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান হইতেই ধারণা করা যায়। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ হইতেই অর্থব্যবস্থার অগ্রগতির পথ নির্দেশ করা হয়।

জাতীয় হিসাব

(The National Accounts)

উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার মাধ্যম হইল জাতীয় হিসাব প্রস্তুত করা। এই হিসাব প্রস্তুত করিতে হইলে দেশের মোট উৎপাদন, মোট আয় এবং মোট ভোগ ও বিনিয়োগের সাহায্যে জাতীয় আয়ের সম্পূর্ণ চিত্র প্রদানের চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপ চিত্রে একদিকে জাতীয় আয়ের সামগ্রিক দিক, আর একদিকে পৃথক পৃথক দিক প্রতিফলিত হয়। জাতীয় হিসাব রচনা কালে সকল পরিবারের মোট আয়-ব্যয়, বেসরকারী ক্ষেত্রের মোট আয়-ব্যয়, সরকারী ক্ষেত্রের মোট আয়-ব্যয় হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। ইহাছাড়া, মোট বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রের লেন-দেন উদ্বৃত্ত এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাপ ব্যাপারে জাতীয় হিসাব পদ্ধতিটিও ত্রুটিবিহীন নহে। ইহার কারণ এই যে, যে-সকল লেন-দেনের কার্য অর্থের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, জাতীয় হিসাবের মধ্যে উহাদের ধরা চলে না।

উপাদান-দাম নির্ধারণ : বণ্টন-তত্ত্ব

(Factor Pricing : Theory of Distribution)

জাতীয় আয় উৎপাদনে যে সকল উপাদান প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে উহারাই এই আয়ের মালিক। উৎপাদনের উপাদানগুলিই জাতীয় আয়ের অংশভাগী। ঐ উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের ভাগ-বাঁটোয়ারাকে বণ্টন বলা হয়। জাতীয় আয় বণ্টনের তত্ত্ব অনেকটা পণ্যের দাম-তত্ত্বের অনুরূপ। জাতীয় আয় বণ্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপাদানগুলির প্রত্যেকে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ কার্যের ভিত্তিতে দাম বা পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে। প্রত্যেকটি উপাদানের বাজার-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় বণ্টন-তত্ত্ব তাহাই বিশ্লেষণ করে। লক্ষণীয় এই যে, যে-জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয়, উহা উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির দিক হইতে উপাদানগুলির সেবার দাম হিসাবে ধরা হয়। আবার, উপাদানগুলির দিক হইতে উহাদের সেবার দরুন প্রাপ্য আয় বলিয়া গণ্য হয়।

বণ্টন কাহাকে বলে?

অর্থবিদ্যার প্রথা অনুযায়ী বণ্টন-তত্ত্বের বিশ্লেষণে ক্রিয়াগত বণ্টনের (Functional Distribution) বিশ্লেষণ করা হয়, ব্যক্তিগত বণ্টনের

(Personal Distribution) আলোচনা করা হয় না। ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ বলিতে দেশবাসিগণের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন বুঝায়। আর ক্রিয়াগত বণ্টন বলিতে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টনকে ধরা হয়।

উপাদান বাজার, উপাদান আয় এবং উপাদান দাম
(Factor Market, Factor Incomes এবং Factor Prices)

পণ্যের বাজারের মত উপাদানেরও বাজার আছে। পণ্যের বাজারে যেমন দাম নির্ধারিত হয় পণ্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা, সেইরূপ উপাদানের বাজারে উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় উহার চাহিদা ও যোগান দ্বারা। উপাদানের বাজারে উপাদানগুলি সেবা যোগানের দ্বারা যে পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে উহা তাহাদের আয়। আর উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ঐ সেবা ক্রয় করিতে উপাদানগুলিকে যে পারিশ্রমিক দিয়া থাকে তাহা উপাদানগুলির দাম। উপাদানগুলির সেবার জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাহা আবার উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা সমাজের উৎপাদন ব্যয়ও বটে।

পণ্যের চাহিদা প্রত্যক্ষ। কিন্তু উপাদানের চাহিদা হইল উদ্ভূত চাহিদা (derived demand)। ভোগকারিগণ যেমন অভাব তৃপ্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে পণ্য চাহিয়া থাকে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ভোগের জন্য উপাদান সংগ্রহ করে না। প্রতিষ্ঠান-মালিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া পণ্য উৎপাদন দ্বারা ভোগকারীর চাহিদা মিটাইয়া থাকে। অর্থাৎ ভোগকারিগণের চাহিদা হইতেই উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের উপাদানের জন্য চাহিদার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

উপাদানের চাহিদার বৈশিষ্ট্য

উপাদানের চাহিদার আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সংযুক্ত চাহিদা (Joint demand)। একটিমাত্র উপাদান ব্যবহার দ্বারা কোন পণ্য উৎপাদন সম্ভব নহে। একাধিক উপযোগের মিশ্রণে পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয় বলিয়া উপাদানগুলির চাহিদা সংযুক্ত ও একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য কোন উপাদানের চাহিদা কেবল উহার নিজস্ব দামের উপর নির্ভর করে না, অন্যান্য উপাদানের দামের উপরও নির্ভর করিয়া

থাকে। উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্যের চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে, উপাদানগুলির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি হইবে।

নিয়োগকারীর দিক হইতে কোন উপাদানের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে উপাদানটির উৎপাদনশীলতার উপর।

উপাদানের যোগান আবার নির্ভর করে উপাদানটির সুযোগ-আয়ের (Transfer earnings or Opportunity earnings) উপর। কোন একটি উপাদানের জন্য অন্যান্য শিল্প কি দাম দিতে রাজী আছে—ঐ উপাদানটি যদি কোন নির্দিষ্ট শিল্পে কমপক্ষে ঐ দাম বা আয় লাভ করে তাহা হইলে উহাই হইবে উহার সুযোগ-আয়। যে শিল্পে উপাদানটি যত বেশি সুযোগ-আয় পাইবে সেই শিল্পের দিকেই উহা তত বেশি আকৃষ্ট হইবে এবং উহার যোগান এ শিল্পে কতকটা পাওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ করা যাইবে।

বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
(Marginal Productivity Theory of Distribution)

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব দ্বারা সাধারণভাবে কোন একটি উপাদানের আয় কিভাবে নির্বাচিত হয় তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ওয়ালরাস, উইকষ্টীড, এজওয়ার্থ, ক্লার্ক প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহা আয় বণ্টনের নয়া ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

তত্ত্বটির মূল বক্তব্য এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে পণ্য ও উৎপাদনের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে তাহা হইলে কোন উপাদানের আয়ের উহার প্রান্তিক উৎপন্নের (Marginal Product) সহিত সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায়। উপাদানের আয়ের সহিত উহার প্রান্তিক উৎপন্নের সমতা সৃষ্টি হয় বাজারে প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তকতার নীতির (Principle of Substitution) কার্যকারিতার দরুন। এই তত্ত্বটির প্রধান বিষয়বস্তু নিচে বিশ্লেষণ করা হইল।

প্রান্তিক উৎপন্ন কি? (What is Marginal Product?): অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি কোন একটি উপাদানের নিয়োগ অতিরিক্ত এক একক বাড়ানো যায়, তাহা হইলে মোট উৎপন্ন যে

পরিমাণে বাড়ে উহাই ঐ পরিবর্তনীয় উপাদানটিব প্রান্তিক উৎপন্ন। উপাদানের এই প্রান্তিক উৎপন্ন নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ে পরিমাপ করা যায় :

(১) **প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন** (Marginal Physical Product): কোন একটি উপাদানের নিয়োগ একটি অতিবিক্ত একক পরিমাণ বাড়াইলে মোট উৎপন্ন বস্তুগতভাবে যতটা বৃদ্ধি পায়, তাহাই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন। মনে কর, কোন একটি ফার্ম ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া মোট ৫০ একক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিল। ফার্মটি আরও অতিরিক্ত ১ একক পবিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া যদি মোট ৫৩ একক পবিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন (MPP) হইবে : ৩ একক পণ্য।

(২) **প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য** (Value of the Marginal Physical Product): প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নকে উহার একক প্রতি দাম দ্বাবা গুণ করিলে যে গুণফল পাওযা যাইবে উহাকেই প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের বা প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য বলে। মনে কব, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ কবিযা ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করিল এবং প্রতিটি একক ১০ টাকায় বিক্রয কবিল। ঐ প্রতিষ্ঠান এক একক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করাব ফলে মোট উৎপন্ন বাড়িযা ৫৩ ইউনিট হইল। এখানে প্রতিষ্ঠানটির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্ন হইল ৩ ইউমিট। আর প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নেব মূল্য (VMP) = MPP × P

= ৩ × ১০৲ = ৩০ টাকা।

(৩) **প্রান্তিক আয় উৎপন্ন** (Marginal Revenue Product): অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি কোন প্রতিষ্ঠান একটি উপাদানের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি করে তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানটির আয় যে হারে বাড়ে তাহাকে উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বলা হয়। উপরের দৃষ্টান্ত ধরিলে দেখা যায় যে, যখন প্রতিষ্ঠানটি ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা মোট ৫০ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং দ্রব্যের প্রতিটি একক ১০ টাকায় বিক্রয় করে, তখন প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় হয় : ৫০ × ১০ = ৫০০ টাকা। শ্রমিকের নিয়োগ এক একক বাড়াইলে মোট উৎপন্ন হইল ৫৩ ইউনিট। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির মোট আয় হইবে : ৫৩ × ১০ = ৫৩০ টাকা। অতএব প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) = ৫৩০ − ৫০০ = ৩০ টাকা।

কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ভিন্নরূপ হইবে। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান একটি উপাদানের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি দ্বারা যদি অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত দ্রব্য উহা পূর্বের দামেই বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যের অতিরিক্ত পরিমাণ বিক্রয় করিতে হইলে পূর্বের দাম কমাইতে হইবে। উপরের উদাহরণে প্রতিষ্ঠান ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা যখন ৫০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে তখন প্রতিটি একক ১০ টাকা দামে বিক্রয় করে। কিন্তু বাজার অনিখুঁত প্রতিযোগিতার হইলে ১ একক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা ৫৩ একক দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে প্রতিষ্ঠানটিকে দ্রব্যের অতিরিক্ত এককের দাম কমাইয়া, মনে কর, ৯.৭৫ টাকা করিতে হইল। ফলে, এই বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য (MVP) হইবে : ৩ × ৯.৭৫ = ২৯.২৫ টাকা। আর প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) হইবে : ৫৩ × ৯.৭৫ − ৫০ × ১০৲ = ৫১৬.৭৫ − ৫০০ = ১৬.৭৫।

অনিখুঁত প্রতি-যোগিতার বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত মূল্য ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদি পণ্য ও উপাদানের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য (VMP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) পরস্পর সমান হইবে। ইহার কারণ এই যে, এইরূপ বাজারে প্রান্তিক আয় ও দাম পরস্পর সমান হয় (MR = P)। আবার অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রান্তিক আয় অপেক্ষা অধিক হয় বলিয়া (P > MR) এই বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইবে (VMP > MRP)।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য (VMP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) পরস্পর সমান হয় বলিয়া VMP রেখা ও MRP রেখা দুইটি পরস্পর মিশিয়া যায়। সেইজন্য এই রেখা দুইটি একটি রেখাদ্বারা নির্দেশ করা যায়। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে বাজার দাম অপরিবর্তিত থাকে বলিয়া VMP রেখাটি MRP রেখার মত প্রথমে দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিতে থাকে আবার MRP রেখার মতই দক্ষিণে নিচের দিকে নামিতে থাকে। ইহার

প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্যরেখা এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখার প্রকৃতি

কারণ এই যে, অন্যান্য উপাদানের নিয়োগকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি মাত্র একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম দিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের বিধি এবং শেষের দিকে ক্ষীয়মাণ উৎপাদনের বিধি কার্যকর হইয়া থাকে। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে VMP রেখা ও MRP রেখা উভয়ই নিম্নমুখে নামিতে থাকে এবং MRP রেখাটি VMP রেখার নিচে অবস্থান করে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী উপাদানের দাম নির্ধারণ

(Pricing of a Factor by the application of the Marginal Productivity Theory)

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী কোন একটি উপাদানের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, আমরা এখন তাহা বিশ্লেষণ করিব।

কোন একটি উপাদানের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা জানিতে হইলে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের চাহিদা-রেখা কি, প্রথমেই তাহা জানা দরকার। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি একটিমাত্র উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের মোট আয় কি পরিমাণে পরিবর্তিত হইবে, উহা প্রতিষ্ঠানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) দ্বারা নির্দেশ করা হয়। পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাই প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের চাহিদা-রেখা। সুতরাং, প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানটির চাহিদা-দাম উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন দ্বারা নির্ধারিত হয়।

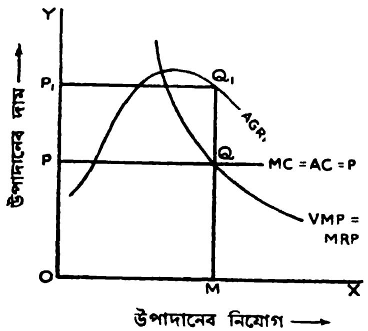
উপাদানের চাহিদা-রেখা

আবার, উপাদানের বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উপাদানের পরিমাণ যতই ক্রয় করুক না কেন, উহা উপাদানটির বাজার দাম ও যোগানের পরিমাণ প্রভাবিত করিতে পারে না। বর্তমান বাজার-দামে প্রতিষ্ঠানটি কতটা পরিমাণ উপাদান কিনিবে কেবলমাত্র তাহা নির্ধারণ করিতে পারে। অর্থাৎ প্রতিটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের যোগান-রেখা ভূমিতলের অক্ষরেখার সমান্তরাল। উপাদানের

উপাদানের যোগান-রেখা

যোগান অসীম স্থিতিস্থাপক (perfectly elastic)। সেইজন্য উপাদানের নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উপাদানের দাম, প্রান্তিক ব্যয় এবং গড ব্যয় পরস্পর সমান হয় (P = MC = AC)।

উপাদান ও পণ্য উভয় বাজারেই যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে উপাদানের দাম এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ভারসাম্য কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হইল :



পার্শ্বের চিত্রে উপাদান ও পণ্য-বাজার নিখুঁত প্রতিযোগিতার বলিয়া প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের মূল্য এবং প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন সমান হইয়াছে এবং একই রেখা-দ্বারা উহাদের নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাটিই প্রতিষ্ঠানের নিকট পরিবর্তনীয় উপাদানটির চাহিদা-রেখা। অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রতিষ্ঠানটি পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগ যতই বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, ততই উপাদানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমিতে থাকিবে। সেইজন্য MRP রেখাটি বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী দেখানো হইয়াছে। উপাদানটির বাজার-দাম OP দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এই দাম উৎপাদক প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত করিতে পারে না। আবার, উপাদানটির প্রান্তিক ব্যয়, গড ব্যয়ও উপাদানের এই দামের সহিত পরস্পর সমান। সুতরাং একই সমান্তরাল রেখা PQ দ্বারা দাম, উপাদানটির প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় নির্দেশ করা হইয়াছে। এই PQ রেখাটিই প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানের যোগান-রেখা। এখন চাহিদা-রেখা MRP ও যোগান-রেখা PQ পরস্পর Q বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। Q বিন্দুই প্রতিষ্ঠানের নিকট উপাদানটির নিয়োগের ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দুতে P = MC = AC = VMP = MRP। এই অবস্থায় উপাদানটির দাম হইবে OP এবং নিয়োগের পরিমাণ হইবে OM। অর্থাৎ OP দামে OM পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করিলেই প্রতিষ্ঠানটির সর্বাধিক আয় লাভ হইবে।

উপরের রেখাচিত্রে AGRP (Average Gross Revenue

Product) রেখাটি দ্বারা পরিবর্তনীয় উপাদানটির নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার গড় মোট আয় উৎপন্ন কিরূপে পরিবর্তিত হয় তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান যখন OM পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করিতেছে তখন উহার গড় মোট আয় উৎপন্নের পরিমাণ হইতেছে MQ_1 এবং মোট আয় হইতেছে : $OM \times MQ_1 = OMQ_1P_1$ ক্ষেত্র। কিন্তু OP দামে পবিবর্তনীয় উপাদানটিব OM পবিমাণ ব্যবহাবে পরিবর্তনীয় উপাদানটির আয় উৎপন্ন হইতেছে = OMQP ক্ষেত্র। অতএব মোট আয় উৎপন্নের মধ্যে পবিবর্তনীয় উপাদানটির প্রাপ্য আয়ের অংশ হইতেছে OMQP পরিমাণ এবং অন্যান্য অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির প্রাপ্য আয়ের অংশ হইতেছে : PQQ_1P_1 পরিমাণ।

প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন নির্দিষ্ট অপরিবর্তিত উপাদানসমূহের সহিত একটি বা একাধিক পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করিবে তখন উহাকে স্বল্পতম ব্যয়ে উপাদান সংমিশ্রণেব (Least-cost combination) দ্বারা সর্বাধিক সম্ভব মুনাফা উপার্জনের লক্ষ্য গ্রহণ করিতে হয়। উপাদান ও উৎপন্ন পণ্যের বাজারে যদি নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান সেই পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ করিয়া সর্বাধিক আয় উপার্জন কবিবে যাহাতে প্রত্যেকটি পরিবর্তনীয় উপাদানের দাম, উহাব প্রান্তিক ব্যয় এবং উহাব প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পবস্পব সমান হয় (P = MC = MRP)। ইহাই উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের প্রথম শর্ত। ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি হইল : একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য (MRP = VMP) আর একটি পরিবর্তনীয় উপাদানেব সমান হওয়া চাই। যদি একটি উপাদানের MRP = VMP আর একটি উপাদান অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান কম প্রান্তিক আয় উৎপন্নেব উপাদানটির পরিবর্তে বেশি প্রান্তিক আয উৎপন্নের উপাদানটি অধিক পরিমাণে নিয়োগ করিতে থাকিবে। এই ভাবে পরিবর্তক নীতি (Principle of Substitution) প্রয়োগের ফলে প্রত্যেকটি পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য পরস্পর সমান হইবে (MRP = VMP)। সুতরাং উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের অবস্থায় প্রত্যেকটি পরিবর্তনীয় উপাদানেব MRP = VMP = MC = P অপর একটি পরিবর্তনীয়

উপাদান নিয়োগে ভাবসাম্যেব শর্তাবলী

উপাদানের MRP = VMP = MC = P-এর সহিত পরস্পর সমান হইবে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির অনুমিত শর্তাবলী (Basic Assumptions of the Theory of Marginal Productivity): প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি নিম্নলিখিত অনুমিত শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত:

(ক) উপাদান ও পণ্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং সমাজে পূর্ণ নিয়োগ বর্তমান আছে।

(খ) উপাদানগুলির অবাধ গতিশীলতা রহিয়াছে।

(গ) অন্যান্য উপাদান অপরিবর্তিত রাখিয়া এক বা একাধিক উপাদানেব নিয়োগ বাড়াইয়া যাওয়া চলে। তাহাতে উৎপাদনের কোন অসুবিধা হয় না।

(ঘ) প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন কারকগুলি সমান দক্ষতাসম্পন্ন। প্রত্যেকটি উপাদানের কারকগুলির একটি আর একটির পরিবর্তক হিসাবে ইচ্ছামত ব্যবহার করা চলে।

(ঙ) প্রত্যেকটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা যায়।

(চ) অন্যান্য উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি এক বা একাধিক উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধিটি কার্যকর হইবে।

(ছ) প্রত্যেক উপাদানকে যদি প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাহা হইলে মোট উৎপন্ন সম্পূর্ণভাবে বণ্টিত হইয়া যাইবে।

(জ) এই তত্ত্বটি দীর্ঘকালীন সময়ে উপাদানের দাম নির্ধারণে প্রয়োগ করা হয়।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা
(Criticism of the Marginal Productivity Theory)

এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত একাধিক সমালোচনা করা হইয়াছে:

(১) তত্ত্বটি কতকগুলি অবাস্তব অনুমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, এই তত্ত্বে অনুমান করা হইয়াছে যে, পণ্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ নিয়োগ আছে। কিন্তু এই অনুমান দুইটি অবাস্তব।

(২) প্রতিটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। কেন না, একটি উৎপন্ন পণ্য সকল উপাদানের সংযুক্ত উৎপাদনের ফল, কোন একটি উপাদানের এককভাবে উৎপাদনের ফল নহে। শ্রীমতী জোয়ান রবিনসন প্রান্তিক নীট আয় উৎপন্নের (Marginal Net Revenue Product) ধারণার সাহায্যে একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন পৃথকভাবে পরিমাপের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে একটি পরিবর্তনীয় উপাদানের প্রান্তিক নীট আয় উৎপন্ন এইভাবে জানা যায়: অন্যান্য অপরিবর্তনীয় উপাদানের সহিত পরিবর্তনীয় কোন একটি উপাদানের অতিরিক্ত এক একক ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ মোট আয় বাড়ে উহা হইতে অপরিবর্তনীয় উপাদানগুলির নিয়োগ বাবদ আনুপাতিক ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই পরিবর্তনীয় উপাদানটির প্রান্তিক নীট আয় উৎপন্ন (MNRP) হিসাবে ধরা হইবে।

(৩) উৎপাদনের কোন একটি উপাদানের সকল এককগুলি সমান দক্ষতাসম্পন্ন হয় না। সকল শ্রমিক বা উদ্যোক্তার দক্ষতাও সমান নহে।

(৪) উপাদানগুলির গতিশীলতা অবাধ নহে। যখনই কোন একটি উপাদান বিশিষ্টতা (specificity) অর্জন করে তখনই উহার সচলতা হ্রাস পায়।

(৫) প্রত্যেকটি উপাদানই অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য নহে। যে কোন উৎপাদনের নিয়োগ অতি অল্প মাত্রায় ইচ্ছামত বাড়াইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। উপাদানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য ও পরিবর্তনীয় হইলেই কেহ ইচ্ছামত উহাদের নিয়োগ বাড়াইয়া যাইতে পারে না। উপাদানের নিয়োগের অনুপাত বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের বর্তমান কারিগরি অবস্থার (Technical Condition) উপর। কাবিগরি অবস্থা বিবেচনা করিয়া ক্রমাগত উপাদানের ব্যবহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রায় বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদনে বিপর্যয় ঘটিতে বাধ্য।

(৬) এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক উপাদান উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান পারিশ্রমিক পাইবে এবং তাহার ফলে মোট উৎপন্ন নিঃশেষে বণ্টিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধিটি কার্যকর রহিয়াছে ধরা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটি উপাদান উহার প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান পারিশ্রমিক পাইলেও মোট উৎপন্ন নিঃশেষে বিভক্ত হইবে না; মোট উৎপন্নের কিছুটা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে।

(৭) এই তত্ত্বটি উপাদানের দাম নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব হইতে পারে না। কেন না, ইহা কেবল উপাদানের চাহিদার দিক বিবেচনা করিয়াছে, যোগানের দিকে মোটেই জোর দেয় নাই। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা উপাদানের চাহিদা নির্ধারিত হয় বটে। কিন্তু উপাদানের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান উভয়েরই ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রভাব প্রয়োজন।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন একটি উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ উহার পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করে। যেমন, মজুরির হার কমিলে শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণও বাড়িবে। কিন্তু এই অনুসিদ্ধান্তটি বাস্তবধর্মী নহে। মন্দার সময় মজুরির হার কমিয়া যাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। লর্ড কেইনসের মতে, শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ উহার মজুরি হারের উপর নির্ভর করে না। নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের কার্যকরী চাহিদার (Effective Demand) উপর।

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি উপাদানের দাম নির্ধারণে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারে নাই। গতিশীল অর্থব্যবস্থায় উপাদানের দাম এমন অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যাহা এই তত্ত্বে বিবেচনা করা হয় নাই।

২৪ | মজুরি

(Wages)

মজুরির সংজ্ঞা
(Definition of Wages)

শ্রমের দামকে মজুরি বলা হয়। শ্রমিক উৎপাদনে সেবা যোগান দিয়া থাকে। শ্রমিকের এই সেবার দাম বা পারিশ্রমিকই মজুরি। শ্রমিকের দিক হইতে মজুরি হইল তাহার আয়, আর উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে মজুরি হইল উৎপাদন ব্যয়ের একটি উপাদান।

শ্রমিক দুইপ্রকারে মজুরি পাইতে পারে: (ক) শ্রমিক কতটা কাজ করিয়াছে তাহার ভিত্তিতে, এবং (খ) শ্রমিক কতটা সময় খাটিয়াছে তাহার ভিত্তিতে। কাজের পরিমাণ অনুযায়ী যখন শ্রমিক মজুরি পায়, তখন উহাকে বলা হয় কাজানুসার-মজুরি (Piece-wages)। আবার সময় হিসাবে অর্থাৎ দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাস হিসাবে যখন মজুরি পায়, তখন উহাকে বলা হয় সময়ানুসার-মজুরি (Time-wages)। অনেক সময় আবার মজুরি-হার রাষ্ট্রের আইন দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি
(Money Wages and Real Wages)

যে ভাবেই মজুরি দেওয়া হউক না কেন, শ্রমিক তাহার পরিশ্রমের বিনিময়ে কিছু মজুরি পায় টাকাপয়সা বা অর্থ-আয় হিসাবে। শ্রমিক তাহার শ্রমের মূল্য বাবদ দিন, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে কোন নির্দিষ্ট সময়ে যে টাকা-পয়সা পারিশ্রমিক পায় তাহাকে আর্থিক-মজুরি (Money wages) বলে। কিন্তু কেবল এই আর্থিক-মজুরির পরিমাণ দ্বারাই কোন শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে বুঝিতে পারা যায় না। শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রকৃত মজুরি কি তাহা জানিতে হয়। শ্রমিক আর্থিক মজুরি হিসাবে যে টাকা-পয়সা পায় তাহা দিয়া নানাবিধ নিত্যব্যবহার্য আরামপ্রদ

ও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। আর্থিক মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক যে পরিমাণ এই ধরনের সামগ্রী কিনিতে ও সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহাই প্রকৃত মজুরি (Real wages)।

প্রকৃত মজুরি কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে

শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে সে কতটা আর্থিক মজুরি পায় কেবল তাহা জানিলেই যথেষ্ট নহে। যদিও আর্থিক মজুরি বেশি পাইলে সাধারণত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির পরিমাণ বাড়ে, তথাপি একমাত্র আর্থিক মজুরির উপর প্রকৃত মজুরি নির্ভরশীল নহে। প্রকৃত মজুরি আরও নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

(১) দাম-স্তরের উঠা-নামা

প্রকৃত মজুরি দেশের দাম-স্তরের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। দেশে দাম-স্তর উঠা-নামার সঙ্গে প্রকৃত মজুরির পরিবর্তন ঘটিতে পারে। দাম-স্তর যদি বৃদ্ধি পায় আর আর্থিক মজুরি একই থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইবে। জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়িয়া যায় তখন অর্থ-মজুরি দ্বারা শ্রমিক কম পরিমাণ জিনিস বা সুখ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। ফলে, তাহার প্রকৃত মজুরিও কমিবে। আবার দাম-স্তর কমিলে একই পরিমাণ অর্থ-মজুরি দ্বারা শ্রমিক বেশি পরিমাণ জিনিস কিনিতে বা সুখ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে। ফলে, তাহার আসল মজুরিও বাড়িবে।

(২) নিয়োগের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব

শ্রমিকের নিয়োগ স্থায়ী না অস্থায়ী, নিয়মিত না অনিয়মিত ইহার উপরও তাহার প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে। যে সকল কাজ অস্থায়ী বা অনিয়মিত সেখানে আর্থিক মজুরি বেশি হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশি নহে। কেন না, এই সকল কাজে নিযুক্ত শ্রমিক যে-কোন সময়ে বেকার হইতে পারে।

(৩) কাজের সম্মান ও শারীরিক খাটুনি

শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কাজের শারীরিক খাটুনি, সম্মানবোধ ও পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে শরীরের খাটুনি খুব বেশি হয়। এই ধরনের কাজে আর্থিক মজুরি বেশি হইলেও প্রকৃত মজুরি কম। কেন না, এই কাজ দীর্ঘদিন ধরিয়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব নহে। শিক্ষকের কাজের সম্মান যথেষ্ট। সেইজন্য এই কাজের অর্থ-আয় কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যপূর্ণ, স্বাধীন ও

সুনীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে যে কাজ করিতে হয় তাহার আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি বেশি।

শ্রমিকের উপরি পাওনার সম্ভাবনা, কাজের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ, ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশা প্রভৃতির উপরও প্রকৃত মজুরি নির্ভর করে।

(৪) উপরি পাওনার সম্ভাবনা

যে কাজে উপরি পাওনা যথেষ্ট, সে কাজ করিয়া শ্রমিক যথেষ্ট ভোগ্যদ্রব্য কিনিতে ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে। ফলে, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিও বাড়ে। চা-বাগানের কুলিদের কাজে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে। তাহারা অল্প মূল্যে রেশন পায়, বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ পায়, বিনামূল্যে ঔষধ, চিকিৎসাদি লাভ করে। উহাদের প্রকৃত মজুরি সেইজন্য বেশি। যে সকল কাজে পদোন্নতির আশা বেশি, সেখানে আর্থিক মজুরি কম হইলেও প্রকৃত মজুরি অধিক হয়।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির এই পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের শ্রমিকগণের প্রকৃত অবস্থা কি, উহা আর্থিক মজুরির উপর ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে প্রকৃত মজুরির উপর। অন্যান্য বিষয়ে যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে আর্থিক মজুরির বৃদ্ধি এবং জীবন-যাত্রার ব্যয়-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত মজুরিও বাড়িতে থাকে।

মজুরি-হারের পার্থক্য

(Differences in Wages or Wage-Differentials)

মজুরি-হারের পার্থক্য বলিতে সাধারণত আর্থিক মজুরির হারের (Money wage rate) বিভিন্নতা বুঝাইয়া থাকে। এই আর্থিক মজুরি-হার বিভিন্ন কাজ বা পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকের বেলায় বিভিন্ন হইতে পারে। আবার বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশেও আর্থিক মজুরির হার বিভিন্ন দেখা যায়।

নিম্নলিখিত কারণে বিভিন্ন পেশায় মজুরি-হার বিভিন্ন হইতে পারে :

(১) সকল পেশা বা কাজ শ্রমিকের নিকট সমান আকর্ষণীয় নহে। যে কাজ করিতে কায়িক পরিশ্রম অধিক দরকার হয়, কিংবা যে কাজে সামাজিক মর্যাদা কম উহা শ্রমিকের নিকট অপেক্ষাকৃত কম লোভনীয়। এইরূপ কাজে মজুরি বেশি না দিলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয় না। যেমন, ইঞ্জিন-

চালক, কশাই প্রভৃতির কাজ। অপর পক্ষে, যে কাজে দৈহিক ক্লান্তি কম ও সামাজিক মর্যাদা বেশি, উহার মজুরি কম হইলেও শ্রমিক ঐ কাজে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন, শিক্ষকের কাজ।

(২) মজুরির বিভিন্নতা কাজ বা পেশা শিখিবার সুযোগ-সুবিধা ও ব্যয়ের আপেক্ষিক তারতম্যের উপরও নির্ভর করে। অনেক বৃত্তি আছে, যাহা শিক্ষা করা সময়-সাপেক্ষ ও ব্যয়-বহুল। যেমন, ডাক্তারি, ইন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি। এই সকল কাজে পারিশ্রমিক স্বভাবতই বেশি।

(৩) যে কাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিযুক্ত থাকা যায়, যে কাজ স্থায়ী, উহার মজুরি কম হইয়া থাকে। অল্প সময়ের জন্য কাজ, কিংবা যে কাজ সারা বৎসর নিয়মিতভাবে চলে না উহার মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক না হইলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয় না।

(৪) ভবিষ্যতে কাজের উন্নতির সম্ভাবনার উপরও মজুরির বিভিন্নতা নির্ভর করে। যে কাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যে কাজ করিলে অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকের পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে কিংবা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের আশা আছে, সে কাজের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়।

(৫) অনেক সময় প্রকৃতিগত দক্ষতা (inborn ability), আয়, শিক্ষা, পেশাগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির পার্থক্যের দরুন মানুষে মানুষে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহার ফলে সমাজে কতকগুলি অপ্রতিযোগী শ্রমিক-গোষ্ঠীর (Non-competing labour groups) উদ্ভব হয়। কোন একটি গোষ্ঠীর শ্রমিক অপর গোষ্ঠীর শ্রমিকের সহিত একই পেশা গ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। কোন ইন্‌জিনিয়ার বেশি আয় করিতেছে বলিয়া কোন ডাক্তার ডাক্তারি ছাড়িয়া ইন্‌জিনিয়ারিং আরম্ভ করিতে পারে না। কোন ফোরম্যান বেশি উপার্জন করিতেছে বলিয়া কোন কেরাণী ফোরম্যানের কাজের প্রতিযোগিতা করে না। এক গোষ্ঠীর শ্রমিক অপর গোষ্ঠীতে সহজে যাওয়া-আসা করিতে পারে না বলিয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিকের পারিশ্রমিক বিভিন্ন। অনেক সময় কোন একটি অপ্রতিযোগী শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবার বিভিন্ন অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী (Non-competing groups within non-competing group) দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, ডাক্তার এবং হাতুড়ে ডাক্তারের মধ্যে প্রতিযোগিতা

শ্রমিকের সচলতার অভাবই মজুরি-হারের পার্থক্যের মূল কারণ

দেখা যায় না। সকল ইন্‌জিনিয়ারের সম্মুখে আয়ের সুযোগ-সুবিধা সমান নহে। শ্রমিকের সচলতার অভাবই (Absence of mobility of labour) বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারের পার্থক্যের মূল কারণ। অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, পরিবারের প্রতি টান, জাতি, ধর্ম ও ভাষাগত তারতম্য প্রভৃতি শ্রমিকের বিভিন্ন স্থানে গমন এবং ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের পথে বাধা-স্বরূপ। শ্রমিক যদি বিশেষ কোন পেশায় অধিক দিন নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে সে ঐ কাজে বিনির্দিষ্ট (specific) হইয়া পড়ে এবং তাহার সচলতা কমিয়া যায়।

শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলেও বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকের মজুরি-হারের পার্থক্য দেখা দেয়।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরির বিভিন্নতা দেখা যায়, এক দেশ হইতে অন্য দেশে শ্রমিকের অবাধ সচলতার অভাবে। বিভিন্ন দেশের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, আইন-প্রণালী প্রভৃতি বিভিন্ন হওয়ায় এক দেশ হইতে অপর দেশে শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা থাকে না। ফলে, বিভিন্ন দেশে মজুরি-হারে তফাৎ হয়। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও জাতীয়গুণের (racial quality) তারতম্যের জন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার বিভিন্নতা দেখা যায় এবং তাহার জন্যও মজুরি-হারের পার্থক্য হইতে পারে।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রমিকের আর্থিক মজুরির বিভিন্নতা ছাড়া মজুরির প্রকৃত পার্থক্যও থাকিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে কাজ বা পেশার মধ্যে বহু রকমের প্রকৃত বা অনার্থিক পার্থক্য (Non-money difference) দেখা যায়। যেমন, শিক্ষকের কাজে কায়িক পরিশ্রম কম, নিয়োগকাল নিয়মিত, সামাজিক মর্যাদা বেশি, ছুটি বেশি। আবার ইঞ্জিন চালকের কাজ খুবই শ্রমসাধ্য। ইহাতে সামাজিক মর্যাদা কম, ছুটি বা অবসর কম। এইরূপ ক্ষেত্রে ইঞ্জিন-চালকের আর্থিক মজুরি শিক্ষকের আর্থিক মজুরি অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি হয়। কিন্তু ইঞ্জিন-চালকের কাজে আর্থিক মজুরি বেশি হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরিতে শিক্ষকের কাজই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন তাহা হইলে বলা চলে যে, এই দুইটি বিপরীত ধরনের কাজের প্রকৃত বা অনার্থিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আর্থিক মজুরির বিভিন্নতা দ্বারা প্রকৃত মজুরির পার্থক্য পূরণ করা হইয়াছে। এইভাবে আর্থিক মজুরির পার্থক্য যখন মজুরির প্রকৃত পার্থক্যকে সমান করিয়া থাকে,

মজুরির সমতাকারী পার্থক্য

তখন উহাকে আর্থিক মজুরির সমতাকারী পার্থক্য (Equalizing wage differentials) বলা হয়।

কিন্তু আর্থিক মজুরির পার্থক্যগুলি সকল ক্ষেত্রেই সমতাকারী পার্থক্য হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। আর্থিক মজুরির আবার বৈষম্যকারী পার্থক্যও (Non-equalizing wage differentials) আছে। এমন অনেক কাজ আছে যাহাতে কায়িক পরিশ্রম কম প্রয়োজন হয়, দায়িত্ব কম, অবসর বেশি। অথচ এ ধরনের কাজে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বেশি। আবার, অনেক কাজ আছে যাহা শ্রমসাধ্য ও বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। অথচ এইরূপ কাজে পারিশ্রমিক কম। এইরূপ ক্ষেত্রে মজুরির পার্থক্যকে বৈষম্যকারী পার্থক্য বলা হয়। মজুরির এই বৈষম্যকারী পার্থক্য নানা কারণে ঘটিতে পারে। সকল শ্রমিক এক জাতীয় নহে। শ্রমিকেব স্বাভাবিক গুণ ও কর্মদক্ষতার তাবতম্যের জন্য মজুরির বৈষম্যকারী বিভিন্নতা দেখা যায়। আবাব, শ্রমেব বাজার যদি অনিখুঁত হয় তাহা হইলেও মজুরিব বৈষম্যকারী পার্থক্য দেখা দিতে পারে। শ্রমের বাজার অনিখুঁত হইলে শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োগ সম্পর্কে সঠিক খোঁজ-খবরাদি রাখিতে পারে না। ফলে, বিভিন্ন শিল্পে মজুরি-হার কম-বেশি হইতে পারে। অনেক সময় সবকাব যদি আইন দ্বারা কোন শিল্পে মজুরির স্তর বাঁধিয়া দেয়, কিংবা শ্রমিক-সংঘ চাপ দিয়া কোন শিল্পে উচ্চ মজুরি আদায় করে, তাহা হইলেও এক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরির হার অপর শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মজুরিব হার অপেক্ষা বিভিন্ন হইতে পারে। শ্রমের বাজার অনিখুঁত হওয়াতেই সমাজে বিভিন্ন অপ্রতিযোগী শ্রমিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। এক গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিক অপর গোষ্ঠীতে সহজে চলাচল করিতে পারে না। এক গোষ্ঠীর শ্রমিক অপর গোষ্ঠীর শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ডাক্তার ইন্‌জিনিয়ার হইতে পারে না, কিংবা করণিক ইঞ্জিন-চালক হইতে পারে না। ফলে, বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভুক্ত শ্রমিকের মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু বৈষম্যকারী পার্থক্যের মূল কারণ হইল, শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে পার্থক্য। ভাল চিকিৎসকের যোগান চাহিদাব তুলনায় এবং একজন করণিকেব যোগানের তুলনায় কম। সেইজন্য ভাল চিকিৎসকের মজুরি করণিকেব মজুরি অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে।

মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্য

শ্রমের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Labour)

উৎপাদনের উপাদান হিসাবে শ্রমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহা উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের সম্পর্কে খাটে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মজুরি নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। শ্রমের বৈশিষ্ট্য-গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল :

(১) **শ্রমকে শ্রমিক হইতে পৃথক করা যায় না :** অন্যান্য উপাদানগুলিকে যেমন উহাদের মালিক হইতে বিচ্ছিন্ন করা চলে, শ্রমের বেলায় তাহা চলে না। কোথাও শ্রমের চাহিদা দেখা গেলে, শ্রমিককেও শ্রম যোগানের সহিত সেখানে যাইতে হয়।

(২) **শ্রম খুব অপচয় প্রবণ (perishable) :** অন্যান্য উপাদানের বাজার-দাম আকর্ষণীয় না হইলে তাহা যেমন মজুদ করিয়া রাখা যায়, শ্রমের বেলায় তাহা চলে না। শ্রমিক যদি কাজ না করিয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার শ্রমের বৃথা অপচয় ঘটিবে।

(৩) **শ্রমিক শুধু শ্রমই বিক্রয় করে :** শ্রমিক যখন শ্রম যোগান দেয় তখন শুধু শ্রমই বিক্রয় করিয়া থাকে। শ্রম বিক্রয়ের দ্বারা শ্রমিকের মালিকানা ক্রেতার নিকট স্থানান্তরিত হয় না।

(৪) **শ্রমের যোগান অত্যন্ত ধীরে পরিবর্তিত হয় :** অন্যান্য উপাদানের তুলনায় শ্রমের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক। শ্রমের চাহিদা বাড়িলে স্বল্পকালীন সময়ে শ্রমের যোগান বাড়ানো যায় না।

(৫) **শ্রমের দামদস্তুরের ক্ষমতা কম :** উৎপাদকের তুলনায় শ্রমিকের দামদস্তুর করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। শ্রমিকরা সাধারণত গরিব। কাজ না করিয়া তাহারা একদিনও বসিয়া থাকিতে পারে না। কাজ না করিলে মজুরি পায় না বলিয়াই তাহারা যে কোন মজুরিতেই কাজ করিতে রাজী হয়। শিক্ষার অভাব, চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান অত্যধিক, শ্রমিক-সংঘের দুর্বলতা প্রভৃতির দরুন শ্রমিকগণ মালিকের সহিত সমানভাবে দামদস্তুর করিতে সক্ষম হয় না।

(৬) **শ্রম অপেক্ষাকৃত কম সচল :** শ্রম একটি মানবিক উপাদান। কাজের পছন্দ-অপছন্দ, কাজের জায়গা ও পরিবেশ শ্রমিকের যোগানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ভাষা, জলবায়ু, সামাজিক রীতি-নীতি ও

আচার-পদ্ধতি প্রভৃতির তারতম্যের জন্য শ্রমিকের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গতিশীলতা অবাধ বা সহজ নহে।

শ্রমের চাহিদা
(Demand for Labour)

শ্রমের চাহিদা আসে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা মালিকের নিকট হইতে। এই চাহিদা নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর। মালিকের দিক হইতে শ্রমের চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমের নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে উৎপাদনের একটি স্তরের পর শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কমিতে থাকিবে। ফলে, শ্রমের চাহিদা-রেখা বামদিক হইতে দক্ষিণে নিচের দিকে ঢালসম্পন্ন হইবে। শ্রমের চাহিদা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

(ক) কারিগরি কৌশল (Technology) শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করিয়া শ্রমের চাহিদাকে নির্ধারণ করে।

(খ) পণ্যের চাহিদাও শ্রমের চাহিদাকে প্রভাবিত করিয়া থাকে। শ্রমের চাহিদা প্রত্যক্ষ নহে। শ্রমের চাহিদা উদ্ভূত চাহিদা (derived demand) ; পণ্যের চাহিদা হইতেই শ্রমের চাহিদার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভোগকারিগণের নিকট পণ্যের চাহিদা যত বাড়িবে, ঐ পণ্য উৎপাদন করিতে শ্রমের চাহিদাও তত বেশি হইবে।

(গ) শ্রমের চাহিদা শ্রমের পরিবর্তক উপাদানগুলির দামের উপরও নির্ভর করে। যদি পরিবর্তক উপাদানগুলির বাজার দাম বেশি হয়, তাহা হইলে উৎপাদক ঐ সকল উপাদান নিয়োগ না করিয়া শ্রমই নিয়োগ করিবে। সেক্ষেত্রে শ্রমের চাহিদা বাড়িবে। আবার, পরিবর্তক উপাদানগুলির দাম যদি কমে, তাহা হইলে শ্রমের চাহিদা কমিবে।

শ্রমের যোগান
(Supply of Labour)

শ্রমের যোগান বলিতে একটি নির্দিষ্ট পেশাভুক্ত শ্রমিক বিভিন্ন মজুরিতে কত বিভিন্ন ঘণ্টা বা দিন কাজ করিতে প্রস্তুত তাহাকে বুঝায়। সাধারণত

মজুরির হার যত বেশি দেওয়া হইবে তত বেশি শ্রমের যোগানের পরিমাণও বাড়িবে। অর্থাৎ শ্রমের যোগান-রেখা উর্ধ্বমুখী হইবে।[১]

কোন এক জাতীয় শ্রমের যোগান দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

(১) শ্রমের যোগান নির্ভর করে এক পেশা হইতে অন্য পেশায় চলিয়া যাইবার সম্ভাবনার উপর। কোন কোন পেশায় বা শিল্পে প্রবেশ করা এবং উহাদের পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া সহজ। আবার, কোন কোন পেশাতে বা শিল্পে প্রবেশ করা বা উহাদের পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। শ্রমিকের পেশাগত পরিবর্তন বা শিল্পান্তরে নিয়োগ গ্রহণ আবার নির্ভর করে

(ক) অন্যান্য পেশাভুক্ত বা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণ কতটা যোগ্যতাসম্পন্ন বা প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করিতে সক্ষম ;

(খ) বিভিন্ন পেশার আপেক্ষিক প্রকৃত বা অনার্থিক সুযোগ-সুবিধা (non-monetary advantages) কতটা বর্তমান ;

এবং (গ) এক পেশা হইতে পেশান্তর গ্রহণের ব্যয় কতটা, তাহার উপর।

যতক্ষণ পর্যন্ত মজুরির হার বাড়িবার ফলে শ্রমিক স্বল্প মজুরির পেশা পরিত্যাগ করিয়া অধিক মজুরির পেশা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, ততক্ষণ শ্রমের যোগান-রেখা ধনাত্মক হইবে। কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় শ্রমের যোগান-রেখা স্বল্পকালীন সময় অপেক্ষা দীর্ঘকালীন সময়ে অধিক স্থিতিস্থাপক। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘকালীন সময়ে, এক পেশা হইতে পেশান্তর গ্রহণের সম্ভাবনা বেশি।

শ্রমের যোগান শুধু যে বিভিন্ন পেশাগত গতিশীলতার উপর নির্ভর করে তাহা নহে। শ্রমের যোগান মজুরির হারের পরিবর্তন, বাজারে শ্রম বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক জনসংখ্যা এবং তাহারা কতটা সময় কাজ করিতে রাজী প্রভৃতি বিষয়ের উপরও নির্ভরশীল। মজুরি-হারের পরিবর্তনের ফলাফল দুই প্রকারে বিপরীতভাবে শ্রম যোগানের উপর দেখা দিতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে মজুরির হার বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে, আবার কমিতেও পারে। মজুরির হার বাড়িলে শ্রমিক বিশ্রাম পরিত্যাগ করিয়া

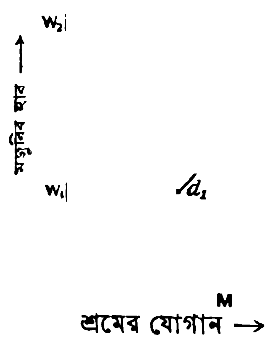
১. লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রমের মোট যোগান-রেখা অঙ্কন করা যায় না। ইহার কারণ এই যে, কোন দেশের সকল শ্রম সমজাতীয় নহে।

উহার পরিবর্তে অধিক মজুরিতে বেশি করিয়া কাজ করিতে রাজী হইবে। ইহাকে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তক-প্রভাব (Substitution effect of a rise in wages) বলা হয়। অপরদিকে, মজুরি বাড়িবার ফলে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি ঘটিলে তাহারা বিশ্রাম খুঁজিবে, অতিরিক্ত কাজ না করিয়া অবসর বা ছুটি ভোগ করিতে চাহিবে। ইহা হইল মজুরি বৃদ্ধির আয়-প্রভাব (Income effect of a rise in wages)।

মজুরি-হার বৃদ্ধির পরিবর্তক- ও আয়-প্রভাব

মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্তক-প্রভাব ও আয়-প্রভাব শ্রম যোগানের উপর বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিবর্তক-প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে, আবার, আয়-প্রভাবের ফলে শ্রমের যোগান কমে। শ্রমের যোগান শেষ পর্যন্ত বাড়িবে কি কমিবে, তাহা এই দুইটি বিরোধী প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে। যদি পরিবর্তক-প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে মজুরি-হারের বৃদ্ধির দরুন শ্রমের যোগান বাড়িবে। আবার, আয়-প্রভাব যদি পরিবর্তক-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে মজুরি-হার বাড়িলে শ্রমের যোগান কমিবে। নিচের রেখাচিত্রের দ্বারা দুইটি প্রভাবের পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখানো হইল :

চিত্রে OX অক্ষরেখা শ্রমের যোগান এবং OY অক্ষরেখা মজুরির হার নির্দেশ করিতেছে। মজুরির হার যখন OW_1 তখন শ্রমের যোগান W_1d_1। মজুরির হার বাড়িয়া OW হইলে, শ্রমের যোগান W_1d_1 হইতে বাড়িয়া Wd (=OM) হইল। মজুরির হার আরও বাড়িয়া যখন OW_2 হইয়াছে, তখন শ্রমের যোগান Wd হইতে কমিয়া W_2d_2 হইল। d_1, d ও d_2 বিন্দুগুলিকে পরস্পর যোগ করিলে যে SS রেখা পাওয়া যাইবে উহা শ্রমের যোগান-রেখা। d বিন্দু পর্যন্ত যোগান রেখা SS দক্ষিণে উপরের দিকে উঠিয়াছে। d বিন্দু পর্যন্ত আয়-প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্তক-প্রভাব



অধিক শক্তিশালী। ফলে d বিন্দু পর্যন্ত মজুরির হার বৃদ্ধির সহিত শ্রমের যোগান বাড়িবে। আবার d বিন্দুর পর হইতে পরিবর্তক-প্রভাব অপেক্ষা আয়-প্রভাব অধিক শক্তিশালী হওয়ায় যোগান-রেখা SS বামে উপরে হেলিয়াছে। ফলে d বিন্দুর পর হইতে মজুরি বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও শ্রমের যোগান কমিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়?
(How Wages are determined ?)

এযাবৎ মজুরি নির্ধারণের বহু তত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ ন্যূনতম ভরণ-পোষণ তত্ত্ব, মজুরি-তহবিল তত্ত্ব এবং জীবন-যাত্রার মানের তত্ত্ব দ্বারা মজুরি নির্ধারণের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আবার, নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতিকালে চাহিদা ও যোগান-তত্ত্ব দ্বারা মজুরি নির্ধারণের বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদের ধারণা এই যে, এই সকল তত্ত্বের কোনটিই সন্তোষ-জনক নহে। তাঁহারা মনে করেন যে, পণ্যের দামের মত শ্রমের দাম (মজুরি) চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারণের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সহজ নহে। মজুরি নির্ধারণের যে কোন সন্তোষজনক পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে শ্রম-বাজারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। শ্রম-বাজারে মালিকশ্রেণী কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর একচেটিয়া ভাবাপন্ন সংগঠন থাকিতে পারে। মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর দামদস্তুর করিবার পারস্পরিক ক্ষমতার পার্থক্য থাকিতে পারে, শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে, মজুরি-হারের উপর বিভিন্ন-রকম সরকারী আইনের প্রভাব থাকিতে পারে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির যে কোনটি শ্রমের চাহিদা ও যোগান প্রভাবিত করিয়া মজুরি নির্ধারণে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। লর্ড কেইন্‌সের অভিমত এই যে, শ্রমের চাহিদা ও যোগানকে জাতীয় আয় ও দেশের নিয়োগের স্তর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং মজুরি-হার নির্ধারণে ব্যষ্টিগত কোন তত্ত্বই সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। নিচে প্রধান প্রধান কয়েকটি মজুরি-তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইল।

ন্যূনতম ভরণ-পোষণ তত্ত্ব
(The Subsistence Theory of Wages or The Iron Law)

এই তত্ত্বের সারমর্ম এই যে, শ্রমিকের পরিবার ও নিজের নিম্নতম মানের জীবনযাত্রার জন্য যে পরিমাণ আয় প্রয়োজন, মজুরির হার কমপক্ষে উহার সমান হওয়া চাই। মজুরির হার যদি শ্রমিকের ন্যূনতম ভরণ-পোষণের ব্যয় হইতে বেশি হয়, তাহা হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া শ্রমের যোগান বাড়িবে। ইহাতে মজুরির হার কমিয়া শ্রমিকের ভরণ-পোষণের ব্যয়ের সমান হইবে। আবার মজুরির হার যদি শ্রমিকের বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে আয় দরকার তাহা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে জনসংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং শ্রমের যোগানও কমিবে। ফলে, মজুরির হার বাড়িয়া যাইবে।

সমালোচনা

এই তত্ত্বটির প্রথম ও প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে কেবলমাত্র শ্রমের যোগানের দিক হইতেই মজুরি বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। মজুরি নির্ধারণে যে শ্রমের চাহিদারও বিশেষ ভূমিকা আছে তাহা এই তত্ত্বে অস্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মজুরি বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমের যোগানও বাড়ে। ইহা বাস্তবত সত্য নহে। তৃতীয়ত, বিভিন্ন পেশাভুক্ত শ্রমিকগণের মজুরি-হারের কেন বিভিন্নতা হয়, তাহা এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নাই। চতুর্থত, শ্রমিক-সংঘ ও শ্রমিক আন্দোলনের চাপে মজুরি-হার ন্যূনতম ভরণ-পোষণের স্তর অপেক্ষা যে বেশি হইতে পারে, তাহা এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নাই।

মজুরি-তহবিল তত্ত্ব
(The Wages Fund Theory)

মজুরি-তহবিল তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, দেশের মোট বিনিয়োজিত পুঁজির একটি স্থির নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকগণের মজুরি হিসাবে বরাদ্দীকৃত আছে। ইহাকে মজুরি-তহবিল বলা হয়। এই মজুরি-তহবিলকে দেশের মোট শ্রমিকের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সাধারণ মজুরির হার নির্ণয়

করা যায়। দেশে শ্রমিক সংখ্যা যত বাড়িবে মজুরির হারও তত কমিবে। আবার, শ্রমিক সংখ্যা কমিলে, মজুরির হার বাড়িবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে একটি শিল্পে মজুরির হার বাড়িলে অন্য একটি শিল্পে মজুরির হার অবশ্যই কমিবে। যদি সকল শিল্পে মজুরি বাড়ে তাহা হইলে মুনাফা হ্রাস পাইবে, এবং পুঁজি বিনিয়োগ কমিবে। ইহার ফলে কর্ম-নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং শেষ পর্যন্ত মজুরির হারও কমিবে।

সমালোচনা

মজুরি-তহবিল তত্ত্বটির একাধিক ত্রুটি আছে। এই তত্ত্বে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, মজুরি দেওয়ার জন্য পুঁজির একটি স্থির নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ আছে। ইহা মোটেই সত্য নহে। শ্রমিকগণের মজুরি পুঁজি হইতে কিংবা কোনরূপ মজুরি তহবিল হইতে প্রদান করা হয় না। শ্রমিকগণের মজুরি দেওয়া হয়, তাহারা যে সম্পদ উৎপাদন করে উহার বিক্রয় দাম হইতে। শ্রমিকগণের উৎপাদনশীলতার দরুনই যে তাহারা মজুরি পাইয়া থাকে, ইহা এই তত্ত্বে অস্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে যে, মুনাফা হ্রাস পাইলেই মালিকগণ উৎপাদন হইতে পুঁজি তুলিয়া লয়। ইহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। ভবিষ্যতে মুনাফা বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিলে বিনিয়োগকারিগণ বর্তমানে লোকসান দিয়াও উৎপাদন চালাইয়া যায়। তৃতীয়ত, এই তত্ত্বটি বিভিন্ন পেশায় ও বিভিন্ন দেশে মজুরি-হারের পার্থক্য কেন ঘটে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করে নাই। চতুর্থত, বাস্তবতার দিক হইতেও এই তত্ত্বটি গ্রহণ করা যায় না। অনেক সময় দেখা যায় যে, নূতন দেশে, যেখানে পুঁজির পরিমাণ কম, সেখানে মজুরির হার বেশি। আবার, পুরাতন দেশে, যেখানে পুঁজির পরিমাণ বেশি, সেখানে মজুরির হার কম। এই সকল ত্রুটির জন্য তত্ত্বটির প্রবর্তক জে. এস. মিল নিজেই শেষ পর্যন্ত তত্ত্বটিকে বাতিল করিয়াছেন।

জীবনযাত্রার মানের তত্ত্ব
(The Standard of Living Theory)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একদল অর্থনীতিবিদ্ ন্যূনতম ভরণ-পোষণের তত্ত্বটি পরিমার্জিত করিয়া জীবনযাত্রার মানের তত্ত্ব হিসাবে মজুরি নির্ধারণের আর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁহাদের মতে, মজুরি

শ্রমিকগণের ন্যূনতম ভরণ-পোষণের স্তরের সমান হইলেই যথেষ্ট নহে। শ্রমিকগণ যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত উহা বজায় রাখিতে যে পারিশ্রমিক প্রয়োজন তাহাদের মজুরির হার উহার সমান হইবে। মজুরির হার যদি শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে যে পারিশ্রমিক প্রয়োজন উহা হইতে কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিকগণ বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি উৎপাদনে অনিচ্ছুক হইবে। ফলে, জনসংখ্যা ও শ্রমের যোগান হ্রাস পাইবে। ইহাতে মজুরির হার বাড়িবে। অন্যদিকে মজুরির হার জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা বেশি হইলে শ্রমিকগণ বাল্যকালেই বিবাহ করিবে এবং সন্তান-সন্ততি সংখ্যা সীমিত রাখিতে যত্নবান হইবে না। ফলে, শ্রমের যোগান বাড়িয়া মজুরির হাব কমাইয়া দিবে। সুতবাং, মজুরির হার জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা বেশি বা কম হইতে পারে না।

সমালোচনা

কিন্তু জীবনযাত্রার মানের তত্ত্বটি আংশিক সত্য। শ্রমিকগণকে তাহাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী আবশ্যকীয় পারিশ্রমিকের কম মজুরি দেওয়া হইলে তাহারা স্বভাবতই আন্দোলনের মাধ্যমে বাধা প্রদান করিবে। শ্রমিকগণ একবার যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত হইয়া গিযাছে উহা বজায় রাখিতে সর্বদা যত্নবান থাকিবে। অর্থাৎ মজুরির হার শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভবশীল। আবার, অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে মজুরির হারও শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানকে নির্ধারণ করে। উচ্চ মজুরি পাইলে শ্রমিকগণেব জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। সুতরাং জীবনযাত্রার মান ও মজুরি-হারের সম্পর্ক পারস্পরিক।

এই তত্ত্বটির প্রধান গলদ এই যে, ইহা শুধু শ্রমের যোগান-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহাই ব্যাখ্যা করে। শ্রমের চাহিদা-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়, তাহার সন্ধান এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। অনেক সমালোচক এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বাস্তবত মানুষের জীবনযাত্রার নির্দিষ্ট কোন মান নাই। আবার এই তত্ত্ব অনুযায়ী যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, মজুরির হার শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের সমান হইবে, তাহা হইলে স্বভাবতই জীবনযাত্রার মানের যখন-তখন পরিবর্তন হওয়া উচিত নহে। কিন্তু শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান বেশ কিছু সময় ধরিয়া স্থির থাকিলেও মজুরির হার বাস্তবত

হামেশাই হ্রাস-বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পরিশেষে, জীবনযাত্রার মান মজুরি-হারের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মজুরি-হার প্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত হয় শ্রমের চাহিদা ও যোগান দ্বারা। শ্রমের চাহিদা ও যোগানের উপর জীবনযাত্রার মান সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। জীবনযাত্রার মান শ্রমের চাহিদা ও যোগানকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করিয়া মজুরির হার নির্ধারণে সহায়তা করিয়া থাকে।

সুতরাং জীবনযাত্রার মানের তত্ত্বটিকে মজুরি নির্ধারণের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব
(Marginal Productivity Theory of Wages)

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে, মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দামের সমান। মজুরির এই তত্ত্বটি বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বেরই প্রয়োগ বিশেষ। এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত :

এই তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী

(১) উৎপন্ন দ্রব্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান, (২) শ্রমের যোগান বাজারে নির্দিষ্ট ; (৩) উৎপাদনের উপাদানগুলির অবাধ সচলতা আছে ; (৪) উপাদানগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা চলে ; (৫) প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন এককগুলি সমান দক্ষতাসম্পন্ন ; (৬) অন্যান্য উপাদানগুলির নিয়োগের পরিমাণ স্থির রাখিয়া শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ ক্ষুদ্র মাত্রায় বৃদ্ধি করা চলে ; (৭) অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রাখিয়া যতই শ্রমের নিয়োগ ক্ষুদ্র মাত্রায় বাড়াইয়া যাওয়া যায় নিয়োগের একটি স্তর হইতে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ন বিধিটি ততই কার্যকর হইবে ; (৮) উৎপাদনের সকল উপাদানগুলি পূর্ণ নিয়োগের স্তরে আছে।

উপরি-উক্ত অনুমিত শর্তগুলি বজায় থাকিলে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং মজুরি-হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দামের সমান হইবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতাসম্পন্ন উপাদানের

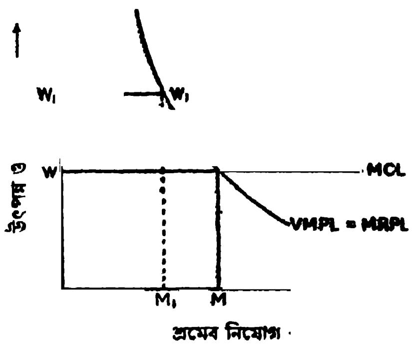
বাজারে শ্রমের অসংখ্য ক্রেতা বর্তমান। বাজারে শ্রমের চলিত দামেই সকল ক্রেতাকে শ্রম ক্রয় করিতে হয়। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যে কোন পরিমাণ শ্রম ক্রয় করুক না কেন, উহাকে বাজারে চল্‌তি-মজুরির হারেই কিনিতে হইবে। অর্থাৎ বাজারে শ্রমের দাম অথবা মজুরির হার অথবা শ্রমের যোগান একটি সমান্তরাল রেখা দ্বারা নির্দেশ করা যায়। আবার, এই একই সমান্তরাল রেখা দ্বারা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়ও নির্দেশ করা যায়। ইহার কারণ এই যে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিটি অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগের দরুন বাজারে চল্‌তি-মজুরির হারই দিতে হয়। সুতরাং, নিখুঁত বাজারে শ্রমের দাম বা মজুরি-হার এবং শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান।

শ্রমের নির্দিষ্ট প্রান্তিক ব্যয়ে, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কতটা পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে তাহা নির্ভর করে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দামের উপর। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রাখিয়া প্রতিষ্ঠান যদি শ্রমিকের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করে তাহা হইলে যে অতিরিক্ত বস্তুগত দ্রব্য উৎপন্ন (Marginal physical product অথবা সংক্ষেপে MPP) হইবে উহাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন বলা হয়। শ্রমের এই প্রান্তিক উৎপন্নকে একক প্রতি বাজারের দাম দিয়া গুণ করিলেই শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম (Value of the marginal physical product of labour অথবা সংক্ষেপে VMPL) পাওয়া যায়।

আবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন অন্যান্য অপরিবর্তিত উপাদানের সহিত শ্রমিকের একটি অতিরিক্ত একক নিয়োগ করে তখন অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়িয়া থাকে। এইভাবে উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবার দরুন প্রতিষ্ঠানের মোট আয় যেটুকু পরিমাণ বাড়িবে তাহাই উহার প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue)। শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্য উৎপন্নকে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় দ্বারা গুণ করিলেই শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (Marginal revenue product of labour অথবা, সংক্ষেপে MRPL) পাওয়া যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম (VMPL) এবং শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRPL) পরস্পর সমান হইয়া থাকে। আবার, উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ যতই শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া যাইবে (এবং অন্যান্য

উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিবে) ততই শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন দুই-ই কমিতে থাকিবে। উৎপাদনে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপন্ন (Diminishing Marginal Productivity) বিধি কার্যকর হওয়ার দরুন শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের দাম-রেখা এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্ন-রেখা দক্ষিণে ঢালসম্পন্ন ও নিম্নগামী হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য এমন সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যাহাতে উহা ভারসাম্যে পৌঁছাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান সেইসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা ভারসাম্যে পৌঁছাইবে যে-সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইলে বাজারে চল্‌তি-মজুরি হার, শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান হয়। যদি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ঐ সংখ্যা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে মজুরি-হারের চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কম হইবে। আবার, শ্রমিকের সংখ্যা যদি ভারসাম্যের সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয় তাহা হইলে মজুরি-হারের চেয়ে শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বেশি হইবে। কিভাবে নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রয়োগ দ্বারা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগে ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা দেখানো হইল :



চিত্রে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন OM পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে, তখন মজুরির হার MW (=OW) শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দাম ও শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সহিত পরস্পর সমান হইয়াছে। সুতরাং, OM হইল প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নিয়োগের ভারসাম্যের পরিমাণ এবং MW হইল ভারসাম্য মজুরির হার। যদি মজুরির হার বাড়িয়া M_1W_1 ($=OW_1$) হয়, তাহা হইলে শ্রমের নিয়োগ ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষা কমিয়া OM_1 পরিমাণ হইবে। আবার, মজুরির হার

যদি MW (=OW) অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে শ্রমের নিয়োগ ভারসাম্য নিয়োগের পরিমাণ OM অপেক্ষা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিক নিয়োগকারী কোন প্রতিষ্ঠানের মজুরি-হার (Wage Rate)=শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপন্নের আর্থিক মূল্য (Value of the marginal physical product of labour)= শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (Marginal revenue product of labour) (W=VMLP=MRPL)।

মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটির বিরুদ্ধে একাধিক সমালোচনা করা হইয়াছে। এই তত্ত্বের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য :

সমালোচনা

(১) এই তত্ত্বের অনুমিত শর্তগুলি অবাস্তব। পণ্য ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন উপাদানগুলিব পূর্ণ নিয়োগ, এক পেশা হইতে অন্য পেশায় শ্রমের অবাধ সচলতা, শ্রমের বিভিন্ন এককের সমদক্ষতা, শ্রম ব্যতীত অপরাপর উপাদানগুলির অপরিবর্তনীয়তা প্রভৃতি শর্ত অনুমান করা একমাত্র স্থিতিশীল অর্থ-ব্যবস্থাতেই সম্ভব। গতিশীল বাস্তব জগতে শর্তগুলি অনুমান করা যায় না।

(২) এই তত্ত্বে শ্রমের চাহিদার দিকটা উহার উৎপাদনশীলতা দ্বারা আংশিকভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রমের যোগান সম্পর্কে কোন আলোচনাই করা হয় নাই। মরিস ডব (Dobb) মন্তব্য করিয়াছেন যে, শ্রমিকের চাহিদা শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে না। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অতীতে কতটা লাভ করিয়াছে, বর্তমানে উহা কতটা সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক প্রভৃতি বিষয়ও শ্রমিকের চাহিদা নির্ধারণ করিয়া থাকে। কোন একটি উপাদানের উৎপাদনশীলতা বিচ্ছিন্নভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন উপাদান সম্মিলিতভাবে পণ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন সংযুক্ত উৎপন্ন পণ্য হইতে শ্রম বা কোন একটি উপাদানের উৎপাদন-শীলতা পৃথক করা সম্ভব নহে। ফলে, শ্রম বা অন্যান্য উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করাও সহজ নহে।

(৩) টাউসিগের (Taussig) মতে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্যের সমান হয় না; ইহা শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের বাট্টাকৃত অংশের (Discounted marginal product) সমান হয়। শ্রমিকের মজুরি পণ্য

বিক্রয়ের আগেই দেওয়া হয়। শ্রমিককে অগ্রিম পারিশ্রমিক দেওয়ার সময় তাহাকে প্রান্তিক উৎপন্নের আর্থিক দামের সমান মজুরি না দিয়া উহা হইতে সুদ বাবদ কিছু কাটিয়া রাখিয়া বাকি অর্থ দেওয়া হয়। সুদ কাটিয়া রাখিয়া যে অর্থ পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিককে দেওয়া হয় উহাই তাহার শ্রমের প্রান্তিক উৎপন্নের বাট্টাকৃত অংশ।

(৪) এই তত্ত্বের একটি অনুমিত শর্ত এই যে, নিয়োগকর্তা অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া ক্রমাগত শ্রম নিয়োগের পরিমাণ বাড়াইয়া যাইতে পারে। এই শর্তটিও সর্বৈব সত্য নহে। বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ও নিয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের সাম্প্রতিক কারিগরি অবস্থার উপর, নিয়োগকর্তার খুশির উপর নহে।

মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব
(Demand and Supply Theory of Wages)

অনেক অর্থনীতিবিদ্ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের বিকল্প তত্ত্ব হিসাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে শ্রমের যোগানের বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা করা হয় নাই। সেই ত্রুটি চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বদ্বারা দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এক হিসাবে মজুরির চাহিদা ও যোগান তত্ত্বকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বেরই পরিমার্জিত সংস্করণ বলা চলে। মজুরি শ্রমের দাম। পণ্যের দাম যেমন উহার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইরূপ শ্রমের দাম মজুরিও এক একটি পেশায় নিযুক্ত এক একটি শ্রমিকশ্রেণীর চাহিদা ও যোগানের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে মজুরি-হারের বিশ্লেষণ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতা, উভয় বাজারের ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা যায়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণ
(Wage Determination under Perfect Competition)

আমরা জানি, নিখুঁত বাজারে পণ্যের দাম দীর্ঘকালীন সময়ে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। ঠিক সেই রকম শ্রমের দামও নিখুঁত প্রতিযোগিতার

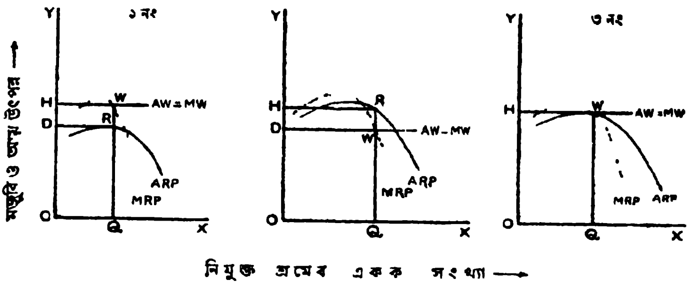
বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে শ্রমের গড আয় উৎপন্ন (ARP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্নের (MRP) সমান হয়। কোন উৎপাদক ফার্মের নিকট শ্রমের গড় আয় উৎপন্ন নির্ণয় করিতে হইলে মোট আয়কে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হয়। আর, প্রান্তিক আয় উৎপন্ন নির্ণয় করিতে হইলে শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত দ্রব্য উৎপন্নকে পণ্যের বাজার-দাম দ্বারা গুণ করিতে হয়। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে অথবা লোকসান নিম্নতম রাখিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকের অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের সেই স্তর অবধি যাইবে যে স্তরে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় (অথবা প্রান্তিক মজুরি) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) পরস্পর সমান হয়। যদি ঐ স্তর ছাড়াইয়া আরও অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় (অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরি) শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে। আবার, প্রতিষ্ঠান যদি ঐ স্তরে পৌঁছাইবার পূর্বেই শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি বন্ধ করিযা দেয়, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় (অথবা প্রান্তিক মজুরি) অপেক্ষা কম হইবে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাইতে গেলে সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় এবং শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান (MW = MRP) হয়। ভারসাম্যের এই শর্তটি স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় সময়েই খাটে। কিন্তু এই অবস্থায় শ্রমের গড ব্যয়ের (AW) অর্থাৎ মজুরির এবং গড় আয় উৎপন্নের (ARP) মধ্যে কি সম্পর্ক দেখা যায়? মজুরি (শ্রমের গড আয়) এবং শ্রমের গড আয় উৎপন্নের মধ্যে তিন প্রকার সম্পর্ক দেখা দিতে পারে :

(ক) মজুরির হার শ্রমের গড আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হইতে পারে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রম নিয়োগ দ্বারা লোকসান হইবে।

(খ) মজুরির হার শ্রমের গড় আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইতে পারে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান শ্রম নিয়োগ দ্বারা মুনাফা লাভ করিতে পারিবে।

(গ) মজুরির হার শ্রমের গড় আয় উৎপন্নের সমান হইতে পারে। সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের লাভ বা লোকসান কিছুই হইবে না।

মজুরির হার ও শ্রমের গড় আয় উৎপন্নের মধ্যে উপরি-উক্ত সম্ভাব্য তিনটি সম্পর্ক নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :



উপরের ১নং চিত্রে মজুরি হার WQ শ্রমের গড আয় উৎপন্ন RQ অপেক্ষা বেশি। সেইজন্য নিয়োগকারী ফার্মটি OQ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিলে লোকসানগ্রস্ত হইবে। ২নং চিত্রে মজুরির হার WQ শ্রমের গড আয় উৎপন্ন RQ অপেক্ষা কম বলিয়া প্রতিষ্ঠান OQ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা মুনাফা লাভ করিবে। কিন্তু ৩নং চিত্রে মজুরির হার এবং গড আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান বলিয়া প্রতিষ্ঠান লাভ-লোকসান কিছুই করিবে না—ইহা স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে।

স্বল্পকালীন সময়ে উপরে আলোচিত তিনটি সম্পর্কই দেখা দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে তৃতীয় সম্পর্কটি মাত্র কার্যকর হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের গড আয় উৎপন্ন ও মজুরির হার সমান হয়। অতএব নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের এবং গড় আয় উৎপন্নের সমান হয় (W = MRP = ARP)। আবার, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় ও শ্রমের গড ব্যয়ের সহিত পরস্পর সমান (W = MW = AW) বলিয়া নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য অবস্থায় W = MW = AW = MRP = ARP।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণ
(Wage Determination under Imperfect Competition)

বাস্তব শ্রমের বাজার বলিতে অনিখুঁত বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বুঝাইয়া থাকে। কোন কোন শ্রমের বাজার আছে যেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা তাহার উন্নততর দর কষাকষির দ্বারা মজুরি নির্ধারণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার

করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রমের বাজারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানটি একমাত্র নিয়োগকর্তা (Monopsony in the labour market)। আবার, বেশির ভাগ শ্রমের বাজারে শ্রমিক-সংঘ শ্রমের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক-সংঘের যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারিত হইয়া থাকে।

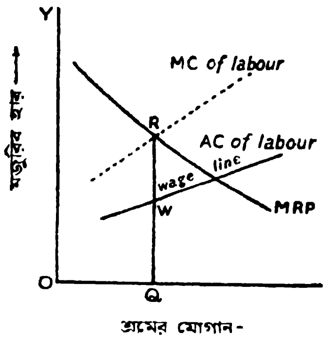
যদি অনিখুঁত শ্রমের বাজারে মাত্র একজন নিয়োগকর্তা বর্তমান থাকে এবং শ্রমের সচলতা একদম না থাকে, তাহা হইলে মজুরির হার খুব নিচু হইবে। মজুরির হার এতটা ন্যূনতম হইবে যে শ্রমিকগণ অনাহারে না থাকিয়া এই মজুরিতেই নিয়োগ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শ্রমের বাজারে একাধিক নিয়োগকর্তা থাকে তাহা হইলে মজুরি নির্ধারণে নিয়োগ-কর্তার প্রভাব ও ক্ষমতা নির্ভর করিবে অংশত নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে কতটা প্রতিযোগিতা বর্তমান আছে তাহার উপর এবং অংশত শ্রমিকগণের মধ্যে সচলতা কতটা বর্তমান তাহার উপর। শ্রমের সচলতা যত বেশি হইবে, শ্রমের যোগান তত বেশি স্থিতিস্থাপক হইবে এবং নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরি-হার নিখুঁত প্রতিযোগিতায় নির্ধারিত মজুরি-হারের প্রায় সমান হইবে।

যেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক-সংঘের যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরি নির্ধারিত হয় সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা মজুরি-হার যতটা সম্ভব কম নির্ধারণের চেষ্টা করে। আবার, শ্রমিক-সংঘও মজুরি-হার যতটা সম্ভব বাড়াইতে চেষ্টা করে। মজুরি-হার সাধারণত নিচু স্তরেই নির্ধারিত হইয়া থাকে, যদি নিয়োগকর্তা প্রচুর আর্থিক পুঁজির অধিকারী হন এবং তিনি শ্রমিক ধর্মঘটের ভয়ে ব্যবসায়ের সুনাম নষ্ট করিতে ও সাময়িক লোকসান দিতে রাজী থাকে না। আবার, শ্রমিক-সংঘ যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং উহা সাফল্যের সহিত ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে পারিবে বলিয়া নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে মজুরির হার অবশ্যই বেশি হইবে।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে শ্রমের শোষণ

অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইবে। ফলে, এইপ্রকার বাজারে শ্রমের শোষণ (Exploitation of Labour) অবধারিত। কেন এইরূপ ক্ষেত্রে মজুরি-হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হয়?

আমরা জানি যে, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কোন নিয়োগকর্তার নিকট শ্রমের যোগান-রেখা সমান্তরাল। ফলে, তাহার নিকট শ্রমের প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয় সমান হয়। নিয়োগকর্তা শ্রমের অতিরিক্ত একক একই মজুরি দিয়া নিয়োগ করিতে পারে। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতায় নিয়োগকর্তার নিকট শ্রমের যোগান-রেখা দক্ষিণে ও উপরের দিকে ধনাত্মক। অর্থাৎ তাহাকে শ্রমের অতিরিক্ত একক নিয়োগ করিতে হইলে ক্রমাগত বেশি মজুরি প্রদান করিতে হইবে। শ্রমের এই উর্ধ্বমুখী যোগান-রেখাকেই গড় মজুরি-রেখা (Average Wage Curve) কিংবা শ্রমের গড় ব্যয় বলা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক মজুরি-রেখাও (Marginal Wage Curve) উপরের দিকে আরও বেশি সোজাসুজি উঠিয়া শ্রমের গড় মজুরি-রেখার উপরে অবস্থান করে। শ্রমের চাহিদা-রেখা উহার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই রেখাটি বামদিক হইতে দক্ষিণে ঢালসম্পন্ন হইবে। কেন না, নিয়োগকর্তা মজুরি-হার ক্রমাগত কমাইয়া অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবে। নিয়োগকর্তা শ্রম নিয়োগের দ্বারা ভারসাম্য তখনই লাভ করিবে যখন শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং প্রান্তিক মজুরি (অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়) পরস্পর সমান হয়। নিচে রেখাচিত্রেব সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝানো যায় :



চিত্রে দেখানো হইয়াছে যে, নিয়োগকর্তার R বিন্দুতে ভারসাম্য প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, R বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও প্রান্তিক মজুবি (অথবা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়) পরস্পর সমান হইয়াছে। নিয়োগকর্তা এই অবস্থায় OQ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করিবে। নিয়োগকর্তার পক্ষে OQ সংখ্যক শ্রমিকের বেশি নিযুক্ত করা লাভজনক নহে, কেন না, OQ সংখ্যার অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কমিতে থাকিবে এবং প্রান্তিক মজুরি (অথবা শ্রমের প্রান্তিক ব্যয়) বাড়িতে থাকিবে এবং উভয়ে পরস্পর সমান হইবে না।

কিন্তু ভারসাম্য অবস্থায় OQ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হইলে দেখা যায় যে, শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন RQ মজুরি-হার QW অপেক্ষা RW পরিমাণ বেশি হইয়াছে। শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ও মজুরির মধ্যে এই পার্থক্যটুকুই (RW পরিমাণ) নিয়োগকর্তা নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে। ইহাই আবার শ্রমের শোষণ।

শ্রমিক-সংঘ মজুরি কতটা বাড়াইতে পারে ?

(How far can Trade Unions raise Wages)

শ্রমিক-সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইল শ্রমিকগণের মজুরি বৃদ্ধি করা। সংঘ নিয়োগকর্তার সহিত দাম কষাকষির মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া থাকে। একটি অভিমত এই যে, শ্রমিক-সংঘের এই মজুরি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যত সাফল্য লাভ করে না। কেন না, মজুরি বৃদ্ধি করিতে হইলেই মুনাফার অঙ্ক হ্রাস করিতে হয়। মুনাফা হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দিলেই বিনিয়োগ কমিয়া যাইবে এবং শ্রমিক-নিয়োগও হ্রাস পাইবে। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া মজুরি কমাইতে হয়। আর একটি অভিমত এই যে, মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং ফলে শ্রমিক-সংঘ চেষ্টা করিয়াও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা মজুরির হার বেশি বাড়াইতে পারে না। এই ধারণা দুইটি কতটা সত্য তাহা নিচে আলোচনা করা হইল।

শ্রমিক-সংঘ অবস্থা বিশেষে মজুরি বাড়াইতে পারে। প্রথমত, অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে নিয়োগকর্তাগণ স্বভাবতই অধিকতর ক্ষমতাশালী এবং শ্রমিকগণকে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে কম মজুরিতে নিয়োগ করিয়া থাকে। যেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাগণ যথেষ্ট পুঁজির মালিক কিংবা শ্রমিক-সংঘ অত্যন্ত দুর্বল কিংবা শ্রমিকগণের নিকট কোন পরিবর্তক পেশা বা কাজ সহজলভ্য নহে, সেক্ষেত্রে মজুরির হার ন্যূনতম জীবন-ধারণের স্তরের চেয়েও কম নির্ধারিত হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়াই শ্রমিকগণকে উপবাসের পরিবর্তে অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ করিতে হয়। এই অবস্থায় শ্রমিক-সংঘ শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে সংগ্রাম চালাইয়া মজুরি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতে পারে। অবশ্য সংঘের চাপে মজুরি বাড়াইলে মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কিন্তু তাহা বলিয়া বিনিয়োগ সঙ্কুচিত হইবে কিংবা

নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পোৎপাদনে অগ্রসর হইবে না, ইহা সত্য নহে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের শোষণ হ্রাস পাইবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে শ্রমিকের শোষণ বর্তমান, সেক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মজুরি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে।

মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান—ইহাও কার্যত সত্য নহে। শুধু শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেই এই ধারণাটি খাটে। কিন্তু বাস্তবত শ্রমের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। বাস্তব শ্রমের বাজারে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। শ্রমিক-সংঘের পক্ষে দাম কষাকষি করিয়া মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার স্তর পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব।

আবার, শ্রমিক-সংঘ শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়াও মজুরি বাড়াইতে সহায়তা করিতে পারে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা শ্রমিকের যোগ্যতা, কারিগরি শিক্ষা, কর্মে উৎসাহ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। শ্রমিক কিরূপ যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা কাজ করে, কারখানায় কিরূপ পরিবেশের মধ্যে কাজ করে প্রভৃতিও তাহাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে। শ্রমিক-সংঘ মালিকগণের উপর চাপ দিয়া উন্নত আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা ব্যবহারের প্রচলন করিতে পারে, কারখানার পরিবেশের উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং শ্রমিকগণকে তাহাদের কারিগরি কুশলতা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতে পারে। এইভাবে শ্রমিকগণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া শ্রমিক-সংঘ মজুরি বাড়াইতে সক্ষম হয়।

কতকগুলি অবস্থা বর্তমান থাকিলে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মজুরি বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। এই অবস্থাগুলি হইল:

কোন্ কোন্ অবস্থায় শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টা মজুরি বৃদ্ধি করিতে ফলপ্রদ হইতে পারে?

(১) যে পণ্য উৎপাদনে শ্রমিক-গোষ্ঠী নিযুক্ত আছে উহার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। পণ্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের চাপে মজুরি বৃদ্ধি ও পণ্যের দাম বৃদ্ধি ঘটিলেও উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে না।

(২) নিয়োগকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গোষ্ঠীর চাহিদাও অস্থিতিস্থাপক হওয়া চাই। শ্রমিকের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে ঐ শ্রমের নিয়োগ ছাড়া পণ্য উৎপাদন

সম্ভবপর নয়। শ্রমিককে তখন বেশি মজুরি দিয়াই উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করিতে হয়।

(৩) সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গোষ্ঠীকে নিয়োগকর্তা মজুরি হিসাবে যাহা দিয়া থাকে উহা মোট মজুরির খাতে তাহাকে যাহা ব্যয় করিতে হয় তাহার অতি সামান্য অংশ হওয়া চাই। তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘ চাপ দিয়া অধিক মজুরি আদায় করিলেও নিয়োগকর্তার পক্ষে ইহা বেশি ভারী মনে হইবে না।

(৪) নিয়োগকর্তার পক্ষে অন্যান্য উপাদানকে অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে বাধ্য করানো চাই। নিয়োগকর্তা যদি অন্যান্য উপাদানকে কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে রাজী করাইতে পারে তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের প্রচেষ্টায় মজুরি বৃদ্ধি ফলপ্রসূ হইতে পারে।

শ্রমিক-সংঘের দর কষাকষি দ্বারা মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা

(Limits to the bargaining power of Trade Unions in raising wages)

শ্রমিক-সংঘ মালিকগণের সহিত দর কষাকষি করিয়া মজুরির হার বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিক-সংঘের এই প্রচেষ্টার সাফল্যের পথে তিনটি বাধা আছে :

(১) যদি নিয়োগকর্তার দিক হইতে শ্রমিকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ নিয়োগকারী শ্রমিকের বদলে অন্য কোন পরিবর্তক উপাদান নিযুক্ত করেন তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের পক্ষে দর কষাকষির দ্বারা মজুরির হার বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না। নিয়োগকারী শ্রমের পরিবর্তে যদি শ্রম-সাশ্রয়কারী (labour-saving) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, কিংবা অপর কোন সস্তা শ্রম নিয়োগ করেন, তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘ উচ্চ মজুরি দাবি করিলে কোনই ফল হইবে না। সুতরাং, শ্রমিক-সংঘের দ্বারা মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর একটি বড় বাধা হইল শ্রমের পরিবর্তকের স্থিতিস্থাপকতা।

(২) শ্রমের বিকল্প বা পরিবর্তক উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও শ্রমিক-সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতাকে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে।

পরিবর্তক উপাদানগুলির যোগান যদি স্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ উহাদের যদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সংঘ উচ্চ মজুরি দাবি করিলেও নিয়োগকারী উহা মানিয়া লইবে না। তিনি তখন শ্রমের বদলে অন্যান্য পরিবর্তক উপাদান সহজেই নিয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। সাধারণত তেজীবাজারে কিংবা যুদ্ধের সময়, যখন পুঁজি ও মূলধন সহজলভ্য নহে তখন নিয়োগকর্তাকে বাধ্য হইয়া উচ্চ মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু মন্দার বাজারে যখন মূলধন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শ্রমের পরিবর্তক উপাদানগুলি সহজেই সংগ্রহ করা যায়, তখন শ্রমিক-সংঘ উচ্চ-মজুরি দাবি করিলে নিয়োগকর্তা উহা মানিয়া লইতে নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবেন।

(৩) শ্রমিক-সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার আর একটি প্রতিবন্ধক হইল উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। যদি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা খুব স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে শ্রমিক-সংঘের চাপে মজুরি ও উৎপাদন ব্যয় বাড়িলে দ্রব্যটির চাহিদা অনেক হ্রাস পাইবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধির দাবি কখনই ফলপ্রসূ হইবে না। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যটির চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধির ফলে দাম বাড়িলেও উহার চাহিদা কমিবার সম্ভাবনা থাকে না। এক্ষেত্রে শ্রমিক-সংঘের মজুরি বাড়াইবার প্রচেষ্টার সাফল্যের আশা খুবই বেশি।

মজুরির সাধারণ স্তর
(The General Level of Wages)

মজুরির সাধারণ স্তর বলিতে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকের বিভিন্ন মজুরির হারের গড়কে বুঝাইয়া থাকে। এই গড় পৃথকভাবে আর্থিক মজুরির বেলায় নির্ণয় করা যায়, আবার প্রকৃত মজুরির বেলাতেও নির্ণয় করা যায়। যখন বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকগণের বিভিন্ন আর্থিক মজুরির গড় নির্ণয় করা হয় তখন উহাকে আর্থিক মজুরির সাধারণ স্তর বলা হয়। আবার, বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরির গড় নির্ণয় করিয়া প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর বলা যায়।

মজুরির সাধারণ স্তর নির্ধারণে অর্থনীতিবিদ্‌গণ প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তরের ধারণাটির উপরই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার

কারণ এই যে, প্রকৃত মজুরিই শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান নির্দেশক। কোন একটি দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির সাধারণ স্তর নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে :

(১) শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা (Productivity of labour) : পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়। কিন্তু অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির হার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের কম হয়। অবশ্য শ্রমিক-সংঘ দাম কষাকষি দ্বারা মজুরির হার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার স্তর পর্যন্ত বাড়াইতে চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই মজুরির হার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার বেশি হইতে পারে না।

(২) বহির্বাণিজ্যের শর্তাবলী (Terms of Trade) : দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্তাবলীর উপরও মজুরির স্তর নির্ভর করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শর্ত বলিতে দেশের আমদানির সহিত রপ্তানির বিনিময় হারকে বুঝাইয়া থাকে। এই হার অনুকূল হইতে পারে, আবার প্রতিকূলও হইতে পারে। বহির্বাণিজ্যের শর্ত যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে দেশ কম দ্রব্য রপ্তানি করিয়া বেশি আয় উপার্জন করিতে পারে। ইহাতে দেশের মোট প্রকৃত আয় বাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণেব প্রকৃত মজুরিও বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবার, বাণিজ্যের শর্ত প্রতিকূল হইলে দেশের মোট প্রকৃত আয় হ্রাস পাইয়া উহার সহিত শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরি কমিতে পারে।

(৩) সামাজিক ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়গুলির প্রভাব (Influence of social and institutional factors) : দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সরকারের শ্রমনীতি ও শ্রমিক-কল্যাণকর বিবিধ আইন-কানুন, নিয়োগকর্তাগণের জোটবদ্ধতা, শ্রমিক-সংঘের শক্তি প্রভৃতি বিষয় শ্রমিকগণের প্রকৃত মজুরির স্তর বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। যদি দেশের শ্রমিক-সংঘ খুব শক্তিশালী হয় এবং সরকার শ্রমিকের স্বার্থে শ্রম-নীতি ধার্য ও মঙ্গলবিধায়ক আইন পাশ করেন, তাহা হইলে প্রকৃত মজুরির স্তর বাড়িবে। দেশের সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যদি একচেটিয়া ক্ষমতার খুব বেশি উদ্ভব না হয় এবং তাহার ফলে আয়-বণ্টনে বৈষম্য বেশি না দেখা দেয়, তাহা হইলে জাতীয় আয়ে শ্রমিকগণের অংশ স্বভাবতই বাড়িবে। ফলে, প্রকৃত মজুরির স্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

বেশি মজুরি দেওয়ার ফলে ব্যয়-সংক্ষেপ
(Economy of High Wages)

সাধারণের ধারণা এই যে, শ্রমিককে যত কম মজুরিতে নিয়োগ করা যায় মালিকের তত বেশি লাভ হয়। কিন্তু এই ধারণা বাস্তবত সত্য নহে। একাধিক কারণে দেখা যায় যে, শ্রমিককে বেশি মজুরি দিলে শেষ পর্যন্ত মালিকের লোকসান না হইয়া লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে। উচ্চ মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিলে মালিকের নিম্নলিখিত কারণে ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটিয়া থাকে :

(১) মজুরির হার বাড়াইলে মালিক অপেক্ষাকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ও কর্মনিপুণ শ্রমিক আকৃষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে তাহার উৎপাদন বাড়িবে এবং উৎপাদন ব্যয় সঙ্কুচিত হইবে।

(২) বেশি মজুরি দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের মনে অসন্তোষের ভাব তেমন তীব্র হইতে পারে না। ফলে, শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতির সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া যায় এবং উৎপাদন হ্রাসের আকাঙ্খাও অনেকটা হ্রাস পায়। উৎপাদনের পরিমাণ না কমিলে, ব্যয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

(৩) বেশি মজুরি দিলে শ্রমিক সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে। সহজে এক কাজ ছাড়িয়া দিয়া অন্য কাজ গ্রহণ করে না। শ্রমিক এক কাজে দীর্ঘদিন লাগিয়া থাকিলে অধিক কর্মনিপুণ হয়। এইভাবে শ্রমিকের কর্মনিপুণতা বা উৎপাদনশীলতা বাড়িলে মালিকের ব্যয়-সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

(৪) মজুরি বেশি পাইলে শ্রমিক যত্ন সহকারে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করে। ফলে, প্রতিষ্ঠানের অপচয় ব্যয় (depreciation charges) কম হয়। ইহাতেও বেশি মজুরি প্রদানের ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিয়া থাকে।

(৫) বেশি মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকগণের আয় বাড়ে ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। উহার ফলে তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িলে মালিকের উৎপাদনও বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের গড় ব্যয় হ্রাস পাইবে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত মালিকের লাভ হইবে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও মজুরি
(Inventions and Wages)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মজুরির উপর বিভিন্ন প্রকার প্রভাব দেখা দিতে পারে।

সাধারণভাবে বলা হয় যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনে কোন নূতন যন্ত্রের ব্যবহার করা হইলে, অনেক শ্রমিককে কাজ হইতে ছাঁটাই করা হয়। ইহাতে শ্রমিকের বেকার সমস্যা বাড়িয়া যায়। বেকার সমস্যা বাড়িলে শ্রমের যোগান বাড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে মজুরির হারও কমিয়া যায়। কিন্তু এই ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মজুরির হার কোন অবস্থায় কমে, আবার কোন অবস্থায় বাড়িতে পারে তাহা নির্ভর করে কি ধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে এবং কি ধরনের যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার উপর।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতিগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি যন্ত্রপাতি হইল শ্রম সঞ্চয়কারী (labour-saving), আবার কতকগুলি হইল মূলধন সঞ্চয়কারী (capital-saving)। যে আবিষ্কারগুলি প্রচলনের ফলে শ্রমিক-পিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ বাড়িয়া যায় উহাদের শ্রম-সঞ্চয়কারী আবিষ্কার বলা হয়। আবার, যে আবিষ্কারগুলি প্রচলনের ফলে শ্রমিক-পিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যায় উহাদের মূলধন সঞ্চয়কারী আবিষ্কার বলা হয়।

আবিষ্কারের ফলে যদি উৎপাদনে শ্রম সঞ্চয়কারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়িয়া যায় তাহা হইলে সাময়িকভাবে শ্রমিকের কাজের সুযোগ কমিয়া যাইতে পারে এবং উহার ফলে মজুরিও হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু সাময়িক ভাবে এইরূপ কোন বিশেষ শিল্পে কোন বিশেষ পেশাভুক্ত শ্রমিকের চাহিদা ও মজুরি কমিলেও দীর্ঘকালীন সময়ে যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলনের প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে। যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে নূতন নূতন শিল্প কারখানার সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন কিছু শ্রমিকের জন্য চাহিদা বৃদ্ধি হইবে। আবার, যন্ত্রপাতি প্রচলনের ফলে অনেক শ্রমিকের যান্ত্রিক কর্মকুশলতা বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহার ফলে এই সকল শ্রমিকের মজুরির হার বাড়িয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দেশে যখন

উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয় এবং তাহার ফলে শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয় তখন সাধারণ মজুরির হারও স্বভাবতই বাড়িয়া থাকে।

কিন্তু মূলধন-সঞ্চয়কারী আবিষ্কারের ফল অন্যরূপ হইবে। আবিষ্কারের ফলে শ্রমিক-পিছু যন্ত্রপাতির পরিমাণ যদি কম লাগে, তাহা হইলে মূলধনের চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং সুদের হারও কমিবে। ইহার ফলে জাতীয় আয়ের বেশি অংশ শ্রমিকের ভাগে আসিবে। ইহাতে শ্রমিকের মজুরি বাড়িবে। আবার আবিষ্কৃত অনেক যন্ত্রপাতি আছে যাহা ব্যবহারের ফলে কর্মদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমিয়া যায় (skill saving)। ফলে এইরূপ শ্রমিকের মজুরি হারও হ্রাস পায়।

২৫ সুদ
(Interest)

সুদের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
(Definition and Nature of Interest)

ঋণ ব্যবহারের দামকে সুদ বলে। যখন এক ব্যক্তি অপর একব্যক্তিকে ঋণ দেয়, কিছুকাল পরে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে শুধু ঋণের টাকাই ফিরিয়া পায় না। উহার সহিত আরও কিছুটা টাকা ঋণ ব্যবহারের দাম হিসাবে ফিরিয়া পায়। ঋণের টাকার উপর ঋণদাতা যে আয় ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে লাভ করে উহাকেই সুদ বলা হয়। সুদ সাধারণত বিনিয়োগকৃত টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা হারে হিসাব করা হয়।

কিন্তু অর্থবিদ্যায় ঋণ ব্যবহারের মোট দামকে প্রকৃত বা নীট (real or net) সুদ বলা হয় না। ঋণ ব্যবহারের দরুন যে মোট অর্থমূল্য আদায় করা হয় তাহাকে মোট সুদ (gross interest) বলে। প্রকৃত বা নীট সুদ বলিতে ঋণের প্রকৃত সেবার (pure service of loan) দামকে বুঝায়। কিন্তু সচরাচর ঋণদাতা যখন ঋণ ব্যবহারের দাম আদায় করে তখন উহার মধ্যে ঋণের প্রকৃত সেবার দাম তো ধরা হয়ই, উহার উপর আরও অতিরিক্ত কিছু অর্থ আদায় করা হয়। ঋণদাতা যখন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেয় তখন ঐ টাকা তাহার হাত ছাড়া হইয়া যায়, ঐ টাকা নিজে ব্যবহার করিতে পারে না। ঋণ দেওয়ার ঝুঁকিও যথেষ্ট আছে। ঋণের টাকা হয়তো ঋণগ্রহীতার হাতে অনেকদিন আটক থাকিতে পারে, হয়তো ঋণের টাকা পরিশোধের কোন সম্ভাবনাই না থাকিতে পারে, কিংবা ঋণ এমন সময়ে পরিশোধ হইতে পারে যখন মহাজনের পক্ষে নূতন বিনিয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব। ঋণের হিসাবপত্র রাখা এবং ঋণ তদারক করিবার জন্যও ঋণদাতাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। ঋণের জন্য তাহাকে এইরূপ অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং অর্থব্যয়ও করিতে হয়। ঋণদাতা সেইজন্য ঋণের

মোট সুদ ও নীট সুদ

নিছক ব্যবহারের দাম ছাড়া ঋণ দেওয়ার ঝুঁকি ও অন্যান্য অসুবিধা ভোগের বাবদ অতিরিক্ত অর্থমূল্য আদায় করে। সুতরাং মোট সুদের মধ্যে বহু উপাদান থাকে, নীট সুদ উহার অন্যতম উপাদান।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সুদ কেবল আর্থিক ঋণ ব্যবহারের দাম নহে, ইহা প্রকৃত পুঁজি (Real Capital) হইতে প্রাপ্ত আয়কেও বুঝাইয়া থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে আর্থিক ঋণের সুদের হার এবং পুঁজি দ্বারা উপার্জিত আয় পরস্পব সমান হইয়া থাকে। ঋণদাতা যখন অর্থ বিনিয়োগ করে তখন সে মিলাইয়া দেখে যে, সে আর্থিক ঋণ প্রদান করিষা কি সুদ পাইবে এবং টাকা দ্বারা পুঁজি কিনিলে ঐ পুঁজি হইতেই বা কি আয় লাভ করিবে। সে যদি মনে করে যে, ঋণ দিয়া সে উহার বাবদ বৎসরে যে সুদ পাইবে উহা অপেক্ষা পুঁজি দ্রব্য কিনিলে তাহার আয় বেশি হইবে এবং তাহা হইলে সে ঋণ না দিয়া ঐ টাকা পুঁজি-দ্রব্যে বিনিয়োগ করিবে। ইহার ফলে আর্থিক ঋণের যোগান হ্রাস পাইবে এবং ঋণের বাবদ সুদের হারও বাড়িবে। অপর দিকে, পুঁজি-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পুঁজি-দ্রব্যে বিনিয়োগ বাড়িবে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যোগানও বাড়িবে। ইহার ফলে দ্রব্যের দাম কমিবে এবং পুঁজি-দ্রব্যে অর্থ বিনিয়োগ করিয়া আয়ও কম পাওয়া যাইবে। সুতরাং, যদিও আর্থিক ঋণের সুদের হার এবং পুঁজি-দ্রব্যের বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে স্বল্পকালীন সময়ে পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহাদের সমান হইবার দিকে প্রবণতা থাকে।

আর্থিক ঋণের সুদের হার এবং পুঁজি দ্বারা উপার্জিত আয়ের সমতা

সুদের হারের পার্থক্যের কারণ
(Differences in Interest Rates)

ঋণের বাজারে সুদের হারের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ঋণের প্রকারভেদের দরুন ঋণ ব্যবহারের দাম বিভিন্ন হারে আদায় করা হয়। নিম্নলিখিত একাধিক কারণে সুদের হারের পার্থক্য দেখা দিতে পারে :

(১) সুদের হারের বিভিন্নতার মূল কারণ হইল ঋণের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে তারতম্য। যদি চাহিদার তুলনায় ঋণের যোগান স্বল্প

হয়, তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। আবার, যোগানের তুলনায় যদি ঋণের চাহিদা বেশি হয় তাহা হইলে সুদের হার বাড়িবে।

(২) সুদের হারের পার্থক্যের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, সকল প্রকাব ঋণের ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা এক প্রকার নহে। যে ঋণের ঝুঁকি বেশি সেই ঋণের সুদের হারও অপেক্ষাকৃত বেশি।

(৩) যে ঋণের ব্যবস্থাপনা-ব্যয় বেশি কিংবা যে ঋণের জন্য ঋণদাতাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, উহার সুদের হার বেশি হয়।

(৪) সুদের হারের পার্থক্য ঋণের মেয়াদের উপরও নির্ভর কবে। সাধারণভাবে বলা যায়, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদ অপেক্ষা বেশি হয়। ইহার কারণ এই যে, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশি। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, যদি ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকে, তাহা হইলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণেরও কম সুদ হইতে পারে। এই জন্যই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জমাব অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া (overdraft) তাহার যে সুদ হয়, তাহা অপেক্ষা তমসুক পত্রের (bond) সুদ বেশি হয়। তমসুক দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র; overdraft স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র। কিন্তু তমসুক পত্রের ঋণ আদায়ের জন্য কোন ঝামেলা পোহাইতে হয় না; কিংবা এই প্রকার ঋণপত্রেব পুনর্বিনিয়োগের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সেইজন্য তমসুক পত্রের সুদ অপেক্ষাকৃত কম।

(৫) ঋণের বাজারের অপূর্ণাঙ্গতাবশত অর্থাৎ ঋণের বাজারের মধ্যে নিখুঁত প্রতিযোগিতার অভাব হেতুও সুদের হারের পার্থক্য ঘটিতে পাবে। যদি এক বাজার হইতে অন্য বাজারে ঋণের অবাধ গতিশীলতা না থাকে, তাহা হইলে সুদের হারের পার্থক্য অনিবার্য। এই কারণেই আমাদেব দেশে গ্রামীন ব্যাঙ্ক, যৌথকারবারী ব্যাঙ্ক, বিদেশীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণের সুদের হার সমান নহে।

সুদের তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Interest Theories)

সুদের হার কিভাবে স্থির হয়, এ সম্বন্ধে এযাবৎ বহু তত্ত্ব রচিত হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: (১) প্রকৃত

তত্ত্বসমূহ (Real Theories) এবং (২) আর্থিক তত্ত্বসমূহ (Monetary Theories)।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণ প্রকৃত তত্ত্ব দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সুদ হইল পুঁজি বা মূলধন হইতে প্রাপ্ত আয়। এই আয় নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানগুলি (real factors) একমাত্র ভুমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। 'প্রকৃত উপাদান' বলিতে হয় কোন বাস্তব বিষয় নতুবা কোন মনোগত বিষয় অথবা বাস্তব ও মনোগত উভয় বিষয়ই বিবেচনা করা হয়। সুদের হারের বাস্তব নির্ধারক হইল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব, আর মনোগত নির্ধারকগুলির মধ্যে অপেক্ষা ও সময় পছন্দজনিত ত্যাগ স্বীকার, পুঁজির চাহিদা ও যোগান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুদ সম্বন্ধে আর্থিক তত্ত্বগুলি অপেক্ষাকৃত অধুনা রচিত হইয়াছে। এই তত্ত্বগুলিতে সুদের হার নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানের প্রভাব অস্বীকার করা হইয়াছে। সুদের হার নির্ধারণে প্রকৃত উপাদানের পবিবর্তে 'আর্থিক উপাদানই' যে প্রধান অংশ গ্রহণ কবিয়া থাকে তাহাই এই তত্ত্বগুলিতে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। আর্থিক তত্ত্বগুলির মধ্যে নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থ-বিজ্ঞানিগণের অবদান ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্ব এবং কেইন্‌সের নগদ পছন্দনীয়তা-তত্ত্বটি ধরা হইয়া থাকে।

সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয়, সে বিষয়ে আজও পর্যন্ত অর্থবিজ্ঞানি-গণের মধ্যে মতবিরোধিতার শেষ হয় নাই। একদিকে যেমন প্রকৃত তত্ত্বগুলি বনাম আর্থিক তত্ত্বগুলির বিরোধিতার অবসান হয় নাই, অপর দিকে ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্ব এবং পছন্দ-তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, তাহা লইয়াও বিতর্কের শেষ হয় নাই। সুদের কোন তত্ত্বই এযাবৎ সর্বজন-গ্রাহ্য নহে। নিচে সুদের কয়েকটি তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইল।

কয়েকটি সুদের তত্ত্ব
(Some Interest Theories)

ভোগবিরতি বা অপেক্ষা-তত্ত্ব (Abstinence or Waiting): অধ্যাপক সিনিয়র ও কেয়ার্নস্‌ যোগানের দিক হইতে সুদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। ঋণের যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। মানুষ তাহার

মোট আয় বর্তমান ভোগে ব্যয় করিতে পারে কিংবা কিছুটা সঞ্চয় করিতে পারে। তাহাকে সঞ্চয় করিতে হইলেই বর্তমান ভোগ পরিহার করিতে হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় ভোগবিরতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভোগবিরতি পীড়াদায়ক ; কেন না, ভোগ পরিহার করিতে হইলেই অপযোগ (disutility) বহন করিতে হয়। সেইজন্য যাহারা সঞ্চয় করিবে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন। সঞ্চয়কারীর ভোগবিরতি ও অপযোগ বহনের পুরস্কারই সুদ।

কিন্তু ভোগবিরতি-তত্ত্বটি এই বলিয়া সমালোচনা করা যায় যে, বাজারে ঋণের যোগানের অধিকাংশ আসে ধনী সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে। ধনী ঋণদাতাগণ যখন ঋণ যোগান দেয় তখন তাহাদের বর্তমান ভোগ খুব সামান্যই ত্যাগ করিতে হয়। যেহেতু তাহাদেব ঋণ যোগান দিতে অপযোগ বহন করিতে হয় না, সেইহেতু তাহারা ভোগবিরতির জন্য সুদ নামক পুরস্কার দাবি করিতে পারে না।

অধ্যাপক মার্শাল ভোগবিরতি-তত্ত্বটিকে কিছুটা সংস্কার করিয়া অপেক্ষা-তত্ত্বদ্বারা সুদের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহাব মতে, সুদ ভোগবিরতির পুরস্কার নহে. সুদ অপেক্ষাব পুরস্কার। সঞ্চয় করিতে হইলেই বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যতে ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করাইবার প্রদেয় মূল্যই সুদ। বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখার উৎসাহ সকল সঞ্চয়কারীর পক্ষে সমান নহে। অনেক সঞ্চয়কারী আছে যাহারা ভবিষ্যতে ভোগের জন্য কোন সুদের আকর্ষণের উপর অপেক্ষা করে না। সুদ নামক পুরস্কারের প্রলোভন না পাইলেও তাহারা সঞ্চয় করে। আবার, অনেকে আছে যাহারা উপযুক্ত পরিমাণ সুদ না পাইলে সঞ্চয়ই করে না। আবার, একদল সঞ্চয়কারী আছে যাহারা কোন বিশেষ অবস্থায় সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক নহে। ইহাদের প্রান্তিক সঞ্চয়কারী বলে। সুদের হার এমন আকর্ষণীয় হওয়া উচিত যাহাতে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীও বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করে এবং বাজারে ঋণের যোগান দেয়।

কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভোগবিরতি বা অপেক্ষা-তত্ত্ব সুদেব পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা নহে। ঋণের যোগান-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় ইহা কেবল তাহাই বিশ্লেষণ করে, ঋণের চাহিদা-দাম কিভাবে স্থির হয় তাহার সন্ধান এই তত্ত্বে মেলে না।

সময়-পক্ষপাত তত্ত্ব (Time-preference Theory) : অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী বম ওয়ার্ক (Bohm Baweık) সময়-পক্ষপাত তত্ত্বদ্বারা সুদের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার মতে, ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা মানুষ বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তিকেই অধিক পছন্দ বা গুরুত্ব প্রদান করে। ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানের উপর পক্ষপাত বেশি তিনটি কাবণে : (ক) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ অনিশ্চিত : (খ) ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা কম বলিয়া মানুষ ভবিষ্যৎ অভাবের তুলনায় বর্তমান অভাবকেই অধিক তীব্রভাবে অনুভব করে ; (গ) দীর্ঘস্থায়ী উৎপাদন-পদ্ধতি (round about process of production) অধিক উৎপাদনশীল বলিয়া মানুষ মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্য ভবিষ্যতেব তুলনায় বর্তমানেই দ্রব্য-সামগ্রী বেশি হাতে রাখিতে আকাঙ্খা কবে। অতএব মানুষের কাছে বর্তমানের ভোগ ভবিষ্যৎ ভোগ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক আকর্ষণীয়। এই অবস্থায় তাহাকে বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া ভবিষ্যৎ ভোগ লাভে বাজী করাইতে হইলে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ কিছু পুরস্কার দিতে হইবে। এই পুরস্কার সুদ। বর্তমান ভোগ সমান আকর্ষণীয় নহে। ১০০ টাকার আজ যাহা দাম, আগামী বৎসর সে দাম থাকিতে পারে না। সুতরাং, কাহাকেও যদি ১০০৲ টাকার বর্তমান ভোগ ত্যাগ করিযা ঋণ দিতে হয়, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে ঠিক ঐ ১০০ টাকাই ফেরৎ পাইবে এই প্রতিশ্রুতিতে ঋণ দিতে পাবে না। ঋণের আসল টাকার উপর 'অতিরিক্ত পাওনাব' প্রতিশ্রুতি না পাইলে সে ঋণ প্রদান কবিতে রাজী হইবে না। এই অতিরিক্ত পাওনাই সুদ। ঋণের আসল টাকাব উপর 'অতিরিক্ত পাওনা' হইল বর্তমান ভোগের উপর প্রদেয় 'প্রিমিয়াম'। মানুষেব ভবিষ্যৎ ভোগ মোটেই আকর্ষণীয় বা পছন্দ নহে। ভবিষ্যৎ ভোগের প্রতি অপছন্দ দূর কবিয়া তাহাকে যাহাতে ঋণদানে প্রবৃত্ত কবানো যায় সেই হিসাবেই সঞ্চযকারীকে বাট্টা (discount) রূপে সুদ দেওয়া হইযা থাকে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ ফিশার বম্ ওয়ার্কেব তত্ত্বটির সংস্কার করিয়া সুদের সময়-পক্ষপাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানুষ ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমানকে অধিক পছন্দ করে। বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তির প্রতি তাহার এই আকর্ষণ দূব করিয়া সঞ্চয় ও ঋণদানে উৎসাহিত করিতে হইলে তাহাকে সুদরূপে পুবস্কার দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমান ভোগের প্রতি তাহার পছন্দ

যত প্রবলতর হইবে, সুদের হারও তত বেশি হইবে। যতটা পরিমাণ অর্থ দিলে যখন কোন ব্যক্তি তাহার টাকা বর্তমান ভোগে ব্যয় না করিয়া ধার দিতে রাজী থাকিবে তখন উহাকে ঐ ব্যক্তির সময়-পক্ষপাত হার (rate of time preference) বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি এক বৎসরের জন্য ১১০৲ টাকা ফিরিয়া পাইবার প্রতিশ্রুতিতে ১০০৲ টাকা ধার দেয়, তাহা হইলে তাহার সময়-পছন্দ হার হইবে শতকরা ১০৲ টাকা।

কিন্তু সময়-পক্ষপাত তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা ঋণের চাহিদা-দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহার কোন সন্ধান দেয় না। ইহা কেবল-মাত্র ঋণের যোগান-দাম ব্যাখ্যা করে। সেই হিসাবে ইহা সুদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory) **:** এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুঁজি উৎপাদনশীল। পুঁজিহীন উৎপাদন অপেক্ষা পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন কবিলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হয়। ঋণগ্রহীতা পুঁজির দ্বারা উৎপাদন করিয়া অতিরিক্ত উৎপন্ন দ্রব্য লাভ করে বলিয়াই উহার কিছুটা অংশ সুদরূপে পুঁজির পাওয়া উচিত। উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন পুঁজির বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে, (এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যদি অপরিবর্তিত থাকে) তখন উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পাইতে থাকিবে। যতই পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ততই ক্ষীয়মাণ উৎপাদনশীলতা নীতি (principle of diminishing marginal productivity) অনুসারে পুঁজির চাহিদা-দামও কমিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারে সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতার কম থাকিবে, ততক্ষণ ঋণগ্রহীতা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান ঋণগ্রহণ করিতে থাকিবে। যদি সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে বেশি হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস করিয়া উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিবে। দীর্ঘকালীন সময়ে অবশ্য সুদের হার পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সহিত সমান হইবে।

সুদের এই তত্ত্বটিও এক-তরফা বিশ্লেষণ ; কেন না, ইহা শুধু ঋণের চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়, তাহাই ব্যাখ্যা করে। ঋণের যোগান-দাম কিভাবে স্থির হয়, তাহার সন্ধান এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না। আবার, চাহিদার দিক

হইতেও ইহা নির্দেশ দিতে পারে না, কিভাবে ঋণের মোট চাহিদা নির্ধারিত হয়। ভোগব্যয়ের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয় উহার সুদ কেমন করিয়া স্থির হয় তাহা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি যে সকল অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই শর্তগুলিও অবাস্তব।

চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (The Demand and Supply Theory): এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। পুঁজির চাহিদা নির্ভর করে উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার উপর। পুঁজির যোগান নির্ধারিত হয় প্রান্তিক ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাত দ্বারা। সুদের এই তত্ত্বটিকে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বলা হয়।

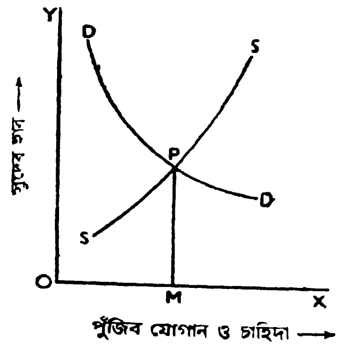
পুঁজির চাহিদার মূল কারণ হইল উহার উৎপাদনশীলতা। পুঁজি বিনা উৎপাদন অপেক্ষা পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে। পুঁজির উৎপাদনশীলতা আছে বলিয়াই উৎপাদক প্রতিষ্ঠান পুঁজির দামস্বরূপ সুদ প্রদান কবিয়া উহা উৎপাদনে বিনিয়োগ করিয়া থাকে। যদি অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে যতই পুঁজির বিনিয়োগ রদ্ধি করা হইবে ততই উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতাও কমিতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা সুদ অপেক্ষা বেশি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্তই উৎপাদকের পক্ষে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া লাভজনক। পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও সুদের হার পরস্পর সমান হইলে, উৎপাদক আর পুঁজির বিনিয়োগ বাড়াইবে না। ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায় পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উহার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ক্রমশ কমিতে থাকে। সেইজন্যই পুঁজির চাহিদা-রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে নিম্নগামী হইয়া থাকে।

যোগানের দিক হইতে পুঁজির যোগান নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। প্রত্যেক দেশেই কিছু সঞ্চয় সুদ পাওয়া না গেলেও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চয়ের পরিমাণ পুঁজির চাহিদার তুলনায় নগণ্য। চাহিদা অনুযায়ী পুঁজি বা সঞ্চয় পাইতে হইলে উহার দাম বা পুরস্কার দিতেই হইবে। ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা মানুষ বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি বেশি পছন্দ করে। বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত করাইতে

হইলে তাহাকে ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাতের পুরস্কার স্বরূপ সুদ প্রদান করিতে হইবে। সুদের হার যত বেশি হইবে ততই ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাতের পুরস্কারও বাড়িবে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে। আবার, সুদের হার কমিলে ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাতেব পুরস্কার কমিবে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণও কমিবে। অর্থাৎ 'সঞ্চয় হইল সুদের হারের অপেক্ষক' (Saving is a function of the rate of interest)। সুদের হার ও সঞ্চয়ের এই সম্পর্কের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সঞ্চয় বা পুঁজির যোগান-রেখা ধনাত্মক ; অর্থাৎ এই রেখা বাম হইতে দক্ষিণে উর্ধ্বগামী হয়।

সুদের যে হারে পুঁজির চাহিদা পুঁজির যোগানের সহিত পরস্পর সমান হয় উহাকেই ভারসাম্য হার বলে। সুদের ভারসাম্য হারে উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যতটা পরিমাণ সঞ্চয় চাহিয়া থাকে, সঞ্চয়কারিগণও ঠিক সেই পরিমাণ সঞ্চয় যোগান দিতে রাজী থাকে। নিচে চিত্রের সাহায্যে সুদের চাহিদা ও যোগানের তত্ত্বটি প্রকাশ করা হইল :

DD ও SS রেখা দুইটি যথাক্রমে পুঁজির চাহিদা ও যোগান-রেখা। উহারা পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। PM সুদের ভারসাম্য হার। এই হারে পুঁজি বা সঞ্চয়ের যোগান OM পুঁজি বা সঞ্চয়ের চাহিদা OM-এর সহির পরস্পর সমান।



সমালোচনা : কিন্তু সুদের এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত একাধিক কারণে সমালোচিত হইয়াছে :

(১) এই তত্ত্বটি পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থাতেই প্রয়োগ করা চলে। যদি উৎপাদনের সকল উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহা হইলেই বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সুদ প্রদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উপকরণগুলি যদি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে অলস উপকরণগুলিকে সহজেই পুঁজি দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা যায়। সেক্ষেত্রে সুদের প্রলোভন দ্বারা বর্তমান ভোগ-সঙ্কোচন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয় না।

(২) সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় কিংবা পুঁজির যোগান বাড়িবে, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তও সত্য নহে। ইহার কারণ এই যে, সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে। সুদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের ব্যয় বাড়ে এবং মুনাফাও কমে। বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে কর্মনিয়োগ হ্রাস পায় এবং জাতীয় আয়ও কমে। আয় কমিলে সঞ্চয়ও কমে। অতএব সুদের হার বাড়িলে বিনিয়োগ কমিয়া সঞ্চয় হ্রাস পায়। সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাড়ে না। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের বড় ত্রুটি এই যে, ইহাতে আয়ের উপর যে বিনিয়োগের প্রভাব আছে, তাহা উপেক্ষা করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, সুদের হারের পরিবর্তনের দ্বারা বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদের হারের পরিবর্তন নহে, আয়-স্তরের পরিবর্তনই সমাজে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে সমতা আনে।

(৩) এই তত্ত্বের সিদ্ধান্ত, পুঁজির চাহিদা ও যোগান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল নহে, একথা সত্য নহে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বিভিন্ন আয়-স্তরে বিভিন্ন হইয়া থাকে। আয়ের বিভিন্ন স্তর আবার বিনিয়োগের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। সুতরাং, সঞ্চয় বা পুঁজির যোগান বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ বলিতে পুঁজির চাহিদা বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং, পুঁজির চাহিদা ও যোগান প্রকৃতপক্ষে একে অন্যের উপর নির্ভরশীল।

(৪) কেইন্‌সের মতে, নগদ টাকার পছন্দ এবং টাকার যোগানের উপর সুদের হার নির্ভর করে। পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, ভোগ-বিরতি বা সময়-পক্ষপাত প্রভৃতি প্রকৃত বিষয় দ্বারা সুদের হার বিশ্লেষণ করা যায় না।

নগদ-পছন্দ তত্ত্ব
(The Liquidity Preference Theory)

বিলাতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেইন্‌স সুদ সম্পর্কে একটি নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। উহাই সুদের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কেইন্‌সের মতে, সুদ প্রকৃত বিষয়ের (real factors) উপর নির্ভরশীল

নহে। সুদ টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয় (monetary factors) দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। টাকার চাহিদা ও টাকার যোগান, এই দুইটি বিষয়ের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারাই সুদ নির্ধারিত হইয়া থাকে। সেইজন্য কেইন্‌সের তত্ত্বকে সুদের আর্থিক তত্ত্ব (Monetary Theory of Interest) বলা হয়।[১]

মানুষ তাহার সম্পদ বিনিয়োগ করার চাইতে তাহা নগদ অবস্থায় ধরিয়া রাখিতেই বেশি পছন্দ করে। ইহাকেই টাকার নগদ-পছন্দ বলা হয়। নগদ-টাকা ধরিয়া রাখিবার পছন্দই হইল টাকার চাহিদা। টাকার এই নগদ-পছন্দ কেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। তাহাকে টাকার নগদ-পছন্দ ত্যাগ করিয়া ঋণদানে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে কিছু একটা আকর্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। সুদ হইল নগদ টাকার পছন্দ পরিত্যাগ করিবার আকর্ষণস্বরূপ পুরস্কার। কেইন্‌সের নিজের কথায়:

"Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period."

নগদ টাকার চাহিদা ও যোগান এই দুইটি শক্তিদ্বারা সুদের হার কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা নিচে বিশ্লেষণ করা হইল।

টাকার চাহিদা (Demand for Money): টাকার চাহিদা বলিতে উহার নগদ-পছন্দকে বুঝাইয়া থাকে। যে পরিমাণ নগদ টাকা মানুষ হাতে রাখিতে ইচ্ছা করে উহাই টাকার চাহিদা।

টাকার চাহিদা বা নগদ-পছন্দের তিনটি কারণ

কেইন্‌সের মতে টাকার নগদ-পছন্দের মূলে তিনটি কারণ থাকে। এই কারণ বা উদ্দেশ্যগুলি হইল: (১) লেন-দেনের উদ্দেশ্য (Transaction Motive); (২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য (Precautionary Motive) এবং (৩) ফাট্‌কা দ্বারা উপার্জনের উদ্দেশ্য (Speculative Motive)।

ব্যক্তি, পরিবার ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সকলকেই দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু-না-কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। বেশির ভাগ ব্যক্তি ও

(১) লেন-দেনের

পরিবার আয়ের টাকা দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাস হিসাবে পাইয়া থাকে। কিন্তু যে সময়ে বিভিন্ন খাতে উহাদের ব্যয় করা প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই সময়ে

১. Keynes: "Interest is purely a monetary phenomenon, a payment for the use of money."

আয়-প্রাপ্তি ঘটে না। সুতরাং একবার আয়-প্রাপ্তির পর আবার আয়-প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যয় করিবার জন্য নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। ব্যক্তি ও পরিবারের ন্যায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকেও কাঁচামাল ক্রয়, মাহিনা ও মজুরি প্রদান প্রভৃতি বাবদ নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। লেন-দেনের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখা হয় তাহা নির্ভর করে ব্যক্তি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়ের পরিমাণ এবং আয়-প্রাপ্তির ব্যবধানের উপর। লেন-দেন সংক্রান্ত নগদ টাকার চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে না এবং স্বল্পকালীন সময়ে একরূপ অপরিবর্তিত থাকে।

(২) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য

দ্বিতীয়ত, আকস্মিক প্রয়োজন নির্বাহ ও ভবিষ্যৎ সতর্কতা অবলম্বনের জন্যও নগদ টাকা হাতে রাখিবার প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি কিংবা পরিবার এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কিংবা ভবিষ্যতে বিপদ-আপদের দিকে চাহিয়া নগদ টাকা হাতে রাখে। এইরূপ সতর্কতা-মূলক প্রয়োজনের জন্য নগদ টাকার চাহিদা স্বল্পকালীন সময়ে অপরিবর্তিত থাকে এবং এই প্রকার নগদ-পছন্দ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল নহে। এই প্রকার প্রয়োজনে টাকার চাহিদার পরিমাণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়, পারি-পার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

(৩) ফাট্‌কা দ্বারা উপার্জনের উদ্দেশ্য

তৃতীয়ত, ফাট্‌কা কারবারের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া লাভবান হইবার উদ্দেশ্যেও মানুষ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। বাজারে বহু রকমের ঋণপত্র থাকে যাহা ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা আয় উপার্জন করা যায়। মনে কর, বাজারে যখন সুদের হার শতকরা ৫ টাকা, তখন সরকার ৫ টাকা সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ১০০ টাকা দামের ঋণপত্র ইসু করিল। এই ঋণপত্র কেহ কিনিলে শতকরা সে ৫ টাকা সুদ বা আয় লাভ করিবে। কিন্তু বাজারে সুদের হার কমিয়া যদি শতকরা ২½ টাকা দাঁড়ায় তাহা হইলে ১০০ টাকা দামের ঋণপত্র বাজারে ২০০ টাকায় বিক্রয় হইবে। আবার, বাজারে সুদের হার বাড়িয়া যদি শতকরা ১০ টাকা হয় তাহা হইলে ১০০ টাকা দামের ঋণপত্র বাজারে মাত্র ৫০ টাকায় বিক্রয় হইবে। অতএব দেখা যায় যে, সুদের হার যখন বেশি তখন ঋণপত্র ক্রয় করিলে এবং সুদের হার যখন কম তখন ঋণপত্র বিক্রয় করিলে বেশ লাভ করা যায়। এইরূপ ফাট্‌কা দ্বারা

উপার্জনের উদ্দেশ্যে যখন নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে হয় তখন টাকার চাহিদা সুদের হারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অর্থাৎ সুদের হার কমিলে বেশি করিয়া নগদ টাকা ধরিয়া রাখা হয়, আবার সুদের হার বাড়িলে কম করিয়া নগদ টাকা ধরিয়া রাখা হয়। ফাট্‌কা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকার চাহিদা সুদের সহিত সম্পর্কিত (interest-elastic)। সুদের হারের একটু পরিবর্তন ঘটিলেই ফাট্‌কা উপার্জনের জন্য টাকার চাহিদারও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত টাকার তিন প্রকারের চাহিদা যোগ করিলেই জাতীয় আয়ের কোন নির্দিষ্ট স্তরে টাকার মোট চাহিদা বা নগদ-পছন্দ নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ টাকার মোট চাহিদা বা নগদ-পছন্দ = লেন-দেনের উদ্দেশ্যে চাহিদা + সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে চাহিদা + ফাট্‌কা উপার্জনের উদ্দেশ্যে চাহিদা।

টাকা ঋণ দেওয়ার অর্থই টাকার নগদ-পছন্দ পরিত্যাগ করা। কিন্তু যেহেতু মানুষ নগদ টাকা হাতে রাখিতে পছন্দ করে, সেইহেতু তাহাকে টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে রাজী করাইতে হইলে একটি দাম দিতে হইবে। নগদ টাকা ব্যবহার না করিবার এই দামই হইল সুদ।

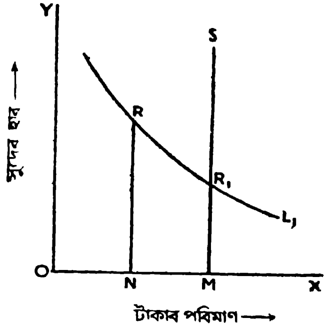
নগদ-পছন্দ এবং সুদের হারের পরস্পর সম্পর্ক এই ভাবে নির্দেশ করা যায় : যখন সুদের হার বেশি হয় তখন লোকের নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা কমে এবং তাহারা বেশি টাকা ঋণ দিয়া থাকে। অন্যদিকে, যখন সুদের হার কম হয়, তখন লোকের নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা বাড়ে এবং তাহারা কম টাকা ধার দেয়। এই ভাবে বিভিন্ন হারে লোকে কতটা পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহিবে তাহা নগদ-পছন্দের সূচী (liquidity preference) প্রণয়ন দ্বারা দেখানো যায়।

নগদ পছন্দ ও সুদের পরস্পর সম্পর্ক (Relation between liquidity preference and interest rate)

এই নগদ-পছন্দের সূচীকে রেখাচিত্রের সাহায্যে রূপায়িত করিলে নগদ পছন্দের রেখা (liquidity preference curve) পাওয়া যায়। এই রেখাকেই টাকার মোট চাহিদা-রেখা (demand curve of money) বলা হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে সুদের হার ও নগদ টাকার পছন্দের মধ্যে ক্রিয়াগত সম্পর্ক দেখানো হইল :

চিত্রে L_1 রেখাটি নগদ-পছন্দ রেখা কিংবা নগদ টাকার মোট

চাহিদা-রেখা (একটি নির্দিষ্ট আয়স্তরে)। জাতীয় আয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তরে সুদের হার যখন RN তখন লোক ON পরিমাণ নগদ টাকা ধরিয়া রাখিতে চাহিবে। আবার, সুদের হার যখন কমিয়া R_1M হইল, তখন নগদ টাকার চাহিদা বাড়িয়া OM পরিমাণ হইবে। সুতরাং, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, নগদ-পছন্দ রেখা বা নগদ টাকার মোট চাহিদা-রেখা ঋণাত্মক হয় ; অর্থাৎ ইহা বাম দিক হইতে দক্ষিণে নিম্নমুখী হইয়া থাকে।



টাকার যোগান (Supply of Money) : চাহিদার দিক হইতে নগদ টাকার পছন্দ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। যোগানের দিক হইতে সুদের হার টাকার যোগানের উপর নির্ভরশীল। সমাজে টাকার যোগান আবার নির্ভর করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির উপর। কোন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার মোট যোগান স্থির থাকে। টাকার যোগান স্বল্পকালীন সময়ে স্থির থাকে বলিয়া উহা লম্ব-রেখা দ্বারা রূপায়িত করা হয়। উপরের চিত্রে SM টাকার যোগান-রেখা নির্দেশ করিতেছে।

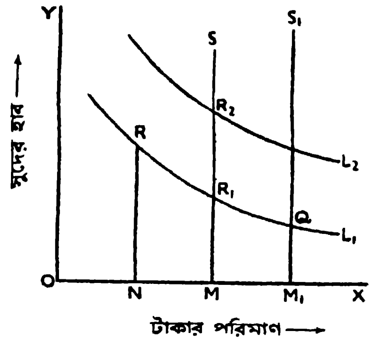
ভারসাম্য সুদের হার
(Equilibrium Rate of Interest)

ভারসাম্য সুদের হার টাকার মোট যোগান-রেখা ও মোট চাহিদা-রেখার ছেদবিন্দুতে নির্ধারিত হয়। এই বিন্দুতে লোকের অভ্যাস ও নগদ-পছন্দ দ্বারা নির্ধারিত টাকার মোট চাহিদার পরিমাণ এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দ্বারা নির্ধারিত টাকার মোট যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হইবে।[1] অর্থাৎ টাকার মোট যোগান ও মোট চাহিদার সমতা আসিলেই সুদের হারেও

১. Benham : "The rate of interest equals the supply of money, as determined by the banking system, with the demand for money as determined by the people's habits and their preferences for liquidity."

ভারসাম্য আসিবে। নিচে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য সুদের হারে টাকার চাহিদা ও যোগান কি ভাবে পরস্পরের সমান হয় দেখানো হইল :

চিত্রে টাকার চাহিদা বা নগদ-পছন্দ রেখা L_1 এবং টাকাব যোগান-রেখা SM। টাকার যোগান-রেখা টাকার চাহিদা-রেখাকে R_1 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। R_1 বিন্দুতে সুদের ভারসাম্য হার R_1M নির্ধারিত হইয়াছে। সুদের ভারসাম্য হার R_1M-এ টাকার মোট যোগান OM টাকার মোট চাহিদা OM-এর সহিত পরস্পর সমান। ইহা এইভাবে প্রমাণ করা যায। মনে কর, সুদের হার RN নির্দিষ্ট হইল। এই হারে লোকে ON পরিমাণ নগদ টাকা হাতে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইবে। কিন্তু টাকার মোট যোগানের পরিমাণ OM। টাকার যোগান টাকার চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত হওযায় সুদের হার কমিয়া R_1M-এ আসিযা দাঁড়াইবে। আবার, বিপরীত দিকে সুদের হার যদি QM_1 নির্দিষ্ট হয, তাহা হইলে লোকে OM_1 পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখিতে চাহিবে। টাকাব মোট যোগানের পরিমাণ হইল OM। যোগানের তুলনায় টাকার চাহিদা অতিরিক্ত বলিযা সুদের হার বাড়িয়া R_1M-এ দাঁড়াইবে। যখন সুদের হাব R_1M-এ নির্দিষ্ট হইবে তখন টাকাব যোগান ও টাকার চাহিদা সমান হইবে এবং ঐ হারের আর কোন পরিবর্তনের ঝোঁক থাকিবে না।



টাকার যোগান যদি স্থির থাকে এবং নগদ-পছন্দ যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নূতন করিয়া নগদ-পছন্দ রেখা আঁকিতে হইবে। এই রেখা পুরাতন নগদ-পছন্দ রেখার উপরে ও ডানদিকে অঙ্কন করিতে হইবে। উপরের চিত্রে L_2 দ্বারা নূতন নগদ-পছন্দ রেখা নির্দেশ করা হইয়াছে। L_2 রেখা টাকাব

যোগান-রেখা SMকে R_2 বিন্দুতে ছেদ করিয়াছে। ফলে, এখন সুদের হার বাড়িয়া R_2M-এ নির্ধারিত হইবে। অন্যদিকে, টাকার নগদ-পছন্দ কমিলে সুদের হার হ্রাস পাইবে। আবার, টাকার নগদ-পছন্দ যদি অপরিবর্তিত থাকে অথচ টাকার যোগান বাড়ে, তাহা হইলে টাকার পুরাতন যোগান-রেখা SM ডানদিকে সরিয়া নূতন যোগান-রেখা S_1M_1-এ রূপান্তরিত হইবে। এই নূতন যোগান-রেখা এখন নগদ-পছন্দ রেখা L_1কে Q বিন্দুতে ছেদ করিবে। ফলে, সুদের হার R_1M অপেক্ষা কমিয়া QM_1-এ নির্ধারিত হইবে।

নগদ টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের পরিবর্তনের ফলে সুদের হারের পরিবর্তন

সমালোচনা : কেইন্‌সের সুদ-তত্ত্বটি নিম্নলিখিত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে :

(১) পুঁজির চাহিদা ও সুদের হার নির্ধারণে পুঁজির উৎপাদনশীলতার যে বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেইন্‌সের তত্ত্বে তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু উৎপাদক প্রতিষ্ঠান যখন ঋণ গ্রহণ করে ও উহার জন্য সুদ দিতে রাজী হয়, তাহার প্রধান কারণই এই যে, পুঁজি ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন কার্য অধিকতর উৎপাদনশীল হইয়া থাকে।

(২) কেইন্‌সের সুদের তত্ত্বটি একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব নহে। তিনি টাকার চাহিদা ও টাকার যোগানের ভিত্তিতে সুদের ভারসাম্য হার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কিন্তু টাকার চাহিদা আয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। আয়ের স্তর কি ভাবে নির্ধারিত হয়, তাহা না জানিতে পারিলে সুদের হার কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কেইন্‌স আয়ের স্তর কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বিশ্লেষণ না করিয়াই সুদের হার কি ভাবে স্থির হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তাহার তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ বলা চলে।

(৩) অধ্যাপক সোমার্স এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুদের হার কেবলমাত্র নগদ-পছন্দ এবং টাকার যোগানের উপর নির্ভর করে না। ইহা বহু জিনিসের উপর নির্ভরশীল। কোন লোকের পুঁজি থাকিলে সে উহা চারিটি বিষয়ে ব্যয় করিয়া থাকে : (ক) সে লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ করে ; (খ) নগদ অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখে ; (গ) উৎপাদনে বিনিয়োগ করে এবং (ঘ) ভোগ-তৃপ্তির জন্য ব্যয় করে।

লগ্নীপত্রে বিনিয়োগ নির্ভর করে উহার চাহিদা ও যোগানের উপর। নগদ

টাকা ধরিয়া রাখিবার পরিমাণ নির্ধারিত হয় নগদ টাকা পছন্দের দ্বারা। উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয় উৎপন্নের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার দ্বারা। ভোগ-ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে সময়-পক্ষপাতের উপর। সুতরাং, সেবাকার্যের মত সুদের হার নির্ধারণ, লগ্নীপত্রের চাহিদা ও যোগান, টাকার নগদ-পছন্দ, পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, সময়-পক্ষপাত প্রভৃতি বিষয়গুলি কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কেইন্‌স সুদের হার নির্ধারণে টাকার নগদ-পছন্দ ও টাকার যোগান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছেন।

নয়া ক্ল্যাসিক্যাল বা ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্ব
(Neo-Classical or Loanable Funds Theory)

উইকসেল, গুণার মিরডাল, বেণ্ট হ্যানসেন, রবার্টসন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্ব দ্বারা সুদের হার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্বটিকে সুদের নয়া ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদ হইল ঋণযোগ্য তহবিলের ব্যবহারের দাম (Interest is the price paid for the use of loanable funds)। পণ্যদ্রব্যের দাম যেমন উহার চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়, সেইরূপ সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। 'ঋণযোগ্য' তহবিল বলিতে বাজারে যে টাকার চাহিদা ও যোগান দেখা যায় তাহাকে বুঝাইয়া থাকে।

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা : বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের বা আর্থিক পুঁজির চাহিদা নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক হইতে আসিতে পারে :

(১) **বিনিয়োগ**—যে সকল কারণে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা দেখা দেয় উহার মধ্যে বিনিয়োগ সর্বপ্রধান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মাত্রেই আর্থিক পুঁজি ঋণ করিয়া উহা বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে চেষ্টা করে। এই পুঁজি বা ঋণ ব্যবহারের জন্য তাহারা যে দাম দিতে রাজী থাকে উহাই সুদ। কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিনিয়োগের জন্য ঋণ গ্রহণ করে ঐ বিনিয়োগ হইতে আয় উপার্জনের সম্ভাবনা কতটা আছে তাহার ভিত্তিতে। অনুমিত লাভের বিচার করিয়াই উহারা স্থির করে কত সুদে কতটা পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিবে। উহারা ঋণযোগ্য তহবিল ততক্ষণ

পর্যন্ত নিয়োগ করিয়া যাইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনিয়োগ হইতে সম্ভাবিত আয়ের হার বাজারের সুদের হারের সমান হয়। অতএব সুদের হার কম হইলে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হার বাড়িল এই চাহিদা হ্রাস পায়। কারবারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া, সরকারও ঋণ গ্রহণ করে। সরকার যখন যুদ্ধবিগ্রহ ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তখন যে কোন সুদের হারেই ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু সরকার শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের জন্য যখন ঋণ গ্রহণ করে তখন ঐ ঋণের টাকা বিনিয়োগ দ্বারা লাভের সম্ভাবনা কতটা আছে তাহা বিচার করিয়া ঋণ গ্রহণ করে।

(২) **অসঞ্চয়**—ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার মূলে আর একটি কারণ হইল ভোগ-ব্যয়ের প্রয়োজন। যদি কাহাকে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য, যথা, রেডিও, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি কিনিতে হয় এবং তাহার স্বাভাবিক আয় দ্বারা তাহা কেনা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাকে ঋণ করিতে হয়। এই ধরনের ভোগ-ব্যয়ের দরুন যখন ঋণ করিতে হয় তখন উহাকে অসঞ্চয় বলা হয়। বাজারে যখন সুদের হার কমে তখন ভোগ-ব্যয়ের জন্য ঋণের চাহিদা বাড়ে; আবার সুদের হার বাড়িলে, ভোগ-ব্যয়ের জন্য ঋণের চাহিদা কমিয়া থাকে।

(৩) **অলস নগদ টাকা হাতে রাখিবার আকাঙ্খা**—ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার আর একটি কারণ হইল, অলস নগদ টাকা হাতে রাখিবার ইচ্ছা।. বাজারে সুদের হার কম হইলে লোকে বেশি পরিমাণ অলস নগদ টাকা হাতে রাখিতে চায়। আবার, সুদের হার বাড়িলে লোকে বেশি পরিমাণ অলস নগদ টাকা হাতে রাখিতে ইচ্ছা করে।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা বলিতে বিনিয়োগ, অসঞ্চয় এবং অলস নগদ টাকা ধরিয়া রাখিবার পরিমাণ—এই তিনের যোগফল বুঝাইয়া থাকে।

ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান: ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন উৎস হইতে:

(১) **ব্যাঙ্ক-প্রদত্ত ঋণ**—ঋণযোগ্য তহবিলের অন্যতম প্রধান সূত্র হইল ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট ঋণ। ব্যাঙ্ক যখন ঋণ প্রদান করে তখন উহার পরিমাণ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হইলে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ বাড়ে, আর সুদের হার কম হইলে ব্যাঙ্ক-ঋণের পরিমাণ

কমিয়া যায়। অবশ্য ঋণ দেওয়ার সময় ব্যাঙ্ককে নগদ টাকার সচ্ছলতা বজায় রাখিতে হয়; কেন না, তাহা না হইলে ব্যাঙ্ক দাবী (claims) মিটাইতে সক্ষম হইবে না।

(২) **সঞ্চয়**—ঋণযোগ্য তহবিলের আর একটি সূত্র হইল সঞ্চয়। সঞ্চয় বলিতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, কারবারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় এবং সরকারী সঞ্চয়ের সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। ব্যক্তির অতীত আয় ও বর্তমান ভোগ ব্যয়ের পার্থক্যই ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ। ব্যক্তিগত সঞ্চয় সুদের হারের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহা হইলে সুদের হার বাড়িলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাড়ে, আবার, সুদের হার কমিলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় কমে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় বলিতে উহার মুনাফার যে অংশ অবণ্টিত অবস্থায় থাকে তাহাকে বুঝায়। সুদের হার বাড়িলে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বাজার হইতে ঋণ গ্রহণ করার পরিবর্তে অবণ্টিত মুনাফার অংশ পুঁজি হিসাবে উৎপাদনে নিয়োগ করে। সরকারী সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে বাজেট উদ্বৃত্তের (surplus) উপর। যখন সরকারের রাজস্ব-আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ কম হয় তখন উদ্বৃত্ত বাজেট দেখা দেয়। ইহাই সরকারের সঞ্চয়।

(৩) **অলস নগদ তহবিল ত্যাগ**—অনেক সময় মানুষ অতীতের আয় ভোগ-ব্যয় কিংবা বিনিয়োগে ব্যবহার না করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় হাতে ধরিয়া রাখিতে পারে (hoard)। এইরূপ নিষ্ক্রিয় নগদ তহবিল ও ঋণ যোগানের একটি উৎস। বাজারে সুদের হার বাড়িলে এইরূপ অলস নগদ তহবিল হইতে বর্তমানে ঋণ যোগান দেওয়া হয়। ফলে, বাজারে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বাড়ে।

উপরি-উক্ত মোট ব্যাঙ্ক-ঋণ, মোট সঞ্চয় এবং অলস নগদ তহবিলের পরিত্যাগের পরিমাণ যোগ দিলেই ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান পাওয়া যাইবে।

ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার: ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সুদের হার সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়। যে হারে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা ও ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান পরস্পর সমান হয় উহাকেই ভারসাম্য সুদের হার (Equilibrium rate of interest) বলা হয়। যদি সুদের হার

সাম্যাবস্থার হার হইতে বেশি হয়, তাহা হইলে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বৃদ্ধি পাইবে। তাহার ফলে সুদের হার কমিয়া সাম্যাবস্থার হারের সমান হইবে। আবার, সুদের হার যদি সাম্যাবস্থার হার অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। তাহার ফলে সুদের হার বাড়িয়া সাম্যাবস্থার হারে পৌঁছাইবে।

সমালোচনা : ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্বের সপক্ষে দাবী করা হয় যে, ইহা সুদের ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব এবং কেইন্‌সের নগদ-পছন্দ তত্ত্ব—এই দুই তত্ত্ব হইতেই উৎকৃষ্টতর। এই তত্ত্বে সুদ নির্ধারণে প্রকৃত ও আর্থিক—এই দুই-প্রকার বিষয়গুলির প্রভাবই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থকগণের মতে তাঁহাদের তত্ত্ব সুদ নির্ধারণে একদিকে যেমন ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের প্রকৃত বিষয়গুলির গুরুত্ব মানিয়া লইয়াছে, অপরদিকে আবার কেইনসের নগদ-পছন্দ তত্ত্বের আর্থিক বিষয়গুলির প্রভাবও স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু তাহা বলিয়া এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন নহে। ঋণযোগ্য তহবিল-তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহাতে জাতীয় আয় স্থির ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সুদের হারের পরিবর্তনের সহিত জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে সুদের হারের বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় বা ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বাড়ে না। সুদের হার বাড়িলে বিনিযোগ কমে, জাতীয় আয় হ্রাস পায়, এবং সঞ্চয়ও হ্রাস পাইয়া থাকে। অনেকের অভিমত এই যে, স্থিতিশীল অবস্থায় ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারণে এই তত্ত্বটির নূতন কোন অবদান নাই।

সুদ প্রদান করা হয় কেন ?

(Why is Interest Paid ?)

সুদ দেওয়া হয় কেন? এই প্রশ্নের জবাব কোন একটি তত্ত্বের সাহায্যে দেওয়া সম্ভব নহে। কেন না, সুদের কোন একটি তত্ত্বই সম্পূর্ণ ও সন্তোষজনক নহে। সুতরাং, সুদ প্রদানের কারণ নির্দেশ করিতে হইলে বিভিন্ন তত্ত্বগুলিতে সুদ সম্পর্কে যে যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই আলোচনা করিতে হইবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে, সুদ প্রদানের পক্ষে অন্যতম যুক্তি

হইল পুঁজির উৎপাদনশীলতা। পুঁজি ছাড়া উৎপাদনের তুলনায় পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন অধিক উৎপাদনশীল। সেইজন্য উৎপাদকগণ যখন পুঁজির সহায়তায় উৎপাদন করে তখন পুঁজি ব্যবহারের মূল্যস্বরূপ সুদ প্রদান করা উচিত। চাহিদার দিক হইতে পুঁজির উৎপাদনশীলতাই সুদ প্রদানের কারণ। আবার, চাহিদার তুলনায় পুঁজির যোগান যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলেও পুঁজি ব্যবহারের দাম সুদ দেওয়া প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ যোগানের দিক হইতে সুদের কারণ ভোগ-বিরতি তত্ত্বদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ হইল ভোগ-বিরতির পুরস্কার। পুঁজি বা ঋণের যোগান সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। আবার, সঞ্চয় করিতে হইলেই বর্তমান ভোগ ত্যাগ করিতে হয়। বর্তমান ভোগ পরিহার করা বেশ কষ্টদায়ক। সেইজন্য যাহারা ভোগ-বিরতি দ্বারা সঞ্চয় করিবে তাহাদের পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক মার্শাল ভোগ-বিরতির তত্ত্বকে কিছুটা সংস্কার করিয়া অপেক্ষা-তত্ত্ব দ্বারা সুদের কারণ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুদ ভোগ-বিরতির পুরস্কার নয়, সুদ অপেক্ষার পুরস্কার। যাহারা সঞ্চয় করে তাহাদের বর্তমান ভোগ ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান ভোগই অধিক আকর্ষণীয়। বর্তমান ভোগ স্থগিত রাখিয়া মানুষ ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য যাহাতে অপেক্ষা করে তাহার জন্য পুরস্কার দেওয়া প্রযোজন। সুদ এই পুরস্কার।

অষ্ট্রীয় অর্থবিজ্ঞানী বম্ ওয়ার্কের অভিমত এই যে, বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত। সেইজন্য মানুষের নিকট বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তিই অধিকতর লোভনীয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ভোগ বা তৃপ্তির প্রতি অনিচ্ছা দূর করিতে পারিলে মানুষ সঞ্চয় ও ঋণদানে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ভবিষ্যৎ ভোগ বা তৃপ্তিকে বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তির সমান করিয়া না তুলিতে পারিলে বর্তমান তৃপ্তির পরিবর্তে ভবিষ্যতে তৃপ্তিলাভে কাহাকেও প্রবৃত্ত করানো সম্ভব নহে। বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তির উপর প্রিমিয়াম হিসাবে কিছু অতিরিক্ত অর্থ না দিলে ভবিষ্যৎ ভোগের প্রতি অনিচ্ছা দূর হইতে পারে না। এই অতিরিক্ত অর্থ ই হইল সুদ। এই অতিরিক্ত অর্থ পাইলেই মানুষ বর্তমান তৃপ্তির পরিবর্তে ভবিষ্যতে তৃপ্তিলাভে রাজী হইবে এবং সঞ্চয় করিবে। ফিশার বম্ ওয়ার্কের তত্ত্বটিকে একটু পরিবর্তন করিয়া সময় পক্ষপাত তত্ত্ব দ্বারা

সুদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মানুষ বর্তমান ভোগকে বেশি পছন্দ করে। বর্তমান ভোগের প্রতি পছন্দ হইতে নিবৃত্ত করিয়া সঞ্চয়ে রাজী করাইতে হইলে তাহাকে কোন পুরস্কারের প্রলোভন দেওয়া প্রয়োজন। সুদ এই পুরস্কারের প্রলোভন।

লর্ড কেইন্‌স সুদ প্রদানের কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, সুদ হইল মানুষের নগদ-পছন্দ পরিত্যাগ করিবার পুরস্কার। মানুষ নগদ টাকা হাতছাড়া করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাহার নগদ টাকা হাতছাড়া করিবার অনিচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য করা যায় যদি তাহাকে পুরস্কার দেওয়া যায়। সুদই এই পুরস্কার।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুদ
(Economic Progress and Interest)

সাধারণত এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের চাহিদা বাড়ে এবং তাহার ফলে সুদের হারও বাড়িয়া থাকে। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে সুদের হার বাড়িলেও প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে সুদের হারের হ্রাস পাইবার দিকেই ঝোঁক দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা ও মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে ঋণের যোগান বাড়িয়া সুদের হার হ্রাস পায়। এই ভাবে অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে আয় যতই বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির যোগানও বাড়িবে ততই সুদের হার হ্রাস পাইবার প্রবণতা দেখা দিবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার কমিবার সম্ভাবনা থাকিলেও সুদের হার কমিতে কমিতে একেবারে শূন্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ এই যে :

সুদের হার কি করিয়া শূন্যে পরিণত হইতে পারে ?

(১) পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা একেবারে শূন্য হইবে ইহা কোন সমাজেই কল্পনা করা যায় না। প্রায় প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি গতিশীল অর্থনৈতিক শক্তি (dynamic economic forces) কাজ করে যাহার ফলে পুঁজির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা একেবারে শূন্যে পরিণত হইতে পারে না।

নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি দ্বারা পুঁজি-সম্পদের ধ্বংসের ফলে মূলধন বা পুঁজির নূতন নূতন চাহিদার সৃষ্টি হইয়া থাকে। পুঁজির এই চাহিদার তুলনায় যোগান দুষ্প্রাপ্য হইলেই সুদ দেওয়ার প্রয়োজনও থাকিবে।

(২) অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যখন লোকের আয় বাড়ে তখন তাহার চাহিদার বৈচিত্র্যও বাড়িতে দেখা যায়। মানুষের চাহিদার বৈচিত্র্য যত বাড়ে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পুঁজির চাহিদাও তত বৃদ্ধি পায়। এইভাবে পুঁজির চাহিদার ফলে ঋণের যোগান দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে এবং সুদের হারও শূন্যে পরিণত হইতে পারে না।

(৩) মানুষ ভবিষ্যতের ভোগ বা তৃপ্তি অপেক্ষা বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি সর্বদাই বেশি পছন্দ করে। মানুষের নিকট বর্তমান ভোগ বা তৃপ্তি অধিক আকর্ষণীয় বলিয়া তাহাকে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করাইতে হইলে সুদ প্রদান করিতেই হইবে। সুতরাং, সুদের হার শূন্য হইতে পারে না।

(৪) মানুষ নগদ টাকা হাতছাড়া করিতে চাহে না কিন্তু নগদ টাকা হাতছাড়া না হইলে সঞ্চয় বা পুঁজি যোগানো সম্ভব নহে। নগদ টাকা পরিত্যাগের অনিচ্ছা দূর করিয়া মানুষকে সঞ্চয়ে রাজী করাইতে হইলে 'সুদ' রূপে পুরস্কার দিতে হয়। সুতরাং, টাকার নগদ-পছন্দের জন্যই সুদের হার শূন্য হইতে পারে না। সুদের হার শূন্য হইলে নগদ টাকার পছন্দ কেহ পরিত্যাগ করিবে না ; ফলে, বাজারে ঋণ বা পুঁজির যোগানও মিলিবে না।

২৬ খাজনা

(Rent)

খাজনার অর্থ কি ?

(Meaning of Rent)

সাধারণভাবে খাজনা কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইযা থাকে। যে কোন স্থায়ী জিনিসের নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া বাবদ যে অর্থমূল্য দেওযা হয় অনেক সময় উহাকেই খাজনা বলা হয। এই অর্থে বাড়িঘর, কলকব্জা, যান-বাহন প্রভৃতির ভাড়া হিসাবে যে মূল্য দেওয়া হয় তাহাই খাজনা। কিন্তু অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই অর্থে খাজনা শব্দটি ব্যবহার করেন না। প্রাচীন-পন্থী অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে, জমি বা যে কোন প্রাকৃতিক সম্পদের (natural resources) ব্যবহারের জন্য যে অর্থ বা দাম দেওয়া হয় তাহাই খাজনা। কিন্তু বসতবাটি বা কারখানা-গৃহের ব্যবহারের জন্য যে ভাডা দেওয়া হয তাহাকে অর্থনৈতিক (economic) বা প্রকৃত বা নীট খাজনা বলা যায় না। ইহার কারণ এই যে, ভাডাটিয়া যখন গৃহের মালিককে খাজনা দেয়, তখন উহাব মধ্যে জমির বাবদ পাওনা ছাডা গৃহনির্মাণে যে মূলধন বিনিযোগ করা হইয়াছে উহার বাবদ সুদ, গৃহ নির্মাণে যে ঝুঁকি গ্রহণ করা হইয়াছে উহার পুরস্কাব বাবদ মুনাফা, বাড়ি নির্মাণের তদারক ও দেখাশোনার বাবদ খরচ ইত্যাদি ধরা হইয়া থাকে। এই খাজনা (যাহা ভাডাটীয়া ও জমির মালিকের মধ্যে চুক্তিদ্বারা ধার্য হইযা থাকে) অর্থনৈতিক বা নীট খাজনা নহে ; ইহাকে মোট খাজনা বলা হয়। মোট খাজনা হইতে সুদ, মজুরি, মুনাফা প্রভৃতি উপাদান বাদ দিলে যাহা পাওয়া যায় তাহাই নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে খাজনা কেবল জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রেই যে দেখা দিয়া থাকে তাহা নহে ; শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ প্রভৃতি উপাদানেব ক্ষেত্রেও খাজনা দেখা দিতে পারে। ইহারা খাজনাকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখিয়া থাকেন। যখন কোন উৎপাদনের উপাদান উহার ন্যূনতম যোগান-দাম অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তখনই উপাদানটি খাজনা লাভ করিয়া থাকে।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব

(The Ricardian Theory of Rent)

প্রাচীন-পন্থী অর্থনীতিবিদ্গণ খাজনার যে সকল ব্যাখ্যা দিযাছেন, উহাদের মধ্যে রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আধুনিক অর্থশাস্ত্রিগণ রিকার্ডোর তত্ত্বের কিছু কিছু অদল-বদল করিয়াছেন বটে ; কিন্তু মূলত খাজনা সম্পর্কে তাঁহার ব্যাখ্যা ও মতবাদ স্বীকৃতি পাইযাছে। রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব নিম্নলিখিত কতকগুলি শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া গডিযা উঠিয়াছে :

(১) প্রথমত তিনি ধরিযা লইয়াছেন যে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ এবং উহার কোন যোগান-দাম নাই।

(২) অনুমান করা হইযাছে যে, উৎপাদনশীলতার দিক হইতে সকল জমি একই পর্যাযের (grade) নহে।

বিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বে অনুমিত শর্তগুলি

(৩) ধবিযা লওযা হইযাছে যে, জমিতে ক্ষীয়মাণ উৎপাদন বিধিটি বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য।

(৪) পরিশেষে, আর একটি অনুমিত শর্ত হইল যে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

এই সকল শর্ত ধরিয়া রিকার্ডো খাজনার যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, উহার মূল বিষয়গুলি নিচে আলোচনা করা হইল :

(১) রিকার্ডো মনে করেন যে, খাজনা হইল জমির উৎপাদনের সেই অংশ যাহা মৃত্তিকার মৌলিক অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেওয়া হইযা থাকে (Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil)। মৃত্তিকার মৌলিক শক্তি বলিতে রিকার্ডো জমির উর্বরতাকে বুঝিযাছেন। তাঁহার মতে, জমির উর্বরতা অবিনশ্বর; বৎসরের পর বৎসর চাষাবাদেও এই শক্তি নষ্ট হয় না।

(২) রিকার্ডোর মতে, খাজনা হইল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয় (Producer's surplus)। চাষের অধীন সকল জমি সমজাতীয় নহে। উর্বরতার দিক দিয়া কোন জমি উৎকৃষ্ট, আবার, কোন জমি নিকৃষ্ট। যে সকল জমি উৎকৃষ্ট উহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। আবার যে সকল জমি নিকৃষ্ট উহাদের উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি। উৎপাদক জমি চাষাবাদ করিয়া উদ্বৃত্ত আয় তখনই উপার্জন করিতে সক্ষম হয় যখন উৎপন্ন পণ্যের দাম

অপেক্ষা উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। যে কোন শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করিয়া এই উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করা যায় না। অনেক জমি আছে যাহা চাষাবাদ করিলে উৎপাদক যে ফলন পায় তাহা বিক্রয় করিয়া কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয়ই উঠাইতে পারে, ব্যয়ের উপর কোন উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিতে পারে না। এই প্রকার জমিকে প্রান্তিক জমি (marginal land) বলা হয়। এই ধরনের জমিকে খাজনাবিহীন জমি (no-rent land) বলিয়া বর্ণন করা চলে। প্রান্তিক জমির চেয়ে উৎকৃষ্ট জমিতেই কেবল খাজনা নামক উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। কেন না, এই প্রকার উৎকৃষ্টতর জমির উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা উৎপন্ন ফসলের দাম বেশি হইয়া থাকে। সুতরাং, প্রান্তিক-উত্তম জমির (intra-marginal land) ফলন এবং প্রান্তিক জমির ফলনের মধ্যে যে পার্থক্য উহাকেই খাজনা বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরাশক্তির তথা ফলনের মধ্যে পার্থক্যের জন্য খাজনার উৎপত্তি হয় বলিয়া খাজনাকে পার্থক্যমূলক আয় (Differential Income or Return) বলিয়া গণ্য করা হয়।

খাজনা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়

(৩) খাজনা উৎপাদন ব্যয়ও পণ্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয় না। খাজনা জমির উদ্বৃত্ত আয়। পণ্যের দাম নির্ধারিত হয় প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় দ্বারা। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে খাজনা নামক উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে না। সুতরাং খাজনা প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত হয় না এবং দাম নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে না। বরং দামই খাজনা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

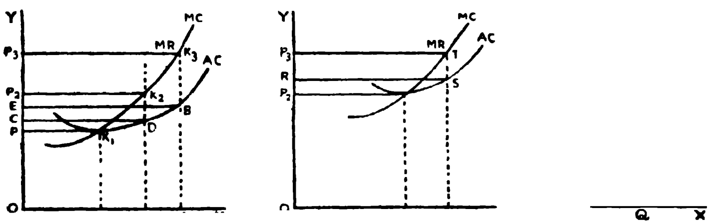
(৪) রিকার্ডো খাজনাকে পার্থক্যমূলক আয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিভাবে জমির উর্বরতার তারতম্যের জন্য পার্থক্যমূলক খাজনার (Differential rent) উৎপত্তি ঘটে তাহার ব্যাখ্যা তিনি এই ভাবে করিয়াছেন :

নূতন বসতিহীন দেশে যখন প্রথম চাষাবাদ শুরু হয় তখন সর্বোৎকৃষ্ট জমির অভাব হয় না। সেই অবস্থায় যখন শুধু সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে চাষাবাদ হয়, তখন দাম ও উৎপাদনের গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয় এবং জমিতে কোন উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটে না। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন সর্বোৎকৃষ্ট 'ক' শ্রেণীর সকল জমি আবাদ হইয়া যায় তখন হয় নিকৃষ্টতর 'খ' শ্রেণীর জমিতে চাষাবাদ প্রসারিত হয় (Extensive cultivation) নতুবা 'ক' শ্রেণীর

পার্থক্যমূলক খাজনার উৎপত্তির কারণ

জমিতেই গভীর বা আত্যন্তিক চাষাবাদ (Intensive cultivation) চলিতে থাকে। এই দুই প্রকার চাষাবাদের ফলেই খাজনার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। সর্বোৎকৃষ্ট জমির সহিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্য যেমন খাজনার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে, তেমনি আবার একই জমিতে বিভিন্নবারের বিনিয়োগের পার্থক্যের দরুনও পার্থক্যমূলক খাজনার উৎপত্তি ঘটিতে পারে। 'ক' শ্রেণীর জমিতে যে পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে, 'খ' শ্রেণীর জমিতেও যদি একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিযোগ করা হয়, তাহা হইলে 'ক' শ্রেণীর জমির ফলনের তুলনায় 'খ' শ্রেণীর জমিতে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হইবে। আবার, 'ক' শ্রেণীর জমিতে প্রথমবার যে পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার যদি শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ বাড়ানো হয় তাহা হইলে ঐ একই জমি হইতে প্রথমবারের বিনিয়োগ দ্বারা যে ফলন পাওযা গিয়াছিল দ্বিতীয়বারের বিনিয়োগ দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম ফলন পাওয়া যাইবে। মনে কর, দুইখণ্ড ভিন্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমি 'ক' ও 'খ' প্রত্যেকে ৩০ মণ করিয়া গম উৎপাদন করে। 'ক' জমিতে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১০৲ টাকা, 'খ' জমিতে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় ১৫৲ টাকা। যখন পণ্যের বাজার দাম মণ প্রতি ১০৲ টাকা তখন 'ক' জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না; কিন্তু যদি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায এবং বাজার-দাম বাড়িয়া মণ প্রতি ১৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে 'খ' জমি চাষাবাদের অধীন আসিবে; এবং 'ক' জমি উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয় খাজনা উপার্জন করিবে। 'ক' জমির উৎপাদন ব্যয় ৩০০৲ (১০৲ × ৩০) টাকাই থাকিবে। কিন্তু বাজারে দাম বাড়িয়া মণ প্রতি ১৫৲টাকা হওয়ায় মোট বিক্রয় দাম(১৫৲ × ৩০) = ৪৫০৲ টাকা হইবে। সুতরাং, 'ক' জমিতে ১৫০৲টাকার উদ্বৃত্ত আয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে। পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে আত্যন্তিক চাষাবাদও হইতে পারে। এক্ষেত্রে ক্ষীয়মাণ উৎপন্নের বিধি কার্যকর হওয়ায় উৎপাদকের উদ্বৃত্ত লাভ ঘটিবে। মনে কর, শ্রম ও মূলধন বাবদ প্রথমে জমিতে ১০৲ টাকা পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইল। এই বিনিয়োগের ফলে পণ্যের ফলন হইল ১ কিলো। ঐ জমিতে আর ১ কিলো ফলন বাড়াইতে হইলে আরও ১৮৲ টাকার মত বিনিয়োগের প্রয়োজন। যদি পণ্যের বাজার দাম ১০৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা হয় তাহা হইলেই দ্বিতীয়বার

বিনিয়োগ করা সম্ভব। দ্বিতীয়বার ১৫৲ টাকা বিনিয়োগ করা হইলে প্রথম-বারের বিনিয়োগ (১০৲ টাকা) ৫৲ টাকার সমান উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিবে। এইভাবে জমির উর্বরতার পার্থক্যের দরুন কিংবা একই জমিতে বিভিন্নবার যে বিনিয়োগ করা হয় তাহার মধ্যে পার্থক্যের দরুন পার্থক্যমূলক খাজনার (Differential rent) উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। পার্থক্যমূলক খাজনার কিভাবে উৎপত্তি হয়, তাহা নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হইল :



'ক' শ্রেণীর জমি 'খ' শ্রেণীর জমি 'গ' শ্রেণীর জমি

মনে করা যাক, তিন খণ্ড বিভিন্ন শ্রেণীর জমি একই প্রকার পণ্য উৎপাদন করিতেছে। 'ক' শ্রেণীর জমি উর্বরতার দিক দিয়া সর্বোৎকৃষ্ট। 'খ' শ্রেণীর জমি উহার চেয়ে নিকৃষ্ট। আর 'গ' শ্রেণীর জমি সর্ব-নিকৃষ্ট। যখন শুধু সর্বোৎকৃষ্ট জমি 'ক' চাষাবাদ করা হয় তখন উৎপাদক কোন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা উপার্জন করিতে পারে না। এই জমিতে উৎপাদক OM_1 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে এবং বাজার-দাম OP গড় ব্যয় K_1M_1-এর সহিত পরস্পর সমান হইবে। কিন্তু এখন যদি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে বাজার-দামও বাড়িবে। মনে কর, বাজার-দাম বাড়িয়া OP_2 হইল। ইহাতে 'ক' জমিতে আত্যন্তিক চাষকর্ম হইবে। OP_2 দামে ঐ জমি হইতে OM_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে এবং দ্রব্য যোগানের এই স্তরে জমির দাম প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে। এই আত্যন্তিক চাষের ফলে (Intensive cultivation) জমির প্রান্তিক ব্যয় K_2M_2 গড় ব্যয় DM_2 অপেক্ষা বেশি হইবে। ফলে, এই জমিতে CDK_2P_2 ক্ষেত্রের সমান খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে। আবার পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত চাষাবাদও (Extensive cultivation) শুরু হইবে, 'খ' শ্রেণীর জমি কৃষিকার্যের অধীন আসিবে। এই জমি ON পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে। এই জমির গড়পড়তা ব্যয় পণ্যের বাজার-দামের সহিত সমান হওয়ায় প্রান্তিক জমি বলিয়া

পণ্য হইবে। ফলে, এই জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না। পণ্যের চাহিদা আরও বাড়িলে বাজার-দামও বাড়িয়া, ধর, OP_3 হইল। তাহা হইলে 'ক' জমি OP_3 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে। প্রান্তিক ব্যয় K_3M_3 এবং গড় ব্যয় BM_3-এর মধ্যে পার্থক্য আরও বাড়িবে। ফলে, সর্বোৎকৃষ্ট জমি 'ক'-এর উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা বাড়িয়া EBK_3P_3 ক্ষেত্রের সমান হইবে। 'খ' জমিতে আত্যন্তিক চাষাবাদ হওয়ার ফলে ON_1 পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনে গড়পড়তা ব্যয় দামও প্রান্তিক আয় হইতে কম হইবে। ফলে, এই জমিতে এখন $RSTP_3$ ক্ষেত্রের সমান খাজনার উৎপত্তি হইবে। কিন্তু 'গ' শ্রেণীর জমি OQ পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে। এই উৎপাদনে জমির গড় ব্যয়, পণ্যের দাম ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে। ফলে, এই জমিতে খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না।

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের বিরুদ্ধ-সমালোচনা
(Criticism of the Ricardian Theory of Rent)

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নলিখিত একাধিক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে :

(১) খাজনা জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তির দাম—রিকার্ডোর এই মতবাদ সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। মৃত্তিকার শক্তি সম্পূর্ণ আদিম ও অবিনাশী নহে। মৃত্তিকার আদিম শক্তি কতটা এবং অর্জিত শক্তি কতটা তাহা পৃথক করা সহজ নহে। তাহাছাড়া, উপর্যুপরি কৃষিকার্যের ফলে মৃত্তিকার আদিম শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জমির খাজনা শুধু মৃত্তিকার আদিম শক্তির মূল্য নহে, উহা জমির অবস্থিতি, পণ্য পরিবহণের ব্যয় ইত্যাদি বিষয়ের উপরও বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে।

(২) রিকার্ডো চাষাবাদের যে ঐতিহাসিক ধারা (Historical order of cultivation) নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা তথ্যগতভাবে সত্য নহে। তাঁহার ধারণা যে, উর্বরতম জমিতেই সর্বাগ্রে চাষাবাদ হয়, অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে পরে চাষাবাদ হয়—ইতিহাস সর্বত্র এ সাক্ষ্য দেয় না।

(৩) রিকার্ডোর মতানুযায়ী কেবল জমিই উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে খাজনা উপার্জন করিতে পারে—ইহাও সত্য নহে। যে কোন উপাদানের আয়ের মধ্যেই খাজনার অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) রিকার্ডো মনে করেন যে, খাজনা উৎপত্তির মূল কারণ হইল জমির উর্বরতার পার্থক্য। কিন্তু জমি কিংবা যে কোন উপাদানের স্বল্পতার দরুন যে খাজনা উৎপত্তি ঘটিতে পারে তাহার ব্যাখ্যা তিনি করেন নাই।

(৫) খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয় না, বরং দামদ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়—রিকার্ডোর এই অনুসিদ্ধান্তটি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতে সত্য। কিন্তু উৎপাদকের দিক হইতে কিংবা জমির কোন একটি ব্যবহারের দিক হইতে খাজনা দামের অপরিহার্য অংশ ও ইহা পণ্যের দামকে নির্ধারণ করে।

(৬) রিকার্ডোর প্রান্তিক জমির ধারণাটির খাজনা উৎপত্তি ও উহার কারণ বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না।

(৭) রিকার্ডো জমির উর্বরতার পার্থক্যের ভিত্তিতে খাজনার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু সকল জমির উর্বরতা এক হইলেও যে খাজনার উৎপত্তি ঘটিতে পারে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ করেন নাই।

(৮) রিকার্ডো তাহার খাজনা-তত্ত্বে সমাজে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান রহিয়াছে অনুমান করিয়া লইয়াছেন। এই অনুমানটি অবাস্তব।

রিকার্ডোর তত্ত্বটি বহু সমালোচিত হইলেও উহার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার মতে খাজনা অনুপার্জিত আয় (unearned income)। এই আয় উপার্জন করিতে জমির মালিককে কোনরূপ চেষ্টা বা শ্রম করিতে হয় না। পণ্যের বাজার-দাম গড় উৎপাদন ব্যয়ের বেশি হইলেই খাজনার উৎপত্তি ঘটে। এইরূপ আয়কে কর কিংবা অন্য কিছুর মাধ্যমে বিলোপ করিতে পারিলে ন্যায়বিচার ও সমাজ কল্যাণের পথ সুগম হইতে পারে—রিকার্ডোর তত্ত্বটি সেই ইঙ্গিত দিয়া থাকে।

খাজনার আধুনিক তত্ত্ব
(The Modern Theory of Rent)

রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইল :

(১) খাজনা প্রকৃতি-দত্ত উপাদান জমির আয়।

(২) খাজনা উৎপত্তির কারণ হইল জমির উর্বরতার পার্থক্য।

(৩) কোন্ জমিতে কতটা পরিমাণ খাজনা পাওয়া যাইবে তাহা প্রান্তিক জমির ফলনের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। ঐ জমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং প্রান্তিক জমির উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্যই ঐ জমির খাজনার পরিমাপ।

(৪) খাজনা পণ্যের দামের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং উহা দাম নির্ধারণ করে না। পণ্যের দামই খাজনা নির্ধারণ করে।

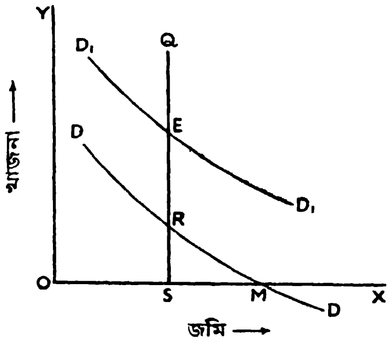
আধুনিক খাজনা-তত্ত্বে খাজনাকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বের অন্যান্য মূল বক্তব্যগুলি মানিয়া লয় নাই। রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্বে জমির উর্বরতার পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন জমিতে খাজনার পার্থক্য কেন ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, কিন্তু খাজনা উৎপত্তির প্রধান কারণ কি তাহা নির্দেশ করা হয় নাই।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্গণের মতে খাজনা উৎপত্তির মূলে প্রধান কারণ হইল, চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের দুষ্প্রাপ্যতা। জমির যোগান যদি স্বল্প বা সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে চাহিদার যতই বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, জমির যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প হইত না। সে অবস্থায় জমির কোন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনারও উৎপত্তি ঘটিত না। কিন্তু বাস্তবে জমির মোট যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়া উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেশের সকল জমি একই প্রকার উর্বর হইলেও চাহিদার তুলনায় জমির যোগান স্বল্প হইলেই উহাতে খাজনার উৎপত্তি ঘটে। জমিতে এই ভাবে যখনই খাজনার উৎপত্তি ঘটে উহাকে দুষ্প্রাপ্যতা খাজনা (scarcity rent) বলা হয়। বস্তুত জমির দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই উহার উর্বরতার পার্থক্য, ক্ষীয়মাণ উৎপাদন বিধির প্রযোগ প্রভৃতি দেখা যায়। সেইজন্য রিকার্ডোর পার্থক্যমূলক খাজনা দুষ্প্রাপ্যতা খাজনা হইতে পৃথক নহে।

খাজনা উৎপত্তির মূল কারণ হইল জমির দুষ্প্রাপ্যতা

সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে মোট জমির অন্য কোনও বিকল্প ব্যবহার নাই। উহা কেবল চাষাবাদেই নিয়োগ লাভ করে। ফলে, জমির কোন যোগান-দাম নাই। সেই জন্য খাজনার সমস্তটাই জমির উদ্বৃত্ত আয়। যোগানের দিক হইতে দেখিতে গেলে সমাজে সামগ্রিক জমির যোগান সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জমির আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিতে জমির যোগান একটুও পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, জমির কোন বিকল্প ব্যবহার না থাকায় উহা কোন সুযোগ-আয় (opportunity earnings) লাভ করিতে পারে না। আবার, জমির কোন সুযোগ-আয় না থাকায় উহার কোন যোগান-দামও (supply price) নাই। আবার চাহিদার দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমির চাহিদা নির্ভর করে ফসলের চাহিদার উপর। বাজারে ফসলের চাহিদা ও দাম

বাড়িলে জমির চাহিদাও বাড়িবে, আবার, ফসলের চাহিদা ও দাম কমিলে জমির চাহিদাও কমিবে। সেই হিসাবে জমির চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand) বলা হয়। জমির চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপন্ন দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। জমিতে ক্ষীয়মাণ উৎপন্ন বিধি কার্যকর হওয়ায় জমির প্রান্তিক উৎপন্ন রেখা বামদিক হইতে ডানদিকে নিম্নমুখী হইয়া থাকে। সুতরাং, জমির চাহিদা-রেখাও বাম হইতে দক্ষিণে ও নিম্নমুখে ঢালসম্পন্ন হয়। জমির চাহিদা ও যোগানের দ্বারা খাজনা কিভাবে নির্ধারিত হয়, নিচেব রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় :



যখন যোগানের তুলনায় জমির চাহিদা সীমাবদ্ধ ছিল, তখন জমিব প্রান্তিক উৎপন্ন-রেখা বা চাহিদা-রেখা ছিল DD। DD চাহিদা-রেখা জমির যোগান-রেখাকে M বিন্দুতে ছেদ করিয়াছিল। তখন চাষাবাদেব জন্য জমির পরিমাণ ছিল OM। জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটে নাই। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল। তখন জমির যোগানের পরিমাণ দাঁড়াইল SO এবং জমির যোগান-রেখা হইল SQ। এবার জমির চাহিদা-রেখা জমিব যোগান-রেখাকে R বিন্দুতে ছেদ করিল। ফলে, জমির মালিক SR পরিমাণ খাজনা উপার্জন করিতে সক্ষম হইল। জমির চাহিদা যদি আবও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে নূতন চাহিদা-রেখা হইবে D_1D_1। কিন্তু জমিব যোগান সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় যোগান-রেখা SQই থাকিবে। নূতন চাহিদা-রেখা D_1D_1 যোগান-রেখা SQকে E বিন্দুতে ছেদ করিবে।

খাজনার পরিমাণ SE নির্ধারিত হইবে। সুতরাং, সমাজের দিক হইতে সামগ্রিক জমির কথা ধরিলে খাজনা উৎপত্তির মূলে রহিয়াছে জমির দুষ্প্রাপ্যতা। পণ্যের দাম বাড়িলে জমির চাহিদা বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে খাজনাও বাড়ে। অতএব খাজনা পণ্যের দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। আবার, সমাজের সকল জমির সামগ্রিকভাবে কোন যোগান-দাম নাই বলিয়া জমির যে আয় উহার সমস্তটাই উদ্বৃত্ত আয়, উহা ফসলের দামকে প্রভাবিত করিতে পারে না।

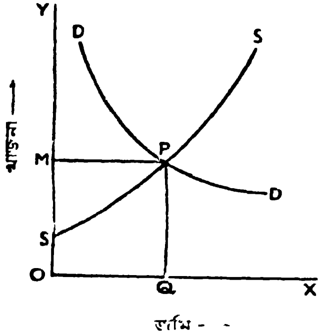
পার্থক্যমূলক খাজনা ও জমির চাহিদাও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। উর্বরতার ভিত্তিতে জমির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীর জমির নিজ নিজ চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা যে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই সেই বিন্দুতেই খাজনার ভারসাম্য হার স্থির হয়।

কিন্তু একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা একটি শিল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, একই জমির একাধিক বিকল্প ব্যবহার সম্ভব, একই জমি বিভিন্ন ব্যবহারে নিযোগ করা যায়। যে জমিতে ধান চাষ করা যায়, সেই জমিতে আবার পাটচাষও করা চলে। যে জমি একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্প ব্যবহার করিতেছে তাহা অন্য প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভব। যে কোন জমির যখন বিকল্প ব্যবহার সম্ভব, তখন কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে উহার যোগান স্থির-নির্দিষ্ট নহে ;. ঐ জমির কোন যোগান-দাম নাই, তাহাও সত্য নহে। জমির যখন বিকল্প ব্যবহার আছে, তখন উহার বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়ও (Alternative earnings or transfer earnings) আছে। কোন ফার্ম বা শিল্পের নিকট জমির বিকল্প আয়ই ঐ জমির যোগান-দাম। কোন ফার্ম বা শিল্পে বর্তমানে নিয়োজিত জমির যোগান-দাম ন্যূনতম ততটা হওয়া আবশ্যক যতটা ঐ জমি পরবর্তী কাম্যতম বিকল্প ব্যবহারে উপার্জন করিতে পারিত।[১] বিকল্প ব্যবহারে যে ন্যূনতম পারিশ্রমিক জমি উপার্জন করিতে পারিত তাহা যদি এই প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে না পায় তাহা হইলে উহা বিকল্প ব্যবহারে আকৃষ্ট হইবে। ফলে, এই প্রতিষ্ঠান বা শিল্পে

১. "The supply price or minimum remuneration of a factor in its present employment is determined by what it can earn from its next best alternative employment."

জমির যোগান হ্রাস পাইবে। সুতরাং, একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট জমির যোগান পরিবর্তনীয়—উহার যোগানের হার বৃদ্ধি নির্ধারিত হয় জমির বিকল্প ব্যবহারে সম্ভাব্য উপার্জন অর্থাৎ উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় দ্বারা। যদি একটি প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে নিয়োজিত কোন জমির আয় উহার বিকল্প আয়ের সমান হয় তাহা হইলে ঐ জমিতে কোন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উৎপত্তি ঘটিবে না। উহা তখন বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের সমান হইবে। কিন্তু কোন একটি প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে নিয়োজিত জমি যদি উহার বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় (= যোগান-দাম) অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক উপার্জনে সক্ষম হয় তাহা হইলে বিকল্প আয় হইতে যেটুকু অতিরিক্ত পারিশ্রমিক উহা লাভ করিয়া থাকে উহাকেই ঐ জমির আয়ের উদ্বৃত্ত বা খাজনা বলিয়া ধরা হইবে। জমির বর্তমান ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রকৃত পারিশ্রমিক উহার বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা যতটুকু বেশি সেইটুকুই উহার খাজনা। সুতরাং, জমির আয়ের সমস্তটাই উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা নহে। কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট একখণ্ড জমির খাজনা বলিতে ততটুকু বুঝায় যতটুকু ঐ জমির বর্তমান বা প্রকৃত আয় উহার বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ খাজনা = জমির বর্তমান বা প্রকৃত আয় (Present earnings or actual earnings) – বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় (Alternative earnings or transfer earnings)। কি ভাবে বিকল্প আয় বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের ভিত্তিতে খাজনা নির্ধারিত হয় পার্শ্বস্থ রেখাচিত্রের সাহায্যে তাহা ব্যাখ্যা করা হইল :

বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের ভিত্তিতে খাজনার ব্যাখ্যান



কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট জমির যোগান-রেখা SS দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। জমির যোগান-রেখাটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন অর্থাৎ বামদিক হইতে দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখী। ইহার কারণ এই যে, জমির যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপকও নহে, আবার

পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকও নহে। জমির চাহিদা-রেখা DD-এর ঢাল ঋণাত্মক। চাহিদা-রেখা ও যোগান-রেখা P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য খাজনার হার PQ এবং ভারসাম্য জমির পরিমাণ OQ নির্ধারিত হইয়াছে। এখন OQ পরিমাণ জমি ব্যবহার করিয়া প্রতিষ্ঠান বা শিল্প মোট আয় উপার্জন করিতেছে $OQ \times QP = OQPM$। কিন্তু এই মোট আয়ই জমির খাজনা বলিয়া ধরা যায় না। এই মোট আয় হইতে জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় (যোগান-দাম) OSPQ বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যাইবে তাহাই খাজনা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা হইবে $OQPM - OSPQ = SMP$।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌গণ খাজনার এই তত্ত্বটিকে আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যে, শুধু জমির ক্ষেত্রেই খাজনা বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়েরউপর উদ্বৃত্ত পাওনা বা আয় রূপে যে দেখা দেয় তাহা নহে। শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগের ক্ষেত্রেও খাজনারূপে উদ্বৃত্ত আয়ের উৎপত্তি ঘটিতে পারে। প্রত্যেকটি উপাদানের আয়ের মধ্যেই খাজনার অংশ থাকিতে পারে। উৎপাদনের কোন উপাদানের যোগানই সম্পূর্ণভাবে অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ নহে। আবার কোন উপাদানই সম্পূর্ণভাবে কোন একটি বিশেষ নিয়োগের উপযোগী হয় না। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উপাদানেরই বিকল্প ব্যবহার সম্ভব। কোন্ উপাদান কতটা পরিমাণ কোন বিশেষ নিযোগের উপযোগী (specific) তাহা ঐ উপাদানের বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। মনে কর, কোন একজন শ্রমিক পাটের কলে সপ্তাহে ২০৲ টাকা মজুরিতে কাজ করে। সে যদি কাপড়ের কলে খাটিয়াও সপ্তাহে ঐ ২০৲ টাকাই পাইত তাহা হইলে ঐ শ্রমিকের পাটের কলে বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় ২০৲ টাকা। তাহার বর্তমান বা প্রকৃত আয় এবং বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এক্ষেত্রে শ্রমিকটি পাটের কলের কাজে বিশেষ উপযোগী নহে।

উপাদানের প্রকৃত আয় ও ক্ষেত্রান্তর আয়ের মধ্যে পার্থক্যের দরুন খাজনার উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে

তাহার পাটের কলের মজুরি ও ক্ষেত্রান্তর আয় সমান। ফলে, তাহার মজুরিতে কোন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার অংশ নাই। কিন্তু সে যদি পাটের কলে সপ্তাহে ৩০৲ টাকা মজুরি পায় আর তাহার ক্ষেত্রান্তর আয় হয় সপ্তাহে ২০৲ টাকা, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রান্তর আয় অপেক্ষা ৫৲টাকা অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিবে। এই উদ্বৃত্ত আয় ৫ টাকাই শ্রমিকের মজুরির

মধ্যে খাজনার অংশ বলিয়া ধরা হয়। এই উদ্বৃত্ত আয়টুকু বা খাজনার অংশ শ্রমিক তাহার বিশেষীকৃত কাজের জন্য লাভ করিযা থাকে। এইভাবে মূলধন ও সংগঠনের আয় সুদ এবং মুনাফার মধ্যেও উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা-জাতীয় অংশ থাকিতে পারে।

মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনার উপাদান
(Rent Element in Wages, Interest and Profit)

খাজনাকে জমির উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে ধরা হয়। জমির এই উদ্বৃত্ত আয বা খাজনা উৎপত্তির মূল কারণ হইল চাহিদার তুলনায় জমির দুষ্প্রাপ্যতা। জমির উর্বরতার পার্থক্যের দরুনও খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখা দিতে পারে। আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে যোগানের সীমাবদ্ধতা ও পার্থক্যের দরুন প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার অংশ উৎপাদনের সকল উপাদানের আয়ের মধ্যেই থাকা সম্ভব। খাজনাকে এইভাবে সকল উপাদান-আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা যায় বলিয়া জমির খাজনাকে এক বড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম প্রধান শ্রেণী বলিযা নির্দেশ করা হয।[১] মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ কিভাবে কতটা থাকিতে পারে, নিচে তাহার আলোচনা করা হইল।

মজুরির মধ্যে খাজনার অংশ দেখা দিতে পারে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার পার্থক্যের দরুন। সকল শ্রমিক সমান দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন নহে। অনেক শ্রমিক আছে যাহাদের উৎপাদন দক্ষতা উৎপাদন ব্যযের অতিরিক্ত কোন উদ্বৃত্ত আয় উপার্জনে সক্ষম নহে। এই শ্রেণীর শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক বলা হয়। ইহাদের মজুরির মধ্যে কোন খাজনার অংশ দেখিতে পাওয়া যায না। কিন্তু প্রান্তিক শ্রমিকের তুলনায় যাহারা অধিক দক্ষ তাহারা উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক মজুরি পাইয়া থাকে। তাহাদের এই উদ্বৃত্ত আয়কে খাজনা বলা চলে। এই উদ্বৃত্ত আয়কে শ্রমিকের যোগ্যতার খাজনা (Rent of ability) বলা হয়। কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের দিক হইতে দেখিতে গেলে, কোন শ্রমিকের নিয়োগ উহার বিকল্প আয বা ক্ষেত্রান্তর আয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে কাজ করিবার

১. Marshall : Rent of land is "the leading species of a large genus."

সময় শ্রমিক যদি শুধু বিকল্প আয়ের (নিম্নতম যোগান-দামের) সমান মজুরি পায়, তাহা হইলে ঐ আয়ের মধ্যে খাজনা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রমিকের প্রকৃত আয় যদি বিকল্প আয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহা হইলে সে যে উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিবে ঐ উদ্বৃত্ত আযই তাহাব মজুরিতে খাজনার অংশ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

পুঁজি বা মূলধনের আয়, সুদের মধ্যেও, খাজনার অংশ থাকিতে পারে। মূলধনের নিম্নতম যোগান-দাম অপেক্ষা উহার প্রকৃত দাম যদি বেশি হয়, তাহা হইলে মূলধন খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিবে। মনে কর, পুঁজিপতিগণ শতকরা ২৲ টাকা হারে মূলধন কর্জ দিতে রাজী আছে। ইহাই হইল মূলধনেব বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তব আয। কিন্তু বাজারে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি সুদেব হার শতকরা ৪৲ টাকা দাঁড়ায়, তাহা হইলে যে সকল পুঁজিপতি পূর্বে শতকরা ২৲ টাকা সুদে মূলধন বিনিয়োগ করিতে রাজী ছিল, তাহারা এখন শতকরা ৪৲ টাকা হারে সুদ পাইবে। ফলে, তাহাদের বর্তমান বা প্রকৃত আয বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয অপেক্ষা বেশি হইবে। তাহাদের আয়ে ২% হারে উদ্বৃত্তের উৎপত্তি ঘটিবে। ইহাই তাহাদের সুদের মধ্যে খাজনার অংশ।

অনেক উদ্যোক্তার আয়ের মধ্যেও খাজনার অংশ নিহিত থাকিতে পারে। সকল উদ্যোক্তার সমান পরিচালনা ও সংগঠন নৈপুণ্য থাকে না। অন্যান্য উপাদানের সহিত দামদস্তুর করিবার ক্ষমতা সকল উদ্যোক্তার সমান নহে। অনেক উদ্যোক্তা আছেন যাহারা স্বাভাবিক মুনাফা (Normal profit) পাইলেই উৎপাদনে থাকিযা যান। এই স্বাভাবিক মুনাফাই এই শ্রেণীর উদ্যোক্তা-গণের নিম্নতম যোগান-দাম। ইঁহারা প্রান্তিক উদ্যোক্তা। ইঁহাদের নৈপুণ্যকে প্রান্তিক নৈপুণ্য বলে। এইরূপ প্রান্তিক উদ্যোক্তাগণের তুলনায় যাহারা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন তাঁহারা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অধিকতর মুনাফা লাভ করিতে পারেন। ইঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক সংগঠন-নৈপুণ্য, দামদস্তুর করিবার ক্ষমতা, একচেটিয়া কর্তৃত্ব লাভ, আকস্মিক বা অস্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির দরুন নিম্নতম যোগান-দাম (=স্বাভাবিক মুনাফা) হইতে বেশি মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হন। নিম্নতম যোগান-দাম বা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা ইঁহারা যে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে সক্ষম হন উহাই ইঁহাদের মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ।

উপরের আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্ন উপাদানগুলির আয়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নাই, পার্থক্য হইল তারতম্যের পার্থক্য।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক

(Relation between Rent and Price)

রিকার্ডোর মতে, খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্গত নহে এবং সেইহেতু পণ্যের দাম নির্ধারণ করে না। অপর পক্ষে, খাজনাই দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। (Rent is price-determined rather than price-determining)।

পণ্যের দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান। প্রান্তিক জমির পণ্য বিক্রয় করিয়া স্বাভাবিক মুনাফার সহিত উৎপাদন ব্যয় উঠিয়া আসে মাত্র, উহার অতিরিক্ত কোন উদ্বৃত্ত আয় আসে না। ফলে ঐ জমিতে খাজনার উৎপত্তি ঘটে না। প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে খাজনা অন্তর্ভুক্ত হয় না বলিয়া খাজনা পণ্যের দাম নির্ধারক নহে। বরং দামই খাজনার নির্ধারক। জমির উচ্চ খাজনা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ নয়, অপর পক্ষে, উচ্চ পণ্যমূল্যই খাজনা বৃদ্ধির কারণ।[১] চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পণ্যের দাম বাড়িলে নিকৃষ্টতর জমিতে কৃষিকার্য প্রসারিত হয়। নিকৃষ্টতর জমিতে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় উৎকৃষ্টতর জমিতে পণ্য উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। যে জমিতে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় ফসলের বাজার দামের সহিত সমান হয় সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বলা হয়। দাম বৃদ্ধির দরুন কৃষিকার্য এই প্রান্তিক জমি পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোন খাজনার উৎপত্তি ঘটে না। কিন্তু প্রান্তিক জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা ফসলের বাজার-দাম বেশি হয়। প্রান্তিক-উত্তম জমিতে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ফসলের বাজার-দাম যতটুকু

রিকার্ডোর মতে, খাজনা দাম নির্ধারণ করে না, দামই খাজনাকে নির্ধারণ করে

১. Ricardo : "Corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high"

বেশি হয় সেইটুকুই উৎকৃষ্টতর জমির উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। ফসলের বাজার-দাম যতই বাড়িবে ততই খাজনার পরিমাণও বেশি হইবে। বর্তমানে যে জমি প্রান্তিক জমি বলিয়া ধরা হয়, পণ্যের চাহিদা ও ফসলের বাজার-দাম বাড়িতে থাকিলে ভবিষ্যতে ঐ জমিও প্রান্তিক-উত্তম জমি বলিয়া গণ্য হইবে এবং উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

খাজনা ও দামের সহিত রিকার্ডো যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন আধুনিক খাজনা-তত্ত্বে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই। আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে খাজনা দাম নির্ধারণ করে, না দাম দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়, তাহা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিষয়টি বিচার করা হইতেছে তাহার উপর।[১] খাজনাকে তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করা যাইতে পারে—সমগ্র সমাজ, নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট শিল্প।

রিকার্ডো খাজনাকে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নাই; জমি একটিমাত্র ফসল উৎপাদনের উপযোগী। ফলে, জমির কোন বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর আয় নাই। সেইজন্য জমি ব্যবহারের কোন যোগান-দামও নাই। সুতরাং জমির আয়ের সমস্তটাই উদ্বৃত্ত বা খাজনা। জমির এই উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা দাম নির্ধারণ করে না। খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে। সুতরাং, সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে রিকার্ডো খাজনা ও দামের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন তাহা সত্য।

কিন্তু কোন একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান অথবা শিল্পের নিকট জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। যে জমিতে ধান রোপণ করা চলে, সেই জমিতে পাটচাষও চলিতে পারে। কোন এক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে জমি নিয়োগ করিতে হইলে অন্য প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে ঐ জমি যে আয় পাইতে পারিত কমপক্ষে ঐ জমিকে উহা দিতে হইবে। তাহা না দিলে ঐ জমি

১. Samuelson: "Whether rent is or is not a price-determining cost depends upon the level of view-point: firm, industry or whole-economy."

ক্ষেত্রান্তরে নিয়োগ লাভ করিবে। ইহাকে বলে ঐ প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের নিকট জমির বিকল্প বা ক্ষেত্রান্তর ব্যয়। আবার, ইহাই হইল জমির যোগান-দাম। জমির এই ক্ষেত্রান্তর ব্যয় ফসল উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি জমি ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকে ক্ষেত্রান্তর ব্যয়ের চেয়ে বেশি দাম দিতে হয় তাহা হইলে জমি উহার ক্ষেত্রান্তর আয় (যোগান-দাম) অপেক্ষা যে উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিবে তাহাও উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হইবে। অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রান্তর ব্যয় (=ক্ষেত্রান্তর আয়) এবং জমি সংগ্রহের বাবদ অতিরিক্ত দাম (=খাজনা) এই দুইএর সমস্তটাই উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। সুতরাং, কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষেত্রান্তর ব্যয় + খাজনা (=অতিরিক্ত দাম) উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং পণ্যের দাম নির্ধারণ করে। প্রতিষ্ঠান বা শিল্পকে ক্ষেত্রান্তর ব্যয় ও খাজনা বেশি দিতে হইলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে এবং সেইহেতু উৎপন্ন পণ্যের দামও বৃদ্ধি পাইবে।

কোন উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের দিক হইতে খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অন্যতম অংশ ও দাম নির্ধারণ করে

খাজনার অনুরূপ আয় বা প্রায়-খাজনা
(Quasi-Rent)

খাজনার অনুরূপ আয় বা প্রায়-খাজনার ধারণাটি অধ্যাপক মার্শালের অবদান। মার্শালের মতে, কেবলমাত্র জমিই যে উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিয়া থাকে তাহা নহে। মানুষের তৈয়ারি উৎপাদনের বহু উপকরণ (Man-made instruments of production), যথা, কারখানা-গৃহ, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, যান পরিবহণ প্রভৃতিও উদ্বৃত্ত আয় লাভ করিতে পারে। মনুষ্য-নির্মিত উৎপাদনের উপকরণ বা উৎপাদক দ্রব্যের আয়কে তিনি খাজনার অনুরূপ আয় বা প্রায়-খাজনা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জমির যোগান স্বল্পকাল কিংবা দীর্ঘকালে অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ। এই অস্থিতিস্থাপকতা বা দুষ্প্রাপ্যতার দরুন জমির খাজনা উদ্বৃত্ত আয় রূপে দেখা যায়। মনুষ্য-নির্মিত উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান দীর্ঘকালীন সময়ে স্থিতিস্থাপক হইলেও স্বল্পকালীন সময়ে অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ। স্বল্পকালীন সময়ে এই সকল উৎপাদক দ্রব্যগুলির চাহিদা বাড়িলে যোগান স্থির বলিয়া উহারা

স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় লাভ করিতে পারে। উহাদের এই অতিরিক্ত আয় অনেকটা খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া উহাকে খাজনার অনুরূপ বলা হয়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে, যে কোন উপাদানের যোগান যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে তাহা হইলে উহার আয়কে খাজনার অনুরূপ আয় বলা চলে।[১]

খাজনা ও খাজনার অনুরূপ আযেব সাদৃশ্য

অর্থনৈতিক খাজনা এবং খাজনার অনুরূপ আয়—দুইই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়। দুই-এরই উৎপত্তি ঘটে যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুন। জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া খাজনার উৎপত্তি ঘটে। মনুষ্য-নির্মিত উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান অস্থিতিস্থাপকতার দরুন খাজনার অনুরূপ আয়ের উৎপত্তি ঘটে। খাজনা পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে, উহা পণ্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং দাম নির্ধারণ করে না। সেইরূপ খাজনার অনুরূপ আয়ও স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না, পণ্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং দাম নির্ধারণ করে না। কিন্তু খাজনা এবং খাজনার অনুরূপ আয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্য থাকিলেও, খাজনার অনুরূপ আয় প্রকৃতপক্ষে খাজনা নহে।

খাজনা ও খাজনার অনুরূপ আয়ের পার্থক্য

খাজনা ও খাজনার অনুরূপ আয়ের মধ্যে পার্থক্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খাজনার উৎপত্তি ঘটে দীর্ঘকালীন সময়ে জমির স্বল্পতা বা অস্থিতিস্থাপকতার দরুন।: কিন্তু খাজনার অনুরূপ আয়ের উদ্ভব ঘটে স্বল্পকালীন সময়ে মনুষ্য-নির্মিত উৎপাদনের উপকরণ বা পুঁজিপাতির অস্থিতিস্থাপকতার দরুন। স্বল্পকালীন সময়ে যদি বাড়িঘর, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্যগুলি চাহিদার তুলনায় স্বল্প থাকে, তাহা হইলে উহারা উহাদের স্বাভাবিক আয়ের উপর খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে এই সকল দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তখন এই সকল দ্রব্য উহাদের স্বাভাবিক আয়ের উপর অতিরিক্ত আয় লাভ করিতে পারে না। দীর্ঘকালীন সময়ে

১. Samuelson : "The return to any factor in temporarily fixed supply is sometimes called a Quasi-Rent."

এই সকল দ্রব্যের আয় উৎপাদন ব্যয়ের অপরিহার্য অংশ এবং পণ্যমূল্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন ইহাদের আয় খাজনার ন্যায় উদ্বৃত্ত পাওনারূপে গণ্য করা চলে না।

সুতরাং খাজনার সহিত খাজনার অনুরূপ আয়ের সাদৃশ্য কেবলমাত্র স্বল্পকালীন সময়েই দেখা যায়। দীর্ঘকালীন সময়ে এই সাদৃশ্য থাকে না। দীর্ঘকালীন সময়ে জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলিয়া খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখা যায়, কিন্তু খাজনার অনুরূপ আয় এই সময়ে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে পাওয়া যায় না ; ইহা তখন উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং, খাজনার অনুরূপ আয়কে খাজনা বলা যায় না। ইহা সাময়িকভাবে খাজনা।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও খাজনা

(Economic Progress and Rent)

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সহিত খাজনার সম্পর্ক কি? অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে খাজনা বাড়ে না কমে? বিষয়টি আলোচনার আগে দেখিতে হইবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিতে কি বুঝায়? অর্থনৈতিক অগ্রগতি বলিতে আমরা সাধারণত বুঝি কৃষি-উন্নয়ন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

কৃষি-উন্নয়ন বলিতে কৃষি পদ্ধতির উন্নতি বুঝাইয়া থাকে। কৃষি পদ্ধতির উন্নতির ফলাফল বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যদি দেশের সকল চাষের জমি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে ও বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে উৎপন্ন ফসলের দাম কমিবে। ফলে, প্রান্তিক জমি আর চাষাবাদে থাকিবে না। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমি প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে। উৎকৃষ্টতর জমির খাজনাও কমিবে। কিন্তু কৃষি উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাগুলি যদি কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জমিই লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ জমিগুলির খাজনা বাড়িবে। ইহার কারণ এই যে, উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে ঐ জমিতে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় কমিবে এবং প্রান্তিক জমি ও উৎকৃষ্টতর জমির ফলনের মধ্যে পার্থক্য বাড়িবে। ইহাতে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বাড়িবে। কিন্তু কৃষি পদ্ধতির উন্নতির ফলে যদি ফসলের বাজার-দাম কমিয়া যায় তাহা হইলে প্রান্তিক জমি আর কৃষিকার্যে থাকিবে না এবং তখন পূর্বে যাহা

কৃষি-উন্নয়ন

প্রান্তিক-উত্তম (intra-marginal) জমি ছিল তাহা এখন প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে। ইহার ফলে উৎকৃষ্টতর ও নূতন প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কমিয়া যাইবে এবং উৎকৃষ্ট জমির খাজনা কমিবে। আবার কৃষি পদ্ধতির উন্নতি যদি শুধু প্রান্তিক জমিতে ঘটে তাহা হইলে ঐ জমিতে ফসল উৎপাদনের ব্যয় কমিবে। ফলে, প্রান্তিক জমি ও উৎকৃষ্টতর জমিতে ফসল উৎপাদনে ব্যয় বা ফলনের ব্যবধানও হ্রাস পাইবে। ইহাতে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমিবে।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলেও খাজনা প্রভাবিত হইয়া থাকে। পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দরুন উৎপাদন স্থান হইতে দূরে অবস্থিত ও নিকটে অবস্থিত জমির মধ্যে পার্থক্য কমিয়া যায়। ইহার ফলে নিকটে অবস্থিত জমির পূর্বে যে পার্থক্য-জনিত সুবিধা ছিল তাহা হ্রাস পায়। ফলে, ঐ জমির খাজনা কমে। আবার, পরিবহণের উন্নতির দরুন দূরে অবস্থিত জমির পূর্বে যে অসুবিধা ছিল তাহা কমিয়া যায়। ফলে, ঐ জমির খাজনা বাড়ে।

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি :

লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি অর্থনৈতিক অগ্রগতির আর একটি সংকেত। যে অনুপাতে লোকের আয় ও জীবন-যাত্রার মান বাড়ে, সেই অনুপাতে তাহাদের ভোগ-ব্যয় বাড়ে না। বিশেষ করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে কৃষিজ খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় বড় একটা বাড়ে না। ফলে, জমির আয় বা খাজনা ততটা বাড়ে না।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি

পরিশেষে, দেশে জনসংখ্যা বাড়িলে তাহার প্রভাবও খাজনার উপর দেখা যায়। জনসংখ্যা বাড়িলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে চাষাবাদ প্রসারের জন্য জমির চাহিদাও বাড়িবে। ইহাতে নিকৃষ্টতর জমি চাষাবাদের অধীনে আসিবে। ফলে, পূর্বে যাহা প্রান্তিক জমি ছিল তাহা এখন প্রান্তিক-উত্তম জমিতে পরিণত হইবে। নূতন প্রান্তিক জমির এবং উৎকৃষ্টতর জমির উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বাড়িবে এবং তাহার ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা বৃদ্ধি পাইবে।

২৭ | মুনাফা
(Profit)

মুনাফার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
(Definition and Nature of Profit)

মুনাফাকে সাধারণত উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দেখা হয়। বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই মুনাফা বলিয়া ধরা হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মোট বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে উৎপাদনে নিযোজিত বিভিন্ন উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মুনাফা।

বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে উৎপাদন ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ তাহাকে মোট মুনাফা (gross profits) বলিয়া থাকেন। ইহাকে প্রকৃত, বা নীট, বা বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক মুনাফা (Real or Net or Pure or Economic Profit) বলা চলে না। তাহার কারণ এই যে, মোট বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে যে উৎপাদন ব্যয় বাদ দেওয়া হয়, উহাকে সুস্পষ্ট-ব্যয় (Explicit Costs) বলে। এই সুস্পষ্ট-ব্যয় বলিতে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি নিযোগ করিবার বাবদ পারিশ্রমিককে ধরা হয়। কিন্তু এই ব্যয় ছাড়া উৎপাদনের আরও কতকগুলি খরচ আছে যাহাকে অন্তর্নিহিত-ব্যয় (Implicit Costs) বলা হয়। উদ্যোক্তা যদি নিজের জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন করে তাহা হইলে, উহাদের সম্ভাব্য পারিশ্রমিককে অর্থাৎ ঐ সকল উপাদান অন্যত্র নিয়োজিত হইলে উদ্যোক্তা যে আয় পাইতে পারিত তাহাকে অন্তর্নিহিত-ব্যয় বলে। মোট বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে এই অন্তর্নিহিত-ব্যয় বাদ দেওয়া হয় না বলিয়া, বিক্রয়লব্ধ-আয় ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যকে নীট মুনাফা বলা যায় না। বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে অন্তর্নিহিত-ব্যয় বাদ না দিয়াই কেবলমাত্র সুস্পষ্ট-ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল মোট মুনাফা। আর বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে সমস্ত সুস্পষ্ট-ব্যয় এবং অন্তর্নিহিত-ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল প্রকৃত, বা নীট, বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক মুনাফা।

অর্থনীতিবিদ্‌গণ মুনাফা বলিতে নীট মুনাফাই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবসায়ী বা কারবারিগণ মুনাফা বলিতে বিক্রয়লব্ধ-আয় এবং উৎপাদন-ব্যয়ের (জমি, শ্রম মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলির পারিশ্রমিক) পার্থক্যকে ধরিয়া থাকেন।

মুনাফার উপাদান
(Elements of Profit)

সাধারণত মুনাফা বলিতে মোট মুনাফা ধরা হয়। ইহা উদ্যোক্তার উদ্বৃত্ত আয; উৎপাদন-ব্যয়ের উপর বিক্রয়লব্ধ-আয হইতে অতিরিক্ত পাওনা। এই মোট মুনাফাকে মিশ্র-আয (Composite income) বলা হয়; কেন না, ইহা বহুপ্রকার উপাদানে গঠিত। মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকিতে পারে :

(১) জমির মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার অনুমিত আয় : উদ্যোক্তা যদি নিজেই মালিক হন এবং সেই জমিতে উৎপাদন করেন তাহা হইলে ঐ জমির অনুমিত পারিশ্রমিক মোট মুনাফার একটি অংশ বলিয়া ধরা হয়। উদ্যোক্তা যদি ঐ জমি নিজে নিযোগ না করিয়া অন্যত্র ব্যবহার করিতে দিতেন তাহা হইলে উহা যে পরিমাণ বিকল্প-আয় (Opportunity earning) বা খাজনা অর্জন করিতে পারিত উহা মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। কেন না, উহা উৎপাদনের একটি অন্তর্নিহিত-ব্যয়।

(২) মূলধনের মালিক হিসাবে উদ্যোক্তার অনুমিত আয় : উদ্যোক্তা যদি নিজের পুঁজি উৎপাদনে নিযোগ করেন, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য এই পুঁজির অনুমিত পারিশ্রমিক মোট মুনাফার মধ্যে রহিয়া যায়। এই পুঁজি অন্যত্র খাটাইলে সে যে সুযোগ-আয় উপার্জন করিত তাহা অন্তর্নিহিত-ব্যয হিসাবে মোট মুনাফা হইতে বাদ দেওয়া উচিত।

(৩) ব্যবস্থাপক হিসাবে উদ্যোক্তার অনুমিত আয় : উদ্যোক্তা যদি নিজেই কারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দাযিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক তিনি পাইতে পারেন, অথচ তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তাহা আদায় করেন না; তাহাও মোট মুনাফার মধ্যে থাকিয়া যায। নীট মুনাফা নির্ণয় করিতে হইলে মোট মুনাফা হইতে উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক বাদ দিতে হয়।

মুনাফার উপাদান হিসাবে উপরে যে তিন প্রকারের পারিশ্রমিকের উল্লেখ করা হইল, উহারা প্রকৃতপক্ষে উদ্যোক্তার আয় নহে। কেন না, এই ধরনের আয় শ্রমিকও অর্জন করিতে পারে। এই প্রকারের অনুমিত পারিশ্রমিককে উৎপাদনের অন্তর্নিহিত-ব্যয় বলে। মোট মুনাফা হইতে এই অন্তর্নিহিত ব্যয় বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহাই নীট মুনাফা। নীট মুনাফা আবার বহু উপাদান মিশ্রিত আয়।

(৪) অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার : উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করা। তাহাকে ভবিষ্যতের চাহিদা ও যোগানের অনিশ্চিত ও সম্ভাব্য অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ করিতে হয়। অনেক সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে যাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার অনুমান ব্যর্থ হইতে পারে এবং তাহার লোকসান ঘটিতে পারে। ইহাকেই উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণ বলে। অবশ্য কতকগুলি ঝুঁকি আছে যেগুলি আগে হইতেই অনুমান করা যায়। এই সকল ঝুঁকির বীমাকরণ দ্বারা মোকাবিলার ব্যবস্থা করা চলে, কিন্তু আবার কতকগুলি ঝুঁকি আছে যেগুলি আগে হইতে অনুমান করা যায় না, বীমা দ্বারা মোকাবিলাও করা চলে না। এই প্রকার ঝুঁকিকে অনিশ্চিত ঝুঁকি বলে। উদ্যোক্তাকে যদি কোন পুরস্কার না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে এইরূপ অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণে রাজী হইবে না। সুতরাং অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার নীট মুনাফার একটি অন্যতম অংশ।

(৫) একচেটিয়া কারবারের লাভ : পণ্যের বাস্তব বাজার একচেটিয়া কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতাসম্পন্ন হয়। ফলে, উদ্যোক্তাগণ বাজারের উপর কম-বেশি একচেটিয়া কর্তৃত্ব খাটাইতে সক্ষম হয়। তাহারা দ্রব্যের যোগান ইচ্ছামত কমাইয়া বাজার-দাম এমনভাবে বাড়াইতে পারে যাহার ফলে অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করা সম্ভব হয়। বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা না থাকার দরুন উদ্যোক্তাগণ এইরূপে যে অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়, উহাও নীট মুনাফার একাংশ।

(৬) উদ্ভাবন, ও বাণিজ্যিক প্রয়োগ জনিত সাফল্যের পুরস্কার : অধ্যাপক শুম্পিটারের মতে, উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কাজ হইল নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার এবং উহাদের বাণিজ্যিক প্রয়োগ দ্বারা নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলন ও নূতন ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা

করা। যে উদ্যোক্তা এই কাজে সাফাল্য লাভ করেন, তিনি নূতন উদ্ভাবিত পণ্যটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রয় করিয়া অন্যান্য প্রতিযোগী উদ্যোক্তা অপেক্ষা অধিক মুনাফা লাভ করিয়া থাকেন। তাহার নূতন উদ্ভাবনের সাফল্যের এই পুরস্কার নীট মুনাফার একাংশ বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে।

(৭) আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত আয়: অনেক সময় উদ্যোক্তাগণ সাময়িক কারণবশত কিংবা কোন অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত (windfall) আয় উপার্জন করিতে সমর্থ হন। দেশে যদি যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয় কিংবা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয, তাহা হইলে তাহারা সেই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ লইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করিতে পারেন। এইরূপ অতিরিক্ত আয় নীট মুনাফার একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়।

মুনাফা ও অন্যান্য উপাদান-আয়ের পার্থক্য
(Differences between Profit and other Factor Incomes)

মুনাফার প্রকৃতি ভালভাবে বুঝিতে হইলে ইহাকে অন্যান্য উপাদানগুলির আয হইতে পৃথক করা প্রয়োজন। মুনাফা এবং অন্যান্য উপদানগুলির আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য নির্দেশ করা যায:

(১) খাজনা, মজুরি ও সুদ প্রভৃতি উপাদানগুলি আয কখনই শূন্য বা ঋণাত্মক হইতে পারে না। কিন্তু মুনাফা শূন্য এমন কি ঋণাত্মকও হইতে পারে। ভূস্বামী যদি খাজনা না পায তাহা হইলে জমি সরবরাহ করিবে না, শ্রমিক যদি মজুরি না পায তাহা হইলে কাজ করিবে না, পুঁজিপতি যদি সুদ না পায় তাহা হইলে মূলধন যোগান দিবে না। বিনা পারিশ্রমিকে এই সকল উপাদান উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু উদ্যোক্তা যদি মুনাফা না পান, কিংবা তাহার যদি সাময়িক লোকসানও হয় তাহা হইলে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধ করিবেন না।

অন্যান্য উপাদান আয শূন্য বা ঋণাত্মক হইতে পারে না, কিন্তু মুনাফা শূন্য বা ঋণাত্মক হইতে পারে

(২) অপরাপর উপাদান-আয়ের তুলনায় মুনাফা অধিক পরিবর্তনশীল। খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি আয় পণ্যের দাম পরিবর্তনের সঙ্গে খুব বেশি উঠা-নামা করে না। সমৃদ্ধির সময় এই সকল আয়ের যে হার থাকে,

মন্দার সময় সেই হারের হ্রাস হয় যৎসামান্য। কিন্তু সমৃদ্ধির সময় উদ্যোক্তাগণ যে পরিমাণ মুনাফা উপার্জন করিয়া থাকেন মন্দার সময় উহা আশ্চর্য রকম কমিয়া থাকে। এই সময়ে মুনাফা শূন্য হইতে পারে কিংবা উদ্যোক্তাগণকে লোকসানেও পণ্য বিক্রয় করিতে হইতে পারে। পণ্য-মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষভাবে ঘটিয়া থাকে।

অন্যান্য উপাদান আয়ের তুলনায় মুনাফা অধিক পরিবর্তনশীল

(৩) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি আয়গুলি পণ্য উৎপাদনের আগেই চুক্তিদ্বারা নির্ধারিত হয়। ভূস্বামী কি হারে খাজনা পাইবেন, শ্রমিক কি হারে মজুরি পাইবে এবং পুঁজিপতি কি হারে সুদ পাইবে, তাহা উৎপাদনে নিযুক্ত হইবার পূর্বেই নির্ধারিত হয় বলিয়া ঐ সকল আয় সুনিশ্চিত। কিন্তু মুনাফা আগাম চুক্তিদ্বারা নির্দিষ্ট হয় না; সেই জন্য মুনাফা সুনিশ্চিত আয় নহে। মুনাফা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়লব্ধ-আয় ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যের উপর। বিক্রয়লব্ধ-আয় উৎপাদন-ব্যয়ের উপর উদ্বৃত্ত হইবে কিনা এবং কতটা পরিমাণে হইবে তাহা না দেখিয়া মুনাফা নির্ধারণ করা যায় না।

অন্যান্য উপাদান আয় পূর্বনির্দিষ্ট ওসুনিশ্চিত: মুনাফা পূর্বনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত নয়

(৪) খাজনা, মজুরি, সুদ প্রভৃতি উৎপাদন-আয়গুলি উৎপাদন-ব্যয়ের অংশবিশেষ; কিন্তু মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ নহে। মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের উপর বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে উদ্বৃত্ত পাওনা।

অন্যান্য আয় উৎপাদন ব্যয়ের অংশ, মুনাফা উদ্বৃত্ত পাওনা

অন্যান্য উপাদান-আয়ে মুনাফার অস্তিত্ব
(Profit Element in other Factor-Incomes)

অর্থবিদ্যার প্রচলিত রীতি অনুসারে উৎপাদনের চারিটি উপাদান আছে বলিয়া ধরা হয়। এই উপাদানগুলি হইল জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। ইহাদের প্রত্যেকটি উপাদানের আয়কে যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা বলা হয়। সংগঠন হইল উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান। যিনি উৎপাদনের সংগঠন বা ব্যবস্থাপনা করেন সেই উদ্যোক্তার আয়কে মুনাফা বলা হয়। সুতরাং, মুনাফা হইল চতুর্থ উপাদান সংগঠন, কর্তা বা উদ্যোক্তার আয়। ভূস্বামী যেমন খাজনা, শ্রমিক যেমন মজুরি এবং পুঁজিপতি যেমন সুদ

উপার্জন করেন, উদ্যোক্তাও তেমনি মুনাফা উপার্জন করেন। সুতরাং, মুনাফা অন্যান্য উপাদানের আয়ের মতই একটি উপাদানের (অর্থাৎ সংগঠনের) আয় ছাড়া কিছু নহে।

কিন্তু উপরের ধারণাটি সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীট মুনাফার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে এবং কি কি কারণে উহার উৎপত্তি হইতে পারে সন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মুনাফা একটি পৃথক উপাদানের আয় মাত্র নহে। অন্যান্য উপাদানগুলির আয়ের মধ্যেও মুনাফা নিহিত থাকিতে পারে। বাস্তব দৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, কোন উপাদানের আয়ের মধ্যেই অন্যান্য উপাদানের আয়গুলির কিছু-না-কিছু মিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান[১]। সকল উপাদান আয়ই কম-বেশি সংমিশ্রিত আয় যাহা হইতে কোন আয়কে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নহে। নীট মুনাফা একাধিক উপাদানে গঠিত এবং একাধিক কারণে উদ্ভব হইয়া থাকে। অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণ, একচেটিয়া কারবারের কর্তৃত্ব লাভ, নূতন নূতন আবিষ্কার ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগজনিত সাফল্য, আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতির দরুন উদ্যোক্তা নীট মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপাদানগুলিও উদ্যোক্তার মত অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণ, অপ্রত্যাশিত সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি অল্পবিস্তর লাভ করিতে পারে। ফলে, উৎপাদনের এই উপাদানগুলি উহাদের স্বাভাবিক আয়ের চেয়ে অতিরিক্ত আয় উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নীট মুনাফার একটি অংশ। কিন্তু উৎপাদনে কেবলমাত্র উদ্যোক্তাই ঝুঁকি বহন করেন না। ভূস্বামী যখন জমি ইজারা দেয় কিংবা উৎপাদনে নিয়োগ করে, শ্রমিক যখন শ্রম যোগান দেয়, পুঁজিপতি যখন মূলধন বিনিয়োগ করে তখন ইহারা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহন করিয়া থাকে। ফলে, ভূস্বামী যে খাজনা পায়, শ্রমিক যে মজুরি লাভ করে, এবং পুঁজিপতি যে সুদ পাইয়া থাকে উহাদের প্রত্যেকেই

মুনাফা একটি পৃথক উপাদানের আয় মাত্র নহে, অন্যান্য উপাদান আয়ের মধ্যেও ইহা নিহিত থাকিতে পারে

১. Samuelson : "Profit is not simply a factor return like wages, interest or rent. Profit is a part of these factor returns"

Blang : "It is not a distinct distributive share, but it is an element found in the payments to all productive agent"

নিজ নিজ স্বাভাবিক আয়ের অতিরিক্ত ঝুঁকি বহনের পুরস্কারস্বরূপ অতিরিক্ত আয় লাভ করিয়া থাকে। স্বাভাবিক আয়ের উপর এই অতিরিক্ত 'পাওনাকেই' উহাদের আয়ের মধ্যে মুনাফা জাতীয় অংশ হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং, মুনাফা কেবল চতুর্থ উপাদান সংগঠন বা উদ্যোগের প্রাপ্য আয় নহে, অন্যান্য উপাদান-আয়গুলির মধ্যেও কিছু কিছু মুনাফার অংশ নিহিত থাকিতে পারে।

মুনাফার বিভিন্ন তত্ত্ব
(Different Theories of Profit)

মুনাফার কি করিয়া উৎপত্তি হয় এ সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। নিচে আমরা মুনাফা সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি। এই তত্ত্বগুলির কোনটাই পৃথকভাবে দেখিতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। তবে প্রত্যেকটি তত্ত্বের পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা আছে এই কারণে যে, উহাদের প্রত্যেকটি মুনাফার কোন বিশেষ একটি প্রকৃতির উপর আলোকপাত করিয়াছে।

মুনাফার খাজনা-তত্ত্ব
(Rent Theory of Profit)

মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ অধ্যাপক ওয়াকার খাজনা-তত্ত্ব দ্বারা মুনাফা ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মুনাফা উদ্যোক্তার কোন কাজের পুরস্কার নহে। ইহা তাঁহার যোগ্যতার জন্য প্রাপ্য উদ্বৃত্ত আয়। জমি যেমন উর্বরতা ও অনুকূল অবস্থানের দিক দিয়া বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়, তেমনি উদ্যোক্তাকেও তাহার যোগ্যতার দিক হইতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রান্তিক জমি যেমন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ প্রান্তিক-উদ্যোক্তাও উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফা লাভ করিতে পারে না। প্রান্তিক-উদ্যোক্তা বলিতে সেই সংগঠন-কর্তাকে বুঝায় যাহার যোগ্যতা কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় তুলিয়া লইতে পারে, ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে সমর্থ নহে। যে উদ্যোক্তাগণ প্রান্তিক-উদ্যোক্তার চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন তাহারাই শুধু খাজনার ন্যায় উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং, মুনাফাকে খাজনার ন্যায় পার্থক্যমূলক আয় বলিয়া গণ্য করা যায়। প্রান্তিক-উত্তম

উদ্যোক্তা প্রান্তিক উদ্যোক্তা অপেক্ষা যে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত আয় লাভ করে উহাই মুনাফার পরিমাপ (Profits are a surplus of the intra-marginal over the marginal producer)। একদিকে খাজনা যেমন উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া দাম নির্ধারণ করে না, অপরপক্ষে দামের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে, মুনাফাও উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে দামের দ্বারাই নির্ধারিত হইয়া থাকে, দাম নির্ধারণে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত লাভ অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বাড়ে, আবার দাম হ্রাসের ফলে মুনাফা কমিতে থাকে। দাম ও উৎপাদন ব্যয় সমান হইলে মুনাফা শূন্যে পরিণত হয়।

কিন্তু মুনাফার এই তত্ত্বটি নিম্নলিখিত একাধিক কারণে সমালোচনা করা হইয়াছে :

সমালোচনা

(১) এই তত্ত্বটি উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিককে (earnings of management) মুনাফা-ভুক্ত করে নাই। ইহা মুনাফাকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে মনে করায় মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নহে বলিয়া প্রচার করিয়াছে। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের একটি অতি প্রয়োজনীয় অংশ।

(২) অনিশ্চিত ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। এই ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নীট মুনাফার একটি বিশেষ অংশ। মুনাফার খাজনা-তত্ত্বে বিষয়টি একেবারে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

(৩) মুনাফার প্রকৃত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা অবস্থা বিশেষে শূন্যে পরিণত হইতে পারে আবার ঋণাত্মকও হইতে পারে। মুনাফা যদি খাজনার মত উদ্বৃত্ত আয়ই হইবে, তাহা হইলে উহা শূন্য বা ঋণাত্মক আয় কেমন করিয়া হইতে পারে ?

(৪) যৌথ মূলধন কোম্পানিগুলি যে লভ্যাংশ বা মুনাফা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকে তাহাকে যোগ্যতার দরুন উপার্জিত উদ্বৃত্ত আয় কিছুতেই বলা চলে না। শেয়ার হোল্ডারগণ কোম্পানির সংগঠন কার্যে কোন অংশই গ্রহণ করে না। সুতরাং, তাহারা যে মুনাফা লাভ করে উহা মোটেই যোগ্যতার পুরস্কার নহে।

উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলির জন্য মুনাফার খাজনা-তত্ত্বটিকে পরিহার করা হইয়াছে।

মুনাফার ঝুঁকি-তত্ত্ব
(Risk Theory of Profit)

অধ্যাপক হলে (Hawley) ঝুঁকি-তত্ত্ব দ্বারা মুনাফার বাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একটি অপরিহার্য কার্য। এই ঝুঁকি গ্রহণের দরুনই মুনাফার উৎপত্তি। উৎপাদন কার্য শুরু হইবার সময় হইতে শেষ অবধি উদ্যোক্তাকে বহু রকমের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে হয়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে বর্তমানে পণ্য উৎপাদন করিতে হয়। ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য হয়তো তাহাকে লোকসান দিয়া বিক্রয় করিতে হইতে পারে। লোকসানের সমস্ত ঝুঁকি তাহাকেই বহন করিতে হয়। জমি, পুঁজি, শ্রম প্রভৃতি উপাদানগুলি আগাম চুক্তিবদ্ধ পারিশ্রমিকে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। উহাদের কোনরূপ লোকসানের ঝুঁকি বহন করিতে হয় না। অথচ এই ঝুঁকি গ্রহণের কাজ মোটেই প্রীতিকর নহে। আবার, এই ঝুঁকি বহন না করিলেও পণ্যের উৎপাদন সংগঠিত হইতে পাবে না। যাহাতে এই কাজ গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত সংখ্যক উদ্যোক্তা আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন। মুনাফা হইল উদ্যোক্তা-গণকে ঝুঁকি বহনে আকৃষ্ট করিবার সেই পুরস্কার। মুনাফা হিসাবে কোন পুরস্কার না পাইলে উদ্যোক্তাগণ সংগঠন কার্যের ঝুঁকি বহন করিতে অগ্রসব হইবে না, তাহারা অন্যত্র বেতনভোগী ম্যানেজারের কাজ গ্রহণ করিবে। মুনাফাকে উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে ধরিলে উহাকে আব উদ্বৃত্ত আয় বলিয়া গণ্য করা চলে না, উহাকে উৎপাদন ব্যয়ের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

মুনাফার ঝুঁকি-তত্ত্বে কিছুটা সত্য নিহিত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া মুনাফার সমস্তটাই যে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার তাহা সত্য নহে। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত একাধিক সমালোচনা করা হইয়াছে :

সমালোচনা

(১) ঝুঁকি বহন উদ্যোক্তার একমাত্র কার্য নহে। উদ্যোক্তার বহু রকমের কার্যের মধ্যে ঝুঁকি বহন অন্যতম। সুতরাং, ঝুঁকি বহনের পুরস্কারই মুনাফার সবটা নহে। ঝুঁকি বহনের পুরস্কার মুনাফার একটি অংশ বা উপাদান মাত্র।

(২) এই তত্ত্ব মুনাফার সহিত ঝুঁকি বহনের সম্পর্ক আছে নির্দেশ করিয়া

এই ইঙ্গিত করে যে, যে উদ্যোক্তা যত বেশি ঝুঁকি বহন করে সে তত বেশি মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এ যুক্তিটি সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া যায় না।

(৩) অধ্যাপক নাইট (Knight) মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুনাফা সমস্ত রকম ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নহে। যে কোন রকম ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি হয় না। তাঁহার মতে, উৎপাদনে প্রধানত দুই প্রকারের ঝুঁকি থাকিতে পারে। এক প্রকারের ঝুঁকি আছে যাহা আগেভাগে অনুমান করা যায়, যাহার বিপক্ষে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে বীমাকরণ সম্ভব হয়। এই ধরনের ঝুঁকি বহনের পুরস্কার মুনাফা নহে। আর এক প্রকারের ঝুঁকি আছে যাহা পূর্বে অনুমান করা সম্ভব নহে, এবং যাহার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক কোন ব্যবস্থা আগে হইতে গ্রহণ করা যায় না। নাইট এই শ্রেণীর ঝুঁকিকে 'অনিশ্চয়তা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং, মুনাফা যে কোন ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নহে, ইহা অনিশ্চিত ঝুঁকি কিংবা অনিশ্চয়তার (Uncertainty) পুরস্কার।

(৪) অধ্যাপক কার্ভার বলেন, ঝুঁকির দরুন মুনাফার উৎপত্তি নহে, ঝুঁকি এড়াইবার বা ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করিবার ফলেই মুনাফার উদ্ভব হইয়া থাকে। উদ্যোক্তা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার স্বরূপ মুনাফা লাভ করেন, সে ঝুঁকি এড়াইতে পারে না বলিয়াই মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে।

অনিশ্চয়তা বহন ও মুনাফা
(Uncertainty bearing and Profit)

অধ্যাপক নাইটের মতে, মুনাফা ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়, ইহা অনিশ্চয়তা কিংবা অনিশ্চিত ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। তিনি কারবারের ঝুঁকিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। কতকগুলি ঝুঁকি নিশ্চিত, আবার কতকগুলি ঝুঁকি অনিশ্চিত। অনিশ্চিত ঝুঁকিগুলিকে তিনি অনিশ্চয়তা (Uncertainty) আখ্যা দিয়াছেন। নিশ্চিত ঝুঁকিগুলি পূর্ব হইতে অনুমান-সাপেক্ষ। এই প্রকার ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমাকরণ দ্বারা প্রতিকার-ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি হইতে যে ক্ষতি হইতে পারে, উহা নিশ্চিত ঝুঁকি। এই

প্রকার ঝুঁকি গ্রহণের দরুন মুনাফার উৎপত্তি হয় না। মুনাফা এই ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার হইতে পারে না। কিন্তু আর একশ্রেণীর ঝুঁকি আছে যাহা পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় না। এই প্রকার ঝুঁকিকে অনিশ্চিত ঝুঁকি কিংবা 'অনিশ্চয়তা' বলা হয়। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা দ্বারা এই প্রকার ঝুঁকি দূর করা যায় না। উদ্যোক্তাকে উহা বহন করিতেই হয়। যেমন, বাণিজ্য-চক্রের পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি, নূতন উদ্ভাবনের ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম অকেজো হইয়া পড়িবার ঝুঁকি, প্রতি-যোগিতার ঝুঁকি ইত্যাদি অনিশ্চিত ঝুঁকি বা 'অনিশ্চয়তা'। এই অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা অনুমান সাপেক্ষ নয় বলিয়া উদ্যোক্তাকে এই ঝুঁকি বহন করিতেই হইবে, নতুবা উৎপাদন সংগঠিত হইতে পারে না। কিন্তু সমাজে অনিশ্চয়তা বহনের উপযোগী উদ্যোক্তার যোগান চাহিদার অনুপাতে কম। মুনাফা স্বরূপ পুরস্কার না পাইলে কোন উদ্যোক্তাই অনিশ্চিত ঝুঁকি বা 'অনিশ্চয়তা' গ্রহণে রাজী হইতে পারে না।

সমালোচনা

অনিশ্চয়তা বহনের তত্ত্বটি ঝুঁকি বহনের তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নততর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহারও নিম্নলিখিত কতকগুলি ত্রুটি আছে :

(১) মুনাফাকে শুধু অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। কেন না, উদ্যোক্তার অনিশ্চয়তা বহনই একমাত্র কাজ নহে। তাহাকে বহুবিধ কাজ করিতে হয়। উহাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বহন অন্যতম। তাহাছাড়া, শুধু অনিশ্চয়তা বহনের ভয়ে উদ্যোক্তার যোগান সীমিত হয় না। উদ্যোক্তার যোগান চাহিদার অনুপাতে কম হয় আরও অনেক কারণে। যেমন, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস (social stratification) ও পরিবেশ, অপূর্ণাঙ্গ বাজার, মূল্যস্তর, অর্থের যোগান ইত্যাদি।

(২) যাহারা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাহাদের মতে অনিশ্চয়তা বহন উৎপাদনের একটি পৃথক উপাদান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তা বহন পৃথক একটি উপাদান নহে। অনিশ্চয়তা বহন উদ্যোক্তার কার্যাবলীর একটি বিশেষ অংশ বা গুণ মাত্র।

(৩) অনিশ্চয়তা বহন উদ্যোক্তার মনোগত বিষয়। অর্থের মাধ্যমে ইহা পরিমাপ করা সম্ভব নহে। সুতরাং উহা দ্বারা মুনাফার পরিমাণ নির্ধারিত হইতে পারে না।

(৪) অনিশ্চয়তা বহনের তত্ত্বটি মুনাফার আংশিক ব্যাখ্যান মাত্র। অনিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের ফলেও যে মুনাফার উৎপত্তি হইতে পারে এই তত্ত্বে তাহা আলোচনা করা হয় নাই।

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুনাফার অনিশ্চয়তা বহনের তত্ত্বটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ কথা খুবই সত্য যে, অনিশ্চয়তা বহন মুনাফা উৎপত্তির একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

মুনাফার গতিশীল-তত্ত্ব
(Dynamic Theory of Profit)

মার্কিন অধ্যাপক ক্লার্কের মতে, মুনাফা হইল উদ্বৃত্ত আয়। দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যই মুনাফা। এই পার্থক্য কেবল গতিশীল পরিবর্তনের ফলেই দেখা দেয়। সুতরাং মুনাফা হইল সক্রিয় আয়, গতিশীল পরিবর্তনের পুরস্কার স্বরূপ। ক্লার্কের মতে স্থিতিশীল অবস্থায় মুনাফার উৎপত্তি হইতে পারে না।

স্থিতিশীল অবস্থায় অর্থনৈতিক কোন রকম পরিবর্তন বা প্রগতি দেখা যায় না। এ অবস্থায় জনসংখ্যার কোন পবিবর্তন নাই, মানুষের আয়, রুচি, পছন্দ, চাহিদা ও উৎপাদন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে না। দাম, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয় বলিয়া চাহিদা ও যোগান পরস্পর ভারসাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভারসাম্যের সময় যে স্বাভাবিক মুনাফা পাওয়া যায়, উহা গড় ব্যয়ের অংশবিশেষ। এই স্বাভাবিক মূনাফা উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনার মজুরি (Wages of superintendence or earnings of management)। ভারসাম্যের অবস্থায় দাম ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয় বলিয়া উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে মুনাফার উৎপত্তি হয় না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা স্থিতিশীল নহে, গতিশীল। এই অবস্থায় চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য দেখা যায় না। চাহিদা ও যোগান সদাসর্বদা পরিবর্তনশীল বলিয়া দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়। এই পার্থক্যের দরুনই মুনাফা উদ্বৃত্ত আয়ের আকারে দেখা যায়। প্রচলিত পথে চলা উদ্যোক্তার কাজ নহে। তিনি নূতন নূতন পথের সন্ধান দিবেন। দূরদৃষ্টি ও যোগ্যতার দ্বারা সাম্যাবস্থার পরিবর্তন এবং চাহিদা ও যোগানের

মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি করাই তাহার প্রধান কাজ। এইভাবে স্থিতিশীল অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং উহার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত লাভ বা মুনাফা উপার্জন করা প্রকৃত উদ্যোক্তার কাজ।

কিন্তু অধ্যাপক নাইট মুনাফার এই গতিশীল তত্ত্বটির ত্রুটি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সকল রকম গতিশীল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উৎপত্তি হয় না। যে সকল পরিবর্তন পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় এবং যাহার বিরুদ্ধে উপযুক্তভাবে বীমা করা সম্ভবপর, সেইরূপ পরিবর্তনের দ্বারা মুনাফার উদ্ভব হয় না। কেবলমাত্র যে সকল পবিবর্তন পূর্ব হইতে অনুমান করা যায় এবং যাহার বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, উহারাই মুনাফা উৎপত্তির কারণ। অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণ যে মুনাফা উৎপত্তির অন্যতম কারণ তাহা ক্লার্কের তত্ত্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই। তাহাছাড়া, এই তত্ত্বে মুনাফার পার্থক্য কেন হয় তাহার সন্ধানও পাওয়া যায় না। উদ্যোক্তার যোগ্যতার তারতম্যের জন্য যে মুনাফার পরিমাণ কম-বেশি হইতে পারে তাহা এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নাই।

সমালোচনা

নূতন উদ্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ-তত্ত্ব
(The Innovation Theory)

অধ্যাপক স্যুম্পিটারের মতে, মুনাফা উৎপত্তির মূলে থাকে উদ্যোক্তার উদ্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ (innovation and the commercial use of a new invention)। উদ্ভাবনের বাণিজ্যিক প্রয়োগ বলিতে নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার, নূতন কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদন, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং নূতন পণ্য বাজারে প্রথম স্থাপন প্রভৃতিকে বুঝায়। যে উদ্যোক্তা এই সকল বিষয়ে অগ্রণী তাহার পক্ষে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু কোন একজন উদ্যোক্তা এই সুবিধা অধিক কাল ভোগ করিতে পারে না। অন্যান্য উদ্যোক্তাগণও নূতন নূতন উদ্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে থাকে। এইভাবে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য আর থাকে না, মুনাফাও বিলোপ পায়। কিন্তু উৎপাদনের একটি ক্ষেত্রে মুনাফা এইভাবে

লোপ পাইলেও নূতন নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের দরুন অন্যান্য ক্ষেত্রে মুনাফার উদ্ভব ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু স্যুম্পিটারের এই তত্ত্বটির প্রধান ত্রুটি এই যে, নূতন উদ্ভাবন ও উহার বাণিজ্যিক প্রয়োগের সাফল্যের ফলে যে অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইতে পারে, তাহা তিনি তলাইয়া দেখেন নাই। নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার, নূতন উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া প্রবর্তন, নূতন কাঁচামাল দ্বারা উৎপাদন, বাজারে সম্পূর্ণ নূতন পণ্য বিক্রয়ের জন্য স্থাপন প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপগুলি উদ্যোক্তাকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত মোকাবিলা করিতে বাধ্য করে। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে উদ্যোক্তাকে যে ঝুঁকি বহন করিতে হয় তাহাও স্যুম্পিটার লক্ষ্য করেন নাই। নূতন নূতন উদ্ভাবনের সফল বাণিজ্যিক প্রয়োগ করিতে হইলে উদ্যোক্তাকে যে ঝুঁকিপূর্ণ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হয় স্যুম্পিটারের তত্ত্বে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

সমালোচনা

অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মুনাফা
(Imperfect Competition and Profit)

আধুনিক অনেক অর্থনীতিবিদের ধারণা এই যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানই মুনাফা উপার্জন করিতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের যখন ভারসাম্য স্থাপিত হয়, তখন দাম ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে বটে, কিন্তু এই স্বাভাবিক মুনাফা ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক হিসাবে গড় ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকে। স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত কোন উদ্বৃত্ত আয় প্রতিষ্ঠান উপার্জন করিতে পারে না।

কিন্তু একচেটিয়া এবং অন্যান্য প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে উদ্যোক্তাগণ দ্রব্য যোগান ও বাজার-দামকে প্রভাবিত করিয়া স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। এই প্রকারের বাজারে উদ্যোক্তাগণ অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে নিয়োগ করিতে পারে। ইহার ফলে গড় ব্যয় হ্রাস করা সম্ভবপর হয়। আবার, অপরদিকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পণ্য যোগানের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে পারে। ইহার ফলে চড়া দামে পণ্য

বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। এইভাবে দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া অনিখুঁত বাজারে উদ্যোক্তাগণ স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং বলা চলে যে, একচেটিয়া ও অন্যান্য প্রকারের অনিখুঁত বাজারে উদ্যোক্তার পণ্য যোগান ও দামের উপর আধিপত্যের দরুনই মুনাফার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক মুনাফা
(Normal Profit)

অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ ইংলণ্ডের প্রায় সকল অর্থনীতিবিদ্‌ই মুনাফাকে উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে না দেখিয়া উৎপাদন-ব্যয়ের একটি অপরিহার্য অংশ বা উপাদান হিসাবে দেখিয়াছেন। অধ্যাপক মার্শালের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা হইল উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা কার্যের পারিশ্রমিক (Earnings of Management)। এই ন্যূনতম পারিশ্রমিক উদ্যোক্তাকে না দিলে তাহাকে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত রাখা সম্ভব নহে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন সময়ে সকল উৎপাদক প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে।

শ্রীমতী রবিনসনের মতে স্বাভাবিক মুনাফা বলিতে উদ্যোক্তার সেই আয় বুঝায় যাহা উপার্জন করিলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণের প্রবণতা থাকে না। কোন শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যদি স্বাভাবিক মুনাফা উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তাহা হইলে উহাদের শিল্প পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং নূতন কোন প্রতিষ্ঠানেরও ঐ শিল্পে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু বাস্তবে মুনাফা স্বাভাবিক হয় না। প্রকৃত মুনাফার (actual profit) হার কখনও স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশি, কখনও বা কম হয়। যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পে প্রবেশ করিবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মুনাফার হার প্রকৃত হারে নামিয়া স্বাভাবিক হারের সহিত সমান হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে। সেইরূপ যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে। ফলে, বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পাইবে এবং প্রকৃত মুনাফা বাড়িয়া স্বাভাবিক হারের

সমান হইবে। সুতরাং, প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে কম-বেশি হইলেও, উহার সবসময়ই স্বাভাবিক মুনাফার সহিত সমান হইবার দিকে ঝোঁক থাকে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফা
(Profit in Socialist Economy)

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা ভোগের পক্ষে কোন সমর্থন নাই। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন এবং সকল রকম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। ফলে, সমাজতন্ত্রবাদিগণ মনে করেন, মুনাফা উদ্যোক্তার ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক নহে, উহা তাহার শোষণের পুরস্কার। উদ্যোক্তা শ্রমিককে প্রকৃত প্রাপ্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করিয়া এবং ভোগকারিগণের নিকট অধিক দামে পণ্য বিক্রয় করিয়া মুনাফার অংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মুনাফা সমাজতান্ত্রিকগণের মতে একরকম চুরি করা আয়।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের সকল উপাদানগুলির মালিক রাষ্ট্র নিজে। রাষ্ট্রই উদ্যোক্তা হিসাবে উৎপাদনের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার কার্য গ্রহণ করিয়া থাকে। রাষ্ট্র উৎপন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া যাহা আয় হয় তাহা রাষ্ট্রই মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করে। বাজারে কোন প্রতিযোগী উৎপাদক বিক্রেতা না থাকায় রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষা বাজার-দাম বেশি ধার্য করিতে পারে। এই ভাবে বিক্রয়লব্ধ-আয় হইতে উৎপাদন-ব্যয়ের অতিরিক্ত যে অর্থ পাওয়া যায় উহা দ্বারা সরকার ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়া থাকে। মুনাফা রাষ্ট্রচালিত বিভিন্ন বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করিতে সহায়তা করিয়া থাকে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ সম্পদ দ্বারা অগণিত উদ্দেশ্য মিটাইতে হয়। বিভিন্ন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র উহার বিনিয়োগের কার্যসূচী নির্ধারণ করে। মুনাফা এই উৎপাদনশীলতা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়া থাকে।

স্থিতিশীল অবস্থায় মুনাফা
(Profit in a Static State)

যে অবস্থাতে চাহিদা ও যোগানের শক্তিগুলি অপরিবর্তিত থাকে, উহাকে স্থিতিশীল অবস্থা বা স্থিতিশীল অর্থনীতি বলে। এই অবস্থাতে চাহিদার দিক হইতে জনসংখ্যা, লোকের আয়, পছন্দ, রুচি প্রভৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না। আবার যোগানের দিক হইতেও উপাদানগুলির পরিমাণ ও দাম, উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠন, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদিতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। ফলে, চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটে না। এই অবস্থায় দ্রব্যমূল্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে বটে, কিন্তু ঐ মুনাফা গড় উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদ্যোক্তা বা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান উদ্বৃত্ত আয় হিসাবে বিশুদ্ধ মুনাফা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং স্থিতিশীল অবস্থায় বিশুদ্ধ মুনাফা অন্তর্হিত হয়।